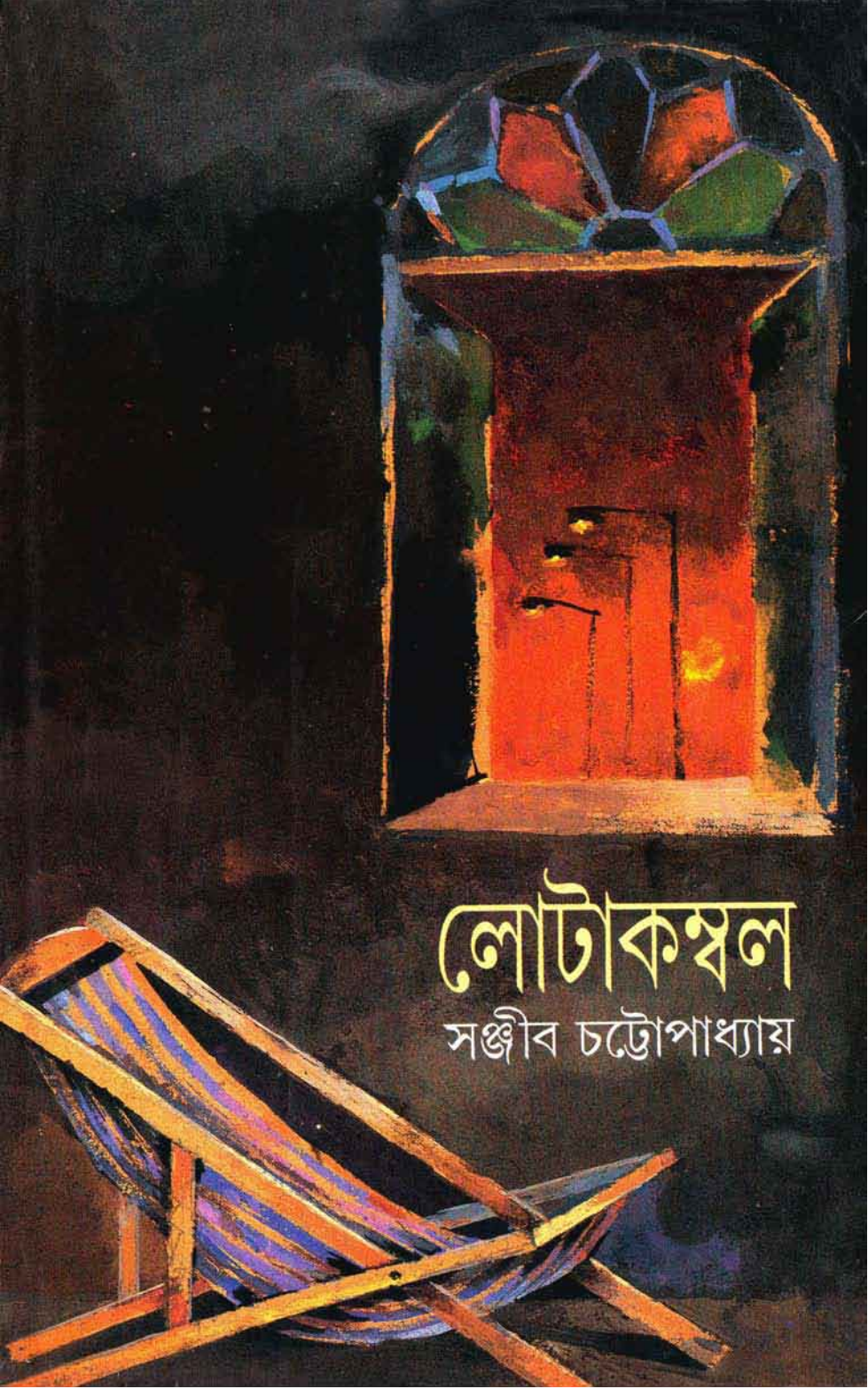

লোটাকম্বল

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

'লোটা-কম্বলের' প্রথম পর্ব শেষ হওয়ামাত্রই 'দেশে'র দপ্তরে আসতে শুরু করেছিল দ্বিতীয় পর্বের জন্য অসংখ্য অনুরোধ। তারই ফলশ্রুতিরূপে এই নবপর্বে প্রাপ্তি ঘটে পূর্বের মতোই আত্মজীবনীর মাত্রায় রচিত হয়েও ভিন্ন-স্বাদের বিচিত্র-মধুর একটি উপন্যাস। রঙ্গে-ব্যঙ্গে, বিরহ-মিলনে, প্রেয়-শ্রেয়ের ঐকতানে এই পর্ব যেন হয়ে উঠেছে নান্দনিক নবরসে তরঙ্গায়িত এক মূর্ছনা।
দ্বিতীয় পর্বের সূচনায় এক দার্শনিক অভিব্যক্তিতে 'আমি'র আবির্ভাব। ...উদাসীন পৃথিবীতে, জগৎ যেমন চলার চলছিল—তারই মাঝে চলমান সে হঠাৎ নিজেকে আবিষ্কার করলো, 'আমি যেন অন্য জগতের মানুষ, এই মাত্র পৃথিবীতে বেড়াতে এসেছি'...আদর্শব্রতী নিরুদ্দিষ্ট পিতাকে এক কঠিন মুহূর্তে ফিরে পেলেও নিজেকে খুঁজে পেতে তাকে হাত বাড়াতে হয়েছে একদা-বান্ধবী মুকুর দিকেই। নতুন মূল্যবোধ নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে মুকু। রূপসী মুকুর রক্তমাংসের শরীরটার লাবণ্য ভেদ করে ক্রমেই প্রকটিত হয়ে পড়েছে আর এক মুকু—নারীর সুষমা আর দৃঢ়তার পৌরুষযোগে অনবগুণ্ঠিতা এক মানবী।
পৈত্রিক বাস্তববোধের বাতাবরণে প্রেমিকার নবানুরাগের স্রোতে এক অভিনব মাত্রায় যেভাবে সংযোজিত হয়েছে সূর্যালোকের মতো ছোট দাদুর আধ্যাত্মিক প্রভাব, তা লক্ষ্য করলে সত্যিই বিস্ময়াবিষ্ট হতে হয়। ...এ এক অন্তর্মুখী পরিব্রাজন...অদ্ভুত এক ব্যঞ্জনায় হঠাৎ নজরে আসে যে কথা-সাহিত্যিক সঞ্জীব চিত্রশিল্পী হয়ে গেছেন। লোটাকম্বল তখন হয়ে যায় অগণিত চরিত্রের বহুবর্ণরঞ্জিত একটা বিরাট ক্যানভাস—তাতে ফ্রেম নেই। ফ্রেমের দায় পাঠক-মানসে—যেখানে স্বতঃস্পন্দনে ক্রমেই চিত্রায়িত হয়ে উঠতে থাকে উত্তরণের আহ্বানে অসীমের ইঙ্গিত—নতুন এক জীবনবোধের অপেক্ষমানতায়।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। বিষয় ছিল রসায়ন। সরকারী চাকরি করেছেন বেশ কিছুকাল। রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। বিখ্যাত এক রাসায়নিক প্রতিষ্ঠানে অ্যানালিস্টের চাকরিতে থাকাকালে তাঁর প্রথম হাসির গল্পটি লেখেন। প্রকাশিত হয় ছোট এক সিনেমা পত্রিকায়। লেখাটি পড়ে সঞ্জীব যাঁর অধীনে কাজ করতেন, তিনি বলেছিলেন— তুমি চেষ্টা করো— তোমার হবে। সেই মানুষটির সস্নেহ উৎসাহে সঞ্জীবের জীবন অন্য দিকে মোড় নিল। সরকারী চাকরিতে থাকাকালীন বেতার ও দূরদর্শনের নানা শিল্পসংক্রান্ত লেখা ও শিল্পপ্রকাশন সঞ্জীবকে এক ধরনের লেখার দিকে টেনে আনে। রঙ্গ ও ব্যঙ্গের লেখাই শুধু নয় নানা ধরনের লেখায় পারদর্শী সঞ্জীব এখন সংবাদপত্র জগতেই কর্মরত। প্রকাশিত হয়েছে অনেক বই। বিভিন্ন আঙ্গিক ও বিষয় নিয়ে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

প্রচ্ছদ ❑ সুনীল শীল

আলোকচিত্র ❑ বিবেক দাস

ISBN 81-7215-087-3

লোটাকম্বল

লোটাকম্বল

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

শ্রদ্ধেয় বিঠ্ঠল রামানুজ
শ্রীচরণে

এই লেখকের অন্যান্য বই

অগ্নিসংকেত

অচেনা আকাশ

একে একে

কলিকাতা আছে কলিকাতাতেই

ক্যানসার

ঝাড়ফুঁক

তুমি আর আমি

তৃতীয় ব্যক্তি

দুটি দরজা

দুটি চেয়ার

পায়রা

পেয়ালা পিরিচ (গল্প)

ফিরে ফিরে আসি

বসবাস

রসেবশে

রাখিস মা রসেবশে

লোটাকম্বল

শঙ্খচিল

শাখা প্রশাখা

শ্বেতপাথরের টেবিল (গল্প)

সোফা কাম বেড (গল্প)

হেঁটমুণ্ড ঊর্ধ্বপদ

১

Does the road wind up-hill all the way?
Yes, to the very end.
Will the day's Journey take the whole long day?
From morn to night, my friend.

জগৎ যেমন চলছিল, ঠিক সেইরকমই চলছে। একজন মানুষের যাই হোক না কেন, বহু মানুষের তাতে কিছু যায় আসে না। পৃথিবী বড় উদাসীন। রাজপথ খোলা ফিতের মতো সুদূরে উধাও। ব্যস্ত মানুষ। ব্যস্ত যানবাহন। সবাই যাচ্ছে। কোথাও না কোথাও যাচ্ছে। দোকানপাটে গিজগিজ করছে মানুষ। রোদ যেন রুটি সেঁকছে। কাচের মতো আকাশ।

আমি হনহন করে অনেকটা হাঁটলুম। কোথায় যাবো তা জানি না। পরামর্শ নেবার মতো কেউ নেই। হাঁটছি আর ভাবছি, থানায় যাবো না কি! একটা ডায়েরি করা যায়। তাতে যে ঘরের কথা বেরিয়ে আসবে। লজ্জার কথা। অফিসার প্রশ্ন করবেন, একজন প্রবীণ মানুষ হঠাৎ ভোররাতে বাড়ি ছেড়ে প্রায় এক বস্ত্রে চলে গেলেন কেন? কি ঘটেছিল? একজন শিক্ষিত, সর্ব অর্থে সম্পন্ন মানুষ কেন চলে গেলেন? উপেক্ষা আর অত্যাচারের মাত্রা কতটা উঠেছিল? তুমি তো তাঁর ছেলে? কি এমন করেছিলে? নেশা-ভাঙ করো? কোনও নারীঘটিত কেলেঙ্কারি? আমি তার কি উত্তর দোবো? আমি তো বোঝাতে পারব না, মহাশয়, সে এক অদ্ভুত আত্মিক সঙ্কট! মনের সেই অবস্থা, যখন মনে হয় আমার সব থেকেও কিছু নেই। আমি রিক্ত, শূন্য, শ্রান্ত।

তোমার কথা হেথা কেহ তো বলে না, করে শুধু মিছে কোলাহল
সুধাসাগরের তীরেতে বসিয়া পান করে শুধু হলাহল ॥

এই তুমিকেই তো বোঝান যাবে না। আমির সংসারে তুমি আবার কে? তারপর চাইবেন ছবি। জানতে চাইবেন, কোথায় যাওয়া সম্ভব বলে আমি মনে করি।

আরও আধ মাইলটাক হাঁটার পর সিদ্ধান্তে এলুম, থানায় যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। থানার পরিবেশে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ব। সিদ্ধান্তে আসার পর আমার গতি মন্থর হল—তাহলে আমি চলেছি কোথায়! সারা ভারত পদব্রজে ঘুরে বেড়ালেই কি আমার পিতা হরিশঙ্কর ফিরে আসবেন। তিনি হটকারী নন। আবেগের বশে কোনও কাজ করেন না। ক্ষণে ক্ষণে তাঁর মত, তাঁর সিদ্ধান্ত পাল্টায় না। ইস্পাত-কঠিন এক মানুষ। সব ছেড়ে, সব ঝুট হায়, বলে চলে গেছেন। আমি থেমে পড়লুম। পথের পাশে কৃষ্ণচূড়ার ছায়ায়। এলোমেলো ভাবনা আমাকে উতলাই করছে, কোনও পথ দেখাতে পারছে না। পিতার খাতায় তাঁরই হাতে লেখা সেই লাইন ক'টি ফিরে ফিরে আসছে 'যে-কর্তব্যের মুখ চেয়ে

এতকাল পুতুল খেলছিলে, তোমার সেই উত্তর-পুরুষ আজ তৈরি। জীবনের সুপথ, কুপথ, ঘুরপথ সবই চিনতে শিখেছে। স্নেহের শিকল কেটে এবার পাখিটিকে উড়িয়ে দাও। তার স্বাধীন ইচ্ছে তৈরি হয়েছে। আর তাকে প্রদীপের মতো আগলে রেখ না। এবার তাকে সাবালক হতে দাও। হাবুডুবু না খেলে সাঁতার শেখা যায় না। জেনে রাখো এক জঙ্গলে দুটো বাঘ থাকতে পারে না। তুমি তো বৃদ্ধ বাঘ হে!'

হাঁটতে, হাঁটতে আমি বাস রাস্তায় এসে পড়েছি। এদিকে, ওদিকে বাসের ছোটাছুটি। হাঁ করে দেখছি সব। আমি যেন অন্য জগতের মানুষ। এইমাত্র পৃথিবীতে বেড়াতে এসেছি অন্য কোনও গ্রহ থেকে। কোনও কিছুর সঙ্গেই আমার মনের যোগ নেই। জীবন্ত এক স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে আছি আমি। অভিমানে ভেতরটা ফুলে ফুলে উঠছে। পিতা পুত্রের সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে পারেন! জগতের সামনে আমাকে কতটা ছোট করে গেলেন! তাঁর মনে যাই থাক, পৃথিবী তো এর অন্য ব্যাখ্যা করবে! সবাই বলবে, আমি তাঁকে তাড়িয়েছি। সবাই বলবে, আমার জন্যেই তিনি আলাদা হয়ে গেলেন।

আমি এখন যাই কোথায়! অফিস তো মাথায় উঠল। কলকাতার হস্টেলে মুকু আছে। আমার প্রেমিকা। আমার জন্যেই সে কলকাতায় পড়তে এসেছে। ঠুনকো প্রেম নয়। অনেক দিন ধরেই লালন-পালন করছে। মুকুর কাছে যাবো বলেই বেরিয়েছিলুম। এখন মনে হচ্ছে কি লাভ! প্রেম বড় সুখী। আমার জীবনের ভিত ভূমিকম্পে দুলে উঠেছে। পায়ের তলায় জমি আছে বলে মনেই হচ্ছে না। সুখের বাগানে বসেই প্রেমের বাঁশি বাজানো চলে। মরুভূমির তপ্ত বালিতে, মনসা গাছের ঝোপের পাশে বসে সুন্দরী রমণীর সোহাগের কথা ভাবা যায় না। মানুষ তখন কোনওরকমে বাঁচার কথাই ভাবে। সংসার মানে সমর্থন। একা একা হয় না। সবাই হাত তুলে সমর্থন জানাবে, তবেই না আনন্দ। প্রেম মানে আনন্দ, প্রেমানন্দ।

আমি জানি, এখনি মুকুর সামনে গিয়ে দাঁড়ালে, সে চলে আসবে। কোনও কিছুর পরোয়া করবে না সেই বেপরোয়া মেয়ে। বাড়ির সদরের বিশাল তালা খুলে, মুকুকে নিয়ে আমি সেই নিরানন্দ পুরীতে গিয়ে ঢুকতে পারি। হাসতে পারি, গাইতে পারি, ভোজসভা বসাতে পারি। মনে মনে ভাবতে পারি কে কার পিতা। সাধ করে কেউ বৈরাগী হতে চাইলে, আমি কি করতে পারি। আমি সানাই বাজিয়ে, আলোর মালা ঝুলিয়ে মুকুকে বিয়ে করতে পারি। আমি চাকরি করি। আমার পদোন্নতি হয়েছে। দেরাদুনে আমি বদলি হয়েছি। সেখানে নতুন যে লেবরেটারি হচ্ছে, আমি তার ভারপ্রাপ্ত। ব্যাঙ্কে জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে সত্তর হাজার টাকা। ষাট-সত্তর ভরি সোনা বাড়িতে মজুত। আমি তো বড়লোক। আমি যদি সত্যসত্যই একটা স্কাউন্ড্রেল হতুম আমার এই মনস্তাপ হত না। বরং আনন্দে নাচতুম, সব আমার। আমি রাজা। আমি মালিক।

আমি তা পারব না। কোথায় কোন সুদূরে আশ্রয়হীন এক মানুষ, আকাশবৃত্তি করে দিন কাটাবেন আর আমি থাকব সুখশয্যায়, যুবতীর নরম বুকে মুখ গুঁজে। এ হতে পারে না। তিনি পথে নেমে আমাকেও পথে নামার ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন।

ব্যস্তসমস্ত লোকজন আমার চারপাশ দিয়ে চলেছে পৃথিবীর কাজে। জীবনসমুদ্রে আমি দাঁড়িয়ে আছি নিঃসঙ্গ নাবিকের মতো। আমার জাহাজের হাল ভেঙে গেছে। কম্পাসের কাঁটা খুলে পড়ে গেছে। কিন্তু বিষয় কি সাংঘাতিক জিনিস! হঠাৎ মনে হল, বাড়িতে কয়েক লক্ষ টাকার জিনিস পড়ে আছে, আর আমি এক সামান্য তালার ভরসায় বাড়ি ফেলে রেখে কোথায় চলেছি! কতদিনের জন্যে চলেছি!

আমি যক্ষ। আমার পিতা আমাকে যক্ষ করে রেখে চলে গেলেন। এ কি ভয়ঙ্কর শাস্তি! সকাল থেকে এক কাপ চা-ও পড়েনি পেটে। খিদেতে নাড়িভুঁড়ি জ্বলছে। ঠাণ্ডা জলে স্নান করার জন্যে শরীর ছটফট করছে। গাছের ছায়া ক্রমশ পাতলা হয়ে আসছে। একভাবে দাঁড়িয়ে থাকতেও আর ভাল লাগছে না। অবশেষে নিজের সঙ্গে একটা সমঝোতা হল। কোনও ব্যাপারেই হঠকারিতা ভাল নয়। আগে বাড়িটার একটা ব্যবস্থা করা দরকার। সোনাদানার একটা সুরক্ষার প্রয়োজন।

আবার আমি উল্টোদিকে হাঁটতে শুরু করলুম। পরামর্শ নেবার মতো একজন কাছের মানুষের নাম মনে পড়েছে। তিনি হলেন বিষ্টুদা। এতক্ষণ ওই নামটা কেন মনে পড়েনি! মাইলটাক হেঁটে বিষ্টুদার দোকানে এসে হাজির হলুম। দোকান প্রায় খালি। আজ অফিসবার। এই সময়ে কে আর দোকানে থাকবে। বিষ্টুদা সবে টিফিন করতে বসেছেন। তাঁর টুকটুকে ফর্সা মেয়েটি খাবার এনেছে বাড়ি থেকে। বিষ্টুদার প্রিয় খাবার, পরোটা, আলুর তরকারি। আমি ধপাস করে একটা বেঞ্চে বসে পড়লুম। আমার আর ক্ষমতা নেই।

একটা ঢোঁক গিলে বিষ্টুদা বললেন, 'কি হল? আজ তোমার ছুটি না কি?'

'আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। সবার আগে এক কাপ চা চাই। সকাল থেকে আমার এক গেলাস জলও জোটেনি।'

'সে কি? পরোটা খাবে? কৌটোয় আছে। খুব ভাল খেতে হয়েছে। টিপের মা খুব ভাল রাঁধে।'

বিষ্টুদার মেয়ের নামটা খুব সুন্দর, টিপ। পরোটা আমারও খুব প্রিয় খাদ্য। পেট খালি। আগুনের মতো জ্বলছে। বললুম, 'খাবো।' আরও বললুম, এই কারণে, আজ আর অন্য কিছু জোটার আশা নেই। কে রাঁধবে! উনুন ধরিয়ে রান্না চাপাবার মতো মনের অবস্থা আমার নেই।

টিপ হাসি মুখে অ্যালুমিনিয়ামের গোল টিফিন কৌটোটা আমার হাতে তুলে দিল। টিপের বয়েস হবে তের থেকে চৌদ্দর মধ্যে। অপূর্ব সুন্দরী। এই মেয়ের জন্যে বিষ্টুদার ভাবনার শেষ নেই। চারপাশের পরিস্থিতি ক্রমশই খুব জটিল হয়ে উঠছে। যুবশক্তি জেগে উঠেছে তো। পুলিশ দিয়ে ঘুম পাড়াতে হয়। টিপকে দেখলে কেবলই মনে হয়, আমার যদি ওইরকম একজন বোন থাকত!

ময়ান দেওয়া ময়দার বাদামি করে ভাজা পরোটার একটা টুকরো মুখে তুলতে গিয়ে আমার হাত থেমে গেল। কেমন করে খাব! কেবলই পিতার কথা মনে পড়ছে। এই মুহূর্তে তিনি কোথায়! তিনি তো পথেঘাটে দিন কাটানোয় অভ্যস্থ নন। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে অতিশয় খুঁতখুঁতে। বারে বারে চা খেতে ভালবাসেন। নিজস্ব বাথরুম ছাড়া অস্বস্তি বোধ করেন। মানুষের সঙ্গে তেমন মিশতে পারেন না। গ্রাম্য আলাপ-আলোচনা অপছন্দ করেন। এমন একজন মানুষ কেমন করে সন্ন্যাসী হবেন! সহসা গুরু বলে কারোকে মানতে পারেন না। তাঁর পক্ষে আশ্রমজীবন তো অসহ্য হবে! অভুক্ত, অস্নাত সেই মানুষটির মুখ আমার চোখে ভেসে উঠেছে। পরোটা খাই কেমন করে! হাত ঠোঁটের কাছে উঠছে, আবার নেমে আসছে।

টিপ দেখছিল। বললে, 'তুমি খেতে পারছ না কেন? ঘেন্না করছে?'

আমি তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলুম। চোখে জল এসে গেল।

'তুমি কাঁদছ?'

বিষ্টুদা আমার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বললেন, 'এ কি? সত্যিই তো তুমি কাঁদছ। কি

হয়েছে ?' পরোটার টুকরোটা আলুর তরকারি সমেত মুখে ঢুকিয়ে দিলুম। এক কথায় উত্তর দেবার মতো সহজ ঘটনা ঘটেনি।

বিষ্টুদা বললেন, 'ব্যাটাছেলে যখন কাঁদে তখন বুঝতে হবে সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটেছে।'

পরোটা দু'খানা কোনওরকমে খেয়ে ফেললুম। টিপ বাটি, কৌটো, যাবতীয় সব নিয়ে বাড়ি চলে গেল। বিষ্টুদা বেশ তরিবাদি করে দু'কাপ চা করলেন। চা খেতে খেতে পুরো ঘটনাটা বিষ্টুদাকে বললুম। কোনও ঝগড়া নয়, কথা কাটাকাটি নয়, তেমন কোনও ভুল বোঝাবুঝি নয়। হঠাৎ সব ছেড়ে, যতদূর মনে হয় একেবারে শেষরাতে আমার সর্বাধিক প্রিয়, শ্রদ্ধেয় বাবা, কোনও নির্দেশ না রেখে, কোনও হদিস না দিয়ে চলে গেলেন।

আমাদের দু'জনের জীবন খুব একটা সুখের ছিল না। অর্থের জন্যে নয়। অর্থের অভাব আমাদের ছিল না। ধনী না হলেও গরিব ছিলুম না আমরা। মৃত্যু। মৃত্যুর পর মৃত্যু আমাদের সংসারের খোঁটা নড়িয়ে দিয়ে গেছে। সব এলোমেলো, ছত্রাকার। কোথাও একটা আদর্শের সংঘাতও ঘটছিল। একটা সন্দেহ খেলা করছিল দু'জনের মনে। সেই সন্দেহের উৎস নারী। বিষ্টুদাকে সব কথা বলা গেল না। বলতে পারা গেল না। সন্দেহের মধ্যে একটা নীচতা থাকে যে! যাকে সন্দেহ করা হয় তার কিছু নয়, যে-সন্দেহ করে সে-ই ছোট হয়ে যায়, সঙ্কীর্ণ হয়ে যায়। আমি কিছুতেই বলতে পারলুম না, তবলাবাদক প্রফুল্লবাবু, যিনি আমার পিতার আশ্রয়ে ছিলেন, সন্দেহজনক অবস্থায় মারা গিয়েছিলেন, সেই ভদ্রলোকের স্ত্রীকে ঘিরে পিতা-পুত্রে একটা ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হচ্ছিল। বলতে পারলুম না আমি নিজে একটা কামুক, লম্পট। ভাবটা দেখাই সন্ন্যাসী হতে চাইলেই হতে পারি। আমি এক মহা ধার্মিক, বেদান্তবাদী, ত্যাগী। সাধুসঙ্গ করি। এটা আমার মুখোশ। আসলে আমি এক দুর্বলতম যুবক। কোপন স্বভাবের ভয়ঙ্কর এক চরিত্র। বয়স, সম্পর্ক কিছুই আমি মানি না। দেহবাদী শয়তান আমি। সুযোগ পেলে যে-কোনও কুকর্ম আমি করতে পারি। আমার মুখ দেখে মনের ভাব পড়ার উপায় নেই। আমার ভেতর দুটো মানুষ বাস করে, সাধু আর শয়তান। সেই শয়তান কিন্তু প্রফুল্লবাবুর স্ত্রীতে আসক্ত। সেই নারী আবার পিতার ওপর নির্ভরশীল। দুর্জ্ঞেয় নারীচরিত্র। ব্যাপারটা অতিশয় জটিল। পিতা হরিশঙ্কর পর্বতের মতোই অচল অটল। তাঁর মন বোঝার সাধ্য কারোর নেই। তিনি গুপ্তযোগী। কিন্তু! এর মধ্যে একটা কিন্তু এসে হাজির হয়েছে। হঠাৎ আমার মনে হয়েছে, ব্রহ্মচারী পিতা কিঞ্চিৎ দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। আমার পরলোকগতা মাতার স্মৃতি ক্রমশ ম্লান থেকে ম্লানতর হয়ে আসছে। সংসারের সমস্ত কর্তৃত্ব চলে যাচ্ছে ওই মহিলার হাতে। ওই মহিলা আমার পিতাকে প্রায় গ্রাস করে ফেলেছিলেন। ওই নিঃসন্তান মহিলার কামনা-বাসনা নির্বাপিত হয়নি। যৌবন বিদায় নেয়নি তাঁর শরীর থেকে। মুহূর্তে তিনি বাঘিনী হতে পারেন। একদিন ওই মহিলা আমারই এক দুর্বল মুহূর্তে আমাকে শরীর দান করেছিলেন। অক্লেশে। সেই দুর্বার আকর্ষণে আমি বড় অসহায় বোধ করেছিলুম। সেই ছিল আমার জীবনের প্রথম যোষিৎ সংসর্গ। একই সঙ্গে প্রচণ্ড পাপবোধ আর পরমানন্দে আমি দীর্ণ হয়েছিলুম। সেইরাতেই একটা বোঝাপড়া হয়েছিল, সম্পর্ক যাই হোক আমরা স্বামী-স্ত্রী। বয়সের ব্যবধান বিচারের বিষয় নয়। আমি ভালবাসি, তুমিও ভালবাস। কি অবিশ্বাস্য ব্যাপার, সেই মহিলা এক ত্রিভুজ তৈরি করে বসলেন। পিতার কঠিন বর্ম ভেদ করে জয় করে ফেললেন তাঁর মন। আমার মায়ের আঁচলে যে চাবির গোছাটি বাঁধা থাকত সেটি চলে গেল তাঁর আঁচলে। যে সব স্মৃতিতে আমরা ছাড়া বাইরের কারোর হাত দেবার অধিকার ছিল না, সেই

সব বস্তু তিনি নিঃসঙ্কোচে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। আমার মায়ের জামাকাপড় সব টেনে টেনে বের করছেন, ঝাড়ছেন, গুছোচ্ছেন, প্রশ্ন করছেন। আমাদের সমস্ত গোপনীয়তার মধ্যে প্রবেশ করতে চাইছেন। একটা অধিকার প্রতিষ্ঠার অযাচিত প্রয়াস। অবশেষে আমাকে রূঢ় হতে হল। কেন হলুম! আজ এই মুহূর্তে, বিষ্টুদাকে বলতে বসে সেই প্রশ্নের উত্তর পেলুম। ঈর্ষা। প্রচ্ছন্ন কাম। প্রবল অধিকারবোধ। জৈব তাগিদ। হাড়ে, মজ্জায়, লুকিয়ে বসে থাকা রিরংসা। কেন এই বিকৃতি? সেই জিজ্ঞাসার উত্তরও আমি যেন দিতে পারছি নিজেকে। বড় আগলে আগলে মানুষ করা হয়েছিল মা-মরা এই ছেলেটিকে। পৃথিবী থেকে আড়াল করে রাখার চেষ্টা হয়েছিল। চেষ্টা করা হয়েছিল দেবোপম করার। নানাভাবে ঠেলার চেষ্টা হয়েছিল ব্রহ্মচর্যের দিকে, সন্ন্যাসীর আদর্শের দিকে। শৈশব থেকেই যে মা-হারা। যার পরিবারে শুধুই পুরুষ, নারী তো তার কাছে এক দুর্বার কৌতূহল। স্বাভাবিক থেকে যে বঞ্চিত, সে তো অস্বাভাবিকের দিকে ছুটবেই। মহাপুরুষ সে হবে কি করে! সে কি হওয়া যায়! হয়ে আসে!

বিষ্টুদা বললেন, 'মনমরা হয়ে বসে থেকো না। যা হয়েছে তা হয়েছে। যা হবে তার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করো। সবচেয়ে বড় ভুল করেছ ওই মহিলা, মানে তোমার পাতানো কাকিমাকে মামার সঙ্গে বিদেশে পাঠিয়ে দিয়ে।'

'তা না হলে যে বাবার নামে যা-তা বদনাম হচ্ছিল। আপনি জানেন ডাকে একটা পারসেল এসেছিল। এই পাড়ারই কোনও বদমাশ পাঠিয়েছিল। সেই পারসেলের মধ্যে ছিল যৌনবিজ্ঞান, আর একটা চিঠি। অশ্লীলতম সেই চিঠি। কি লেখা ছিল জানেন—'নিজে কিনতে লজ্জা পাবেন ভেবে আমরা উপহার পাঠালুম। যে-বউভাত হল না, মনে করুন এটি সেই বউভাতেরই উপহার। খাওয়াটা পাওনা রইল মাইরি। অন্নপ্রাশনে যেন বাদ না পড়ি। বুড়ো হাড়ের ভেলকি দেখি।'

বিষ্টুদা উত্তেজিত হয়ে টুল ছেড়ে উঠে পড়লেন। এগিয়ে গেলেন চা তৈরির টেবিলটার দিকে। নিজের মনেই বললেন, 'দুনিয়াটা শালা ভগবানের চিড়িয়াখানা। নেই কাজ তো খই ভাজ।'

দু'কাপ চা তৈরি করে, এক কাপ আমাকে দিলেন, এক কাপ নিজে নিলেন, 'বুঝলে, এই পাড়াটা একেবারে থার্ডক্লাস হয়ে গেছে।'

'এটা করেছে, ওই মহিলার সেই লম্পট মামাশ্বশুরটা।'

'মিস্টার বার্নিশ।'

'মিস্টার বার্নিশ মানে?'

'বার্নিশ করা জুতো পরে না? পাইপ লাগিয়ে সিগারেট খায়! গুরুদেব লোক। যুদ্ধের সময় মিলিটারি ইউনিফর্ম সাপ্লাই করে বহুত পয়সা কামিয়েছিল। তোমার ওই প্রফুল্লকাকা তো ওই বাড়িতেই ছিল। অনেকদিন ছিল, তারপর আর পারলে না। লোকটা একটা অমানুষ। আজ বাদে কাল ঘাটে যাবে এখনও খিদে গেল না। ভগবান এইসব লোককেই বড়লোক করেন। কি বিচার মাইরি! সাধু মরে ভিক্ষে করে, শয়তানে মারে চামরমণি চাল।'

বিষ্টুদা আবার টুলে এসে বসলেন। হাতে চায়ের কাপ। রাস্তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমাকে তাহলে দেখাশোনা করার কেউ রইল না?'

'নাঃ, একেবারে একা। আপনি আমাকে বলুন, এখন আমার কি করা উচিত! আমি একটা তালা ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়েছি। অনেক দূর চলেও গিয়েছিলুম, শেষে আপনার

পরামর্শ নোবো বলে ফিরে এলুম। আমার মাথায় আসছে না কিছু। নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে আত্মহত্যা করি।'

'তোমার সঙ্গে আমার মনে হয় পূর্বজন্মের কোনও সম্পর্ক ছিল। আত্মহত্যার কথা মনেও এন না। কাপুরুষতা। জানো তো আমারও কেউ ছিল না। একেবারে অনাথ। মামার বাড়িতে পাত কুড়িয়ে মানুষ। লেখাপড়া ছেলেবেলায় হল না, কেউ স্কুলে ভর্তি করলে না বলে। চেহারাটা ভাল ছিল, কিছুকাল যাত্রাদলে নায়ক হয়েছিলুম। চরিত্রটা খরচ হয়ে যাবার ভয়ে পালিয়ে এলুম। নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখলুম। ছাপছোপ নেই ; কিন্তু খুব একটা অশিক্ষিত নই। জীবন হল ঠাণ্ডা মাথায় অঙ্ক কষা। দেখে শুনে পথ চলা। গর্তটর্তে পড়লেই বিপদ ; আর পথে অনেক গর্ত থাকবেই। আপাতত তুমি একটা কাজ করো। বাড়ি যাও। চান করো। দাড়ি কামাও। বাবার চলে যাওয়াটা পাঁচকান কোরো না। চেষ্টা করো নিজেকে স্বাভাবিক রাখতে। যেন কিছুই হয়নি। আজ দুপুরে তুমি আমার বাড়িতে খাবে। খাওয়াদাওয়ার পর আমরা দু'জনে একটা প্ল্যান করব।'

'আপনার বাড়িতে যেতে আমার লজ্জা করবে।'

'তার মানে তুমি আমাকে ঠিক আপন ভাবতে পারছ না। আর তা না হলে, আমাদের বাড়িতে খেতে তোমার ঘেন্না করছে। জাতের বিচার আসছে।'

'জাত আমাদের পরিবারের কেউই মানে না বিষ্টুদা। ঠিক আছে, আমি সব সেরে আসছি।'

সেই বিপুল, বিশাল তালাটা খুলে আবার আমার গৃহপ্রবেশ। মন চাইছে না। পা যেন আর চলছে না ! এ যেন বইয়ের মলাট খুলে অক্ষর হয়ে যাওয়া। সারা বাড়িটা যেন স্তব্ধ সংগীতের মতো। প্রতিটি ইট যেন কথা বলতে চাইছে। প্রতিটি কোণে যেন ঘটনা জমে আছে। অজস্র ঘটনা। বিশাল এক উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি ছিঁড়ে ছত্রাকার হয়ে পড়ে আছে। বহুদিন আগের একটা ঘটনা আমার মনে পড়ছে। ইঁদুরকল পাতা হয়েছিল। ভোরে উঠে দেখি ছোট্ট একটা ইঁদুর সেই কলে পড়েছে। পুঁতির মতো উজ্জ্বল দুটো চোখ। ভেলভেটের মতো মসৃণ চকচকে গা। ইঁদুরটা একেবারে শেষ মাথায় বসে আছে ভয়ে ভয়ে। মৃত্যুকে সবাই চেনে। নির্বোধ ইঁদুরও। কলটার সামনে গিয়ে বসতেই করুণ চোখে ইঁদুরটা আমার দিকে তাকিয়ে রইল। বুঝতে পেরেছিল, আমি এক ঘাতক। ইঁদুরটাকে আমি মারতে পারিনি। ছেড়ে দিয়েছিলুম। কি আর করবে ! কিছু বই আর কাগজ কাটবে। বাড়িতে পা দিয়েই মনে হল, আমি সেই কলে পড়া ইঁদুর। বিশাল এক কলে একা পড়ে আছি।

ঘরের আলনায় বাবার জামাকাপড় হ্যাঙ্গারে ঝুলছে। সমস্ত জামা আর কাপড় পাট করে আলমারিতে তুলে রাখলুম। কি পরে গেছেন বুঝতে পারছি না। চটি জোড়া পড়ে আছে। নিউকাটটা নেই। একবার সন্দেহ হল, বাড়ির কোথাও নেই তো। মন কত অবুঝ ! সত্যকে মেনে নিতে পারে না। গোটা বাড়িটা আবার আমি ঘুরে এলুম। বাথরুমে উঁকি মারলুম। নিচের সমস্ত ঘর। নিচের যে-ঘরে কাকিমা থাকতেন, সেই ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসে রইলুম। চৌকি। তার ওপর পুরু বিছানা। নিপাট চাদর। কাকিমা সবই ফেলে রেখে গেছেন ! সামান্য কিছু নিয়ে গেছেন, যা না নিলেই নয়। সাধের সেই আয়নাটা পড়ে আছে কুলুঙ্গিতে। চিরুনি। চুলবাঁধার ফিতে। বড় একটা পাউডারের কৌটো। সিঁদুর। এক পাতা টিপ। মেয়েলি যত কিছু সব পড়ে আছে। এ সবের আর কোনও প্রয়োজন নেই সেই মহিলার ; কারণ তিনি বিধবা হয়েছেন। সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়, নিঃসন্তান এক মহিলা।

বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকার পর মনে হল, সংসারের যে ছেঁড়া টুকরোটি অবশিষ্ট ছিল,

আমিই সেটাকে শেষ করে দিয়েছি। আর কিছু করার নেই। উঠে এলুম নির্জন দোতলায়। বাবার পড়ার টেবিলে রাজ্যের বই, নোট খাতা। একটু গোছগাছ করে রাখার চেষ্টা করলুম। যদি কোনওদিন ফিরে আসেন হঠাৎ। জানি সে-সম্ভাবনা খুবই কম। তিনি এগোতে জানেন। পেছবার মানুষ তিনি নন।

যে মেয়েটি কাজ করে সে এসে তালা ঝুলতে দেখে ফিরে গেছে। গত রাতের এঁটো থালাবাসন সব পড়ে আছে। ওগুলোর একটা ব্যবস্থা করা দরকার। আমার এখন গুটোবার সময়। ফলাও করে ফেঁদে বসার দিন চলে গেছে।

বেশি না, গোটাকতক বাসন। কুয়োতলায় টেনে নিয়ে মাজতে বসে গেলুম। একবার গভীর জলের দিকে তাকালুম। এই কূপ থেকেই, ঘনঘোর এক বর্ষার দুপুরে বলাইবাবু উপচে পড়েছিল। কচ্ছপ। কেমন পোষ মেনেছিল? নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করলুম! কচ্ছপ; কিন্তু ভীষণ ভদ্রলোক। সারা বাড়িতে আপন মনে ঘুরে বেড়াত। আবার কেমন? বলাইবাবু বলে ডাকলে, যেখানেই থাকুক, গুটি গুটি ঠিক ছুটে আসত। বাড়ি ছেড়ে চিরতরে চলে যাচ্ছি ভেবে, সকালে বলাইবাবুকে আবার কুয়োর মধ্যেই নামিয়ে দিয়েছিলুম। এখনও সে কি ওইখানেই আছে! বহুদিন জল ছাড়া। মরে গেল না তো! বহুক্ষণ তাকিয়ে রইলুম, যদি একবার দেখা দেয় ক্ষণিকের জন্যে! বারকতক ডাকলুম, বলাইবাবু, বলাইবাবু! জল এক অন্য জগৎ। শব্দ সেখানে পৌঁছবে না। ওই ছোট্ট কূপে বলাইবাবু কি বেঁচে থাকবে! তেমন পরিসর তো নেই! মরেই যাবে হয় তো! তার জীবনে এতকাল আমরাই হয়েছিলুম সঙ্গী। কত কি খেত! তার জন্যে বিশাল বড় মাটির গামলায় জল রাখা হত টইটম্বুর। মাঝে মাঝে সেই জলে নেমে সাঁতার কেটে আসত। ওই কূপে তার তো কোনও খাদ্য নেই!

বাসন মাজা হয়ে গেল। ভাল করে মুছে যথাস্থানে সাজিয়ে রাখলুম। বেশ বুঝতে পারছি, এই বাড়িতে একা আমার পক্ষে থাকা সম্ভব হবে না। সে-প্রশ্নও নেই। চাকরিটা আমি যদি না ছাড়ি, তাহলে, আমাকে দেরাদুনে গিয়ে নতুন দায়িত্ব নিতে হবে। সেইখানেই ফেঁদে বসব নতুন ব্যবস্থা। উত্তরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমি সম্ভব, অসম্ভব নানা কিছু ভাবতে লাগলুম। কোনও হদিশ না রেখে বাবার এই চলে যাওয়া, এ তো মৃত্যুরই সামিল। তিনি নেই। যদি সন্ন্যাস নেন, তাহলেও নেই। সংসারের কাছে তিনি অবর্তমান। তা হলে? তা হলে আমাকে তো আমার স্বাধীন পথেই চলতে হবে। এ সংসারে কে কার? একমাত্র আমিই আমার। তাঁর অভিমান থাকতে পারে, আমার অভিমান থাকতে পারে না! পিতাই এখন আমার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী। আমার জ্যাঠামশাইয়ের ভায়রাভাইয়ের ছোট মেয়ে মুকু। মুকুর দিদি কনককে আমি ভালবেসে ফেলেছিলুম। সে ছিল আমার মনের মতো। তার চাবুকের মতো শরীর। তার রসবোধ, পরিমিতিবোধ, আপন করে নেবার ক্ষমতা আমাকে বিমুগ্ধ করেছিল। আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছিল। সেই কনক কিন্তু আমাকে ছেড়ে চলে গেল। শুধু আমাকে নয়, চলে গেল সংসার ছেড়ে। মনে হয়েছিল কনকও আমাকে ভালবাসে। আমার সে-ধারণা ভুল। নারীচরিত্র দুর্জ্ঞেয়। আমাকে ভালবাসলে কি ক্ষতি হত তার! আমি যে তাকে ভীষণ ভালবাসতুম। যে-ভালবাসে মেয়েরা তাকে ভালবাসবে না। কিছুতেই না, কোনও দিনও না। এইটাই নিয়ম। যে ঘৃণা করবে, তাকেই জয় করার জন্যে এগিয়ে যাবে। সব লিভিংস্টোনের জাত। ডার্কেস্ট আফ্রিকা ছাড়া কিছুই মনে ধরে না। মুকুকে আমি তেমন ভালবাসতুম না, অথচ সেই মুকুই আমার জন্যে কলকাতায় চলে এল কায়দা করে, এম-এ পড়ার ছুতোয়।

এই মুকুকে আমি এই মুহূর্তে বিয়ে করে, দেরাদুনে গিয়ে শুরু করতে পারি আমার

সর্বোত্তম নতুন জীবন। তোফা জীবন। পাহাড়ের কোলে সুরম্য বাংলো। টিয়াপাখি রঙের একটা গাড়ি, দু'পা দূরে মুসৌরী। তিন পা দূরে হরিদ্বার।

মাঝে মাঝে মানুষ দিবা-স্বপ্ন দেখে। কল্পনায় প্রাসাদ রচনা করে। কারোর কল্পনা বাস্তব হয়, কারোর হয় না। ভেলভেটের বাক্সে জড়োয়ার অলঙ্কারের মতো সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। মাঝে মাঝে জীবনের অলস মুহূর্তে বের করে নাড়াচাড়া করে। আবার তুলে রেখে দেয়। তাতেও কত সুখ! পাওয়ার চেয়ে না পাওয়ার আনন্দ প্রভূত। বিষণ্ণতার চেয়ে একান্ত উপলব্ধি আর কি আছে! আমার বন্ধুর লেখা একটি কবিতা মনে পড়ছে :

শুরু না সমাপ্তি ভালো অথবা খারাপ
প্রতিটি প্রহর পল অনুপল মৃত্যু না জীবন
পৃথিবী যশোদা মাতা অথবা পুতনা
ভালোবাসা শেষ হলে স্বস্তি না বিষাদ
কে আগে লক্ষ্যের কাছে পৌঁছে যায় পঙ্গু না সক্ষম।

২

Good night? ah! no, the hour is ill
Which Severs those it should unite

স্মৃতির চেয়ে বেদনাদায়ক আর কিছু নেই। বাথরুমের দরজার ফ্রেমে একটা ছোট পেরেক। সেই পেরেকে ঝুলছে টুথব্রাশ। বাবার টুথব্রাশ। নিয়ে যাননি সঙ্গে করে। বাড়িতে পরার চটি দরজার পাশে। কলম, রুমাল, পকেটঘড়ি। প্রিয় বই, নোটখাতা। হিসেবের খাতা। বাথরুমের দরজাটা বন্ধ করা মাত্রই কি অদ্ভুত এক নির্জনতা নেমে এল। হিমশীতল জল। যেন মৃত্যুর সঙ্গে, বিচ্ছেদের সঙ্গে কোলাকুলি। গায়ে জল ঢেলে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম। বিশাল বড়, গোল মতো গায়ে মাখার সাবান জলে গলছে। গোলাপের গন্ধ। এই সাবান বাবার খুব প্রিয়। ইংরেজ আমলে সাবান আসত বিলেত থেকে। টার্কিশ বাথ সোপ। কেমিস্ট মানুষ। সাবান, পারফিউম, ট্যালকাম পাউডার, ফেসক্রিম—এইসব খুব ভাল বুঝতেন। নিজে তৈরিও করতে পারতেন। সাবান তৈরির উপায় ছিল না, বড় প্ল্যান্টের প্রয়োজন। বয়লার চাই। বাষ্প খাওয়াতে হয় সাবানকে। আমাকে শেখাতেন, সাবানের সিজনিং কাকে বলে! সাবানে বুড়ো আঙুলের নখ বসিয়ে দেখবে, কড়কড় করে গুঁড়ো গুঁড়ো উঠলে বুঝবে, সিজনড সাবান। জাত ভাল। বাজার ঢুঁড়ে দিশি সাবানের মধ্যে এই সাবানটাকেই তাঁর মনে হয়েছিল প্রায় বিদেশির মতো। কত শৌখিন মানুষ ছিলেন! সবাই বলত, এ ম্যান অফ টেস্ট।

চৌবাচ্চার পাড়ে সাবানগোলা জল সাবানটাকে ঘিরে বৃত্তাকারে ছড়াচ্ছে। সেইদিকে তাকিয়ে হঠাৎ মনে হল আত্মহত্যা করলে কেমন হয়। নির্জন বাড়ি। কেউ কোথাও নেই। অনেক উঁচুতে একটা জানলা। তার বাইরে ঝোপঝাপ গাছের জটলা। শালিকের কর্কশ চিৎকার। এমন একটা ভিজেভিজে, মনমরা জায়গায় ঝুলে পড়তে মন্দ লাগবে না। ভীষণ একটা প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছে করছে। কিন্তু কার ওপর? বড় মায়া নিজের জীবনের ওপর। সুন্দর সুন্দর দেশ দেখব। জীবনে বড় হব। আরও বড়। কত মানুষের সঙ্গে আলাপ করব। মেয়েদের ভালবাসা পাব। মানুষের প্রশংসা কুড়ব। এত সহজে শেষ করে দিলে চলে! স্নান শেষ হল।

অজস্র জানালা, দরজা। সব একে একে বন্ধ করলুম। ছাদের দরজা বন্ধ করতে গিয়ে ফুলগাছের টবগুলোর দিকে নজর চলে গেল। ঋতু ঘুরছে। রোদ নরম হয়ে আসছে। চন্দ্রমল্লিকায় এইবার ফুল আসবে। কে দেখবে! কে পরিচর্যা করবে! প্রেমিক যে সব

ফেলে রেখে চলে গেছেন। কি নিঃসঙ্গ লাগছে নিজেকে ?

পিতার শিক্ষা তো ভোলা যায় না। এক বাক্স মিষ্টি কিনে নিলুম। বিষ্টুদার বাড়িতে তো শুধু হাতে যাওয়া যায় না। টিপ দরজার সামনেই দাঁড়িয়েছিল। ঠিক যেন দেবীপ্রতিমা। আমার কথা বোধ হয় কিছু শুনেছে, তাই মুখে সেই সুন্দর হাসিটা লেগে নেই। বিষণ্ণ, থমথমে মুখ। জিজ্ঞেস করলে, 'আপনি এত দেরি করলেন ? বাবা আর মা খুব ভাবছেন।'

ভেতর থেকে টিপের মায়ের গলা ভেসে এল, 'হ্যাঁ রে এসেছে ?'

ছোট্ট একটা উঠোন। একপাশে একটা কল্কে গাছ। ফুলে ফুলে হলুদ হয়ে আছে। ঝোলা গুড়ের মতো রোদ মাখামাখি হয়ে আছে চারপাশে। অনেকদিন বৃষ্টি হয়নি। মাটিতে ফাট ধরেছে। ঘাস ফুরফুর করছে। বিষ্টুদার বাড়িতে আগে কখনও আসিনি। মাঠকোঠা। চারপাশ তকতকে পরিষ্কার। দাওয়ার লাল মেঝে আয়নার মতো চকচক করছে। দুটো ভেলভেটের আসন পাশাপাশি পাতা। দু' গেলাস জল চাপা দেওয়া। কাঁসার গেলাস দুটো সোনার গেলাসের মতো ঝকঝক করছে।

টিপের মা যে এত সুন্দরী আমার জানা ছিল না। মা আর মেয়েকে প্রায় একই রকম দেখতে। সাধে বিষ্টুদা কবিতা লেখেন ! গোটা পরিবার যেন সুখ আর শান্তির কোলে ঢলে আছে। ঘর-দোর সব ছবির মতো সাজান। সত্যিই, সুখ হল ঈশ্বরের দান। পূর্বজন্মের সুকৃতি। পরিষ্কার ধুতি আর গেঞ্জি পরে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন তাড়াতাড়ি বিষ্টুদা।

আমার হাত দুটো ধরে বললেন, 'এসে গেছ ভাই ! আমি ভাবছিলুম, তুমি বোধ হয় আর এলে না !'

বিষ্টুদা আমাকে ধীরে ধীরে সাবধানে দাওয়ায় তুলে আনলেন, যেন না আনলে আমি পড়ে যাব। ভালবাসার স্পর্শ বেশ বোঝা যায়। একটা অনুভূতি ছড়িয়ে যায় সারা শরীরে। এমন ভালবাসার স্পর্শ আগে আমি কখনও পাইনি। শাসন পেয়েছি। ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ পেয়েছি। আঁতে ঘা মারা কথা সহ্য করেছি প্রচুর। আদর্শের ট্র্যাক্টর কুদলে দিয়েছে আমাকে। আতঙ্ক ছাড়া আমার জীবনে কিছুই তো ছিল না। পেপারওয়েট চাপা এক খণ্ড কাগজের মতো আমার জীবন।

'জুতোটা খুলে দরজার পাশে রাখ। সাবধানে ঘরে এস, আমাদের চৌকাঠ আবার উঁচু উঁচু।'

বিষ্টুদার কত দিকে নজর। ঘর নয় তো দেবালয়। খাটের ওপর টান টান করে পাতা নকশি চাদর। দুধসাদা কয়েকটা বালিশ। সমস্ত জিনিসপত্র নিখুঁত করে গোছানো। পেতলের জিনিস সব ঝকঝক করছে। রাধাকৃষ্ণ, ফুলদানি, মা লক্ষ্মী, গণেশ। দেয়ালে একটি মাত্র ক্যালেন্ডার, মা দুর্গার। কোথাও কোনও প্রাচুর্য নেই, অথচ কি সুন্দর ! একপাশে একটা টিনের চেয়ার। চেয়ারে একটা হাতের কাজকরা পুরু আসন। সেই চেয়ারে আমি বসলুম। বিষ্টুদার স্ত্রীর মাথায় ছোট্ট করে ঘোমটা তোলা। তার তলায় এলিয়ে আছে ভিজে চুলের ঢল। কালো কুচকুচে। কি সুন্দর চুল ! টিপ মায়ের মতোই চুল পেয়েছে।

বিষ্টুদা স্ত্রীকে বললেন, 'পিন্টুর সামনে তোমাকে আর ঘোমটা দিতে হবে না, খুলে ফেল।'

বউদি আমার দিকে তাকিয়ে ফিক করে একটু হেসে পাশের ঘরে চলে গেলেন। সেই হাসির রেশ অনেকক্ষণ আমার মনে লেগে রইল। অপূর্ব সুন্দর সাজান দাঁত ! বিষ্টুদা আমাকে বললেন, 'যাও, টিপের সঙ্গে গিয়ে হাত ধুয়ে এস, আমরা এইবার খেতে বসি, অনেক বেলা হয়ে গেছে।'

দাওয়ার একেবারে পুব মাথায় একটা জলের বালতি আর ঘটি। সামনেই একটা শিউলি গাছ। তলায় সবুজ ঘাসের উপর একরাশ ফুল বিছিয়ে রেখেছে। যেন ভোরবেলা পুজোয় বসেছিল। আমাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে টিপ বললে, 'সকালে এক চুবড়ি তুলেছি। তাও কত! গাছটায় ফুল হয় বটে।'

দাওয়া থেকে হাতদুটো সামনে বাড়িয়ে দিলুম। টিপ আমার হাতে ধীরে ধীরে জল ঢালছে।

জমিতে সরু একটা নালি কাটা রয়েছে, সেই নালি বেয়ে জল গড়িয়ে যাচ্ছে কুলকুল করে। মাথার ওপর সূর্য। টিপ যে কত ফর্সা, সেই বুঝলুম। হাতদুটো যেন জ্বলজ্বল করছে। ফ্লোরেসেন্ট। ছোট্ট একটা পাথর বসান আঙটি আঙুলে। সরু সোনার বালা। কারো-কারোর গায়ে সোনা ভীষণ উজ্জ্বল হয়। অঙ্গের গুণে। টিপ একেবারে আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। গায়ে গা লেগে যাচ্ছে। নীল একটা শাড়ি পরেছে। সাদা জামা। ব্লাউজের হাতা ওপর বাহুতে একেবারে কাপ হয়ে বসে আছে। লাল একটা তাগার অল্প একটু বাড়তি অংশ লিটলিট করে দুলছে। কিছুক্ষণের মতো আমি আমার জীবনসমস্যার বাইরে চলে গেলুম। সেই হিট গানের লাইন মনে ঘুরছে, সোনার হাতে, সোনার কাঁকন।

পরিষ্কার, পাট করা একটা গামছা টিপ আমাকে এগিয়ে দিল। একেবারে মুখোমুখি দু'জনে। বাদাম-চেরা চোখ, বড় বড় পাতা ঘেরা। যেন নারকেল কুঞ্জের মধ্যে টলটলে নীল দীঘি। হাত মুছে গামছাটা ফিরিয়ে দিতে দিতে আমি একটু মুচকি হাসলুম। মুখে কোনও কথা সরছে না। বিস্ময়কর কিছু দেখলে মানুষের এমনই বাক্যহারা অবস্থা হয় বোধ হয়।

টিপ বললে, 'চান করে উঠে চুল আঁচড়াতে ভুলে গেছেন। দাঁড়ান চিরুনি আর আয়নাটা নিয়ে আসি।'

'চুল আঁচড়াইনি বুঝি? তাড়াতাড়ি এসেছি তো!'

'না আঁচড়েও বেশ ভাল দেখাচ্ছে।'

টিপ একটা মেয়েদের চিরুনি, খুবই পরিষ্কার, তবুও দু' আঙুল চালিয়ে, ফুঁ দিয়ে, চোখের সামনে তুলে, পরীক্ষা করে আমার হাতে দিল। চুল আঁচড়াতে গিয়ে বুঝলুম, মাথাটা মুছতেই ভুলে গেছি। চিরুনি চালান মাত্রই টসটস করে জল গড়িয়ে পড়ল।

টিপ বললে, 'এ কি মাথাটাই তো মোছা হয়নি! জল টসটস করছে। এইবার নির্ঘাত একটা অসুখে পড়বেন।' গামছাটা এগিয়ে দিতে দিতে বললে, 'আগে মুছুন শুকনো করে।'

আমার পেছন দিকটা ভিজে গেল চুলের জলে। একটু লজ্জা লজ্জা করছিল নিজের নোংরামির জন্য। টিপ কি ভাবছে! ভাবছে, ছেলেটা একটা জড়ভরত। চুল আঁচড়াবার পর টিপ বললে, 'দেখুন তো কি সুন্দর দেখাচ্ছে এইবার!' টিপ পেছনে এসে জামার ওপর গামছা চেপে চেপে জল শুকোবার চেষ্টা করল। দু'-একটা চুল লেগেছিল, দু' আঙুলে তুলে দিল।

বিষ্টুদা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ঠিক পাল্লায় পড়েছ এইবার।'

টিপ বললে, 'তোমার এই ছেলে এবার একটা শক্ত অসুখ বাঁধাবে। মাথা ডবডবে ভিজে। মুছতেই ভুলে গেছেন।'

আমরা পাশাপাশি খেতে বসলুম দু'জনে। খুবই পরিচ্ছন্ন আয়োজন। টিপ আর বউদি পরিবেশন করছেন। মুখে ভাত তুলতে গিয়ে হাত থেমে গেল। মনে হল, আমি তো বেশ পরিপাটি আহারে বসলুম, আমার বাবা এখন, এই মুহূর্তে কোথায়! তাঁর কি কিছু জুটবে! বারে বারে চা খেতে ভালবাসতেন। খাওয়ার তরিবাদিও বেশ ছিল। যেখানে সেখানে,

হোটেলে, রেস্তোরাঁয় খেতে পারেন না। আজ মনে হয় উপবাস!

বিষ্টুদা আমাকে লক্ষ করছিলেন। বললেন, 'বুঝতে পেরেছি, তোমার মনে কি হচ্ছে! তবু খেতে হবে। শরীরটাকে ঠিক রাখতে হবে। অসুস্থ, দুর্বল হয়ে পড়লে তো চলবে না! নাও খেয়ে নাও। মনটাকে শক্ত কর। এখন তোমার ওপর অনেক দায়িত্ব।'

'কেবল মনে পড়ে যাচ্ছে বিষ্টুদা। চোখের সামনে তাঁর মুখটা ভাসছে।'

'দেখ পিন্টু, দুঃখ হল মনের ব্যাপার, আর খাওয়া হল দেহের ব্যাপার। তুমি তো নিজেই দেখেছ প্রিয়জনকে শ্মশানে দাহ করে এসে মানুষ কিছুক্ষণের মধ্যেই খাওয়ার চিন্তা করে। স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী কি উপোস করে মারা যায়! না, স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামী! মন কি রকম জান, সমুদ্রের বেলাভূমির মতো। কোনও ছাপই চিরস্থায়ী নয়, কালের ঢেউ এসে মুছে দিয়ে যায়। নিজেকে শক্ত করো। একটা ব্যাপার কি হয়েছে জান, তোমাকে তোমার বাবা খুব আগলে আগলে মানুষ করেছেন। আসল পৃথিবীটা বুঝতে দেননি। এ বড় কঠিন ঠাঁই। লড়াইয়ের জায়গা। আমাকে দেখ। তোমাকে আগেই বলেছি, মামার বাড়িতে মানুষ। বিরাট পরিবার। জমিদারিই বলতে পার। মামা আমাকে বলতেন, লেঠেল। যত কঠিন কাজ সব আমার ওপর। বাজার সরকার, ম্যানেজার, ঝাড়ুদার, কন্ট্রাক্টার। লেখা-পড়ার দফারফা। শেষে মামার সঙ্গে শুরু হল আদর্শের লড়াই। বনিবনা হল না। নিত্য খিটিমিটি। একদিন দূর করে দিলেন। একটু হাতে-পায়ে ধরলে আখের ফিরে যেত। চাইকি, একটা বাড়ির মালিক হওয়াও অসম্ভব ছিল না। আমি রফা করিনি। আমি আমার পথ ধরে চলেছি। জীবিকার জন্যে কিনা করেছি! সিনেমা হলের গেটকিপার, ট্রেনে দাঁতের মাজনের ফেরিঅলা, জমির দালাল, সবশেষে চাঅলা। গোলাগুলি অনেক চলেছে, দুর্গ কিন্তু ভেঙে পড়েনি। ভগবান যেমন সব কেড়ে নিয়েছেন আবার দিয়েছেনও। সবচেয়ে বড় দান ইতুর মতো বউ। ইতু না এলে, হয় আমি পাগল হয়ে যেতুম, নয় টিবি-ফিবি হয়ে পথের ধারে মরে পড়ে থাকতুম, কি আত্মহত্যা করতে হত। বিশ্বাস করো, আজ আমি পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী লোক, অথচ আমার কিছুই নেই। দিন আনি দিন খাই। সুখে ঘুমোই। তুমি যদি সহজে কাবু হয়ে যাও, পৃথিবী তোমাকে আরও চেপে ধরবে।'

টিপ আমার সামনে বসে আছে। ভারি করুণ মুখে বললে, 'লক্ষ্মীটি খেয়ে নিন, তা না হলে আমরা খেতে পারব না। মা উপোস করে আছে।'

বেশ বুঝতে পারছি টিপ আমাকে দখল করে ফেলেছে। ইতুর মেয়ে টিপ। মায়ের মতোই তো হবে! গানটা মনে পড়ছে, যার কেহ নাই তুমি আছ তার। সেই তুমি দুঃসময়ে এইভাবেই পাশে এসে দাঁড়ায়। দেবতা তো মানুষের রূপ ধরেই আসেন।

রান্না এত অপূর্ব হয়েছে যে সব বাধা ভেসে চলে গেল। সামান্য মুগের ডাল তারই কি স্বাদ! কুঁচো কুঁচো নারকোল। লাল নটে শাক, কাবাব ফেলে খাওয়ার মতো। কতকাল আমি এত অপূর্ব রান্না খাইনি! নারকোলকোরা দিয়ে মোচার ঘণ্ট। মুচমুচে বেগুনি। বউদি কেমন করে জানলেন, আমি এইসবই ভালবাসি। বিষ্টুদার সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী মনে একটা বল এনে দিয়েছে। খাওয়া শেষ হল। বেশ ভালই হল।

বিষ্টুদা ঘরে এসে বললেন, 'নাও, আধ ঘণ্টাটাক একেবারে ফ্ল্যাট হয়ে শুয়ে থাক। সব হজম হয়ে যাবে।'

'আমাদের পরামর্শ কখন হবে?'

'শুয়ে শুয়ে হবে। ধূমপানের অভ্যাস আছে?'

'না।'

'আমারও নেই। তুমি দেখছি একালের ছেলেদের কোনও গুণই পাওনি।'

শুয়ে শুয়ে দেখছি, দেয়ালে ঝুলছে ফ্রেমে বাঁধান ছবি। সবচেয়ে বড় ছবি শরৎচন্দ্রের। বিষ্টুদা শরৎচন্দ্রকে দেবতার মতো ভক্তি-শ্রদ্ধা করেন। অভিনেতাদের সঙ্গে তোলা ছবি। জহর গাঙ্গুলী, অহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাদাস, প্রমথেশ বড়ুয়া, ছবি বিশ্বাস, শিশির ভাদুড়ী। আরও অনেকে। আমি তাঁদের চিনি না। সাহিত্য আর নাটকে বিষ্টুদা মশগুল। ঐতিহাসিক আর পৌরাণিক নাটকের সংলাপ গলগল করে বলে যেতে পারেন। ঝকঝকে আলমারিতে পরিপাটি করে সাজানো বই। বিষ্টুদার নিজের চেহারাও নায়কের মতো। যখন দোকানে তখন একরকম সাজপোশাক। কথা বলার ধরন-ধারণ। পাক্কা চাঅলা। হাঁটুর ওপর তোলা মালকোঁচা মারা ধুতি। একটা গেঞ্জি। শীতকালে ওরই ওপর একটা পুলওভার। ভোরবেলা আর রাতের দিকে মাথায় একটা মাফলারের পাগড়ি। হৃষ্টপুষ্ট, গোলগাল মানুষটিকে তখন সন্ন্যাসীর মতো দেখায়।

টিপ দু' গেলাস জল এনে টেবিলের ওপর চাপা দিয়ে রেখে গেল। যাবার সময় জিজ্ঞেস করলে, 'আপনি পান খাবেন?'

'না ভাই পান আমি খাই না।'

বিষ্টুদা বললেন, 'একটু মশলা দিয়ে যা।'

টিপ পরক্ষণেই মশলা নিয়ে এল। আমি হাত পাতলুম। টিপের ফর্সা হাত আমার ডান তালুতে কাত হল, মৌরি, বড় এলাচ, সুপুরির ছোট ছোট টুকরো। মেয়েটার আঙুলগুলো কি লম্বা লম্বা। শিল্পী হাত। আমার আঙুলও লম্বা লম্বা; কিন্তু সিমপ্যাঞ্জির মতো। নিজের হাত দেখে নিজেই ঘাবড়ে যাই। শয়তানের হাত মনে হয় এইরকম ছিল। ছিল বলছি কেন? শয়তান তো এখনও আছে। তা না হলে, আমার কেন ইচ্ছে করছে, টিপকে ভালবাসি। ভীষণ ভালবাসা। একমাত্র টিপই আমার এই পথে-বসা জীবনকে ঘরে তুলতে পারে। টিপের পাশে মুকু লাগে না। লেখা-পড়ায় সাংঘাতিক হলেও, একটু পুরুষালি ভাব। টিপ হল কবিতা, মুকু হল গদ্য। টিপ পেছন ফিরে চলে যাচ্ছে, আমার চোখ যেন আটকে গেছে। আমার মতো মানুষকে কারোর অন্দরমহলে ঢুকতে দেওয়া উচিত নয়। আমার মন বড় বেসামাল।

বিষ্টুদা বললেন, 'তোমার এখন প্রথম কাজ হবে, সোনাদানা যা আছে সব ব্যাঙ্কে জমা করে দেওয়া। কোন্ ব্যাঙ্কে তোমাদের অ্যাকাউন্ট?'

'স্টেট ব্যাঙ্ক।'

'আজ তুমি একটা লিস্ট তৈরি কর, সাবধানে। কাল আমি তোমার সঙ্গে গিয়ে জমা করে আসব। তাহলে বিরাট এক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।'

'আমার বাবাকে খুঁজে বের করার কি হবে বিষ্টুদা?'

'দেখ, থানার সাহায্য নেওয়া যায়। মিসিং পার্সনস স্কোয়াডে একটা ছবি দিয়ে ডায়েরি করালে ওরা অনুসন্ধান করবে। কাগজেও একটা বিজ্ঞাপন দিতে পারি আমরা। সেটা কিন্তু কেমন একটা বিদ্‌ঘুটে ব্যাপার হবে। লোক জানাজানি। আমাদের পক্ষেও অপমানের, তাঁর পক্ষেও অপমানের। পাঁচজনে পাঁচকথা বলবে। অনুসন্ধানটা আমাদেরই করতে হবে তলে তলে।'

'আমরা কি করে করব?'

'কোথায় কোথায় যাওয়া সম্ভব ভেবে দেখ। কোনও আত্মীয়ের বাড়ি, কোনও আশ্রম।'

'আমাদের তো তেমন কোনও আত্মীয় নেই। এক মামা।'

'সেখানে যেতে পারেন।'

'অসম্ভব। এই কারণেই অসম্ভব, কারোর বাড়ি গিয়ে একটা রাতও কখনও কাটাননি। অস্বস্তি বোধ করেন। বহুবার আমরা বেড়াতে গেছি। যেখানে গেছি ইচ্ছে করলে পরিচিত বন্ধুর বাড়িতে ওঠা যেত। ওঠেননি। সোজা চলে গেছি হোটেলে। বলতেন, এক এক সংসারের এক এক সুর। সেই সুরে সুর মেলানো কষ্টকর। অনেকে পারে আমি পারি না।'

'তাহলে কোথায় যেতে পারেন?'

'একবার ভাবছি হরিদ্বার থেকে আমার দাদুর কাছে এক সন্ন্যাসী আসতেন। দাদুর সমাধির রাতে তিনি হঠাৎ এসে হাজির। যেন আগেই জানতেন। সেই সন্ন্যাসীকে বাবার খুব মনে ধরেছিল। সাধারণত সাধু-সন্ন্যাসী তেমন পছন্দ করতেন না। এক ধরনের নাস্তিক ছিলেন। সেই সন্ন্যাসীর আশ্রমে যেতে পারেন। যাওয়াটা অসম্ভব নয়।'

'সেই মহাপুরুষের নাম-ঠিকানা তুমি জান?'

'না।'

'তোমার বাবা জানতেন?'

'সন্দেহ আছে। তিনি জানলে, আমিও জানতুম।'

'তাহলে সেখানে তিনি যাবেন কি করে? ঠিকানা না হয় না জানলেন, নামটা তো জানা দরকার।'

'তা ঠিক। তা হলে কোথায় যেতে পারেন?'

'এমনও হতে পারে সোজা কোনও হোটেলে গিয়ে উঠেছেন। কলকাতারই কোনও হোটেলে। সেখানে দিনকতক থেকে তোমাকে একটু শিক্ষা দিতে চাইছেন। সেটা রাগেও হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। তোমাকে একটু হাত ছেড়ে দিয়ে স্বাবলম্বী হতে শেখাচ্ছেন। ছোট ছেলেকে মা যেমন হাঁটতে শেখান। সত্যিই তো তুমি তাঁর হাতধরা ছিলে। বুক দিয়ে আগলে আগলে রেখেছিলেন।'

'সঙ্গে তো কিছুই নিয়ে যাননি!'

'টাকা?'

'সেইটা আমি বলতে পারব না।'

'শোনো, তিনি প্র্যাকটিক্যাল মানুষ, হিসেবি মানুষ, জেনেশুনে নিজেকে বিপদে ফেলবেন না। পথ চলতে কড়ি, একথা তিনি জানেন। সঙ্গে টাকা থাকলে আর কিছু নেওয়ার দরকার হয় না। মনে করে দেখ, আগের দিন তিনি ব্যাঙ্কে গিয়েছিলেন কিনা!'

'মনে হয় গিয়েছিলেন।'

'বাড়ি গিয়ে চেক বইটা পাও কি না দেখ। কাউন্টার ফয়েলটা দেখ। কত টাকা কোন তারিখে তুলেছেন। ব্যস, প্রবলেম সলভড। উইদাউট টিকিটে ট্র্যাভেল করে জেলখানায় যাবার মানুষ তিনি নন। লোকের কাছে হাতপাতার মানুষও তিনি নন। আমার মনে হয় খুব একটা উতলা না হয়ে কয়েকদিন চুপচাপ দেখলে হয়। ফিরেও তো আসতে পারেন। কোনও বাবা তাঁর ছেলেকে এত ভালবাসতেন না। তিনি যেমন তোমাকে বাসতেন। তোমার যেমন কষ্ট হচ্ছে, ছটফট করছ, তাঁরও তো সেই একই অবস্থা।'

'তা হলে ব্যাঙ্কে যাবার প্রয়োজন নেই?'

'খুব আছে। অত সোনাদানা বাড়িতে কেউ ফেলে রাখে! তোমাদের ওই বিশাল বাড়ি আর তুমি একজন মাত্র প্রাণী।'

'আর আমার চাকরির কি হবে?'

'চাকরি করবে। চাকরি না করার প্রশ্ন আসছে কেন?'

'আমাকে যে দেরাদুনে বদলি করে দিয়েছে।'

'তাহলে অবশ্য খুবই মুশকিল। তোমার তো এখন বাইরে যাওয়া কোনওমতেই চলবে না। তুমি কর্তৃপক্ষকে বলো। তাঁরা নিশ্চয়ই অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করবেন।'

'আমার প্রোমোশানটা যে তাহলে হবে না। বাইরে পাঠাচ্ছিল বিরাট একটা প্রোমোশান দিয়ে।'

'ওই লোভটা তোমাকে ছাড়তে হবে ভাই।'

'আর একটা বাজে ব্যাপার আছে বিষ্টুদা, ওই বাড়িতে রাত্তিরবেলা আমি একা থাকতে পারব না। ভূত আছে।'

'ভূতের ভয় অবশ্য আমারও আছে। তুমি এক কাজ কর, তুমি আমাদের বাড়িতে থাক।'

'আমার লজ্জা করে।'

'লজ্জা? কিসের লজ্জা?'

'আমি কারোর সামনে জামা-কাপড় খুলতে পারি না।'

'এখানে কে তোমাকে উলঙ্গ হয়ে থাকতে বলেছে! পাজামা আর গেঞ্জি পরে শোবে।'

'আমি যে কারোর বাড়ির বাথরুমে যেতে পারি না বিষ্টুদা।'

'আমাদের বাড়ির বাথরুম খুব ভাল জায়গায়। কারোকে জিজ্ঞেস করারও প্রয়োজন নেই। আলো জ্বালবে ঢুকে পড়বে। আজ রাত থেকেই তুমি এখানে থাকবে; কিন্তু দামী গয়নাপত্তর যা আছে সব আজই নিয়ে আসবে এখানে। রাতটা আমাদের আলমারিতে থাকবে।'

'একা আমি গোছগাছ করতে পারব না বিষ্টুদা। আপনিও চলুন না।'

'এ-সব ব্যাপার আমার চেয়ে ইতু আর টিপ ভাল পারে। ওরা তোমার সঙ্গে যাবে, তোমাকে সাহায্য করবে। যে-ভাবে বলবে, সেই ভাবে। এখন তুমি একটু বিশ্রাম কর।'

কুঁকড়েমুঁকড়ে খাটের এক ধারে কিছুক্ষণ শুয়ে রইলুম। বড় শান্ত সংসার। ইতু বউদির গলা তো শোনাই যায় না, টিপও সেইরকম। শালিকের কিচিরমিচির কানে আসছে। ঘুঘু ডাকছে উদাস সুরে। বিষ্টুদা আমার পাশেই শুয়ে আছেন চিৎ হয়ে, বুকের ওপর হাত দুটো জড়ো করে। বিষ্টুদার মনে হয় দুপুরে ঘুমনোর অভ্যাস। শ্বাসপ্রশ্বাস দীর্ঘ হয়েছে। আমি ডাকলুম, 'বিষ্টুদা।'

'বলো।'

'কলকাতার সমস্ত হোটেলে একবার খোঁজ করলে হয় না।'

'হয়; কিন্তু তিনি যদি অন্য নাম নিয়ে থাকেন। আর সেটাই সম্ভব।'

'কাল সারাটা দিন, তাহলে হোটেলগুলো ঘুরে ঘুরে দেখি।'

'দেখতে পার, তবে ব্যর্থ হবে। এখন মনে হচ্ছে অমন একজন মানুষ হোটেলে থাকবেন না। তিনি বাইরেই গেছেন কোথাও।'

'মানে হিমালয়ের দিকে?'

'আচ্ছা, তোমার বাবা তো বড় সরকারী চাকরি করতেন?'

'হ্যাঁ, এই কয়েকমাস হল রিটায়ার করেছেন।'

'আইডিয়া। যেখানেই থাকুন, পেনসন নেবার জন্যে মাসে একবার তাঁকে কলকাতায় আসতেই হবে। ওঁর পেনসনের তারিখটা তুমি যে-ভাবেই হোক বের কর। আমরা তক্কে

তক্কে থাকব, ঠিক ধরে ফেলব। একবার ধরতে পারলে কোনও কথা নয়, সোজা তাঁর পায়ের ওপর, যদি কোনও অপরাধ করে থাকি ক্ষমা করুন।'

'আমি তো কোনও অপরাধ করিনি।'

'শোনো, তোমার মনে হচ্ছে করনি ; কিন্তু করেছ। একটা কিছু হয়েছে। ভীষণ একটা আঘাত পেয়েছেন মনে। সেই অভিমান তাঁকে ঘর-ছাড়া করেছে।'

৩

'Love means never having to say you are sorry'

একটু ভালবেসে ফেলেছিলুম, ঈশ্বর, এই কি আমার অপরাধ ! তাহলে তুমি কেন নারী সৃষ্টি করলে ! মুকু হস্টেল থেকে বেরিয়ে পড়েছিল কোথাও যাবে বলে। আমাকে দেখে অবাক।

মুকু বললে, 'এ কি, তুমি কোথা থেকে এলে ? অফিস থেকে ?'

'মনে হচ্ছে, আমাকে দেখে অবাক হয়েছ ?'

'তা একটু হয়েছি। ভাবতেই পারিনি তুমি আসবে। তুমি তো ব্রহ্মচারী। তোমার বাবা গৃহী সন্ন্যাসী। তুমি একটা মেয়ের কাছে আস কি করে ! মেয়েরা তোমার কাছে যাবে, তোমার তপোভঙ্গ করাবার জন্যে। এ যেন মেঘ না চাইতেই জল !'

'তুমি কোথায় যাবে বলে সেজেগুজে বেরলে !'

'যদি বলি একটা ছেলের কাছে !'

'তা হলে আমার অভিমান হবে।'

'যদি বলি সেই ছেলেটি হলে তুমি।'

'তা হলে আমার অভিমান হবে না।'

'আমি যদি আর একটু আগেই বেরিয়ে যেতুম, তা হলে তো তোমার সঙ্গে আমার দেখা হত না।'

'তা অবশ্য হত না। মন খারাপ করে ফিরে যেতে হত।'

'চল তাহলে দু'জনে মিলে কোথাও যাই।'

তখনই মুকুকে কিছু বলতে ইচ্ছে করল না। কেমন যেন একটা উড়ুউড়ু ভাব। অন্যের দুঃখের কথা মনে ধরবে না। 'সুখে সে রয়েছে, সুখে সে থাকুক। মোর কথা তারে বোলো না, বোলো না।' দেখলেই মনে হয় সুখী মেয়ে, আদুরে মেয়ে। দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার মানসিকতা নেই। মরসুমি ফুলের মতো বাহারি। বড়লোকের মেয়ে। বাবা বড় অ্যাডভোকেট। মুকুর সবটাই কেমন ভাসা ভাসা। আজ খুব সেজেছে। পিঙ্করঙের শাড়ি। কাঁচুলি ধরনের ব্লাউজ। চুলে শ্যাম্পু করেছে। ফুরফুর করে উড়ছে। গা থেকে মিষ্টি একটা গন্ধ বেরোচ্ছে। মুকু যথার্থই সুন্দরী। অন্য কোনও দিন হলে আমি হয়তো চনমন করে উঠতুম। যা আমার স্বভাব। আজ ভেতরটা কুঁকড়ে আছে।

মুকু বললে, 'আমাকে কিছু খাওয়াবে ? ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে।'

'চলো। কোথায় খাবে বলো ?'

'বেশ ভাল একটা জায়গায়, যেখানে নির্জনে কিছুক্ষণ বসা যাবে।'

'তা হলেতো পার্ক স্ট্রিটে যেতে হয়।'

'অত দূরে না, কাছাকাছি কোথাও।'

হঠাৎ মনে হল ওয়াই· এম· সি· এ· রেস্তোরাঁয় গেলে হয়। দু'জনে ট্রামে উঠলুম। খালি ট্রাম। বসার জায়গার অভাব নেই। উঠে বড় অস্বস্তিতে পড়ে গেলুম। একটি আসনে বেশ আয়েস করে বসে আছেন আমার পিতার প্রাণের বন্ধু, সেই জ্যোতিষী অক্ষয় কাকাবাবু। সামনের দিকে বসেছেন। আমরা পেছনে। কি একটা ভাবে তন্ময়। ঘাড় ঘোরালেই আমাদের দেখে ফেলবেন। দেখে ফেলুন এটা আমি চাই না। মুকু এক বিস্ফোরক সুন্দরী। পাঞ্জাবী মহিলার মতো উগ্র সাজ। মুকুর কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললুম, 'চলো পরের স্টপেজে নেমে যাই।'

'কেন ?'

'ট্রামটা ভাল নয়।'

'এর চেয়ে ভাল ট্রাম কলকাতায় পাবে কোথায় ?'

হঠাৎ অক্ষয় কাকাবাবু উঠে দাঁড়ালেন। আমি যতদূর সম্ভব মুখটা নিচু করে রাখলুম। পাশ দিয়ে চলে গেলেন দরজার দিকে। আমার গা ছুঁয়ে গেল তাঁর পাঞ্জাবির পকেট। পকেটে মনে হয় হাত দেখার লেন্‌সটা রয়েছে। ঠকাস করে আমার কাঁধে লাগল। সাবধানের মার নেই। আমি মাথা তুলিনি।

মুকু বললে, 'কাকে দেখে অমন করছ ? পাওনাদার ?'

মাথা না তুলেই বললুম, 'এখন চুপ। আমাকে আড়াল করে রাখ।'

ট্রাম থামল। থেমে আবার চলল। তখন আমি সাহস করে মাথা তুললুম।

মুকু বললে, 'ব্যাপারটা কি ? অমন চোরের মতো লুকলে কেন ?'

'অক্ষয় কাকাবাবু ?'

'কে অক্ষয় কাকাবাবু ?'

'আমার বাবার বন্ধু।'

'তাতে হলটা কি ? আমার সঙ্গে দেখলে তোমার চরিত্র খারাপ হয়ে গেছে ভাববেন ? তুমি এইরকম ভয়ে ভয়ে মেয়েদের সঙ্গে মেশ নাকি ? তোমার সাহস নেই ? ডরপুক ! আমার যেমন বেণী তেমনি রবে চুল ভিজাবো না। ভুখ লাগাবো, ভুখে মরবো তবু আমি জানতে দেবো না। রাঁধিব বাড়িব, ব্যঞ্জন বাঁটিব তবু আমি হাঁড়ি ছোঁবো না। পলিসিটা তোমার ভালই। তোমার বাবাকে বলে দেবেন, এই ভয় ? আর কত দিন বাবার কাছে গোপালটি সেজে থাকবে ? এইবার একটু উড়তে শেখ না। জীবনটাকে একটু দেখ না ?'

মুকু রাগে মুখ ঘোরাল জানালার দিকে। একটু রোগা হয়ে আগের চেয়ে দেখতে যেন আরও সুন্দর হয়েছে। আমার বন্ধু আশিসের কথা মনে পড়ছে। আশিস বলত, দেখ্ পিন্টু এমন একটা বিয়ে করব যেন বউ নিয়ে রাস্তায় বেরতে গর্বে বুক দশ হাত হয়ে যায়। তেমন একটা বউয়ের সন্ধান আজও পায়নি। আশিস যদি মুকুকে দেখতে পায় তো ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে। ডিগ্রি, ডিপ্লোমার পেখম তুলে নাচবে। ওর ধারণা মেয়েরা এইসবেরই প্রেমে পড়ে। নিজেদের বাড়ি, সে-কথাও বলতে ভোলে না। যেন বাড়ি আছে বলেই সুন্দরী মেয়েরা জামার বোতামের গর্তে গোলাপফুল হয়ে সেঁটে যাবে। মুকুর পাশে গায়ে গা লাগিয়ে বসে

আছি বলে আমার অবশ্য তেমন কিছু মনে হচ্ছে না।

ওয়াই· এম· সি· এ-র রেস্তোরাঁয় ঢুকেই পুরনো স্মৃতি মনে পড়ে গেল। এই তো কয়েক বছর আগেই ছাত্রজীবনে আমরা প্রায়ই এখানে আসতুম। সস্তার খাওয়া ছিল, টোস্ট, ওমলেট, চা। যেসব ভাগ্যবানের মেয়ে বন্ধু ছিল, তারা সোজা গিয়ে ঢুকত কেবিনে। লম্বা পর্দার আড়ালে গল্প করার সুবিধে হত। এইরকম একটা কেবিনে আমাদের গ্রেট পার্থ আরতিকে চুমু খেয়েছিল। জীবনের প্রথম নারী-ওষ্ঠ-চুম্বনের অভিজ্ঞতা। ছাদের নল দিয়ে অনর্গল বর্ষার জল বেরোবার মতো, টানা এক মাস গলগল করে কবিতা বেরোতে লাগল। খাতা-পত্তর সব ভরে গেল। কখনও হাসে, কখনও কাঁদে। পার্থর নিরীহ মা একদিন আমাদের সামনে ডুকরে কেঁদে উঠলেন, ওরে আমার ছেলেটার কি হল! কেন এমন করছে! খেতে বসে, ডালেতে, দুধেতে, ঝোলেতে, অম্বলেতে মিশিয়ে ফেলছে। জামার বোতাম ঘরে-ঘরে মেলাতে পারছে না। সবাই বলছে, ছেলে তোমার সন্ন্যাসী হয়ে যাবে। কৃষ্ণ-বিরহে মহাপ্রভুর এই অবস্থা হয়েছিল। আমরা কুঁই, কুঁই করে হেসে মরি আর কি! বলতে পারছি না, মাসিমা, কৃষ্ণবিরহ নয়, ওষ্ঠে ওষ্ঠে ঠেকিয়ে এই অবস্থা হয়েছে। সন্ন্যাসী নয়, ছেলে আপনার গৃহী হবে। পেখম তুলেছে।

আমরা ধারের দিকে একটা কেবিন পেয়ে গেলুম। মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করতে ছাত্রজীবনে ভয় পেতুম। সেই ভয় এখনও যায়নি। কেউ যদি দেখে ফেলে, কেউ যদি বলে দেয় বাড়িতে। মনে হয় ছবির মানুষও জীবন্ত। হঠাৎ বলে উঠবে, অ্যায়, কি কচ্চিস! তোর বাবাকে বলে দোবো।

মুকু কেবিনের পর্দাটা টানছে। বললুম, 'থাক না, খোলাই থাক না।'

'কেন? খোলা থাকবে কেন? পর্দাটা তাহলে আছে কিসের জন্যে?'

মুকু আমার পাশে বসল। আমি বললুম, 'উল্টো দিকে বোসো না।'

'কেন? তোমাকে পুলিসে ধরবে? আজ আমি তোমার ভয় ভাঙাব। তোমাকে আজ আমি মানুষ করব!'

শক্ত পাথরের মতো হয়ে গেছে আমার শরীর। এখনি পর্দা সরিয়ে বয় ঢুকবে। সে যখন দেখবে আমরা এইভাবে বসে আছি, ছি ছি কি ভাববে! এইভাবে বসে থাকাকেই তো ইংরেজিতে বলে, কম্প্রোমাইজিং পজিসান। মুকু যে-ব্লাউজ পরেছে, সর্বাধুনিক ডিজাইনের। দুঃসাহসী মেয়েরা পরতে শুরু করেছে কলকাতায়। পরলেই লোকে কেমন কেমন নজরে তাকায়। আমিও তাকাই। ভেতরটা ছিঁড়ে-খুঁড়ে যায়। বিশ্রী একটা ভাব হয়। মুকুর কোমরের অনেকটা অংশ বেরিয়ে আছে। ধবধবে সাদা। গোলাপি ব্লাউজের তলা খাপ হয়ে বসে আছে। অস্বাভাবিক রকমের ভরাট বুক। যৌবন নয়, যৌবনের জোয়ার। ভয় আর লোভ দুটোই একসঙ্গে খেলা করছে আমার মনে। কখনও মনে হচ্ছে, আমি কি ভাগ্যবান! পরক্ষণেই মনে হচ্ছে, হায়, কি সর্বনাশ! মুকু টেবিলের ওপর দু'হাত রেখে সামনে ঝুঁকে মেনু পড়ছে। আমি দেখছি মসৃণ চওড়া পিঠ। নিখুঁত একটি ঘাড়। পিঠে ছড়িয়ে আছে রেশমির মতো চুল। মুকু ইচ্ছে করলেই ফিল্‌মে নামতে পারে। বম্বের এক নায়িকা, যার এখন খুব নাম-ডাক, অবিকল তার মতো দেখতে।

মুকু বললে, 'এইবার কি হবে! তুমি পালাবে কোথায়! পড়েছ মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে। এইবার আমার কবলে তুমি। আমার যা প্রাণ চায় আমি তাই করব।'

মুকু কাঁধ দিয়ে আমাকে দেয়ালে ঠেসে ধরল। আর ঠিক সেই সময় দুলে উঠল পর্দা। প্রবীণ এক মানুষের মুখ। মুখটা ভিতরে, দেহটা বাইরে। শুধু একটি মাত্র প্রশ্ন, 'বলুন?'

'কি বলব মুকু ?'

'কাটলেট আর চা।'

লোকটি মুকুর দিকে তাকিয়ে আছে হাঁ করে। মেয়েরা ক্রমশই স্বাধীন হচ্ছে। প্রেম ছাড়া পেয়েছে বাজারে। রেস্তোরাঁর কেবিন এখন কুঞ্জবন। সারাদিনে জোড়ায়, জোড়ায় আসে আর চলে যায়। ভদ্রলোক দেখছেন, এ-জোড়াটা কেমন !

দেয়াল আর মুকুর মাঝখানের খোপ থেকে আমি বলে উঠলুম, 'কাটলেট আর চা।'

মুখ অদৃশ্য হল। পর্দাটা দুলতে লাগল।

মুকু আমার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, 'বলো, কেমন লাগছে তোমার ! কি ভাল, তাই না !'

আমি তখনই মুকুকে সব কথা বলতে শুরু করলুম। দু'হাতে মুখ রেখে মুকু শুনছে। তার সব চপলতা চলে গেছে। মুকু যখন সিরিয়াস, তখন তার চেহারা একেবারে অন্যরকম হয়ে যায়।

সব শুনে মুকু বললে, 'তিনি চলে গেলেন ? এইভাবে চলে গেলেন ?'

বলতে বলতে মুকু কেঁদে ফেলল, 'অমন একজন মানুষ চলে গেলেন ! আমি তাহলে কি নিয়ে বাঁচব !' মুকু মুখ নিচু করে আছে, টপ্‌টপ করে জল পড়ছে চোখ থেকে। টেবিলের পাশে, কোলে। হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। হাত বাড়িয়ে বললে, 'তোমার রুমালটা দাও।' রুমালটা নিয়ে চোখ মুছে বললে, 'চলো।'

'সে কি, আমরা যে অর্ডার দিলুম !'

'দাম মিটিয়ে দাও। আমরা খাব না। খাওয়ার আর মুড নেই। তুমি জান না মেসোমশাই আমার কতটা অধিকার করে আছেন ! অমন ফ্যান্টাস্টিক মানুষ হয় না। আর দ্বিতীয় নেই। তোমার বাবা তো, তাই তুমি চিনতে পারনি। তুমি একটা ছাগল। দেবতার আসন তুমি টলিয়ে দিয়েছ।'

ছাগল বলায় রেগে যাওয়াই উচিত ছিল ; কিন্তু মুকুর ওপর আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। ওর উগ্র সাজ, চটুল ব্যবহারের আড়ালে লুকিয়ে আছে গভীর একটা মন। আমার পিতাকে যে এত শ্রদ্ধা করে সে আমারও শ্রদ্ধেয়।

ভদ্রলোক কাটলেট হাতে সামনে দাঁড়িয়ে। থতমত হয়ে গেছেন। বুঝতে পারছেন না ব্যাপারটা কি ! খুব ভদ্রভাবে বললেন, 'তেমন তো দেরি করিনি ! উঠে পড়লেন ?'

আমি বললুম, 'দেরির জন্যে নয়। অন্য ব্যাপার। আপনি একটা প্যাকেট করে দিন। আমি দামটা দিয়ে দি।'

প্যাকেটটা হাতে নিয়ে আমরা বাইরে বেরিয়ে এলুম। হনহন করে কিছু দূর হাঁটার পর জিজ্ঞেস করলুম, 'তুমি এখন কোথায় যাবে মুকু ?'

'তোমাদের বাড়িতে।'

'বেশি রাত হয়ে গেলে তোমাকে তো আবার হস্টেলে ঢুকতে দেবে না।'

'সে আমি বুঝব। তুমি একটু কম চিন্তা কর।'

আমরা একটা বাসে উঠে পড়লুম। বেজায় ভিড়। মানুষের চটকাচটকি। কিছুক্ষণের মধ্যেই মুকু একটা বসার জায়গা পেয়ে গেল। বাস যেন আর নড়তেই চায় না। দু'কদম যায় তো থেমে পড়ে। তিরিশ মিনিটের পথ যেতে এক ঘণ্টা লেগে গেল। গলদঘর্ম হয়ে বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালুম। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে ভূতের বাড়ির মতো। সদর দরজায় বিশাল এক তালা। বাইরের রকের একপাশে দুটো কুকুর শুয়ে আছে।

মুকু বললে, 'প্যাকেটটা ফেলে দাও না। বিশ্রী গন্ধ বেরচ্ছে।'

'পয়সার জিনিস ফেলে দোবো ?'

'হ্যাঁ দেবে। ও আর কে খাবে ? বাসে অত লোকের নিঃশ্বাস আর ছোঁয়াছুঁয়ির মধ্যে ছিল। খেলেই অসুখ করবে। ওই কুকুর দুটোকে দিয়ে দাও।'

কুকুর দুটো অঘোরে ঘুমোচ্ছিল। কাটলেটের গন্ধে গা ঝাড়া দিয়ে উঠল।

তালাটা খুলে গভীর অন্ধকারে আমরা দু'জনেই হাতড়াতে লাগলুম। সুইচবোর্ড আন্দাজ করে পায়ে পায়ে এগতে লাগলুম। ভয় করছে, সাপ থাকা অসম্ভব নয়। নিচের তলাটা একেবারেই ব্যবহার হয় না। হামেশাই সাপের সঙ্গে আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হয়। মুকুর একটা হাত আমার কাঁধে। আমাকে ধরে ধরে আসছে। তার শাড়ির নিচের অংশ আমার পায়ে মাঝে মাঝে জড়িয়ে যাচ্ছে। আমার শরীরে তার শরীরের ভার। একটু অস্বস্তি হচ্ছে। মন একটু উতলা হচ্ছে। কেউ কোথাও নেই। থকথকে আলকাতরার মতো অন্ধকার। মানুষের মন যখন ভাল থাকে না, তখনই সে দুটো 'ম' খোঁজে। মদ আর নারী। এতকাল শুনেছিলুম, আজ অনুভব করছি। মনে হচ্ছে, কি আর হবে, যা হয় হবে। যতরকম অন্ধকার আছে, তাতেই জীবনটাকে ডুবিয়ে দি। আলোর পথিক তো হওয়া গেল না। আঁধারকেই চিনি ভাল করে। এখন তো আমারই দিন। এই অন্ধকার ইমারতের আমিই সম্রাট।

অবশেষে সুইচবোর্ডে হাত ঠেকল। আলো যেন লাফিয়ে পড়ল মল্লবীরের মতো। সেই আলোয় মুকুকে মনে হল বেসামাল কোনও রাজনর্তকী। দু'পা এগোলেই দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। সিঁড়ির তলায় বাগান করার যন্ত্রপাতি। নানা মাপের শাবল, কোদাল, খুরপি, ঝুড়ি, বালতি, ঝাড়ু। মুকু সিঁড়ির হাতল ধরে ধরে ওপরে উঠছে। এইটুকু সময়ের মধ্যেই অক্লান্ত মাকড়সা এ-মাথা থেকে ও-মাথা জাল বুনে বসে আছে। ভেবেই নিয়েছে, আর তো কেউ আসবে না। বিস্মৃতির সূক্ষ্ম পর্দায় বাড়িটাকে ঢেকে দি। অতি মিহি এক শবাচ্ছাদন। সিঁড়ির ধাপগুলো ভাঙা, ভাঙা। কথা হচ্ছিল, বাড়িটাকে ঢেলে মেরামত করার। সব ভেস্তে গেল।

সিঁড়ির প্রথম বাঁক পর্যন্ত নিচের আলো ছিল। দ্বিতীয় বাঁক পড়ে আছে অন্ধকারে। তৃতীয় বাঁক একেবারেই অনিশ্চিত। দ্বিতীয় বাঁকের মুখে মুকু থমকে গেল। আমি বললুম, 'দাঁড়াও, আমাকে আগে যেতে দাও। অন্ধকারে তুমি কোনও কিছুর হদিশ পাবে না।'

সিঁড়ির ধাপ আমার মুখস্থ। তরতর করে উঠছিলুম। মুকু বললে, 'আমার কথা একটু ভাব।'

'তুমি দাঁড়াও, আমি আলোটা আগে জ্বালি।'

সব ঘরের আলো জ্বেলে দিলুম। সারাদিন বন্ধ ছিল। ঝাড়া-মোছা হয়নি। ধুলো-ধুলো লাগছে। প্রচুর চড়াই পাখি এ-বাড়ির আশ্রিত। তাদের এখন বাসা বাঁধার সময়। খড়, কুটো এনে জড় করেছে ভেন্টিলেটারে! সেইসব পড়েছে মেঝেতে। একটা ব্যাপারে মনে একটু খটকা লাগল। বাবা যে-টেবিলে বসে লেখাপড়া করতেন, তার সামনে একটা জানালা আছে। বেশ মনে পড়ছে জানালাটা আমি ভাল করে বন্ধ করে গিয়েছিলুম। এখন দেখছি একটা পাল্লা খোলা। কে খুলল ? আমি তো ছিটকিনি বন্ধ করে গিয়েছিলুম! বেশ একটা ভয় ভয় করছে। এই বাড়িটার বদনাম আছে। নানা জনে নানা কথা বলে। অশরীরী কেউ ছিটকিনি খুলে বেরিয়ে যায়নি তো!

মুকু টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল। বই, খাতা, সব সুন্দর করে সাজান। একপাশে পড়ে আছে পার্কার কলম। সুন্দর, সুন্দর পেপারওয়েট। কিছুকাল হল বাবা মডেলিং নিয়ে মেতেছিলেন। মাটি দিয়ে তৈরি করছিলেন নানা মূর্তি। হেলাফেলার নয়। সুন্দর কাজ।

টেবিলের ওপর সম্প্রতি তৈরি একটা মূর্তি রয়েছে। দু'হাত তুলে এক বাউল নাচছে। মুকু টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে দিল। নীল সিল্কের কাপড়ের শেড। মায়াবী আলোয় একটা সুখের ভাব। মুকুর মুখে ছায়া পড়েছে। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। মাথার দু'পাশে এলো চুলের ঢল। কলমটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে মুকুর চোখে আবার জল এসে গেল।

আমি কেন মুকুর মতো কাঁদতে পারছি না! আমার ভেতরটা ক্রমশই কেন শান্ত হয়ে আসছে! আমার অনুভূতি কি মরে যাচ্ছে! মুকু কলমটা সযত্নে, সাবধানে রেখে শোয়ার ঘরের দিকে চলে গেল। আমি একটা অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে পড়ে খানিক পায়চারি করে নিলুম। তারপর মনে হল মুকুর খিদে পেয়েছে। কিছু একটা ব্যবস্থা করা দরকার।

বাবার বিছানায় মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে পড়ে আছে মুকু। আমি আস্তে আস্তে তার পিঠে হাত রেখে বললুম, 'কিছু একটা খাবে তো! তোমার খিদে পেয়েছে!'

মুকু পাশ ফিরে বললে, 'আর আমার খিদে নেই।'

মুকু এমন একটা ভঙ্গিতে শুয়ে আছে মনে হচ্ছে আমিও শুয়ে পড়ি তার পাশে, তারপর যা হয় হবে। যা ঘটে ঘটুক। ভবিষ্যৎ এখন আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। আজই আমার বিয়ের রাত হোক না, ক্ষতি কি! আমাকে বাধা দেবার তো কেউ নেই। মন, ভেবে দেখ, মাত্র এক বিঘত দূরে এক মোহময়ী নারী। সারা শরীরে যার যৌবন খেলা করছে জোয়ারের জলের মতো। নির্জন, নিস্তব্ধ বাড়ি। একবার যদি সেইভাবে স্পর্শ করি ক্ষতি কি! স্বর্গসুখ তো কয়েক মুহূর্ত দূরে! হাত দুটো শুধু এগিয়ে যাক। কিছুক্ষণের মতো তুমি তোমার পরিবেশ ও জগৎ ভুলে থাকতে পারবে। দুঃখ ও দুশ্চিন্তার ওপর প্রেমের প্রলেপ নেমে আসবে। আবেগের ঝড়ে খড়-কুটোর মতো সব উড়ে যাবে।

প্রায় আমি সিদ্ধান্তে পৌঁছে গিয়েছিলুম, এমন সময় মুকু ঝট্ করে উঠে বসল। গোলাপি আঁচল খুলে পড়ল। ভয়ঙ্কর সেই দৃশ্য থেকে জোর করে চোখ সরালুম। প্রলোভন কি সাঙ্ঘাতিক জিনিস। চরিত্রকে দুর্ভেদ্য করতে হলে মানুষকে কোন লগ্নে জন্ম নিতে হয়! আজ বুঝতে পারছি, আমি সেইরকম কোনও লগ্নে জন্মাইনি। আমি শের নই, চুহা। বেড়াল আমাকে আধমরা করে একপাশে ফেলে রেখে নিজের থাবা চাটছে। আমার মনে হয় মুষিক-লগ্নে জন্ম। আমি সকালেই আশ্রমে চলে যেতে পারতুম, স্বামী নির্মলানন্দজীর কাছে। সেখানে গেলে, আজ আমি যে বিড়ম্বনায় পড়েছি তার চিরসমাধান হয়ে যেত। আমাকে তিনি শক্ত মুঠোয় ধরতে পারতেন। আমি সেই পথে না গিয়ে, গেলুম বিষ্টুদার কাছে পরামর্শ নিতে। সেখান থেকে বিষ্টুদার বাড়িতে। মনে জড়িয়ে নিয়ে এলুম টিপকে। আমার মনের খবর কেউ জানে না। একমাত্র আমিই জানি। মুকু কি জানে, এই মুহূর্তে আমার অন্তর-আত্মা কিসের জন্যে আকুলি-বিকুলি করছে! আমি যেন এক চামচ ঘি, আগুনে পড়ার জন্যে ছটফট করছি। একটা দেয়ালী পোকা!

মুকু সচেতন হয়ে গুছিয়ে নিল নিজেকে। বুঝতে পেরেছে, আমি টলছি, যে-কোনও মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি।

মুকু বললে, 'তোমার রাতের কি ব্যবস্থা!'

'ব্যবস্থা মানে?'

'রান্নাবান্নার কি ব্যবস্থা করেছ?'

'কিছুই না!'

'সকালে কি করেছিলে?'

নির্জলা একটা মিথ্যে কথা বেরিয়ে এল, 'কিছুই না।' চর্ব-চুষ্য খেয়েছি, একথা বলা গেল না। নিজের শোক তাহলে যে তরল হয়ে যায়।

'সারাদিন উপোস করে আছ ?'

'ওই টুকটাক যা হয় কিছু খেয়ে নিয়েছি।'

'রান্নাঘরে কি মজুত আছে ?'

'সবই আছে।'

'তাহলে চল, রান্না বসাই। প্লেন অ্যান্ড সিম্পল খিচুড়ি।'

'ঘড়িটা দেখেছ ? তোমাকে তো এখুনি ফিরতে হবে। তা না হলে তোমাকে আর ঢুকতে দেবে না।'

মুকু চাবুকের মতো উত্তর দিল, 'আমি যদি আর না ফিরি। মেসোমশাই আমাকে এই বাড়িতেই থাকতে বলেছিলেন।'

'তখন তিনি ছিলেন, এখন যে আমি একলা ! পাঁচজনে কি বলবে ?'

'পাঁচজন ? সেই পাঁচজন কারা ?'

'পাড়াপ্রতিবেশী।'

'তারা তোমার চরিত্রে কলঙ্ক দেবে ? তাই তো ! ভণ্ড তপস্বী ! সন্ন্যাসী হবে ! ভগবানের সঙ্গে শেকহ্যান্ড করবে শয়তান। আমার পবিত্র শিউলি ফুল ! তোমার সেই কাকিমার সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক ছিল ! সাহস থাকে তো সত্য কথা বলবে ? আমার দিদিকে তুমি কি চোখে দেখেছিলে ? পবিত্র, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর চোখে ? তুমি ভাব তোমাকে আমি চিনি না ! ভণ্ডামির একটা সীমা আছে। তোমার মস্ত সুবিধে করে দিয়েছিল ওই বাঁজা মেয়েছেলেটা। তোমার আদরের কাকিমা। তোমার ওই বকধর্মের চোটে, তোমার বাবাকে সব ছেড়ে পালাতে হয়েছে। তুমি তাঁকে তাড়িয়েছ। আমি সব বুঝি। তুমি আমার দিদির পেছনে ছোঁক ছোঁক করতে। সেও আমি জানি। চোখ উলটে ধ্যান, সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গ, সব তোমার ভণ্ডামি। তুমি এক বেড়াল তপস্বী। তুমি দেখবে, দেখতে চাও, এই মুহূর্তে তোমাকে আমি ফেলে দিতে পারি ! সাতঘাটের জল খাইয়ে দিতে পারি। সে-ক্ষমতা আমার শরীরের আছে।'

একসঙ্গে অনেকগুলি এসে আমার বুক যেন ঝাঁঝরা করে দিল। ধরা পড়ে গেছি। রাগ হচ্ছে। উত্তর দেওয়া দরকার, 'আমি যদি বলি, তোমার জন্যেই তিনি চলে গেলেন। বুঝতে পেরেছিলেন, কি ঘটতে পারে ! তাঁর সমস্ত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বানচাল হতে বসেছে। তিনি তোমাকে পছন্দ করেননি।'

'আজ্ঞে না ! তিনি আমাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। পছন্দ করতেন না তোমাকে। তোমার ঘিনঘিনে, শতখণ্ড ব্যক্তিত্বকে। তোমার ওই মাকড়সার জাল আমি ছিঁড়বোই। যা হতে পারবে না কোনও দিন সেই হওয়ার চেষ্টা থেকে তোমাকে আমি ফেরাব। তুমি আমার চ্যালেঞ্জ। আমি এইখানে থাকব। ওই পাঁচজনের নাকের ডগা দিয়ে তোমাকে নিয়ে আমি ঘুরবো। এমনভাবে ঘুরবো, লোকে যাতে মনে করতে না পারে, আমরা ভাইবোন। মনে করুক চরিত্রহীন দুটো ছেলেমেয়ে। বিয়ে না করেই স্বামী-স্ত্রীর মতো থাকছে।'

'আমাদের পরিবারের মুখে চুনকালি পড়বে।'

'কারা দেবে সেই চুনকালি ? যাদের নিজেদের মুখেই কালি। সেই তারা, যারা মেসোমশাইকে নোংরা বই আর কুৎসিত চিঠি পাঠিয়েছিল। তোমার বাবা, তোমার দাদু কখনও ভয় পেতেন না। তাঁরাই ছিলেন প্রকৃত সাহসী, মহাপুরুষ। কি তুমি গেরুয়াধারী

সন্ন্যাসীর কথা বলছ ! 'তোমাকে আজ রাতেই গেরুয়া পরিয়ে দিলে, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে যাবে ! তোমাকে যদি আমি জড়িয়ে ধরি ! তোমার সামনে দাঁড়িয়ে যদি আমি একে, একে সব খুলতে থাকি !'

মুকুর হাবভাব দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। মাঝে মাঝে ভয় হয় মানসিকভাবে ও সুস্থ কি না ! ভয় হয় হিচককের ছবির চরিত্র না হয়ে ওঠে। কিছুই হয় তো বোঝা গেল না, ঝপ করে বুকে ছুরি বসিয়ে দিল ; কি গলা টিপে ধরল। মনের ব্যাপার। নদীর মতোই, কখন কোন ধারায় বইবে ! এমন একরোখা মেয়ে সহসা দেখা যায় না। মুকু আমাকে হতবাক করে রেখে পাশের ঘরে চলে গেল। আলমারি খোলার শব্দ পেলুম। মুকু সবই জানে কোথায় কি আছে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললে, 'একটা শাড়িটাড়ি কিছু দেবে তো ! না কি এই বিয়ের পোশাকেই রান্নাঘরে ঢুকবো ?'

'তুমি তো জানো কোথায় কি আছে ?'

'জানি বলেই জিজ্ঞেস করছি। শাড়ি এ বাড়িতে পাবো কোথাও। শাড়ি পরার মানুষ কোথায় ?' হঠাৎ মনে পড়ল কার বিবাহে উপহার দেওয়া হবে বলে একটা শাড়ি কেনা হয়েছিল ; কিন্তু যাওয়া আর হয়নি। সেই শাড়িটা কি তাহলে মুকুর জন্যেই আছে। নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে রেখেছে। যেমন পুজো পাবেন বলে ঈশ্বর পৃথিবীতে ফুলের বাগান করে রেখেছেন !

৪

What if the Universe wears a mask?
What if no latitudes exist
With lips they would not seal with putty
Against the winter's blast?

সেতারের রিমঝিম ঝালার মতো রাত বাড়ছে। স্বস্তি তো কিছুই ছিল না, অস্বস্তি আরও বাড়ছে। মুকুর উত্তম-মধ্যম তিরস্কারে আমার ভণ্ডামির মুখোশ খুলে পড়ে যাবার উপক্রম। সারা ঘরে পায়চারি করছে। কখনও থমকে দাঁড়াচ্ছে জানলার সামনে। বাইরে রাতের পর্দা ঝুলছে, তারার চুমকি বসান। মোড়ের মাথায় খেয়ালী সঙ্ঘ। সেখানে উত্তরা নাটকের মহলা চলেছে। প্রবীণ আর নবীনদের দল। এই প্রথম দলে একজন মহিলা এসেছেন। এ-পাড়ার দুঃসাহসী, সুন্দরী মেয়ে। তার নাম মুক্তি। মুকু আর মুক্তি প্রায় একরকম। দু'জনেই সমান স্বাধীন। সমান সুন্দরী। মুক্তি আমাদের ক্লাসেই পড়ত। স্কুল থেকেই সে আগুন জ্বালিয়ে আসছে। এক শিক্ষক মহাশয়ের কোচিং ক্লাস ছিল। আমরাও সেখানে পড়তুম। সেই শিক্ষকের খুব ক্ষমতা ছিল। তিনি টেস্ট পরীক্ষা ও ফাইনাল ম্যাট্রিক পরীক্ষার প্রশ্ন আউট করতে পারতেন। তাই তাঁর খুব পসার ও প্রতিপত্তি ছিল। একদিন মহা হইচই। শোনা গেল, সেই শিক্ষক মহাশয় মুক্তিকে কোলে বসিয়ে খুব ঘাঁটু ঘাঁটু করছেন। আমরা, যারা কাঙালের দল, চেল্লাচিল্লি শুরু করে দিলুম। আমাদের স্কুলে ছাত্র-আন্দোলনের সেই সূত্রপাত। চরিত্রহীন শিক্ষকের পদত্যাগ চাই। শুধু পদত্যাগ নয়, শিক্ষকমহাশয়ের মাথা কামিয়ে ঘোল ঢেলে মিছিলে ঘোরান হবে। বামপন্থী রাজনীতি তখন মাথা তুলতে শুরু করেছে। ছাত্রদের আর সেই প্রাচীন মেজাজ নেই। শিক্ষাগুরুর সামনে কেঁচো হয়ে থাকার দিন শেষ। প্রথমে হল ছাত্র ধর্মঘট। চিৎকার, চেঁচামেচি। ছাত্রনেতার জ্বালাময়ী বক্তৃতা। প্রধান শিক্ষক ঘেরাও। অতঃপর চেয়ার, টেবিল ভাঙাভাঙি, অবশেষে ছোট মাপের কয়েকটা বোমা ফাটান। সেই সময় স্কুলে একটা শাস্তি প্রচলিত ছিল, রাস্টিকেট করা। তিন নেতাকে সেই শাস্তি দেওয়া হল। ছাত্র-আন্দোলন আরও জোরদার হল। দিনের পর দিন স্কুল বন্ধ। শেষে সেই 'মুক্তি'কামী শিক্ষককে স্কুলের কম্পাউন্ডে ঘেরাও করা হল। কুৎসিত গালিগালাজ, দু'একটা চড়চাপড়। ব্রহ্মতালুতে চাঁটা। শিক্ষকের ভাবমূর্তি চটকানো। শিক্ষককে শেষ পর্যন্ত অপমানের বোঝা নিয়ে সরতে হল। পরে জেনেছিলুম, ব্যাপারটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। একটা ষড়যন্ত্র। অপূর্ব সেই রহস্যজাল। শিক্ষকমশাই যে-বাড়িতে ভাড়া থাকতেন, সেই বাড়িটা ছিল পুরনো আমলের বিশাল বাড়ি। মুক্তির বাবা ওষুধের কারবার করে বেশ দু'পয়সা করেছিলেন। তিনি বেশ দাঁও মেরে বাড়িটা

কিনলেন। ভেতর ভেতর হাত বদল। মাস্টারমশাই গোটা চল্লিশ টাকা ভাড়ায় অত বড় একটা বাড়ি ভোগ করছিলেন। তাঁকে তো তুলতে হবে! যেমন বাপ তার তেমন মেয়ে। টাকার চেয়ে বড় দুনিয়ায় আর কি আছে! আমাদের সঙ্গে হেমন্ত বলে একটা ছেলে পড়ত। মহা তেঁএটে। সে-ই প্রথম রটালে। সন্ধের মুখে ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখে।

কি দেখে!

সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ল। আদি রসই শ্রেষ্ঠ রস। কোথায় লাগে খেজুর রস। হেমন্ত মনে মনে যা করতে চায়, সবই করিয়ে দিলে সেই নিরীহ, সৎ শিক্ষককে দিয়ে। হেমন্ত আড়াল থেকে দেখছে—মুক্তির অন্তর অঙ্গ। আমাদের ধমনীতে রক্ত টগবগ করে উঠল। কান গরম, চোখ লাল। সেই অঙ্কুরিত বয়সে ওই সব বর্ণনায় মানুষ পাগল হয়ে যায়। শুনতে শুনতে প্রদ্যোত আমাকে জড়িয়ে ধরে গাল কামড়ে দিলে, যেন আমিই মুক্তি। মাঝখান থেকে হল কি। হেমন্তর নতুন একটা সাইকেল হল। ঠেলাগাড়িতে রাজ্যের মাল তুলে শিক্ষকমশাই চলে গেলেন পাড়া ছেড়ে। সেই দৃশ্য আজও আমার চোখে ভাসছে। চৈত্রের দুপুর। গাজনের গেরুয়া সন্ন্যাসীরা পথে হাঁকছেন, বাবা, তারকনাথের চরণের সেবায় লাগি। ঠেলা চলেছে, পেছনে বিবর্ণ একটি ছাতা মাথায় মাস্টারমশাই হাঁটছেন। আর মুক্তি রাতারাতি হয়ে গেল নায়িকা। গৌরব বেড়ে গেল তার। ছেলেদের মধ্যে লাঠালাঠি, ফাটাফাটি। সবাই মুক্তির প্রেমিক হতে চায়।

মহলার শব্দে পাড়া কাঁপছে। হঠাৎ মনে হল, হেমন্তর সঙ্গে আমার তফাত কোথায়। সৎ, সাত্ত্বিক, আদর্শবান, আচার্যস্বরূপ এক মানুষকে দেশত্যাগী করে নিজে জাঁকিয়ে বসেছি জমিদারের মতো। লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, সবই আমার আছে পুরোমাত্রায়। সর্বোপরি ভীরু। নিরাপদ, নিশ্চিত আশ্রয় ছেড়ে নড়তে চাইছি না।

মুকু সোজা এগিয়ে গেল কাপড়, জামার আলমারির দিকে। এক টানে পাল্লাটা খুলে ফেলল। নাড়ানাড়ি করল খানিক। টেনে বার করল একটা শাড়ি। সেই ফিকে হলুদ রঙের শাড়িটা, যেটা আমি কাকিমাকে পুজোয় দোবো বলে কিনেছিলুম। দেওয়া আর হল না।

মুকু শাড়িটা তুলে ধরে বললে, 'এটা কার? তোমার সেই কাকিমায়ের?'

সহসা উত্তর দিতে পারলুম না। আমতা, আমতা করে বললুম, 'পুজোর সময় দোবো বলে কিনেছিলুম।'

'দিলে না কেন?'

'পরিস্থিতি বদলে গেল।'

মুকু খাটে বসল। শাড়িটা কোলের ওপর। প্রশ্ন করল, 'সত্যি কথা বল তো, ওই মহিলার সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা কি ছিল? আমি তোমার কনফেসান চাইছি।'

'কেন প্রশ্ন করছ মুকু? তুমি তো জান। তুমি তো অনুমান করতে পার। আমি একটু খারাপ হয়ে গিয়েছিলুম। এখন আবার ঠিক হয়ে গেছি।'

'তোমার লজ্জা করেনি? নিজের ওপর ঘৃণা আসেনি?'

'এসেছে। সামলাতে পারিনি নিজেকে।'

'তুমি না সন্ন্যাসী হবার স্বপ্ন দেখ? কথায় কথায় শঙ্কর, বুদ্ধ, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দের কথা বল। তোমার লজ্জা করে না! বুঝতে পার না তুমি কত ঘিনঘিনে! তুমি একটা পারভার্ট! আমার কাছে খুব বোলচাল মেরেছিলে? মুকু, আমি ব্রহ্মচারী। আমার পথ ভোগের নয় যোগের! কত রঙ্গই না জান! এইভাবে চললে, তুমি কোথায় শেষ করবে জান কি? বেশ্যালয়ে!'

আমি চিৎকার করে উঠলুম, 'মুকু' !

'এ তোমার আর্তনাদ, ধমক নয়। নিজের কাছে নিজেই ধরা পড়ে গেছ। এইবার আমি তোমাকে ধরব। আমাকে তুমি চিনতে পারনি এখনও। আমি তোমার বাবার প্রতিনিধি।'

'তিনি কি তোমাকে পছন্দ করতেন ?'

'না, করতেন না। তার প্রধান কারণ তুমি। তুমি যে কত দুর্বল চরিত্রের তিনি তা জানতেন। যে কোনও মেয়ে একটা টুস্কিতে তোমার ঠাট-ঠমকের দুর্গ ভেঙে দিতে পারে। প্রমাণ চাও ? দেখবে, এখুনি তোমার কি করুণ অবস্থা আমি করে দিতে পারি ? দেখতে চাও ?'

মুকুর হাত দুটো আমি ধরে ফেললুম, 'আমাকে তুমি বাঁচাও। তুমি আমাকে পড়ে ফেলেছ মুকু, খোলা বইয়ের মতো। আমি উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছি। এঁটো হয়ে গেছি। অপবিত্র হয়ে গেছি।'

'তুমি খুব বিপজ্জনক হয়ে উঠেছ। মেয়েরা যে-ধরনের চরিত্রকে ভয় পায়, ঘৃণা করে, তুমি ক্রমশই সেই ধরনের একটি চরিত্র হয়ে উঠছ। এই হলে জীবনে তুমি কোনও দিন সুখী হতে পারবে না, সুখীও করতে পারবে না কারোকে। শেষ পরিণতি আত্মহত্যা। আমার হাত ছাড়। তুমি কাঁপছ ?'

ভয়ে, ভয়ে হাত ছেড়ে দিলুম। মুকুর চোখে নিজেকে খুব ছোট মনে হচ্ছে। অক্ষমের লেখা উপন্যাসের মতো অপাঠ্য।

মুকু বললে, 'ওই ঘরে ঠাকুরের কাছে আজ প্রদীপ, ধূপ জ্বালিয়েছিলে ?'

'না।'

'কেন ?'

'আমরা তো এই সবে এলুম।'

'কথাটা তোমার মনে ছিল ?'

'বোধ হয় না।'

'নিষ্ঠা বলে একটা শব্দ আছে, জান ?'

'জানি।'

'তোমার কি তা আছে ? একটা জিনিস তুমি কত দিন ধরে থাকতে পার, হিসেব করে দেখেছ ?'

'বেশিদিন পারি না।'

'তোমার স্বভাব হল মাছির স্বভাব। একবার এখানে বসছ, একবার ওখানে বসছ। কখনও ফুলে, কখনও গুয়ে। নতুন নতুন খেয়ালের পেছনে ছুটছ। নতুন নতুন মেয়ে। গলে যাওয়া আইসক্রিমের মতো বসে না থেকে উঠে পড়। বাথরুমে গিয়ে চান কর ভাল করে। ঠাকুরের জায়গায় প্রদীপ জ্বাল। ধূপ দাও। কিছুক্ষণ চুপচাপ আসনে বসে থাক চোখ বুজিয়ে। রুটিন থেকে সরে গেলে চলবে না। আমি এই শাড়িটা পরছি।'

'তুমি হস্টেলে ফিরবে না ?'

'একবার বলেছি, না। বারে বারে একই প্রশ্ন আমার ভাল লাগে না। কাল সকালে গিয়ে আমার মালপত্র সব নিয়ে চলে আসব চিরকালের জন্যে।'

'আমাকে তো দেরাদুনে ট্রান্সফার করেছে।'

'সে তো আরও ভাল। দু'জনেই যাব।'

'তোমার এম এ ?'

'বিয়ের পর চিন্তা করা যাবে। দেরাদুন থেকে হরিদ্বার খুব কাছে। হৃষিকেশ, লছমনঝোলা, রুদ্রপ্রয়াগ, দেবপ্রয়াগ। আমরা বাবাকে খুঁজতে বেরবো। আশ্রমে, আশ্রমে। ঠিক পেয়ে যাব। পাহাড়, নদী, ঝরনা, এই তিনের মধ্যেই তো তিনি ঈশ্বরকে দেখেছিলেন। তাড়াতাড়ি বাথরুমে যাও। তোমার পরে আমি যাব।'

সদরের কড়া নড়ে উঠল। আমরা দু'জনে স্তব্ধ হয়ে গেলুম। তিনি ফিরে এলেন না কি ? আমি ফিসফিস করে বললুম, 'কে বল তো ? বাবা ?'

'কড়া নাড়ার ধরন দেখে বুঝতে পারছ না ! এলোমেলো। ছন্দ নেই। কড়া নাড়ার ধরন দেখে ব্যক্তিত্ব বোঝা যায়। নতুন কেউ। ভয়ে ভয়ে নাড়ছে। যাও দেখে এস।'

দরজা খুলে অবাক হয়ে গেলুম। দাঁড়িয়ে আছেন, টিপ আর টিপের মা।

বউদি বললেন, 'কত রাত হয়ে গেল। আরও একটু আগে আসা উচিত ছিল।'

টিপ বললে, 'মাকে আমি সেই সন্ধে থেকে তাড়া লাগাচ্ছি, চলো, চলো, চলো। কাজ যেন আর শেষই হয় না।'

বউদি বললেন, 'চলো, তোমার কোথায় কি আছে, সব গুছিয়ে নিয়ে একেবারে চলে যাই। তোমার জন্যে একটু অন্যরকম রাঁধতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল। বেশিরভাগ রান্নাই অবশ্য টিপ রেঁধেছে। বললে, পিন্টুদাকে আজ জন্মদিনের খাওয়া খাওয়াব।'

আমার গলা শুকিয়ে আসছে। মুকু তো আমাকে যেতে দেবে না। সবাই ওপরে উঠে এলুম। সামনেই দাঁড়িয়ে আছে মুকু রাজমহিষীর মতো। টিপ, ইতু বউদি দু'জনেই থতমত খেয়ে গেছেন। মুখে-চোখে একটা অপ্রস্তুত ভাব। সেই ভাবটা কাটাবার জন্যে আমি তাড়াতাড়ি পরিচয় করিয়ে দিলুম, 'আমার মাসতুতো বোন মুকু।' মুকু দু'হাত তুলে নমস্কার করল।

আমি আরও একটু যোগ করলুম, 'বাইরে থাকে। কলকাতায় এসেছে লেখা-পড়া করার জন্যে।'

বউদি নিজেই নিজের পরিচয় দিলেন, 'পিন্টু আমাকে বউদি বলে। এই আমার মেয়ে টিপ।'

মুকু আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'যাও দেরি কোরো না। তোমার অনেক কাজ পড়ে আছে।' বিকেলের সাজে বউদিকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। কালো কুচকুচে চুল। টান টান খোঁপা। ডুরে শাড়ি। টিপ বেশ কুঁচিয়ে শাড়ি পরেছে। চুলে বিনুনি। ফুলের মতো সুন্দর। আমি পায়ে-পায়ে বেরিয়ে এলুম ঘরের বাইরে। মুকু বোধহয় দেখাতে চাইছে আমার ওপর তার কতটা কর্তৃত্ব ! মুকুর ভিতরে একটা ডিক্টেটর বসে আছে। শীত আসছে। জল বেশ ঠাণ্ডা। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। ভাবছি, ব্যাপারটা বেশ জটিল হল। বউদিকে এখন আমি কি বলব ? মুকু যে-ভাবে হাল ধরেছে, সহজে টাল খাবার নয়। ঠাকুরঘরে প্রদীপ জ্বালালুম। একগোছা ধূপ। সারা বাড়ি গন্ধে ভরে গেল। আসনে বসামাত্রই মনটা অন্যরকম হয়ে গেল। এই আসন সাধকের আসন। বাবা বসতেন। কোনও আসনে দিনের পর দিন বসে অবিরত সৎ চিন্তা করলে, সেই আসনে শক্তি সঞ্চারিত হয়। সেই আসনে বসামাত্রই, আসন তাকে গ্রাস করে। অনধিকারী কেউ বসলে আসন তাকে ঠেলে ফেলে দেয়। একটা ঝিম-ঝিম শান্তির ভাব ছেয়ে আসছে শরীরে। মনে হচ্ছে, দেহের বাঁধন খুলে পড়ছে। কোথা থেকে কোথায় যেন চলেছি ভেসে-ভেসে। এইভাবে অনেকক্ষণ বসে থাকা যেত, কিন্তু উঠে পড়তে হল।

ঘরে ঢুকে দেখি মেয়েদের মজলিশ বসে গেছে। মুকু মধ্যমণি। বউদি তার গায়ের ওপর

হেসে গড়িয়ে পড়ছেন। টিপের মুখ উদ্ভাসিত। যাক, মুকু তাহলে মিশে গেছে!

বউদি বললেন, 'পুজো করে এলে?'

মুকু বললে, 'ও তো ধ্যান-জপ নিয়েই থাকে। মাঝে মাঝে ভয় করে, সংসার ছেড়ে চলে না যায়!'

বউদি বললেন, 'হবেই তো, এ যে সাধকের বাড়ি। রক্তে সাধনা আছে।'

মুকুর কথায় অবাক হয়ে গেলুম। বলে কী! আমাকে ঠেলে কোথায় তুলছে! একটু আগে বললে, কাপুরুষ। পর্যাপ্ত তিরস্কার। এমন কথা নেই, যা বলেনি। এখন বলছে মহাপুরুষ।

মুকু বললে, 'চলো, রান্নাঘরে কোথায় কি আছে দেখে নি। আজ তোমাকে বেশি কিছু খাওয়াতে পারব না, প্লেন অ্যান্ড সিম্পল খিচুড়ি।'

বউদি বললেন, 'সে আর কি কথা! তোমরা আমার ওখানে খাবে। আমি এতক্ষণ সব রান্না করলুম কিসের জন্যে?'

মুকু বললে, 'সে আপনি একজনের জন্যে করেছেন আমার কথা তো ছিল না। ও তাহলে যাক। আমি আমার মতো ফুটিয়ে নি।'

বউদি খপ্ করে মুকুর হাত দুটো ধরে বললেন, 'এ তুমি কি কথা বলছ? অভিমানের কথা। তুমি যে আসবে আমার কি তা জানা ছিল? আর সংসারে কেউ ঠিক ঠিক একজনের জন্যে রাঁধে না। সংসার অনেককে নিয়ে। তোমাদের দু'জনকেই আমরা ধরে নিয়ে যাব।'

টিপ মুকুর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল। জড়িয়ে ধরে বললে, 'তুমি কি সুন্দর! তুমি কত কি জান? মুকুদি তুমি আমাকে পড়াবে? আমার খুব লেখা-পড়া করতে ইচ্ছে করে।'

'আমি যদি এখানে থাকি নিশ্চয় পড়াব তোমাকে। তুমি এত সুন্দর মেয়ে!'

বউদি বললেন, 'আজ তাহলে তোমার সেই-সব জিনিসপত্তর মেলান হচ্ছে না?'

'আজ আর থাক বউদি। হাঙ্গামা করে দরকার নেই। মুকু এসেছে। যা করার কালই হবে।'

'আমি তাহলে একটু চায়ের চেষ্টা করি। মনটা চা-চা করছে।'

বউদি বললেন, 'রাত নটার সময় আর চা খায় না। আমাদের বাড়িতে চলে চল। তখন দেখা যাবে।'

'এত তাড়াতাড়ি গিয়ে কি হবে? বিষ্টুদার দোকান বন্ধ হতে হতে সেই রাত এগারটা!'

'ওর জন্য বসে থাকবে না কি?'

'থাকব না! বিষ্টুদা ছাড়া কিছু জমে! ফাঁকা ফাঁকা লাগবে।'

মুকু বলল, 'বউদি, আপনারা এগিয়ে যান, আমরা দশটার মধ্যে যাচ্ছি।'

নিচে পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেলুম। যাবার সময় টিপ বলল, 'মুকুদিকে আমার ভীষণ ভাল লেগে গেছে। আমি কিন্তু মাঝে-মাঝে আসব।'

'মাঝে-মাঝে কেন, তুমি রোজই এস। তোমরা এলে আমার খুব ভাল লাগবে।'

বউদি কানে কানে বললেন, 'তোমার কেমন বোন? সত্যি বল তো। দূর সম্পর্কের?'

'আমার জ্যাঠাইমার বোনের ছোট মেয়ে।'

'বুঝেছি।' বউদি মুখ টিপে একটু হাসলেন। আমার হাতে সামান্য চাপ দিয়ে বললেন, 'তা ভালই। শাসন করতে জানে।'

মুকু দাঁড়িয়ে আছে খোলা জানালার সামনে। ঢুকতেই ফিরে তাকাল। ডুরে শাড়িটা বিছানার ওপর ছড়ান। মুকু রাগরাগ গলায় বলল, 'নিজের সিদ্ধান্তে নিজে আসতে পার না?

নিজেকে ছড়িয়ে ফেলার অদ্ভুত ক্ষমতা তোমার। গোপনীয়তা রাখতে জান না ? ওঁরা কি করতে এসেছিলেন ? যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই সন্ধে হয়। কাকিমা গেলেন তো বউদি এলেন। সঙ্গে আবার পরী ! কিছু পার বটে ?'

'কি করব বল, সকালে আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কি করি, কোথায় যাই !'

'আমি কি মরে গিয়েছিলুম ! আমার কাছে আসতে তোমার কি হয়েছিল ?'

'তোমার কাছে যাব বলেই তো বেরিয়েছিলুম। বাসস্টপে বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে এলুম। তখন আমার মন একেবারে ভেঙে গেছে।'

'তোমার মন কবে আস্ত ছিল ? না ভোগে, না যোগে, আরশোলার মতো ফড়্ফড় করে উড়ছে একবার এ-দেয়াল একবার ও-দেয়ালে। নিজেকে আগে একটু স্থির করো তো ! তা না হলে তোমার সব যাবে। ভেসে যাবে।'

'মুকু তুমি আমাকে আর বোকো না। বিশ্বাস কর, আমার মন ভীষণ খারাপ হয়ে আছে।'

'সেইজন্যেই তো উত্তম-মধ্যম দিচ্ছি। তোমার মনটাকে ঘোরাবার চেষ্টা করছি। ওরা কি গোছগাছ করতে এসেছিল ?'

'বাড়িতে অনেক সোনার গয়না রয়েছে। ওইভাবে তো ফেলে রাখা যায় না। বিষ্টুদা বলছিলেন, একটা লিস্টি করে ব্যাঙ্কে জমা করে দাও।'

'তুমি ওদের সামনে সেই গয়না বের করবে ! বলিহারি তোমার বুদ্ধি ! ঐশ্বর্যের প্রদর্শনী করতে আছে ?'

'ওঁরা সবাই ভীষণ ভাল মানুষ, তুমি জান না।'

'যতই ভাল মানুষ হোন, কাঙালকে শাকের ক্ষেত দেখাতে আছে !'

'তুমি ওঁদের কাঙাল বলছ ?'

'সংসারী মানুষ মাত্রেই কাঙাল। কখন কি অভাবে পড়বেন বলা যায় !' তখন তোমার কাছে আসবেন সাহায্যের জন্যে। ফেরাতে পারবে না। দিতেই হবে।'

'বিপদে সাহায্য করা খারাপ ?'

'সাহায্য তাঁরাই করতে পারেন, যাঁদের অনেক আছে। আর অনেক যাঁদের আছে, তাঁরা কখনই সাহায্য করবেন না। তাঁরা থাকেন সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে। মাঝামাঝি জায়গায় যাঁরা আছেন তাঁরাই মরেন। কত তুমি সাহায্য করবে ! ক'জনকে তুমি সাহায্য করবে ! একটু বুঝতে শেখ। অত হলহলে হলে চলবে না। পরিবারের গোপন কথা মানুষের মুখে মুখে ছড়ায়।'

'তুমি বড় সংসারী মুকু। বড় বেশি হিসেবী।'

'একজন বেহিসেবী হলে আর একজনকে তো হিসেবী হতেই হবে। তা না হলে ব্যালেন্স হবে কি করে ? তোমার গয়নার লিস্ট আমি করে দোবো। আজ রাতেই করে দোবো। এখন চলো খেয়ে আসি।'

দোরতাড়া বন্ধ করে রাস্তায় নেমে এলুম। কোথায় পা ফেলছিলুম জানি না, মুকু হাঁ হাঁ করে উঠল, 'দেখে, দেখে, কিসের ওপর পা পড়ছে একবার দেখ। গোবর।'

অতটা খেয়াল করিনি। সামলে নিলুম। মুকু শুধু হিসেবী নয়, সাবধানী। দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গেছে। খোলা রাস্তা চলে গেছে সামনে-পিছনে। ছাড়া-ছাড়া ল্যাম্পপোস্ট আলোর জাল ফেলে পোকা ধরছে। এ-রকে, ও-রকে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে মানুষ পড়ে আছে। মিষ্টির দোকানের বাইরে ভিয়েন শেষ করে হাওয়া খেতে বসেছেন ঘর্মাক্ত হালুইকর। আমাদের পাড়ার বিখ্যাত মাতাল শামুদা তাঁতের মাকুর মতো টলে টলে

ফিরছেন, একবার এদিকে একবার ওদিকে। এই সময় সামনাসামনি পড়ে গেলেই মহা বিপদ। দু'কাঁধ ধরে প্রেম বোঝাবার চেষ্টা করবেন। প্রেম কাকে বলে। খাঁটি প্রেম। পেটে পড়লেই ভদ্রলোক প্রেমের লাইনে চলে যাবেন, অথচ বিয়ে করেননি। ভাল চাকরি করেন। সকালে ফিটফাট ভদ্র। যত রাত বাড়তে থাকে ততই রূপান্তর! মধ্যরাতে সম্পূর্ণ বেসামাল। মাঝে মাঝে গলা ছেড়ে গান ধরেন, 'মোর প্রিয়া হবে এস রানী, দেবো খোঁপায় তারার ফুল।' সুন্দর গলা।

মুকুকে বললুম, 'পা চালাও।'

মুকু বললে, 'কেন?'

'টলমলে ওই ভদ্রলোক অতিশয় বিপজ্জনক। একবার ধরলে আর রক্ষে নেই।'

'জান, ষাঁড় দেখলে আমি ভয় পাই না। আমি মগের দেশের মেয়ে। বাবার হাত ধরে আরাকানের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে বার্মা থেকে পালিয়ে এসেছিলুম।'

কথায় কথায় শামুদা আমাদের দূর দিয়ে আপনমনে চলে গেলেন। পড়তি জমিদার বংশের ছেলে। ভারি সুন্দর দেখতে।

মুকু বললে, 'মাতালরা ছাতাকে ভীষণ ভয় পায়।'

'যাঃ, ছাতাকে কেন ভয় পাবে?'

'সত্যি! আমি পরীক্ষা করে দেখেছি। একদিন দুপুরবেলা হরি ঘোষ স্ট্রিটে আমাকে দেখে এক মাতালের প্রেম চাগিয়েছিল। আমার হাতে ছিল একটা ছাতা। ভটাস্ করে খুলতেই লোকটা ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়ে বললে, দেবী, দেবী, মাতা, জননী, বজ্রাঘাত কোরো না। জান তো, বাঘ গুলির চেয়ে ভয় পায় হাঁচিকে। কেঁদো বাঘের সামনে ফ্যাঁচ করে হেঁচে দেখো লেজ তুলে পালাবে। হাতিকে যদি পায়রার পালক দিয়ে সুড়সুড়ি দাও দুদ্দাড় করে পালাবে।'

'এ সব তুমি পরীক্ষা করে দেখেছ?'

'ছাতাটা করেছি। বাকিগুলো শুনেছি।'

আমরাও ঢুকছি, বিষ্টুদাও ঢুকছেন। মুকুর সঙ্গে পরিচয় ছিল না। পরিচয় করিয়ে দিলুম। বিষ্টুদা অসম্ভব খুশি হয়ে বললেন, 'ভগবান তোমাকে পাঠিয়েছেন মা। ছেলেটা মহা বিপদে পড়েছে, কেউ দেখার নেই। পরামর্শ দেবার মতো কেউ নেই। কি খাবে, কোথায় শোবে, তারও কোনও ঠিক নেই। তুমি এসে যে কি ভাল করেছ! চল, চল ভেতরে চল।'

শিউলির গন্ধে উঠোন ভরে আছে। গাছ একেবারে ফুলে ফুলে সাদা। মা আর মেয়ে দু'জনেই বেরিয়ে এলেন। বউদি মুকুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'কি ভাল যে লাগছে। ঘর যেন আলো হয়ে গেল।'

মুকু বললে, 'একটু বেশি বেশি হয়ে গেল। এ বাড়ির আলো আপনারা দু'জনে।'

বিষ্টুদা কুয়োতলায় দাঁড়িয়ে হুড় হুড় করে চান করছেন। শীত শীত রাত। ঠাণ্ডা না লেগে যায়। সবই মানুষের অভ্যাস। অপূর্ব খাওয়া হল। যেন কোনও উৎসবের ভোজ!

মুকু বললে, 'বউদি আপনি আর টিপ এইবার বসে যান, আমি পরিবেশন করি।'

'পরিবেশন করার কিছুই নেই গো, সব আমরা গুছিয়ে রেখেছি। তুমি শুধু আমাদের সামনে জমিয়ে বোসো, গল্প করি আর খাই।'

বিষ্টুদা বললেন, 'আর গল্প করার সময় নেই। রাত হয়েছে বেশ। চলো, তোমাদের পৌঁছে দিয়ে আসি।'

বেরিয়ে আসার সময় মুকু বললে, 'দেখে রাখ একেই বলে লক্ষ্মীর সংসার; ঠিক যেন

একটা আশ্রম। শান্তিকুঞ্জ। ভীষণ ভাল লাগছে, মনে হচ্ছে এখানেই থেকে যাই।'

বউদি বললেন, 'আজ রাতে না-ই বা গেলে। সবাই মিলে বেশ গল্প হবে।'

কিন্তু! সেই আশি না কত ভরি সোনা। তারই টানে বাইরে তো রাত কাটান যাবে না। ভীষণ চুরি হচ্ছে চারপাশে। যক্ষ হয়ে বিষয় আগলাতে হবে। বিছে হার, চন্দ্র হার, বাজু, বাউটি। মৃতাদের যত অলঙ্কার।

৫

Happiness is beneficial for the body
but it is grief that develop the Powers of the mind

গভীর রাতকে মাঝে মাঝে মনে হয় কালো এক অশ্বারোহী। ছুটে চলেছে নতুন এক দিনের দিকে। কখনও মনে হয় জুয়াড়ি। প্রদীপের আলোয় মাথা নিচু করে বসে তিন তাস খেলছে। আগামী প্রভাত কে দেখবে আর কে না দেখবে!

পাশের ঘর থেকে মুকু বেরিয়ে এল সেই ডুরে শাড়িটা পরে। ঘরে ঢুকেই বললে, 'সমস্ত দরজা, জানলা বন্ধ কর। নিচের সব বন্ধ হয়েছে?'

'হয়েছে।'

'ঘুপচিঘাপচি সব দেখে এসেছ, কেউ ঢুকে বসে নেই তো ঘাপটি মেরে!'

'না, তা তো দেখিনি। সদরে খিল লাগিয়ে উঠে এসেছি।'

'বাঃ, টর্চের আলো ফেলে একবার দেখে এলে না! লুকিয়ে থাকার জায়গার তো অভাব নেই। যাও একবার দেখে এস।'

কঠিন পরীক্ষা। আমি ভীতু। ভয়ঙ্কর রকমের ভীতু। ভূতের ভয়, চোরের ভয়, সাপের ভয় এমন কি ব্যাঙকেও ভয় পাই আমি। ব্যাঙের বিশ্রী একটা স্বভাব হল, লাফিয়ে কোলের ওপর আসার চেষ্টা। সেই জন্যেই বলে কোলা ব্যাঙ। আমাকে ইতস্তত করতে দেখে, মুকু বললে, 'ধরেছে তো! ভয়ে একেবারে মরে যাচ্ছ!'

'তুমিও চল না।'

'না, তোমাকে একা যেতে হবে। পুরুষ মানুষ, সাহস কর। ছায়া দেখে চিৎকার করে উঠ না।' সেই পাঁচ সেলের টর্চটা নিয়ে পেছনের সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছি। ড্যাম্প। সোঁদা সোঁদা গন্ধ। দেয়ালে নোনা ধরেছে। আপনা আপনিই নানা দেশের মানচিত্র হয়ে বসে আছে। দরজার ফাটলে, ফাটলে উচ্চিংড়ির রলরোল। রাতের ঝিল্লি যেন কাঁপছে দিনের গর্ভযন্ত্রণায়! মনে হচ্ছে পাতালে নামছি। পায়ের দিক থেকে একটা গুড়গুড়ে শীত তলপেট পর্যন্ত উঠে আসছে। অন্ধকার যেন কফিনে শুয়ে আছে। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে, এই বুঝি কাঁধে কেউ হিমশীতল হাত রাখবে। ঘাড়ে ফেলবে বরফ-নিশ্বাস।

দেখে শুনে ফিরে এলুম। মুকু খাটে আড় হয়ে শুয়ে আছে রাজরানীর মতো। কিছু চুল সামনে ঝুলছে, কিছু পিঠের দিকে। একটা ডায়েরি খুঁজে বের করেছে কোথা থেকে। গম্ভীর মুখে পাতা ওল্টাচ্ছে। নীল চাদরের ওপর মুকুকে বেশ মানিয়েছে। মুখ তুলে বললে, 'সব

ঠিক আছে ?'

'আছে।'

'আমি মেসমশাইয়ের একটা ডায়েরি খুঁজে বের করেছি। বেশ কিছু ঠিকানা লেখা আছে। এই ঠিকানা ধরে আমরা অনুসন্ধান করে দেখতে পারি।'

'সবই কি কলকাতার ?'

'বেশির ভাগই কলকাতার, বাইরেরও আছে কিছু। দক্ষিণ ভারত, উত্তর ভারত, মধ্যভারত।'

'ওই সব ঠিকানার সঙ্গে বছরে একবারই যোগাযোগ। বিজয়ার চিঠি। ওর কোনওটাতেই তাঁকে পাওয়া যাবে না।'

'তোমার অনেক দোষের একটা হল, তুমি নিরাশাবাদী। সব কিছুতেই না। হ্যাঁ বলতে জান না ? যাক তোমার সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। দরজা বন্ধ করে গয়নার বাক্স বের কর। আজই লিস্টটা তৈরি করে ফেলি।'

'অনেক রাত হল না ?'

'হল তো হল, তাতে তোমারই বা কি, আমারই বা কি ? রাতের সম্পর্ক ঘুমের সঙ্গে। সময় নষ্ট না করে সব নিয়ে এস।'

গয়নার বাক্সটা খাটের মাঝখানে রাখা হল। একপাশে আমি আর একপাশে মুকু। মুকুর হাতে কাগজ আর কলম। প্রথমেই বেরল, ছ'টা আংটি। একটা আংটি হাতে নিয়ে মুকু বললে, 'পাথরটা মনে হচ্ছে হীরে ?'

'হ্যাঁ, হীরে। ওটা আমার মায়ের আঙুলের। বিয়ের আংটি।'

আংটিটি নিজের অনামিকায় গলিয়ে মুকু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে। একটা অশরীরী আলো ছিটকোচ্ছে। মুকু বললে, 'মায়ের আঙুল আর আমার আঙুল একই মাপ। আমি যে আসব মা বোধহয় জানতেন। এ সবই তো আমার।'

অবাক হয়ে মুকুর দিকে তাকালুম। এত লোভী!

মুকু বললে, 'খুব খারাপ লাগল শুনতে, তাই না ? ইচ্ছে করে বললুম, তোমার মনে ছেঁকা দেবার জন্যে। সবই তোমার, গয়নার লোভ আমার নেই। পুরো বাক্সটা উপুড় করে দাও। আমি এক একটা লিখব, আর তুমি তুলবে।'

বাক্সটা উপুড় করে দিলুম। চুড়িতে, রুলিতে ঠোকাঠুকি হয়ে কিন্‌কিন্ শব্দ করে উঠল। মনটা কেমন ছাঁত করে উঠল। যাঁদের অঙ্গে এইসব শোভা পেত, তাঁরা পৃথিবীর খেলা শেষ করে বহুদিন হল চলে গেছেন। হীরের আংটি আঙুলে। মা হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইছেন। হীরে ঝিলিক মারছে। নাকে হীরের নাকছাবি। কানে মুক্তোর দুল। কত সুখ ছিল এই সংসারে! মৃত্যু এসে ঈগল পাখির মতো একে একে সব ছোঁ মেরে নিয়ে চলে গেল।

মুকু বললে, 'অতীত থেকে দয়া করে ফিরে এস বর্তমানে। এই নাও, নাম্বার ওয়ান। হীরের আংটি। নাম্বার টু, রুবির আংটি, পোখরাজ, নীলা।'

লিস্ট ক্রমশই বড় হচ্ছে। বিছে হার, প্রজাপতি হার, চেন, সাপ বালা। জোড়া সাপ। সাপের চোখে রুবি। প্রজাপতি হারটার অবাক করা শোভা। মোটামোটা চুড়ি, রুলি, আঙটি, লেট, টায়রা, ব্রোচ। শেষ গয়নাটা যখন বাক্সে ফিরে এল ঘড়িতে তখন রাত দুটো। আমার হাই উঠছে। মুকু আমার চুলে হাত বুলিয়ে বললে, 'এইবার বাবুর ঘুম পেয়েছে গো!' যাও সব তুলে রাখ। কাল আমরা দু'জনে গিয়ে ব্যাঙ্কে জমা করে দিয়ে আসব।'

আলমারির মধ্যে বাক্সটা চালান করে দিলুম। চন্দনের গন্ধ, ন্যাপথালিনের গন্ধ ছড়িয়ে

গেল ঘরে। নানারকম সুগন্ধীর সঙ্গে আমার পিতার যোগ ছিল। ফালি ফালি কাপড়ে নানারকম সেন্ট মাখিয়ে জানালায়, জানালায় ঝুলিয়ে দিয়ে মোটা গালচে পেতে এস্রাজ বাজাতে বসতেন। সুর আর সুগন্ধ একসঙ্গে ছড়াত সারা বাড়িতে। এস্রাজটা সিল্কের আলখাল্লা পরে কোণের টেবিলে দাঁড়িয়ে আছে। আর কি কোনওদিন বেজে উঠবে!

মুকু আলগোছে ঢকঢক করে জল খেল। খাটের চাদরটা টান টান করে বালিশ পেতে দিয়ে বললে, 'নাও শুয়ে পড়। শোওয়ার আগে জল খেয়ো।'

'আর তুমি?'

'আমি পাশের ঘরে।'

'সে কি? এই বিশাল খাটে আমাদের দু'জনেরইতো চমৎকার হয়ে যেতে পারে!'

'আরে ছি, ছি, দু'জনে একই বিছানায় শোয়া যায়, না শোয়া উচিত! তিনি থাকলে পারতে! না-থাকায় তিনি আরও আছেন। এই কথাটা যেন ভীষণ ভাবে মনে থাকে! কোনও অপবিত্র, আদর্শবিরোধী কাজ এই বাড়িতে চলবে না। এটা জ্ঞানপীঠ, সাধন পীঠ!'

'পাশাপাশি, চুপচাপ দু'জনে শুলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে?

'মহাভারত অশুদ্ধ না হলেও, দেহ অশুদ্ধ হবে। তুমি একটু একটু করে আমার দিকে সরবে, আমি সরব তোমার দিকে। রাত ভোর হবার আগেই যা হবার তা হয়ে যাবে। লোহা আর চুম্বক দূরে দূরে থাকতে পারে না।'

'আমি কথা দিচ্ছি।'

'তোমার কথা যে আমি বিশ্বাস করি না মহারাজ। তুমি মিথ্যাবাদী।'

'মিথ্যাবাদী? আমি মিথ্যাবাদী?'

ডাহা মিথ্যাবাদী। বিকেলে তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম, সারাদিন তুমি কি খেলে? অম্লান বদনে বললে, টুকটাক, সামান্য কিছু। মানে, প্রায় উপোসই করে আছ। ইতু বউদি বললেন, তুমি দুপুরে পাত পেড়ে চর্ব-চুষ্য খেয়ে গেছ। এই ডাহা মিথ্যেটা তুমি বললে কেন? আমি জানি, কেন বললে! তোমার সবটাই লোক দেখান। তুমি দেখাতে চাইলে, দেখো, আমি কত বিচলিত, নাওয়া, খাওয়া ভুলে, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছি আওয়ারা হয়ে। আসলে, ব্যাপারটা তুমি বেশ মেনে নিয়েছ শান্ত মনে, হজম করে ফেলেছ। কোনও কিছু তোমার মন স্পর্শ করে না। মন ছুঁয়ে চলে যায়। ছোট ছোট ব্যাপারেই মানুষকে চেনা যায়, বড় ব্যাপারে যে কি করবে। আর যেই করুক তোমাকে আমি আর বিশ্বাস করি না। বিশ্বাস করেননি তোমার বাবাও। নাও এখন শুয়ে পড়। আমি পাশের ঘরে চললুম। আমার প্রবল ঘুম পেয়েছে এইবার। আর দাঁড়াতে পারছি না। শোয়ার আগে হাত জোড় করে প্রার্থনা করবে, ঈশ্বর! আমাকে চরিত্র দাও, আবেগ দাও, চোখে জল দাও। লোককে দেখাব না, নিজেকে দেখাব। নিজেই নিজেকে দেখে বাহবা করে উঠব। সার্টিফিকেট বাইরের কেউ দিতে পারে না। নিজের সার্টিফিকেট নিজেই দেওয়া যায়।'

মুকু যেন আগুনের মতো জ্বলছে! আমার বিবেক যেন আমার সঙ্গে কথা বলছে। পাশের ঘরের দরজা বন্ধ করার শব্দ হল। আমি বসে রইলুম গুম মেরে। আমার ঘুম ছুটে গেছে। হাওয়া কোন দিকে ঘুরছে কে জানে? নিস্তব্ধ চরাচর। উত্তুরে বাতাস ছেড়েছে। দমকে দমকে। গাছের পাতায় ঝুপঝাপ শব্দ। হঠাৎ একটা গান ভেসে এল মনে,

সুদূর কোন্ নদীর পারে গহন কোন্ বনের ধারে
গভীর কোন্ অন্ধকারে হতেছ তুমি পার॥

তিনি কে? তিনি আমার পিতা, শ্রীযুত হরিশঙ্কর। নিরুদ্দিষ্টের কলামে বিজ্ঞাপন দিতে হলে

লিখতে হবে : প্রবীণ এক মানুষ। সুঠাম শরীর। উচ্চতা, পাঁচফুট দশ ইঞ্চি। মাথার চুল পাতলা হয়ে এসেছে। বুকের মাঝখানে অ্যাসিডে পুড়ে যাওয়ার দাগ। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। পাতলা ক্ষুরধার ঠোঁট। উন্নত নাসা। তিনি সুদূর কোন্ নদীর পারে, গহন কোন্ বনের ধারে এই গভীর নিশায় দাঁড়িয়ে আছেন একা। একটি খেয়া হঠাৎ খুলে গেল তীর থেকে। গভীর কোন্ অন্ধকারে হতেছ তুমি পার। আর ভাবতে পারছি না। এইবার শুয়ে পড়ি।

ঘুম ভেঙে গেল। দরজায় টকটক শব্দ। জানালায় উজ্জ্বল প্রভাত। মুকুর গলা, 'গেট আপ মাই বয়।' বাইরে এসে অবাক হয়ে গেলুম। শাড়ির আঁচল কোমরে জড়ান। হাতে একটা ঝাড়ু। খোঁপা মাথার ওপর উঁচু করে বাঁধা।

মুকু বললে, 'গুড মড়নিং'

'মড়নিং। তোমার এ কি বেশ?'

'কাজের লোকের বেশ। তোমার ঘরটা ছাড়া সবই পরিষ্কার করা হয়ে গেছে। উনুনে আগুন পড়েছে। এইবার চা চাপছে। মুখ ধুয়ে নাও।'

'কখন উঠেছ তুমি?'

'উঠেছি? কখন শুয়েছি তাই বল?'

'সে কি সারারাত জেগে ছিলে? কেন? ঘুম এল না?'

'তা হলে এই দেখ।'

মুকু নিমেষে তার ডান উরুটা আমার সামনে খুলে ধরল। ফর্সা ধবধবে। এত ফর্সা যে চোখে ধাঁধা লেগে গেল। সেই শুভ্র ত্বকে থর নিয়ে উঠেছে লাল চাকা মতো একটা কি।'

চমকে প্রশ্ন করলুম, 'কি ওটা?'

শাড়ি নামিয়ে দিয়ে মুকু বললে, 'যন্ত্রণা। সবে শুয়েছি। ঘুমও প্রায় এসে গেছে, এমন সময় দিলে কামড়ে।'

'কি কামড়াল?'

'বিছে। খপ্ করে চেপে ধরলুম অন্ধকারে। চটকে, রগড়ে রসটা মাখিয়ে দিলুম। জান তো, বিষের ওষুধ বিষ। সারা রাত জ্বলল হু হু করে লঙ্কাবাটার মতো। বসে বসেই রাতটা কেটে গেল।'

'আমাকে ডাকলে না কেন?'

'তুমি আমার সুখের সাথী। দুঃখের সাথী হতে যাবে কেন?'

কাল থেকে তুমি খুব পাকাপাকা কথা বলছ। কই দেখি আর একবার।'

মুকু হেসে বললে, 'আর না মশাই। একবারই যথেষ্ট।'

'তুমি আমাকে কি ভাব বলত! চল, একটু ওষুধ লাগিয়ে দি।'

'কোনও প্রয়োজন নেই, আপনিই সেরে যাবে। তুমি তোমার কাজে যাও, আমি যাই আমার কাজে।' মুকু আমার ঘরে ঢুকে গেল। মশারি তুলে, বিছানা গোছগাছের কাজে লেগে গেল। দাঁত বুরুশ করতে করতে নিজেকে ধিক্কার দিলুম—সত্যিই তুমি বাপু শয়তান। তোমার ছলের অভাব নেই। মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছ না। মানুষের একটা প্রত্যঙ্গ তোমাকে এমনভাবে কাবু করে ফেলল। হবে না, তোমার কিছু হবে না। সেই দুই সন্ন্যাসীর গল্প। দু'জনেই চলেছেন, এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়। খুব বৃষ্টি হয়েছে ক'দিন। চারপাশে জলকাদা। ডোবা, খানাখন্দ। সন্ন্যাসী দু'জন চলেছেন। পেছনে আসছিলেন এক সুন্দরী, যুবতী মহিলা। তেমনি তাঁর সুন্দর সাজ পোশাক। সামনেই একটা কাদার দঁক। মহিলা ইতস্তত করছেন। ওই কাদায় নামলে শাড়ি, জুতো সবই যাবে। তাঁর

ইতস্তত ভাব দেখে, এক সন্ন্যাসী তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন। মহিলা কিছু বলার আগেই পাঁজা কোলা করে তাঁকে কাদার অংশটুকু পার করে দিলেন। আবার চলতে শুরু করলেন দুই সন্ন্যাসী। হাঁটতে হাঁটতে তাঁরা এসে পৌঁছলেন এক মঠে। রাত হল। দু'জনেই শুয়েছেন এক ঘরে। হঠাৎ দ্বিতীয় সন্ন্যাসী বললেন, 'পরমানন্দ! তুমি এটা কি করলে?'

'কোনটা?'

'তুমি তো জান, আমাদের মতো সন্ন্যাসীর নারীদর্শনেও চিত্তচাঞ্চল্য হতে পারে। স্পর্শ! সে তো আরও ভয়ঙ্কর! আর তুমি সেই মহিলাকে কোলে করে কাদাপার করালে! কাজটা কি ভাল করলে?'

পরমানন্দ হাসতে হাসতে বললেন, 'হায় হরি! আমি তো তাকে কখন কোল থেকে নামিয়ে দিয়েছি, তুমি এখনও তাকে বয়ে বেড়াচ্ছ!'

ওই দ্বিতীয় সন্ন্যাসীর অবস্থা হয়েছে আমার। কতক্ষণে ওই নিদারুণ প্রত্যঙ্গ মন থেকে সরে যায় দেখি! সারাটা দিনই থাকবে। নিজেকে তো ভালই চিনি। মুকুর ডাক ভেসে এল, 'কতক্ষণ ধরে দাঁত মাজবে! তোমার কটা দাঁত? বত্রিশটা না চৌষট্টিটা?'

মুকুর বেশ দেখে চমকে উঠলুম। আমার একটা পাজামা আর পাঞ্জাবি পরে দু'কাপ চা হাতে নিয়ে ঘরের দিকে চলেছে।

'এ তোমার কি বেশ?'

'কি করব, বাসী কাপড় চোপড় সব কেচে দিয়েছি। আর তো নেই কিছু।'

'কেন যে-শাড়িটা পরে এসেছিলে?'

'সেটা তো রাস্তার কাপড়। ওটা পরে রান্নার কিছু ছোঁয়া যায়!'

'উঃ, তুমি একটা হয়েছ বটে! তোমার ওই জায়গাটা কেমন আছে?'

'আবার সেই চিন্তা! বেশ আছে, ভাল আছে। মাঝে মাঝে চিনচিন করছে।'

'ডাক্তারবাবুকে কল দোবো?!'

'তার আগে এস দু'জনে মিলে বাড়িটা পরিষ্কার করি। বাজারে যাবে তো?'

'কি রাঁধবে?'

'সব নিরামিষ।'

'আমরা তো শাক্ত!'

'মেসোমশাই মাছ, মাংস, ডিম সব ছেড়ে দিয়েছিলেন। দাদু শেষটায় হয়েছিলেন বিষ্ণুর উপাসক। পিতার আদর্শকে যে-ছেলে ধরে রাখতে পারে সে-ই সুসন্তান। এ-কথা আমার নয় কনফুসিয়াসের।'

'তোমার হস্টেলের কি হবে!'

'বারোটার সময় আমরা দু'জনে বেরবো খেয়েদেয়ে। প্রথমে যাব ব্যাঙ্কে। সেখান থেকে হস্টেলে। যা আছে সব নিয়ে চলে আসব।'

'আর ইউনিভার্সিটি।

'কাল থেকে আবার ক্লাস শুরু হবে।'

'আর আমার চাকরি?'

'কাল থেকে বেরোও। কতদিন আর বাড়িতে বসে থাকবে!'

'আমাকে তো দেরাদুনে বদলি করেছে।'

'তুমি তোমার অসুবিধের কথা গিয়ে বল। বল আমি এখন কলকাতায় থাকব।'

'সে হয় না। অত বড় একটা প্রোমোশান নোবো না!'

'তাই বল ! লোভ ! লোভে ধরেছে। তাহলে দোরতাড়া বন্ধ করে দেরাদুনে চলে যাও। আমি আমার হস্টেলেই ফিরে যাই।'

'একটা কথা বলব সাহস করে !'

'বল।'

বেশ কিছুক্ষণ ইতস্তত করলুম। বলব কি বলব না ? শেষে আমতা আমতা করে বলেই ফেললুম, 'আমরা যদি বিয়ে করি ! করে সোজা দেরাদুনে চলে যাই !'

মুকু হা হা করে হেসে উঠল, 'বিয়ে করবে ? মেসোমশাইয়ের অবর্তমানে, অনুমতি ছাড়াই। তিনি বাঁচলেন কি মরলেন একবার দেখবে না ! নিজের সুখ, নিজের কেরিয়ারটাই কেবল দেখতে চাও ! যে মানুষ সমস্ত ত্যাগ করে তোমাকে মানুষ করলেন, শেষটায় তিনি এই ভাবেই হারিয়ে যাবেন !'

'তাহলে আমি করবটা কি ? শূন্য ঘাটে আমি কি-যে করি, রঙিন পালে কবে আসবে তরী ?'

'একটা কাজই তুমি করবে, ওই রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রথম লাইনে যা আছে, তোমায় চেয়ে আছি বসে পথের ধারে সুন্দর হে। তুমি বসে থাকবে, সব যেমন ছিল, সেই ভাবে বজায় রেখে। একেবারে টিপ্‌টপ করে রাখতে হবে। তিনি আসবেন, আসতে তাঁকে হবেই। আমার মন বলছে। প্রয়োজন হলে তোমাকে চাকরি ছাড়তে হবে।'

'খাব কি ?'

'খাবে না। মাস্টারি করবে। অন্য কোথাও চাকরির চেষ্টা করবে। টেকনিক্যাল লাইনে চাকরির অভাব হবার কথা নয়। না হয় দু'পয়সা কমই মাইনে হবে। মা-মরা-ছেলেরা অবশ্য স্বার্থপরই হয়। তুমি একটু বেশি স্বার্থপর, এই যা তফাত।'

'তা হলে কি করব এখন ?'

'বাজার করবে। বারোটার মধ্যে বেরোতে হবে। একেবারে বর্তমানের কথাটাই আগে ভাব, তারপর আগামী দিনের কথা ভাবা যাবে। তোমাকে আমি বাজে পরামর্শ দোবো না।'

ব্যাগ বগলে রাস্তায় নেমে এলুম। চারপাশে যেন গ্যাজগ্যাজ করছে। রাস্তায় নেমে মনে হল, আমি ভীষণ অসুস্থ। জীবনের সুর কেটে গেছে। দু'পা যেতে না যেতেই পেছন থেকে মেয়েলি গলায় ডাক এল, 'এই যে পিন্টু, পিন্টু।'

এ-পাড়ার বিখ্যাত মেনিদা। সাতসকালেই মুখে ডবল খিলি পান। চ্যাকোর, চ্যাকোর করে চিবচ্ছেন। হাতে ধরে আছেন পানের বোঁটায় চুন। জিজ্ঞেস করলুম, 'কি বলছেন ?'

'তোমার বাবা উঠেছেন ?'

'না।'

'আঃ, ভেরি লেট রাইজার। ভোরে ওঠার মহিমা বুঝল না। সারা জীবন শুধু শুনেই গেল সূর্য পুবদিকে ওঠে। দেখা আর হল না। তুমি তো ডেকে দিতে পার। এই বয়েসে ভোরবেলা বেড়ানই হল বেস্ট একসারসাইজ। আমি সেই ভোর পাঁচটা থেকে ঘুরছি। তা কখন গেলে দেখা হবে বল তো !'

'তিনি কিছু দিনের জন্যে বাইরে গেছেন।'

'তাই না কি, চেঞ্জে ? তা আমি যে আবার অন্যরকম শুনলুম। সেই বিধবা মাগীটাকে নিয়ে সংসার পাততে গেছে !'

আমি আর নিজেকে ধরে রাবখতে পারলুম না। পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে গেল। সপাটে এক চড় ভদ্রলোকের মুখে। মাথাটা একপাশে টলে গেল। জীবনের প্রথম চড়।

জামার কলারটা বুকের কাছে খামচে ধরলুম। এক ঝাঁকানি মেরে বললুম, 'কি বললেন ?'

মেনিবাবু বললেন, 'বাস্টার্ড।' থুঃ করে এক ধাবড়া পানের পিক ছুঁড়ে দিলেন আমার দিকে। এক ধাক্কা মারতেই ভদ্রলোক পড়ে গেলেন চিৎপাত হয়ে। সঙ্গে, সঙ্গে লোক জড়ো হয়ে গেল। মেনিবাবু শুয়ে শুয়েই বললেন, 'গুরুজনের গায়ে হাত তোলা ! হারামজাদা ! যেমন বাপ তার তেমনি ছেলে !'

আমি একটা লাথি মারার জন্যে ডান পাটা তুলেছিলুম। আমাকে কে একজন পেছন থেকে জাপটে ধরলে, 'কি হচ্ছে কি ! খুন করে জেলে যেতে চাও ?'

চতুর্দিক থেকে প্রশ্ন, 'কি হয়েছে কি ! একটা বৃদ্ধ, নিরীহ মানুষকে ধরে ঠ্যাঙাচ্ছ ? ভদ্রলোকের ছেলের এ কি দুর্মতি !'

কি হয়েছে, এক কথায় বলি কি করে ! আমার পিতাকে অপমান ! লোকটার জিভ আমি টেনে ছিঁড়ে দোব। জেলে যেতে হয় যাব। জমায়েত দু'ভাগ হয়ে গেল। এক ভাগ আমার দিকে, এক ভাগ মেনিবাবুর দিকে। মেনি খুব তড়পাচ্ছে। 'জিজ্ঞেস করলুম, তোমার বাবা কোথায় ? তা ঝড়াকসে একটা চড় কষিয়ে দিলে !' আমার দিকে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রবীণ পরেশবাবু, খুব রাশভারি মানুষ, তিনি বললেন, 'মেনি, এই প্রশ্নে কেউ চড় মারতে পারে না, পাগল ছাড়া। এই ছেলেটিকে আমি ভাল ভাবেই চিনি, তোমাকেও আমার চিনতে বাকি নেই। পিন্টু, মেনি তোমাকে কি বলেছিল ?'

'জ্যাঠামশাই এমন অশ্লীল কথা, যা আমি মুখে আনতে পারব না।'

মেনিবাবুর তিন মেয়ে খুব ওড়াওড়ি করে। মেনির দিকে আমার বয়সী কিছু স্বাভাবিক কারণেই জুটেছে। তাদের একজন বললে, 'অকারণে কেউ অশ্লীল কথা বলে ! হয় ও পায়ে ধরে ক্ষমা চাক, নয় পেঁদানি খাক।'

পরেশবাবু বললেন, 'পিন্টু, পায়ে ধরে নয়, এমনিই তুমি ক্ষমা চেয়ে নাও, যতই হোক প্রবীণ মানুষ।'

'আমি পারব না জ্যাঠামশাই। কে কাকে পেঁদায়, আমি একবার দেখতে চাই। হয়ে যাক।'

কখন আমার বন্ধু মিহির পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল লক্ষ করিনি। সে এগিয়ে এল, 'কে মারবে ! মারবে কে ! সাহস থাকে এগিয়ে আয় !' মিহির আমাকে জিজ্ঞেস করলে, 'মেনিমুখোটা কি বলেছিল রে ! তোর মতো ঠাণ্ডা ছেলে ক্ষেপে গেল !' আমি বললুম, মেনির মন্তব্য।

পরেশবাবু বললেন, 'আরে ছি ছি। একজন ঋষিতুল্য মানুষ। আমরা সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করি। মেনি তুমি তো একেবারে উচ্ছন্নে গেছ হে ! এ-পাড়ায় তো তোমার থাকা উচিত নয়। তোমার এ কি স্বভাব ! তুমি চোদ্দটা ছেলে মেয়ের বাপ। আজ বাদে কাল ঘাটে যাবে !'

মিহির বললে, 'তোর জামার বুকে লাল মতো কি রে ! রক্ত ?'

'না, পানের পিক দিয়েছে।'

মিহির বললে, 'মেনিবাবু, আজ আপনাকে ওয়ারনিং দিচ্ছি, নিজের ব্যাপার ছাড়া অন্যের ব্যাপারে নাক গলালে খুব খারাপ হয়ে যাবে। আমাকে আপনি ভালই চেনেন। নিজের মেয়ে তিনটেকে আগে সামলান। পিন্টু তুই বাড়ি যা।'

আমি জিতেছি না হেরেছি বুঝতে পারলুম না। দাগরাজি বুকে বাড়ি ফিরে এলুম। বাজার আর হল না।

৬

একদিন কুম্ভকার-গৃহ-পার্শ্ব দিয়া
যাইতে, শুনিয়াছিনু,—কাঁদিয়া কাঁদিয়া
কহিছে কর্দম-পিণ্ড-নরকণ্ঠে যেন,—
'ধীরে, বন্ধু, বাজে বড়, মেরো না বাঁধিয়া !'

একটা কথা আছে, 'মহাগুরু নিপাত যোগ'। পিতার মৃত্যুর পর একটা বছর এই যোগ চলে। যত রকম দুর্ভাগ্য নেমে আসে মানুষের জীবনে। আমি যেন সেই যোগের মধ্যে পড়েছি। শ্রীহরিশঙ্কর কোথায় অদৃশ্য হলেন জানি না। তিনি নেই। এই না-থাকাটা মৃত্যুরই সামিল। অসভ্য ইতর মেনি তাল তোবড়ানো মুখ। ঠোঁট দুটো ছুঁচলো করে, এক ধাবড়া পানের পিক দিয়ে দিলে আমার বুকে। সারা গা ঘিন্ ঘিন করছে। জামাটা তো গেলই। ভেতরের গেঞ্জিটাও গেছে।

মুকু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমার সামনে। একটাও কথা নেই মুখে। তীব্র চোখে দেখছে আমাকে। অপরাধী সন্তানের মতো মাথা নিচু করে আছি আমি। আমি দোষী ? আমার দোষটা কোথায় ?

মুকু ঝাঁঝালো গলায় বললে, 'আধ ঘণ্টার মধ্যে একটা কাণ্ড করে চলে এলে ! গেলে এক কাজে করে এলে আর এক কাজ। তোমার কি দরকার ছিল, খুঁচিয়ে ঘা করার !'

'বাঃ, আমার বাবার নামে যা-তা বলবে আর আমি চুপ করে থাকব ?'

'তুমি হাত তুলতে গেলে কেন ? তোমার তো মুখ ছিল। এই যে জল ঘোলা করে এলে, আরও কিছু শত্রু তৈরি হল। এরপর তুমি এ-পাড়ায় টিকতে পারবে ? যেতে আসতে টিটকিরি মারবে। একজন মানী মানুষের মানসম্মান ধুলোয় লুটোবে। এত সহজে মেজাজ খারাপ করলে চলে ? পৃথিবীটা পৃথিবীই, স্বর্গ নয়। তোমার মতো বোকা পৃথিবীতে আর দুটো নেই। ঠিক ফাঁদে গিয়ে পড়লে !'

'ফাঁদ আবার কি !'

'মানুষ কত উদ্দেশ্যে কত কাজ করে তোমার ধারণা আছে ? নেই।'

'এ পাড়ায় আমারও কিছু বন্ধু আছে।'

'বিপদে কারোকে খুঁজে পাবে না। যাও, জামাটা খুলে ফেলে দিয়ে চান করে এস।'

কোনও রকমে খাওয়া-দাওয়া হল। নিরানন্দ ভোজন। মুকু সেই থেকে আমার সঙ্গে কথাপ্রায় বলছেই না। নীরবে সব কিছু করে যাচ্ছে। তার সাজগোজ হয়ে গেছে। গয়নার বাক্সটা আলমারি থেকে বের করলুম। মুকু হঠাৎ বললে, 'ওটাকে তুমি কী ওইভাবেই নিয়ে যাবে ?'

'তা হলে ?'

'কি তোমার বুদ্ধি ? এ যেন ফুল দিয়ে সাজিয়ে শ্মশানে মড়া নিয়ে যাওয়া। বলো হরি ! এক ঝটকায় কেড়ে নিলে কি করবে ? ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে কাঁদবে ?'

'তা হলে কি করে নিয়ে যাব ?'

'বাজার করার চটের ব্যাগটা নিয়ে এস। একটা খবরের কাগজে সব জড়িয়ে ওর মধ্যে ফেল। তার ওপর একটা কাপড় চাপা দাও।'

অক্ষরে, অক্ষরে মুকুর নির্দেশ পালন করে পৌনে বারোটা নাগাদ আমরা রাস্তায় নেমে এলুম। মোড়ের মাথায় তিন চারটে ছেলে জটলা করছে। একজনের সঙ্গে একটা সাইকেল। আমরা কাছাকাছি যেতেই একজন সিক্ করে একটা সিটি মারল। তীরের মতো লাগল। মন ফুঁড়ে গেল।

মুকু বললে, 'উঁহুঁ, একেবারে পাত্তা দেবে না।'

দু'পা এগোতে না এগোতেই আর একজন বলে উঠল, 'মালটা ভালই জুটিয়েছে।' সঙ্গে সঙ্গে আর একটা মন্তব্য, 'আসবে না কি খাওয়াবো,। চাটিম কলা।'

আমার কান দুটো গরম হয়েগেল। হাতের মুঠো কষকষ করছে। ইচ্ছে করছে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ি। আমি যাঁর সন্তান, সেই হরিশঙ্কর হলে, রক্তগঙ্গা বয়ে যেত। আমার মাতামহ হলে, সবকটাকে এক এক করে তুলে আছাড় মারতেন। ঠিকই বলতেন তিনি, ডাঁটে চলাফেরা করার দুটো হাতিয়ার, ব্রহ্মচর্য আর মুগুর।

এলাকা ছাড়িয়ে আসার পর মুকু বললে, 'একা হবে না, দল চাই। লোফারদের চেন !'

'একটাকে মনে হল চেনা চেনা। আর তিনটে বেপাড়ার। আমার কি মনে হচ্ছে জান ? সব কটাকে ছিঁড়ে খণ্ড খণ্ড করি।'

'একা পারবে না। নিজেই খণ্ড খণ্ড হয়ে যাবে। দলের সঙ্গে লড়তে হলে দল চাই। তুমি একা। তোমাদের পাড়াটা খুবই খারাপ।'

'আগে এইরকম ছিল না। হঠাৎ হয়ে গেছে।'

'এর একমাত্র কারণ, দেশবিভাগ !'

'এ-পাড়ায় আর থাকা যাবে না মুকু !'

'তা বললে তো চলবে না। এত বছরের বসবাস ছেড়ে পালাবে কোথায় ? আরও খারাপ দিন আসছে। হেরে গেলে হবে না। কায়দা করে থাকতে হবে। কোনও কিছু গ্রাহ্য করবে না। যব হাতি চলে বাজার কুত্তা ভুকে হাজার।'

ব্যাঙ্কের ম্যানেজার খুব ভাল ব্যবহার করলেন। আমি একা থাকলে হয়ত করতেন না। মুকুই কারণ। চোখ ঠিকরে দেবার মতো রূপ, তেমনি স্মার্ট। ম্যানেজার ভদ্রলোক চেয়ার থেকে শরীরটাকে আধখানা তুলে ফেলে এদিকে ওদিকে দুলতে লাগলেন লগবগে নাচের পুতুলের মতো। মুকুই হেসে বললে, 'বসুন আপনি।' ভদ্রলোকের চোখ দুটো টিপের মতো আটকে রইল মুকুর মুখে। আমার বেশ মজা লাগছিল। হঠাৎ এক ছত্র কবিতা, প্রজাপতির মতো উড়ে এল,

Man is the hunter, woman is his game ;
The sleek and shining creatures of the chase,
We hunt them for the beauty of their skins
They love us for it, and we ride them down.

কিছু কিছু মানুষ আছেন উত্তেজনায় তোতলা হয়ে যান। ভদ্রলোকের তাই হল।

অলওয়েজ অ্যাট ইওর সার্ভিস, এই একটি লাইন বলতে চেয়েছিলেন। কি বিপদেই যে পড়লেন ! অল, অল করলেন বারকতক। শব্দজব্দের মতো, পরের শব্দটা কি হবে আমরা অনুমান করার চেষ্টা করছি। ওয়েজটা মুক্তি পাবার পর আমরা সাহায্য করলুম, অলওয়েজ অ্যাট ইওর সার্ভিস। ভদ্রলোক যেন মুক্তির নিশ্বাস ফেললেন। বেল টিপলেন। দৌড়ে এল বেয়ারা। বেয়ারার সামনে তিনি ক্ষমতাশালী ম্যানেজার। দাপটে হুকুম দিলেন, চা নিয়ে এস।

ইন্টারন্যাল ফোন তুলে কাকে যেন আসতে বললেন। চা আর ভদ্রলোক আসার ফাঁকে ম্যানেজার মুকুকে আবার একটা কিছু বলতে চাইলেন। সেই একই সমস্যা। আপনিতে এমনভাবে আটকে গেলেন, মনের কথা মনেই রয়ে গেল। কথা যখন চিউয়িংগাম হয়ে যায় তখন আর কিছুই করার থাকে না।

চটের ব্যাগ থেকে একে একে গয়না বেরচ্ছে। ক্যাশিয়ার ভদ্রলোক মুকুর বুদ্ধির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। কি প্র্যাকটিক্যাল, কি ইন্টেলিজেন্টে ! ম্যানেজার শুধু তারিফের হাসি হাসতে লাগলেন। কাগজ-পত্র তৈরি হল। সইসাবুদ হল। মুক্তির আনন্দ নিয়ে আমরা বেরিয়ে এলুম। এত দুঃখ, যে, এই সামান্য ব্যাপারটাকেই মনে হচ্ছে, কত বড় সুখ !

মুকু রাস্তায় নেমে হন হন করে হাঁটতে হাঁটতে বললে, 'হারি আপ মাই বয় !'

মুকু আমার বাবার এই কথা দুটো কোথা থেকে পেল, 'কাম অন মাই বয়', 'হারি আপ মাই বয়'। তিনিই কি কথা বলছেন মুকুর কণ্ঠে বসে ! বড় পরিচিত কথা।

আমার হাতে সেই বিশ্রী চটের ব্যাগটা। জিজ্ঞেস করলুম, 'মুকু এইটার কি ব্যবস্থা হবে ?'

'গোল করে পাকিয়ে বগলে চেপে রাখ। কেন, লজ্জা করছে ?'

'পোশাকের সঙ্গে মানাচ্ছে না।'

'বাবা ! দেখো। সেরকম হলে আমার কাছে দাও।'

এরপর আর কিছু বলা যায় না। ঊর্ধ্বশ্বাসে আরও কিছু দূর হাঁটার পর জিজ্ঞেস করলুম, 'এরপর আমরা কোথায় যাব ?'

'আমার হস্টলে। তুমি একটা ট্যাক্সি ডাকবে। মালপত্র তুলব। সোজা চলে আসব বাড়ি।'

'কিছু কথা ছিল।'

'কি কথা ?'

'কোথাও একটু বসা দরকার।'

'বসার দরকার নেই। বুঝেছি, তুমি কি বলতে চাও। ভয়ে মরছ। তুমি চাও না, আমি তোমার সঙ্গে থাকি ! পাড়ার ওই লোফারগুলো তোমাকে টিটকিরি মারবে। এই হল তোমার এক নম্বর ভয়। দু'নম্বর ভয়, যদি মোসোমশাই ফিরে আসেন, তাহলে আমাকে দেখে কি ভাববেন ? তোমার ওইসব ভয়কে আমি পাত্তা দিচ্ছি না। তোমাকে আমি একলা থাকতে দোবো না। তোমার একটা গুণ ছিল না, সেইটা হঠাৎ এসেছে, কথায় কথায় মারামারি করা। একই সঙ্গে তোমার বাবা আর মা হয়ে তোমাকে আগলাতে হবে।'

মুকুর কথা শুনে আমি থমকে গেলুম। এ অভিনয়, আদিখ্যেতা, না সত্যিই প্রেম।

মুকু বললে, 'হাঁ করে তাকাবার মতো, আমি কিছু বলিনি। তুমি এখন আমার মুঠোয়।'

বাস আসছে। স্টপেজ কিছুটা দূরে। মুকু বললে, 'হারি আপ মাই বয় !'

আমরা বাসে উঠে পড়লুম। ফাঁকা। পাশাপাশি বসলুম। কিছু দূর যেতে না যেতেই আমার মাথায় আর এক চিন্তা এল, টাকা। অন্নচিন্তা চমৎকারা। মুকু যদি আমার সঙ্গে থাকে তাহলে রোজগার চাই। ভাল রোজগার। চাকরি ছাড়ার উপায় নেই। সংসারে জড়িয়ে

পড়ার এই বিপদ। একা হলে কোনও কথাই ছিল না। খাও-দাও বগল বাজাও।

খুব মৃদু গলায় ডাকলুম, 'মুকু।'

চোখ বুজিয়ে বসেছিল। চোখ না খুলেই বললে, 'আবার কি সমস্যা!'

'সবার আগে আমার ফ্যাকট্রিতে তো একবার যেতে হয়।'

'চলো। এর জন্যে অত ভাবার কি আছে?'

'তাহলে টিকিটটা সেইভাবেই কাটি।'

'কাটো। তোমার ম্যানেজিং ডিরেক্টারের সঙ্গে আমি কথা বলব।'

'আমিই সব গুছিয়ে বলতে পারব।'

'আমি বললে, আরও ভাল পারব। তা ছাড়া আমার সঙ্গে পরিচয়ও হয়ে যাবে।'

'যদি কিছু মনে করেন?'

'তোমার এই এক হয়েছে! সবেতেই দুর্ভাবনা। মনে করলে করবেন।'

'তুমি বললে, এম ডি ভাববেন, ছেলেটার কোনও ব্যক্তিত্ব নেই।'

'তোমার সত্যিই কি কোনও ব্যক্তিত্ব আছে? নিজে নিজে কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পার?'

চুপ মেরে গেলুম। মুকুর গলা ক্রমশই চড়ছে। যাত্রীরা আমাদের দিকে তাকাচ্ছেন অবাক হয়ে। একজন সাংঘাতিক সুন্দরী মেয়ে বোকা বোকা একটা ছেলেকে তেড়ে ধমকাচ্ছে। ভাবছেন, ব্যাপারটা কি।

ফ্যাকট্রির গেটের সামনে দু'জনে এসে দাঁড়ালুম। দ্বিতীয় শিফটের কাজ শুরু হয়ে গেছে। অফিস আর ল্যাবরেটারি বিল্ডিং-এর পেছন দিকে কারখানার বিশাল চিমনি, ভুস্‌ভুস্‌ করে ধোঁয়া ছাড়ছে। বেশ ভারি একটা লাঞ্চের পর যেন ধূমপান করছেন বড়সড় কোনও মানুষ। অফিস-গেটের সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন আমাদের পাবলিসিটি অফিসার। খুব সাজগোজ করেন। নিজেই যেন এক জীবন্ত পাবলিসিটি। কোম্পানির যত কসমেটিকস আছে সবই মেখে বসে আছেন। প্রতিদিনই তাই করেন। এইটাই তাঁর ধরন। মেয়েলি চেহারা, মেয়েলি ভাবভঙ্গি। পোশাকে কখনও বাঙালি, কখনও পাক্কা সাহেব। আজ সাহেব। সাদা জামার ওপর টাই ঝুলছে। আমার সাথে মোটামুটি ভালই খাতির। খাতিরের কারণ, আমাকে মাঝে মাঝেই তাঁর কবিতা শুনতে হয়। প্রবল প্রেমের কবিতা। প্রেমিকা কোথায় আছেন জানি না। সেই প্রেমিকাকে তিনি প্লেটে সাজিয়ে কখনও দিচ্ছেন রক্তঝরা হৃদয়, কখনও ফুসফুস, কখনও অঞ্জলি দিচ্ছেন নয়নপদ্ম। বাকি আছে, যকৃৎ, প্লীহা। একমাত্র কোনও সার্জেনই এই কাণ্ড করতে পারেন।

আজ সাহেবী পোশাক বলে, সাহেবের মতো আচরণ, 'হ্যাল্লো। হাউ ডু ইউ ডু!' শোনাল, 'হাডুডু'। আর একটু হলেই মুখ ফস্কে বেরিয়ে যাচ্ছিল, 'কিৎ কিৎ!' সামলে নিলুম কোনওক্রমে। হাতটা ধরে কষে ঝাঁকানি মারলেন। তারপর মুকুর দিকে তাকিয়ে কুমড়োর ফালি মতো হাসলেন। হেসেই রইলেন। চোখ দেখে মনে হল, অসীম কৌতূহল পরিচয় জানার।

বলেই দিলুম প্রশ্ন করার আগে, 'আমার বোন।'

'দেখেই বুঝেছি, মুখের মিল। অসম্ভব সাদৃশ্য।'

হাতে একটা চেন বাঁধা চাবি ছিল। উত্তেজনায় পাঁই পাঁই ঘোরালেন একবার। শেষে অদ্ভুত এক প্রশ্ন করলেন, 'তোমার চুল কত বড়?'

মুকু অবাক হয়ে বলল, 'আমার চুল?'

'হ্যাঁ তোমার চুল।'

'তা হবে, কোমর পর্যন্ত নামবে তো বটেই।'

'ব্যাস, আমার একটা মস্ত চিন্তা গেল। তোমাকে আমাদের তেলের বিজ্ঞাপনের মডেল করব। এমন সুন্দর চেহারা, চাঁদের মতো মুখ। মডেলিং-এর ফিউচার জান, ভেরি ব্রাইট। কাপড়ের বিজ্ঞাপন হলে তোমাকে কখনই বলতুম না। চুলের বিজ্ঞাপন অ্যাবসলিউটলি ইনোসেন্ট। চুল আঁচড়াবে, চুল খুলবে, ব্লোয়ার দিয়ে চুল উড়িয়ে দোবো, তুমি একটা টার্নটেবিলে ঘুরবে। স্লো-মোশানে দেখান হবে। গোটা চারেক কথা। কবিতাও হতে পারে। আমাদের পেমেন্ট খুব ভাল। ক্যাশ। তোমাকে আজ আমি বলে রাখছি, তুমি ফিল্মস্টার হবে। কেউ আটকাতে পারবে না। লেখা-পড়া কি করেছ?'

মুকু যেন একটা ঘোরের মধ্যে চলে গিয়েছিল। কোনও রকমে বেরিয়ে এসে বললে, 'এম-এ পড়ছি।'

'তা হলে? সেটাও তো একটা ব্যাপার। তুমি তো আমাদের পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্টে জয়েন করতে পার। একটা ওপনিং আছে। ভাই, বোন একসঙ্গে আসবে, একসঙ্গে যাবে। এম ডি-কে বললে এখুনি রাজি হয়ে যাবেন। তোমার ভাইকে ভীষণ ভালবাসেন তো! তা তোমরা দু'জনে যাচ্ছ কোথায়?'

আমি বললুম, 'ছুটিতে আছি, এম ডি-র সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

'তা, যাও, যাও, দেখা করো। পারলে কথাটা পেড়।'

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে মুকু বললে, 'মেয়েদের জীবনে কত বিপদ দেখেছ? সামনেরবার ছেলে হয়ে জন্মাব।'

'আমি কি ভাবছি জান? সামনেরবার মেয়ে হয়ে জন্মাব। মেয়েদের কি ডিম্যান্ড।'

মুকু শেষ পর্যন্ত এম ডি-র ঘরে ঢুকল না। বসে রইল ভিজিটার্স রুমের সোফায়। আমি ঢুকতেই তিনি বললেন, 'এ কি তুমি কলকাতায়? যাওনি এখনও? বোসো বোসো।'

চেয়ার টেনে বসলুম। সামনে বিশাল টেবিল ঝকঝক করছে। পেছনে সার সার বুক শেলফে রাজ্যের রসায়ন শাস্ত্রের বই। দেয়ালে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ছবি। সারা ঘরে চোখ ঘুরে এল। চেয়ারে সামান্য নড়াচড়া করে বললুম, 'আমি খুব বিপদে পড়ে আপনার কাছে ছুটে এসেছি। আমার খুব প্যাথেটিক অবস্থা।'

এম ডি উদ্বিগ্ন মুখে আমার দিকে তাকালেন। আমি বেশ গুছিয়ে আমার কাহিনী বললুম। শেষে যোগ করলুম 'আপনি যদি আমাকে কলকাতায় থাকতে দেন তবেই আমার এই চাকরিটা থাকে।'

তিনি অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'তোমারও দুর্ভাগ্য আমাদেরও দুর্ভাগ্য। নতুন একটি প্রোজেক্ট হাতে নিলুম, এখন তোমার মতো ভাল ছেলে পাই কোথায়!'

'আমার যা মনে হয় স্যার, মাস তিনেকের মধ্যে তাঁকে খুঁজে পাব এবং ফিরিয়ে আনতে পারব।'

'আমার তা মনে হয় না। তোমাদের পরিবারে একটা বৈরাগ্যের বাতাস ঘুরছে। তাছাড়া হরিশঙ্করকে আমি যতদূর জানি, সে কোনও হটকারিতা করার পাত্র নয়। কলেজ লাইফ থেকে আমি তাকে চিনি। সব ব্যাপারেই ভেরি সিরিয়াস। আর এই বৈরাগ্য, এ বড় মজার জিনিস। হঠাৎ আসে প্রশ্ন নিয়ে, একেবারে বেসিক প্রশ্ন,

তাই কি? সকলি ছায়া? আসে থাকে আর মিলে যায়?
তুমি শুধু একা আছ, আর সব আছে আর নাই?

যুগ যুগান্তর ধরে ফুল ফুটে ফুল ঝরে তাই ?
প্রাণ পেয়ে প্রাণ দিই সে কি শুধু মরণের পায় ?

এম ডি উজ্জ্বল মুখে আমার দিকে তাকালেন, 'কার লেখা ?'

'রবীন্দ্রনাথ।'

এম ডি নিজেই একটা ঘোরের মধ্যে চলে গেলেন। মনে হয় একই প্রশ্ন তাঁকেও পীড়া দিচ্ছে,

কোথা রাত্রি কোথা দিন, কোথা ফুটে চন্দ্র সূর্য তারা !
কেবা আসে, কেবা যায়, কোথা বসে জীবনের মেলা !
কেবা হাসে, কেবা গায়, কোথা খেলে হৃদয়ের খেলা !
কোথা পথ, কোথা গৃহ, কোথা পাথ্, কোথা পথহারা !
কোথা খসে পড়ে পত্র জগতের মহাবৃক্ষ হতে,

ফর্সা, টকটকে মুখ, অনেকটা গ্রীক ভাস্কর্যের মতো। সোনার ফ্রেমের চশমা। ছোট্ট, টিকলো নাক। সর্ব অর্থে সফল একজন মানুষ। মস্ত বড় একজন রাসায়নিক। তাঁর চোখেও জল চিক চিক করছে। কার কথা ভেবে ? কোথায় যাবার কথা ভেবে ? এত পূর্ণতার মাঝেও রিক্ততা। আমি, আমার, এর নাম অজ্ঞান ; তুমি, তোমার, জ্ঞান। আমিই তুমি, তুমিই আমি, এর নাম বিজ্ঞান। এম ডি এই মুহূর্তে সেই বিজ্ঞানী।

হঠাৎ বললেন 'তুমি তো গান জান ? এই গানটা গাইতে পার, গোল ছেড়ে মাল লও বেছে। গোলমালে মাল মিশান আছে ॥ জান না, মন রাগের কারণ। যেমন বালির সঙ্গে চিনির মিলন। সহস্র বর্ণে মিশেছে। পুরোপুরি কেমিস্ট্রি। কি বলো ? ফিলট্রেশান, ডিক্যান্টেশান, ডিস্টিলেশান, অ্যানালিসিস, অ্যাসে, টাইট্রেশান। বিশাল এই হিউম্যান ল্যাবরেটারিতে তিনিই হলেন চিফ কেমিস্ট। আমি কি বলি জান ? আমি তো তোমার পিতার মতোই। একটা ভাল পরামর্শ দোবো ?'

'আমি তো আপনার পরামর্শের জন্যেই সব ছেড়ে ছুটে এসেছি।'

'তুমি দেরাদুনে যাও। বড় কাজের মধ্যে নিজেকে ছেড়ে দাও। আর দেরাদুন হল হিমালয়ান সেন্টার। ওইখান থেকে অনুসন্ধান চালাও হরিদ্বার, ঋষিকেশ, রুদ্রপ্রয়াগ, দেবপ্রয়াগ। তাঁকে পাওয়ার কাজটা সহজ হবে।'

'একটাই যে সমস্যা, এখানকার বাড়িতে কে থাকবে !'

'ওটা কোনও সমস্যাই নয়। অনেক সময় সব সপরিবারে বাইরে বেড়াতে যায়, তখন কি হয় ! বাড়ি তালাবন্ধ থাকে। এক মাস, দু'মাস।'

'সব যে ধুলো পড়ে যাবে ! চুরির ভয় আছে।'

'কেন ? তোমাদের পাড়া কি তেমন সুবিধের নয় ! ধুলোকে ভয় নেই। ঝাড়লেই উড়ে যাবে। ভয় হল চোরের।'

'একসময় খুব ভাল পাড়া ছিল। এখন আর তেমন নেই।'

'তা হলে এক কাজ করা যায়। তোমাকে একজন বিশ্বাসী লোক দিতে পারি, কেয়ারটেকারের মতো। ভীষণ বিশ্বাসী মানুষ। আসলে কি জান, তোমাকে আমি ভীষণ ভালবেসে ফেলেছি। কেন তা বলতে পারব না। তোমার ফিউচার আমি গড়ে দিয়ে যেতে চাই। আমার আর ক'দিন। হরিশঙ্কর চলে গিয়ে আমার দায়িত্ব আরও বাড়িয়ে দিয়ে গেছে। হরিশঙ্করের ছেলে মানে আমার ছেলে। তা ছাড়া আমার ছেলে নেই। একটি মাত্র মেয়ে। আমার মেয়ের সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়েছে ?'

'আজ্ঞে না।'

'শান্তিনিকেতন থেকে এবার এলেই তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দোবো। তা হলে তুমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেল। চলে যাও দেরাদুনে। ওখানে নিখিল তোমার অপেক্ষায় আছে। দেখবে কি সুন্দর বাংলো! সামনেই মুসৌরী হিলস। পেছনে ফরেস্ট। একটু দূরেই সহস্রধারা। মিলিটারি অ্যাকাডেমি।'

'আমি তা হলে আসি আজ।'

'কাল আমাকে জানাবে। রাতটা ভেবে নাও ভাল করে। বেশি ভেব না। সারেন্ডার করে দাও নিজেকে। ঘটনা মানুষকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কৌশল হল নিজেকে ভাসিয়ে রাখা। জীবন অনেকটা নৌকোর মতো, ভাসতে তোমাকে হবেই। হালটা শুধু ধরিয়ে দাও শক্ত হাতে। তাঁর হাতে।'

উঠে প্রায় দরজার কাছে চলে এসেছি এমন সময় পাবলিসিটি অফিসার ঢুকলেন। ঢুকেই বললেন, 'তোমার বোনকে বাইরে বসিয়ে রেখেছ কেন? বেচারা মুখ চুন করে বসে আছে।'

এম· ডি· সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'তোমার বোন? তোমার বোন আছে জানতুম না তো? তা হলে তো তোমার দেরাদুন যাওয়া হবে না।'

একটু অস্বস্তিতে পড়ে গেলুম। ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার হওয়া দরকার। এম· ডি নিজের ঘর ছেড়ে ভিজিটার্সরুমে বেরিয়ে এসেছেন। মুকু উঠে দাঁড়িয়েছে। সহবত জানা মেয়ে, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। এম· ডি তাড়াতাড়ি মুকুর মাথায় হাত রেখে বললেন, 'বাঃ, ভারি সুন্দর মেয়ে তো। কি নাম তোমার মা?'

'মুকুলিকা।'

পাবলিসিটি অফিসার বললেন, 'আমার একটা সমস্যা মিটে গেছে। একে আমার বিজ্ঞাপনের মডেল করব। মেয়েটি শিক্ষিতা, এম· এ পড়ছে। ভাবছি, আপনার অনুমতি নিয়ে ওকে আমার ডিপার্টমেন্টে নিয়ে নোবো। ভাই-বোন একই সঙ্গে, একই প্রতিষ্ঠানে চাকরি করবে। বেশ হবে।'

এম· ডি আমার পিঠে হাত রেখে বললেন, 'তা হলে তুমি কলকাতাতেই থাকো। তোমার জায়গায় সুহাসকেই পাঠাই। সেইটাই হবে বেস্ট সলিউশান। আচ্ছা, আমি আর তোমাদের সময় দিতে পারছি না। আমার আবার চেম্বার অব কমার্স-এ মিটিং আছে।'

আমি আর মুকু পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

৭

প্রেমের হাতে ধরা দেব
তাই রয়েছি বসে,
অনেক দেরি হয়ে গেল,
দোষী অনেক দোষে।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে বাড়িটার দিকে একবার তাকালুম। কারখানার কালো চিমনি ভস ভস করে ছেড়ে চলেছে পিঙ্গল ধোঁয়া। সাবান তৈরি হচ্ছে। গন্ধে চারপাশ আমোদিত। মাথা ঝিম ঝিম করছে। একটা যা তা ব্যাপার হয়ে গেল। যে-রাস্তাটা ধরে হাঁটছি, সেইটা কিছুদূরে গিয়ে পড়েছে ট্রাম আর বাস রাস্তায়। ট্রামের শব্দ কানে আসছে। মুকু আমার পাশে পাশে প্রায় গায়ে গা লাগিয়ে চলেছে।

মুকুই প্রথমে কথা বললে, 'সব তো ভেস্তে গেল।'

'কি ভেস্তাল ?'

'ভাই বোনে বিয়ে হয় ?'

'না।'

'আমরা তো ভাই বোন হয়ে গেলুম।'

'ও তো একটা বলতে হয় তাই বলা।'

'কেন ? সাহস করে বলতে পারলে না, এ আমার বোন নয়, বউ। বুক ফুলিয়ে বলা গেল না ? লোকে খারাপ ভাববে, তাই না ? বাঙালী তো, ঘোমটার আড়ালে খেমটা নাচ। বাইরে প্রকাশ হয়ে পড়লেই চরিত্রে চিড় ধরে যাবে।'

'রাগ করেছ ?'

'দুঃখ পেয়েছি। অভিমান হয়েছে। আমার এই লুকোচুরিটা একেবারে সহ্য হয় না।'

'যদি অনুমতি দাও তো একটা কথা বলি।'

'বলো। তুমি তো কথার মালা, কথামালা। কথামালার শৃগাল।'

'তা হয় তো ঠিক। ধূর্ত এবং ভীরু। তোমার গালাগালের যোগ্য। তুমি ভীষণ কড়া কড়া কথা বলো।'

'তুমি বলাও।'

'যে কথাটা বলতে চেয়েছিলুম, সেটা হল, মেয়েরা রাখী বাঁধে জানো তো, দাদা দিয়েই প্রেমের শুরু। অনেক দাদাই শেষে স্বামী হয়। এই কেসটাও সেই কেস।'

'আমি এতক্ষণ ধরে কি ভাবলুম জান, তোমার একজন বোনেরই দরকার, বউ নয়। বোন অনেক পবিত্র। আমি ওপর-পড়া হয়ে তোমার জীবন দখল করতে চেয়েছিলুম, সেটা

ঠিক হবে না। তোমার চরিত্রটা বড় এলান।'

'আমি তা মনে করি না।'

'আমার তাই মনে হয়।'

'আমার আসল দিকটা তুমি দেখনি। দেখলে তোমার সিদ্ধান্ত পাল্টাতে।'

'সেই দিকটা কি ? তোমার সবই তো তালগোল পাকান। এই তো দেরাদুনের সুযোগটা হারালে। আর একজন যাবেন তোমার জায়গায়। তুমি কলকাতায় বসে বসে বোন আর বাড়ি আগলাবে। সুযোগ বারে-বারে আসে না।'

'প্রথমে তো তাই ঠিক হল। মাঝখান থেকে বিপুলবাবু ঢুকে সব গোলমাল করে দিলেন তোমাকে বোন বলে পরিচয় করিয়ে দিয়ে। বাড়িটার একটা ব্যবস্থা হয়েই গিয়েছিল।'

'তুমি তো বলতে পারতে, আমি হস্টেলে থাকি।'

'তা কি করে হয় ! বাড়ি ছেড়ে বোন খামোখা কেন হস্টেলে থাকবে, কোন যুক্তিতে ?'

'তুমি তো ব্যাপারটা এক্সপ্লেন করতে পারতে, মায়ের পেটের বোন নয়, মাসতুতো বোন।'

'তাহলে কি ভাবতেন ? ভাবতেন, বাবা নেই, মাসতুতো বোনকে হস্টেল থেকে এনে কি না কি করছে !'

'আমার কি মনে হচ্ছে জান, এটা রাস্তা না হলে, ঠাস্ করে তোমাকে এক চড় কষাতুম। একেবারে পারফেক্ট জানোয়ারের মতো কথা। তোমার নোংরা ভাবনাটা অন্যের ঘাড়ে চাপাতে চাও ? একজন সুন্দর শিক্ষিত মানুষ কেন এমন ভাববেন ? ছেলেবেলা থেকে কিছু গ্রাম্য মহিলার মধ্যে থেকে তোমার এই অবস্থা হয়েছে। একটা ছেলে আর একটা মেয়ে মানেই উঁহুঁ, উঁহুঁ। ভাশুর, ভাদ্দর বউ, বউদি, ঠাকুরপো, তুতো বোন, তুতো ভাই, যেখানে যত আছে সব ব্যভিচার করে বেড়াচ্ছে। একে বলে ঝিয়ে-সাইকোলজি। তোমার উচিত, তোমাদের ওই প্রাগৈতিহাসিক বাড়ি ছেড়ে বৃহৎ বিশ্বে নিজেকে ছড়িয়ে দেওয়া। তোমার মনে নোনা ধরেছে।'

মুকু ছিটকে আমার থেকে বেশ কিছুটা দূরে সরে গেল। রেগে গেলে মুকুর মুখচোখ লাল হয়ে ওঠে। চলন-বলন সবই তড়বড়ে হয়ে যায়। কাঁকড়া বিছের মতো খড় খড় করতে থাকে। প্রকাশ্য রাজপথে 'সিন ক্রিয়েট' করার ইচ্ছে আমার নেই। ইতিমধ্যেই লোকজন তাকাতে শুরু করেছে। নীরবে বাকি পথটুকু হেঁটে আমরা ট্রাম-স্টপেজে এসে গেলুম। মুকু একটা দূরত্ব রেখে দাঁড়িয়েছে, যেন আমাকে চেনেই না। মধ্যদিনের আলোয় তাকে ভীষণ মায়াবী লাগছে। পানের মতো মুখ। ফুরফুরে চুল। ফর্সা দেহত্বক রাতের সমুদ্রের ফেনার মতো জ্বলছে। ভীষণ একটা ভালবাসায় ক্রমশই আমি উতলা হয়ে উঠছি। আমার সমস্ত সমস্যা টমস্যা ভেসে বেরিয়ে যেতে চাইছে। বেশ বুঝতে পারছি মুকুকে ছাড়া আমার চলবে না।

মুকু হঠাৎ আমার কাছে সরে এসে বললে, 'শোনো, আমি তোমার বোনটোন হতে পারব না। ও-সব আদিখ্যেতা আমার সহ্য হবে না। আমি তোমার মতো পাপ করতে পারব না। মুখে বলব এক, কাজে করব আর এক, আমার দ্বারা তা হবে না। তুমি চলো।'

'কোথায় যাব ?'

'তোমার ওই এম ডি-র কাছে। এইবার যা বলবার আমি বলব।'

বেশ ভয় পেয়ে গেলুম, 'কী বলবে ?'

'বলব, 'মশাই ! আসল ব্যাপারটা হল, আমি বোনটোন নই। ও ওইরকম বলতে হয়

বলছে। সাধু পুরুষ সাজবার জন্যে। মায়ের বোন মাসি হয় ঠিকই। একই রক্ত। আমি ওর জ্যাঠাইমার বোনের মেয়ে। তার মানে ঘোড়ার ডিম। আমি ভালবাসি। আজ বাদে কাল বিয়ে করব। স্বামী-স্ত্রী সীমানায় দাঁড়িয়ে আছি। আমরা দু'জনেই দেরাদুনে যাব। চলো চলো। আর দেরি নয়।'

'দেরাদুনে যাবার প্রয়োজন নেই মুকু। কলকাতাতেই বেশ থাকা যাবে। তা ছাড়া তুমি যদি চাকরিটা পেয়ে যাও, তাহলে দু'জনের রোজগারে রাজার হালে।'

'ও এখন থেকেই তুমি আমার রোজগারের আশায় আছ? তা ভাল।'

'আমি ঠিক অতটা লোভী নই মুকু। তোমার রোজগারের আশা আমি করি না। আমার একার রোজগারেই দু'জনের সংসার বেশ ভাল চলে যাবে। আমি তোমাকে ভালবাসি।'

'ভালোবাসো? বাবা, এ যেন ভূতের মুখে রামনাম। শোনো, ওসবে আমি ভুলছি না। তোমাদের ওই বিশ্রী পাড়া ছেড়ে চিরকালের জন্যে প্রবাসী হতে হবে। হিমালয়ের কোলে হলে তো কথাই নেই। চলো, চলো।'

আমাদের সামনে দিয়ে সাদা রঙের বিলিতি একটা গাড়ি বেরিয়ে গেল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেললুম। পেছনের আসনে বসে আছেন এম ডি। কি একটা পড়ছেন গভীর মনোযোগে। আমি বললুম, 'ওই দেখ এম ডি বেরিয়ে গেলেন। আজ আর কোনও কথা হবে না। চেম্বার অফ কমার্সে ওঁর মিটিং আছে।'

'তাতে তোমার আনন্দে নাচার কোনো কারণ নেই। কাল আমি আসব। এসে সমস্ত পরিস্থিতিটা নিজে বুঝিয়ে বলব। আমি কে, তুমি কে, আমরা ভবিষ্যতে কি হব! তোমার কি মনে হয় আমি ইয়ারকি করার জন্যে ওই মুল্লুক থেকে এই মুল্লুকে এসেছি! আমার একটা পরিকল্পনা আছে। পরিকল্পনাটা শুনবে?'

'ট্রাম আসছে।'

'আসুক। আসবে, থামবে, চলে যাবে, আবার আসবে। ট্রামের অভাব নেই। পরের ট্রামে যাব। না হয় তারও পরের ট্রামে।'

'কিন্তু এই রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে কাঁহাতক আর তর্কাতর্কি করা যায়, তুমিই বল?'

'চলো, তাহলে এই পার্কে গিয়ে বসি। ফাঁকা জায়গায় বসে মন দিয়ে আমার পরিকল্পনাটা তোমার শোনা উচিত।'

গুটি গুটি এগিয়ে গিয়ে আমরা দুজনে অদূরের একটা ছোট পার্কে বসলুম। ছোট হলেও মনোরম। গোটা তিনেক বিশাল গাছ। তিন কোনা সবুজ ঘাসের কার্পেট। দু'একটা খালি ঠোঙা, আইসক্রিমের কাপ, ঝরাপাতা, সিগারেটের টুকরো ছড়িয়ে আছে। একটা সুন্দর রুমাল পড়ে আছে। কেউ পেতে বসেছিলেন, তুলতে ভুলে গেছেন। আমরা একটা আড়াল দেখে পাশাপাশি বসে পড়লুম। বসেই মনে হল শুয়ে পড়ি, এত ক্লান্ত। কিছু না করেই ক্লান্ত। শরীর হল মনের খেলা। মন গেল তো সব গেল।

মুকু তার ফর্সাফর্সা হাত দুটো দিয়ে আমার ডান হাতটা খপ করে চেপে ধরল। ফর্সা। দুধের মতো। অনামিকায় রক্ত লাল একটা রুবি। যেন ডালিমের দানা। সিল্কের মতো শরীরের ত্বক। টান টান হয়ে আছে। হাতের কোথাও একটা রোম নেই। শাড়ির তলা দিয়ে পা দুটো বেরিয়ে আছে। মোমের মতো গোড়ালি। পায়ের আঙুল যেন মোচার কলি। ভগবানের নিজের হাতের ভাস্কর্য। এমন কিছু দেখলে আমার ইচ্ছে করে পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়তে। কে বড়, কে ছোট, সে বিচার আর থাকে না। মনে হয় হেরে গেছি, পরাজিত আমি। ঈশ্বরের আর্ট গ্যালারির মেঝেতে আমি ছিঁড়ে পড়ে আছি। পুরনো চার

চরণ কবিতা মনে পড়ে যায় :

যে হৃদে আছিল শোভা কত অমরার,
অমরী আসিত যেথা ছুটে বার বার
তুমি নারী, মৃদু হেসে, আঁখি-কোণে চেয়ে
নিলে অনায়াসে লুটে সে হৃদি আমার ?

আমার হাত ছেড়ে দিয়ে মুকু একটা গাছের ভাঙা ডাল কুড়িয়ে নিয়ে ঝ্যাঁটার মতো ঘাসের ওপর বোলাল কিছুক্ষণ। মুখটা নিচু করে আছে। কপালের ওপর চুল ঝুলছে কয়েক গুছি। হঠাৎ মুখ তুলে তাকিয়ে একটু মুচকি হাসল। অসাধারণ সেই হাসি ! যেন পাথরে চিড় ধরল। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলুম কিছুক্ষণ। এ কেমন মেয়ে ! এই বকছে, এই ধমকাচ্ছে, এই হাসছে !

মুকু গাছের ডালটাকে কোলের ওপর শুইয়ে, বেশ গুছিয়ে বসে বললে, 'আমাদের সংসারটা ভেঙেছে আমার বাবার ভুলের জন্য, একগুঁয়েমির জন্যে। যুদ্ধ যখন বাধল, তখন বার্মা থেকে সবাই পালাতে লাগলেন। আমার একগুঁয়ে বাবা শেষ দিন পর্যন্ত পড়ে রইলেন মাটি কামড়ে। সময়ে পালালে কিছু সঙ্গে নিতে পারতেন। ট্র্যান্সপোর্ট পেতেন। শেষে কি হল ? হাঁটা পথে রওনা দিতে হল। রেঙ্গুনের জেল খুলে দিয়েছে। যত চোর গুণ্ডা, বদমাস, উন্মাদ ছাড়া পেয়ে সারা শহরে তাণ্ডব করে বেড়াচ্ছে। দোকানের পর দোকান লুঠ করছে। শেষে আমাদের পাশের বাড়ির এক বউকে রাতের বেলা বাড়ি চড়াও হয়ে নৃশংসভাবে রেপ করে মেরে ফেললে। তখন আমার বাবার টনক নড়ল। পরের রাতেই আমাদের টার্গেট করত। আমরা পেগুর পথ ধরলুম। সেখান থেকে প্রোম। শ দুই মাইল। ভাবতে পার হাঁটছি তো হাঁটছিই। প্রোম থেকে মান্দালয়। কাতারে কাতারে মানুষ চলেছে। এমনি তবুও হাঁটা যায়, সঙ্গে বোঁচকা বুচকি। পথের ধারে মৃতদেহ পড়ে পচে ফুলে ঢোল হয়ে আছে। কেউ ফিরেও তাকাচ্ছে না। কারো বাবা, কারো মা, কারো মেয়ে। অসুস্থ হয়ে কেউ পড়ে আছে, আর হাঁটতে পারছে না। কে থামবে তার জন্যে ! সবাই পালাচ্ছে। টাকার কোনও দাম নেই। হোটেল আছে জায়গা নেই। জল নেই, খাবার নেই। লাখোপতি, কোটিপতি হন্যে হয়ে ঘুরছে। টাকা হয়ে গেছে কাগজ। প্রোমে শুরু হয়ে গেছে কলেরা। আমরা যখন আর হাঁটতে পারছি না, তখন বসে পড়ছি রাস্তার ধারে খোলা আকাশের নিচে। পাশেই হয়তো পড়ে আছে কেউ, মারা গেছে কলেরায়। কোনওরকমে মান্দালয়ে গিয়ে পৌঁছলুম। মায়ের অবস্থা তখন খুবই খারাপ। প্রোম থেকে মান্দালয় পাঁচ'শ মাইল। তুমি ভাবতে পার ? দুরত্ব ভাবলেই মাথা ঘুরে যায়। কোথাও কোনও সাহায্য নেই। কেউ কারোকে সাহায্য করবে না। মান্দালয়ের পথে আমার মা মারা গেলেন। জঙ্গলের গভীরে একটা জায়গায় দুটো গাছের মাঝখানে কিছু মাটি গাছের ডাল দিয়ে উসকে মাকে শুইয়ে দেওয়া হল। প্রথমে চিৎ করে শোয়ানো হল। বাবা বললেন, না, না অমন সুন্দর মুখ জন্তু-জানোয়ারে খেয়ে যাবে। উপুড় করে শোয়াই। মাকে উপুড় করে দেওয়া হল। মা শুয়ে আছেন ঝুরো ঝুরো মাটির ওপর। চারপাশ দিয়ে চলে গেছে ইলিবিলি গাছের শিকড়। মচমচে গাছের পাতা। আমি আর দিদি গাছের পাতা জড়ো করে মাকে চাপা দিচ্ছি। কিছু শুকনো কিছু ভিজে দলা পাকানো। আস্তে আস্তে মা তলিয়ে গেলেন পাতার স্তূপে। এক সময় বাবা বললেন, চলো আর তো কিছু করার নেই। সামনে অনন্ত পথ। আমাদের তখন এমন অবস্থা কাঁদতেও ভুলে গেছি। খাওয়া নেই, দাওয়া নেই, চান নেই। পশুর মতো অবস্থা। আমার কেবল মনে হচ্ছে, আমিও শুয়ে পড়ি মায়ের পাশে। মাকে দু'হাতে জড়িয়ে

ধরে, যেমন শুয়ে থাকতুম রেঙ্গুনে আমাদের বাড়ির খাটে। মান্দালয় থেকে ভারত কমসেকম দেড় হাজার মাইল। পথ আরও সাঙ্ঘাতিক। একের পর এক খরস্রোতা পাহাড়ি নদী, ইরাবতী, চিণ্ডুইন। ঠিক হল আমরা কোনও রকমে ইরাবতী পেরিয়ে, আরাকান আকিয়াব হয়ে চট্টগ্রামে ঢুকব। এমন কোনও অখাদ্য নেই যা আমাদের খেতে হয়নি। কুমিরের মাংসও খেয়েছি। এমন একটা ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার পরেও বাবার কিন্তু সংসারে বিতৃষ্ণা এল না। মনকে দিয়ে বলাতে পারলেন না, কি ছার সংসার। উল্টে বললেন, এই তো সংসার! ভোগ আর দুর্ভোগ এ ছাড়া সংসারে নেই কিছু। আমার কিন্তু শিক্ষাটা হয়ে গেল অন্যরকম। আর কোনও দিন সেই মান্দালয়ের জঙ্গলে যেতে পারব না। পাতার স্তূপ সরিয়ে দেখতে পারব না, কোনও কঙ্কাল শুয়ে আছে কি না চিরনিদ্রায়? আমার মা। আমি দেখেছিলুম, মৃত্যুর সেই মহোৎসবেও পশু-মানবের নারী মাংস লালসা। মৃতদেহের পাশে মানুষের মৈথুন। সব সময় ভিক্টিম হয়েছে মেয়েরা। দিদি আমার চেয়েও বড়। ঘোরতর সুন্দরী। আরাকানের পথে বাবা তার সারাগায়ে কাদামাটি মাখিয়ে দিলেন রূপ চাপা দেবার জন্যে। পরিয়ে দিলেন একটা ঢোলা শার্ট, যাতে দেহের আকর্ষণ চাপা পড়ে থাকে। সেই থেকে পুরুষজাতের ওপর আমার প্রবল ঘৃণা।'

'তার মানে তুমি আমাকেও ঘৃণা কর?'

'চুপ! আমার কথা এখনও শেষ হয়নি। আমি আগে শেষ করি। আমার বাবা আমাদের দু বোনের জন্যে যথেষ্ট করলেন। লেখাপড়া শেখালেন; কিন্তু তোমার বাবার মতো আমার বাবার জীবনে কোনও ত্যাগ নেই, কোনও আদর্শ নেই। এই বয়সেও নারীসঙ্গের জন্য লালায়িত। আমাদের সমালোচনায় কান দেননি। মায়ের স্মৃতি মুছে ফেলেছেন মন থেকে। কথায় কথায় বলবেন, জীবনের ব্যাপারে আমি একজন পাকা ইংরেজ। আমার আদর্শ চুটিয়ে বাঁচো, মরে যাও। সবারই শেষ এক মুঠো ছাই। ফুঁ দিলে উড়ে যাবে। কিছু মনে করো না, আমার বাবাকে দেখলে মনে হয়, এক বৃদ্ধ পশু। তোমার বাবাকে দেখে আমার আবার বিশ্বাস ফিরে এল। মনে হল মানুষও দেবতা হতে পারে। আমি প্রেমে পড়ে গেলুম। সে এক অদ্ভুত প্রেম। মেয়ে, স্ত্রী, বন্ধু, মা সব মিলিয়ে একটা ব্যাপার তৈরি হল। তখনই মনে হল, এই মানুষটিকেই আমার জীবনের ধ্রুবতারা করব। শিবের সংসারকে গৌরী হয়ে সাজাবো। তোমার সমস্ত ন্যাকামি তছনছ করে তোমাকেও তোমার বাবার মতো করব কুছ নেহি হায় তো থোড়া থোড়া। অন্তত কুড়িটা ছেলে আমার জন্যে হাঁ হাঁ করে আছে। তাদের মধ্যে একজন অধ্যাপকও আছেন। বেশ বুঝতে পারি সব কটা দেওয়ালি পোকা। চরিত্রের কোনও জোর নেই। অধ্যাপকের আবার বউ আছে। সব কটা এমন হ্যাংলার মতো ভাব করে, পা থেকে মাথা অব্দি জ্বলে যায়। এক মাত্র তোমার মধ্যে তোমার বাবার গুণ কিছুটা খুঁজে পেয়েছি। তোমাকে এইসময় ধরতে পারলে আমি একজন মানুষ পাব। তোমাকে একটু টেম্পার করে নিতে হবে। বেশ করে তাতাতে আর পেটাতে হবে। লোহা থেকে তৈরি করতে হবে স্টিল। এও একধরনের ভালবাসা। দায়িত্বপূর্ণ ভালবাসা।মেসোমশাই ফিরে এসে যেন বলতে না পারেন, আমার ছেলেটাকে কেউ দেখেনি। এই দায়িত্ব কেউ আমাকে দেয়নি, আমি নিজেই তুলে নিয়েছি কাঁধে।'

'মুকু মুখ নিচু করে ঘাসের ওপর হাত বোলাচ্ছে। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি তার মুখের দিকে। পাতার ফাঁক দিয়ে পড়ন্তবেলার রোদ এসে পড়েছে তার রেশম চিক্কণ চুলে। আমার আর বলার কিছু নেই। আমার মাতামহের কণ্ঠে শোনা একটি গানের কলি হয়ে গেছি আমি দিয়েছো তুমি অনেক দিয়েছো/ অযাচিত তব দান/ বুঝিনি মহিমা দিইনি মূল্য/ তবু

দান অফুরান/ কতো করুণার কণিকা ঝরিয়ে/ নিতি মমতায় রেখেছো জড়িয়ে/ অযতনে আমি ফেলেছি ছড়িয়ে/ করোনি তো অভিমান ॥ আমার এই প্রবল দুর্দিনে ভগবানের এ কি করুণা ! আমার মতো একটা মর্কটকে এইভাবে কেউ ভালবাসতে পারে, এই বিশ্বাসটাই আমার ছিল না। সেই ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি সকলেই আমাকে এলেবেলে ভাবে। খেলার মাঠে যখন টিম তৈরি হত, দু'পক্ষই বলত ও হল এলেবেলে। সেই এলেবেলেকে শিক্ষিতা, ডাকসাইটে সুন্দরী এক মেয়ে ভালবেসেছে। প্রেমের আদিখ্যেতা নয়, অভিভাবিকা হতে চাইছে। গভীর একটা ভাবনা রয়েছে আমাকে ঘিরে।

মুকু চোখ তুলে তাকাল। চোখের কোণে জল চিকচিক করছে। 'বিশ্বাস করো, আমার অনেক জায়গা আছে যাবার' কিন্তু কোথাও যেতে মন চায় না। আমি মানিয়ে নিতে পারব না। কিন্তু তোমাকে পারব। তোমার ভেতর একটা শিশু আছে, যে কোনও দিন বুড়ো হবে না। তোমার ওই অবিষয়ী, ভাবালু ভাবটাকে আমি ভালবেসে ফেলেছি। ভালবেসে ফেলেছি তোমাদের সাত্ত্বিক সংসারটাকে।'

'তোমার মতে আমার তাহলে কি করা উচিত মুকু ?' তুমি দু'বার দু'রকমের পরামর্শ দিলে। একবার বললে, চাকরি ছাড়তে হয় ছাড়বে। এখানেই থাকবে। সব টিপটপ করে সাজিয়ে অপেক্ষা করবে, তিনি আসবেন। এই মুহূর্তে বলছ দেরাদুনে যেতে হবে।'

'এটা হচ্ছে আমার দ্বিতীয় চিন্তা। একরোখা অভিমানী মানুষ। নিজে তিনি ফিরবেন বলে মনে হয় না। তাঁকে ফেরাতে হবে। ধরে আনতে হবে। পাহাড়েই তিনি গেছেন। দেরাদুনে থেকে সন্ধান করা সহজ হবে। সামনেই আসছে কুম্ভমেলা ।সেই বিশাল জমায়েতে আমরা তন্ন-তন্ন করে খুঁজব।'

'বেশ তাহলে তাই হোক। কাল আবার আসব। এখন চল, তোমার হস্টেলে যাই।'

পার্ক থেকে বেরিয়ে আমরা একটা ট্রামে উঠে পড়লুম। হস্টেলের সামনে এসে আমরা একটু অবাক হয়ে গেলুম। পুলিসের একটা জিপ দাঁড়িয়ে আছে। আছে, আছে, আমরা তেমন গ্রাহ্যকরলুম না।মন একমুখী হয়ে আছে। অন্য কোনও ভাবনা ঢুকছে না মাথায়। একটাই চিন্তা আমাদের যেতে হবে। মালপত্র গোছগাছ করে আমরা বেরিয়ে পড়ব।

মুকু বলল, 'তুমি বাইরে অপেক্ষা কর। যখন বলব তখন একটা ট্যাক্সি ডাকবে।'

মুকু চলে গেল। আমি দাঁড়িয়ে আছি বাইরে। সামনেই জিপগাড়িটা। নিরেট এক ব্যক্তিত্ব। দেখলেই ভয় ভয় করে। হস্টেলের অফিস ঘরটা গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে। মনে হল ঘরের মধ্যে অনেক মেয়ের জটলা। একজন ভারিক্কি মহিলার তর্জন-গর্জন কানে আসছে। ঠিক বুঝতে পারছি না অশান্তিটা কিসের ? কোনও মেয়ে কি আত্মহত্যা করেছে ? চুরি হয়েছে ? মেয়েরা মারামারি করেছে নিজেদের মধ্যে ? কিছু একটা হয়েছে। পুলিস অফিসারের ইউনিফর্ম চোখে পড়ছে। মেয়েদের হস্টেল। একেবারে সামনে দাড়ান ঠিক হবে না। একটু দূরে সরে গেলুম। যারা কাগজ কুড়োয়, এইরকম দুটো ছেলে বস্তা থেকে ফুটপাথে সমস্ত কাগজ উজাড় করে কি যেন বাছাবাছি করছে। ভীষণ ব্যস্ত তারা। দিন শেষ হয়ে আসছে। হস্টেলের ভেতরে বিশাল দেবদারু। এক ঝাঁক পাখি চুটিয়ে কলরব করছে। জায়গাটা নিরাপদ বলেই মনে হল। পুলিশের এক বড়কর্তা এসেছেন, তাঁর নির্দেশে ইভ টিজারদে'র আর রকবাজদের আচমকা খুব ধরা হচ্ছে। কোনও কথা নয়, ধরো আর ভ্যানে তোলো। হস্টেলের ভেতর পুলিস ঢুকে আছে। বলা যায় না বেরিয়েই আমাকে দেখলে হয়তো চ্যালেঞ্জ করবেন। এ-ব্যাপারে আমি বেশ ভীতু। মুকুকে নিয়ে যতক্ষণ আমি পার্কে বসেছিলুম, কেবলই ভাবছিলুম, এই বুঝি কেউ এসে বলে, অ্যায় কি হচ্ছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে

এমন একটা মুখ করে কাগজ বাছাই দেখতে লাগলুম, যেন আমারই কাগজ। আমারই জীবনের ছেঁড়া পাণ্ডুলিপি। ছেলে দুটোর চারটে কথার তিনটেই খিস্তি। খিস্তির 'লেসন' নেওয়াও চলতে লাগল। কতরকমের গালাগাল যে আছে!

দাঁড়িয়েই আছি। একসময় জাঁদরেল অফিসারকে নিয়ে জিপটা চলে গেল। ছেলে দুটোর সব কাগজ আবার রাস্তার বস্তায় ঢুকে গেল। দু'জনে এক পক্কড় ইয়ারকি মারামারি করে, বস্তা কাঁধে সরে পড়ল ডাইনে-বামে থুতু ছেটাতে ছেটাতে। আমি দাঁড়িয়েই আছি। দিনের আলো নিবে গেল। রাস্তার আলো জ্বলে উঠল পটপট। হাঁকছে মালাই, হাঁকছে ঘুঘনি। রাতের চরিত্ররা সব বেরিয়ে পড়েছে। ঠুনঠুন্ রিকশা। দাঁড়িয়েই আছি। মুকুর পাত্তা নেই। একবার মনে হল, যা থাকে বরাতে, নিজের পরিচয় দিয়ে ভেতরে ঢুকে সুপারকে জিজ্ঞেস করি। হঠাৎ মাথায় খেলে গেল, আচ্ছা জিপটা মুকুর কারণেই আসেনি তো! কাল বিকেল থেকে মেয়েটা হস্টেলে নেই। কোনও খবরও দেয়নি। আমার আর সাহসে কুললো না? হস্টেলের ঘরে ঘরে আলো জ্বলে উঠেছে। একটা ছেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে কারো কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি, সব মেয়েই ঢুকছে, একজনও বেরোচ্ছে না, যে ছুটে গিয়ে জিজ্ঞেস করব। ভেতরের নাটক ছেড়ে কেউই বেরোতে চাইছে না।

আর কাঁহাতক দাঁড়ানো যায়। উদ্‌ভ্রান্তর মতো আমি বাড়ির পথ ধরলুম। একা দোকানের সামনে এসে একজনকে ফোন করতে দেখে মনে হল, হস্টেলে একটা ফোন করলেও হয়? বলতেও তো পারি, আমি মুকুলিকার দাদা বলছি। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন হবে, কেমন দাদা? দাবড়ানি খেয়ে ফোন ফেলে দিতে হবে।

এত ফাঁকা লাগছে নিজেকে! এক কথায় জীবনটা অর্থশূন্য হয়ে গেল। এত বছর বেঁচে আছি এমন নিঃসঙ্গ নিজেকে কখনও মনে হয়নি। মধ্যরাতের নির্জন রাজপথে একাকী একটা ষাঁড়ের মতো মনে হচ্ছে নিজেকে। কোথাও কোনও যাবার জায়গা নেই। কথা বলার মতো কোনও লোক নেই। দু'চারজন বন্ধুবান্ধব সব বিদেশে। আত্মীয় স্বজনের বালাই নেই। পাড়ায় ঢুকবো, বলা যায় না, মেনির সাপোর্টাররা বদলা নেবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে কি না!' বিষ্টুদার বাড়িতে কথায় কথায় যাওয়া যায় না। লজ্জা করে। বউদি ভাববেন, টিপের সঙ্গে ভাব জমাতে এসেছি। আবোল-তাবোল কিই বা বকবো, মনের সে অবস্থা নেই। নিজের বাড়িতে ঢুকতে ইচ্ছে করছে না। নিরানন্দ পুরী। ভীষণ বিষণ্ণতা আসবে।

সামনেই ঠনঠনের কালীবাড়ি। আরতি হচ্ছে। দাঁড়িয়ে গেলুম একপাশে। আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন এক ভদ্রলোক। ফিনফিনে পাঞ্জাবি, কোঁচানো মিহি ধুতি। সরু গোঁফ। আরতি চলছে। ভদ্রলোক হঠাৎ আমার হাতে মৃদু একটা চাপ দিলেন। আমি তাকালুম। ভদ্রলোক হাসলেন। চিনতে পারলুম না।

ফিসফিস করে বললেন, 'চিনতে পারছ না?'

'আজ্ঞে না?'

'মনে করার চেষ্টা করো।'

আরতির বাজনা দ্রুত চলেছে। পুরোহিতের চামর দ্রুত লয়ে দুলছে। দেখছি আর ভাবছি। হঠাৎ দেখি ভদ্রলোক অদৃশ্য। আরতি শেষ। ভক্ত কণ্ঠের মা, মা চিৎকার। প্রণাম করে, সামনেই যে ট্রাম পেলুম উঠে বসলুম। ভাড়া দেবার জন্যে পকেটে হাত দিলুম। ফাঁকা। মালমশলা সব উধাও।

৮

রক্ষা করো হে।
আমার কর্ম হইতে আমায় রক্ষা করো হে।
আপন ছায়া আতঙ্কে মোরে করিছে কম্পিত হে ;
আপন চিন্তা গ্রাসিছে আমায়—রক্ষা করো হে।

সামনেই ট্রামের কন্ডাক্টার হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। শূন্য পকেট থেকে আমার নিরালম্ব হাত বের করে তাঁর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আমি হা হা করে হেসে উঠলুম। এমন মুক্ত হাসি বহুকাল আমার গলা ছেড়ে বেরোয়নি।

ভদ্রলোক অবাক হয়ে বললেন, 'কি হল ?'

একজন সহযাত্রী বাঁকা মন্তব্য করলেন, 'ঢিলে হয়ে গেছে। ভাড়া দেবার সময় অনেকের এমন হয়।'

আমি পাত্তা না দিয়ে বললুম, 'কেল্লা মার দিয়া।'

দরজার দিকে এগিয়ে গেলুম। ভাড়া যখন দিতে পারব না, তখন নেমে যাই। ভদ্রলোক আমার হাত চেপে ধরে বললেন, 'মেরে দিয়েছে তো ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। একেবারে ক্লিয়ার।'

ভদ্রলোক রসিক। বললেন, 'কোষ্ঠ সাফ ! উঠলেন তো ঠনঠনিয়া থেকে। কালীবাড়ি গিয়েছিলেন বুঝি !'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'টাকা মাটি, মাটি টাকা। তা নামছেন কেন ? বসুন। ভাড়া দিতে হবে না। শ্যামবাজারেই বাড়ি ?'

'তাহলে তো ভাবনা ছিল না। মাইল-চারেক আরও যেতে হবে।'

'বাসে চড়তে হবে। এই নিন একটা টাকা রাখুন।'

হতভম্ব হয়ে গেলুম। এমন হৃদয়বান মানুষ এখনও পৃথিবীতে আছেন ! প্রায় তোতলা হয়ে গেছি, 'আপনি আমাকে ভাড়া দিচ্ছেন ! আমি শোধ করব কি ভাবে !'

'খুব সহজ ভাবে। কাল কালীবাড়িতে প্রণামী দিয়ে দেবেন এক টাকা।'

যে-ভদ্রলোক একটু আগে ব্যঙ্গ করেছিলেন, তিনি বললেন, 'আরে ভাই যা-পাওয়া যায় নিয়ে রাখো না।'

লোকটির দিকে এইবার তাকাবার সুযোগ হল। নিখুঁত বাঙালী। সেই দাঁত বের করা বোকা বোকা হাসি। সবজান্তা ভঙ্গি। সন্দেহপ্রবণ। তেল চুকচুকে মুখ। কন্ডাক্টার ভদ্রলোক সোজা তার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'টিকিট ?'

ভদ্রলোক বললেন, 'মান্থলি ।'

'দেখান ।'

বুকপকেটে দু'আঙুল ঢুকিয়ে কি একটা তোলার ভঙ্গি করলেন। বেরলো না কিছুই। কন্ডাক্টার এইবার ধমকের সুরে বললেন, 'নকশা ছেড়ে টিকিটটা দেখান।'

'হোয়াট ডু ইউ মিন ?'

'বাঙালীর মুখে ইংরেজী বেরোলেই বুঝতে হবে, ডালমে কুছ কালা।'

'জানো আমি বোনাফাইড প্যাসেঞ্জার।'

'প্রথমে আপনি বলতে শিখুন, তারপর টিকিটটা কেটে বোনাফাইড প্যাসেঞ্জার হোন। এমন বোনাফাইড প্যাসেঞ্জার আমরা সারাদিনে শয়ে শয়ে দেখছি।'

'আমি কমপ্লেন করব অথরিটির কাছে। হোয়াট ইজ ইওর নাম্বার ?'

'এই যে আমার বুকে। পয়সা ছাড়ুন।'

ভদ্রলোক একটা দশ টাকার নোট বের করলেন। খুব গোলমেলে লোক। গুরুদেব টাইপের। ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখার মতো। কন্ডাক্টর বললেন, 'খুচরো দিন। দশ টাকার নোটের ভাঙানি হয় না। আপনার মাথার ওপর নোটিসটা পড়ুন।'

'খুচরো নেই।'

'ভাবছেন ওই কায়দায় বেরিয়ে যাবেন ? দিন, আমি আপনাকে চেঞ্জ দোবো।'

একটা খালি আসনে বসে কন্ডাক্টর ভদ্রলোক ব্যাগ উল্টে চেঞ্জ বের করলেন। ঠোঁটে মুচকি হাসি। আমার খুব ইচ্ছে করছিল, সিক্ করে অসভ্য ছেলের মতো একটা সিটি মারি। শ্যামবাজারের মোড়ে না নেমে আমি ডিপো পর্যন্ত চলে গেলুম, শুধুমাত্র কন্ডাক্টার ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করার জন্য। অতুলনীয় মানুষ। তা ছাড়া বাড়ি গিয়েই বা কি হবে ! নির্বান্ধব, নিরানন্দ পুরী। স্মৃতিভারাতুর। যে-যাই বলুক, যতই অস্বীকার করুক, আমাদের ওই ওলন্দাজ আমলের বাড়িতে অশরীরী আত্মার উপদ্রব আছে। পাশেই ছিল ওলন্দাজ শাসকের বাড়ি। সেই বাড়ি এখন এক বিশাল ব্যবসায়ীর প্রমোদ-ভবন। আমাদের বাড়িটা ছিল সেই বিদেশী বণিকদের কুঠি। খুন-জখম-অত্যাচার-ধর্ষণ সবই হয়েছে। যত রাত বাড়ে তত ভয় বাড়ে।

'এই আমার শেষ ট্রিপ' বলে কন্ডাক্টার ভদ্রলোক ট্রামগুমটির অফিসের সামনে একটা বেঞ্চে বসে পড়লেন। কথা বলতে বলতেই টিকিট আর পয়সার হিসেব চলছে। ভদ্রলোকের নাম, পরেশ মৌলিক। বেহালায় থাকেন।

হিসেব চুকিয়ে বললেন, 'এক ভাঁড় চা চলবে না কি ?'

'আমার পকেটে তো আপনার দেওয়া টাকাটাই পড়ে আছে !'

ভদ্রলোক জিভ কেটে বললেন, 'আরে ছি ছি। কে কাকে দেয় ? দেনেঅলা সেই একজন, লেনেঅলাও সেই একজন। বিশ্বজুড়ে সেই একের খেলা। আমরা শালা ধরতে পারছি না।' ভদ্রলোক জিভ কাটলেন, 'অ্যায় শালা, শালা বলে ফেলেছি। এই অভ্যাসটা আমার এসেছে দাদুর কাছ থেকে। আমাকে শালা বলেই ডাকতেন। চলে আসুন, গুডনাইট চা-টা মেরে আসি। ওই স্টিমে এখনও আমাকে অনেকদূরে যেতে হবে। ট্রাম চলে বিদ্যুতে। বড়লোক চলে বোতলের ইস্পিরিটে। মধ্যবিত্ত চলে চায়ের ইস্টিমে। গরীব চলে কল্কেতে। গরীবের ভগবান মহাদেব। বড়লোকের ভগবান কালী। মহাদেব হয়ে চিৎপাত, বুকে নাচছেন ম'কার। দুই ম-য়ের পায়ের তলায় সারা জীবন ফ্ল্যাট।'

'আপনি ইস্পিরিট, ইস্টিম বলছেন কেন ?'

'ধ্যুর বোকা, স্পিরিট আর স্টিম, বললে তো ভদ্দরলোক হয়ে গেলুম। ভদ্দরলোক কে হতে চায়! ভদ্দরলোক হলেই তো ট্রাম-বাসের ভাড়া মারার টেন্ডেনসি হবে, ঘুষ নিতে ইচ্ছে করবে। ভায়ের পোঁ, সরি, গাঁ, সরি, পেছনে বাঁশ ভরতে ইচ্ছে করবে। বাঁশ ভরে দে, বাঁশ ভরে দে হুঁউঁউঁউঁ। জেন্টলম্যান হবার ইচ্ছে আমার একদম নেই। অতটা নীচে নামতে পারবো না ভাই। মাপ করো রাজা। দাঁড়ান আপনাদের হিসেবটাকে জমা করে দিয়ে আসি। কুঁচো পয়সা, কাঁচা পয়সা।'

পরেশবাবু এগিয়ে গেলেন কাউন্টারের দিকে। গুমটিতে গোল হয়ে ট্রামের পর ট্রাম দাঁড়িয়ে আছে। বেশীরভাগই এইবার ঘুমিয়ে পড়বে। আমার হাতে বাবার দেওয়া ঘড়িটা বাঁধা। সময় দেখছি যতটা কাটান যায়। মুকুর কথা ভাবছি। কি হল মেয়েটার! নিশ্চয় ওদের সাংঘাতিক অধ্যক্ষা ঘরে তালাচাবি দিয়ে রেখেছেন। গোটা পাঁচেক মেয়েকে বসিয়ে রেখেছেন প্রহরায়। লেডিজ হস্টেল মানেই তো জেলখানা। কি জানি কি হয়েছে ভেতরে! যাই হোক, আর একবার আমি আহত হলুম। ঈশ্বর না কি যা করেন, সবই মঙ্গলের জন্য। হে মঙ্গলময় কোথায় বসে আছেন আপনি! কিতনি দূর! সামনেই বাগবাজারের খাল। দগদগে অন্ধকার। এ-পারে ও-পারে দু'সার ঝুপড়ি। টিমটিমে আলো কাঁপছে কোথাও কোথাও। মেয়েদের খ্যানখেনে গলা বাতাসে ওঠা-পড়া করছে।

পরেশবাবু অর্থমুক্ত নিরর্থ মানুষ হয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন, 'চলুন, তাহলে একটু ইস্টিম নিয়ে যে-যার তাঁবুতে ফিরে যাই। আজকের মতো যুদ্ধ শেষ। কাল কোন ভোরে আমাকে উঠতে হবে, আপনার কোনও ধারণা আছে?'

'না পরেশদা।'

'দাদা বললেন? তাহলে আপনাকে তুমিই বলি। নামটা পেলে বেশ হত।'

'পিণ্টু।'

'বাঃ, আমাদের দু'জনেরই প দিয়ে শুরু।'

গ্যালিফ স্ট্রিটের মাঝামাঝি জায়গায় এলোমেলো একটা চায়ের দোকান। ঝাপসা শোকেসে ঠাণ্ডা ফুলুরি, বেগুনী গড়াগড়ি খাচ্ছে। তাকালেই অম্বল। আমরা নড়বড়ে বেঞ্চে পাশাপাশি বসলুম। একজন মহিলা চা তৈরি করছেন। রঙ ময়লা, কিন্তু বহত যৌবন। বেশ আদেশের ভঙ্গিতে কথাবার্তা বলছেন সকলের সঙ্গে। চিবনো দাঁতনের মতো চেহারার একটি লোক খিদমত খাটছে। আমরা আসার আগেই লোকটি কিছু একটা অন্যায় করে থাকবে। মহিলা তাকে বেদম ঝাড়ছে। আমাদের দেখে একটু নরম হল।

পরেশদা বললেন, 'দুটো, মোটা করে।'

মেয়েটি একগাল হেসে বললে, 'দুধ কেটে গেছে এই মড়াটার জন্যে। মোটা হবে না, সরু করে দিচ্ছি।'

মানুষ কারো দাঁতের প্রেমে পড়ে! আমি পড়ে গেলুম। দু' সেট দাঁত যেন দু'সার মুক্তো। কত বয়স হবে! পঁচিশ, তিরিশের মধ্যে। আমার সহপাঠী সুখেন, জবা যাকে নিয়ে পালিয়েছে, সেই সুখেন এই রমণীকে দেখলে, শাস্ত্রসম্মতভাবে প্রমাণ করে দিত, এ হল একটা সোনার মোহর, চিনতে পারছিস না, অনেকদিন মাটি চাপা ছিল বলে। তোর কম্পানির আধখানা সাবান দিয়ে প্রথমে ওয়াশ কর, তারপর পাতলা করে অলিভ অয়েল মাখিয়ে স্পঞ্জ। চুল রিঠে মেরে একটু সেন্ট। বিচিলি-রঙের শাড়ি আর ব্লাউজ। কপালে একটা টিপ। পায়ে পড়ে যাও। কালবিলম্ব নয়।

পরেশদা বললেন, 'জীবন যদি দেখতে চাও, দোতলার ঘর ছেড়ে নেমে এস ফুটপাথে।

কড়া লিকারের চায়ের মতো কড়া জীবন। কোনও ফ্যাঁসফোস নয়, একেবারে বাঘা-থাবা। আমি যা চাই, ভগবান আমাকে তাই দিয়েছেন। আহা ঈশ্বর পরম-করুণাময়।' পরেশদা দুটো হাত মাথার ওপর তুলে আকাশের স্লেটে তাঁর এই বার্তাটা লিখতে চাইলেন। ডানহাতে বেশ একটা মোটা লোহার বালা।

পরেশদা বললেন, 'ভগবানকে বললুম, ভগবান! আমার সংসার ঘুচিয়ে দাও। পনের বছর সময় নিলেন। সব ফৌত। পরিবার, পরিজন, আত্মীয়স্বজন সব চৌপাট। ভগবান বললেন, লেখা-পড়া করলে কেরানী হবি। সারাদিন চেয়ারে বসে থেকে থেকে বাতে ধরবে, বদহজমে মরবি। এই তোর সব টাকা-পয়সা কেড়ে নিলুম। নে ব্যাটা, এইবার বোঝ, অন্নচিন্তা চমৎকারা, কালিদাস হয় বুদ্ধিহারা। একটু ভাগ্য খারাপ, রেলগাড়ি হল না, হল ট্রামগাড়ি। ভগবান বললেন, এমন করে দিলুম, একেবারে ঘোড়ার মতো, সারাজীবন চেয়ারের সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক থাকবে না। সারাদিন, দু ঠ্যাঙে খাড়া হয়ে ঘড়ঘড় করে ঘোরো। রাস্তায় হাঁটার সময় মনে হয় ফুটকড়াইয়ের ওপর দিয়ে হাঁটছি। কেরানী হলে সাততাড়াতাড়ি বিয়ে করার জন্যে ক্ষেপে উঠতুম। বিয়ে মানে মাস তিনেকের স্বপ্ন তারপর সারাজীবন দুঃস্বপ্ন। আলপিনের শয্যা। সে-পথেও আর যেতে হল না। মহাদেব মাথায় হাত রেখে বললেন, বাবা পরেশ, তুমি আমার চেলা বনে যাও, দালান-কোঠা ফেলে দিয়ে শ্মশানে বৈঠকখানা।

শেষ কথাটা গান হয়ে পরেশদার গলা ছেড়ে চাবুকের মতো আছড়ে পড়ল। বুঝলুম, বেশ ভালই চর্চা আছে গানের। ওদিকে দু'গেলাস চা নিয়ে প্রলয় কাণ্ড চলেছে। একটা লটরপটর হাত-পাখা নিয়ে সেই মড়া নামধারী মানুষটি উনুনের আঁচের সঙ্গে লড়াই করছেন, আর শ্যামা মহিলাটি উত্তম-মধ্যম খিস্তি করে চলেছেন। তার মধ্যে দেহ আছে, ভাগ্য আছে, অদৃষ্ট আছে, ওই লোকটির চোদ্দ পুরুষের শ্রাদ্ধ আছে।

পরেশদা বললেন, 'ল্যাঙ্গোয়েজ শুনছো! স্বামী-স্ত্রীর কম্বিনেশানটা একবার দেখছ! যেমন লিকার তেমনি ফ্লেভার! আসাম, দার্জিলিং ব্লেন্ড।'

অবশেষে দু' গেলাস চা আমাদের হাতে এল। ভদ্রলোক গেলাস দুটো যখন আমাদের হাতে দিচ্ছেন, তখনই লক্ষ করলুম, তাঁর হাত দুটো পোড়া। সমস্ত চামড়া গুটিয়ে পাকিয়ে এক জায়গায় জড়ো হয়ে গেছে। দেখা মাত্রই সারা শরীর কেমন করে উঠল। লোকটির মুখ দেখে মায়া হল। একসময় দেখতে নেহাত খারাপ ছিলেন না। জীবন এখন সব রস নিঙড়ে নিয়েছে। মুখে কোনও কথা নেই। অসম্ভব উজ্জ্বল দুটো চোখ। গাল ভেঙে যাবার ফলে নাকটা খাড়া। মুখটা ধারালো।

পরেশদা বললেন, 'হাত দুটো দেখলে?'

'পুড়ে কঙ্কাল হয়ে গেছে।'

'ইতিহাস শুনবে? ওটা আগুনে পোড়া নয়, অ্যাসিডে পোড়া। ওই মেয়েটির নাম লতা। তিনজনে ফাইট করছিল ওই লতার জন্যে। এক ব্যর্থ প্রেমিক, সে আবার সোনার দোকানের কারিগর ছিল। লতাকে অ্যাসিডে গলিয়ে সোনা করতে চেয়েছিল মনে হয়। তখন এই ছেলেটা বাঁচিয়েছিল, ওর গোটা পিঠটা পোড়া। একটুর জন্য মুখটা বেঁচে গেছে। তুমি পারবে, তোমার প্রেমিকাকে এইভাবে বুক দিয়ে বাঁচাতে? পারবে না। মধ্যবিত্ত বাঙালির সব কিছুই ভাসা-ভাসা, অগভীর। আগে নিজেকে সামলাবে। বলবে, আপনি বাঁচলে বাপের নাম।'

'প্রেমটা তেমন সাকসেসফুল হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না!'

'তোমার মাথা। প্রেমের তুমি কাঁচকলা বোঝো। তোমার চোখের সামনে যা ঘটছে সবই প্রেম। তুমি ওই লোকটিকে কিছু বলে দেখ না একবার, কি হয়! আস্ত চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে। তুমি এখনও নাবালক। নবকার্তিকের মতো চেহারা, প্রেমট্রেম করেছ?'

প্রেমে চুরচুরে হয়ে আছি। কি আর বলব! মিথ্যে কথাই বলতে হল। পেটের কথা পেটে রাখাই ভাল। দোকানে আর কোনও খদ্দের নেই। মেয়েটি বাইরে এসে বসল। ভগবান চোখ দিয়েছেন, নারীশরীরের আকর্ষণ বোঝার ইন্দ্রিয় আমার জেগেছে। আড়ে, আড়ে তাকাচ্ছি। মেয়েটি বললে, 'আজ আর শালা কোনও খদ্দের নেই। তুমি ভাতের জলটা এইবার বসিয়ে দিয়ে চালটা বেছে ফেল। আনাজের ঝুড়িতে কি পড়ে আছে দেখ।'

এতক্ষণে লোকটির মুখে কথা সরল, 'আজ রুটি করো না, গরম-গরম রুটি।'

মেয়েটি ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'আমার একেবারে লোহার গতর দেখেছো, তাই না! কে এখন বসে বসে আটা ঠেসবে?'

পরেশদা গেলাস নামিয়ে বললেন, 'চলো, এবার যাওয়া যাক।'

হঠাৎ কোথা থেকে বেশ জমাটি গান ভেসে এল, সঙ্গে চালু হাতের হারমোনিয়াম। গানের বাণীও স্পষ্ট, 'চিন্তা না করো শ্যাম।' কপাক, কপাক করে তবলার ঠেকা। ফুরফুরে বাতাস। ঠুংরি অঙ্গের গান। আসছে খালের ওপার থেকে। পরেশদা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন, 'ওস্তাদ, এসে গেছে। যাঃ, আজ রাতে আর বাড়ি যাওয়া হল না।'

'কেন পরেশদা?'

'অসম্ভব! এই গান ছেড়ে যাওয়া যায়? ওস্তাদ এসে গেছে। জোর মাইফেল।'

'কোথায় হচ্ছে?'

'ওই তো ওপারে! সাহাবাবুর গোলায়। যাও, তুমি বাড়ি চলে যাও। বাড়িতে ভাববে। আমি আসর মেরে কাল সকালে ডিউটিতে চলে আসব।'

'আপনার বাড়িতে ভাববে না?'

'যাতে কেউ না ভাবে তার ব্যবস্থা তো আমার শিববাবু করে দিয়েছে। কেউ নেই, তা ভাববে কে? এমন কি চোরেও আমার কথা ভাববে না। আমি কোথায় থাকি জানো? এক বড়লোকের বাড়ির দারোয়ানের গুমটি ঘরে। পড়তি বড়লোক। দারোয়ান দেহাতে ভেগেছে। পরিবারের ছোটবাবু বললেন, 'শেয়ালের আস্তানা হওয়ার চেয়ে তুমিই থাকো। পারলে একটু পাহারা-টাহারা দিও। তা মন্দ কি? বিনা পয়সায় থাকা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে তেনারা, মানে শিববাবুর মাফলাররা।'

'সেটা কি?'

'বুঝলে না? জ্যান্ত মাফলার। ফণা আছে। ফোঁস করে। তারা মাঝে মাঝে দেখভাল করতে আসে। নাঃ, তোমার সঙ্গে আর কথা বলা যাচ্ছে না। শুনছো, ওস্তাদ কি ছাড়ছে?'

পরিষ্কার কানে আসছে, 'চিন্তা না করো শ্যাম, আয়ি বাহার।' গন্ধর্ব কণ্ঠ শোনাই ছিল, আজ কানে এল। বললুম, 'পরেশদা, আমিও যাবো। গান আমিও ভীষণ ভালবাসি।'

'তোমার বাড়িতে সবাই ভাববেন।'

'একই ব্যাপার, আমারও কেউ নেই।'

'তাই নাকি? আহা কি ভাগ্য! শিবুদার কি কেরামতি! রতনে রতন মিলিয়ে দিয়েছেন। চলো তাহলে।'

'রাতের খাওয়া?'

'সে ব্যবস্থাও হবে।'

পরেশদা চায়ের ঝুপড়িতে ফিরে গেলেন। লতার সঙ্গে কি একটা ব্যবস্থা করে ফিরে এলেন। বললেন, 'হয়ে গেল। তুমি আবার ভদ্দরলোক, শেষপর্যন্ত খেতে পারবে তো!'

সন্দেহ আমারও আছে। ঘেন্না করলেও চেষ্টা করতে হবে। আর না। অনেক আদর খাইয়েছি নিজেকে। এইবার দেয়াল ভাঙতে হবে। সংসার-লেত্তি জীবন-লাট্টুকে ঘুরিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। তালগোল পাকাবার সময় এসেছে। ভাল ছেলে, লক্ষ্মী ছেলে হয়ে লাভ কি? জীবন অনেক বড়। একটা দিক দেখা হয়েছে! এইবার আর একটা দিক দেখব। যেটাকে আমরা আলোর দিক বলি, সে তো আমাদের ব্যাখ্যা। সে আলোর কেমন আলো! মুকু কিরকম খেলাটা দেখালে! এই লতা-রা অনেক ভাল। বোঝা যায়। মুকুরা ধড়িবাজ।

রাস্তা পাক মেরে খালের ওপারে গিয়ে পড়েছে। অন্ধকারে বাগবাজার ব্রিজ হাতিরমতো দাঁড়িয়ে আছে। আমরা ব্রিজ পেরিয়েই গেলুম। গেট ঠেলে ঢুকতেই গান আরও স্পষ্ট হল। ভেতরটা বেশ প্রশস্ত। একটা মাথা-ঘেরা চাতাল। লুঙ্গি আর পাঞ্জাবি পরে আসরে বসে আছেন ওস্তাদ। চেহারা দেখলে তেমন সমীহ হবার কথা নয়; কিন্তু গলায় সুরের ফুলঝুরি। শ্রোতারাও কেউ তেমন বিশিষ্ট নয়। আমরা একপাশে বসে পড়লুম। পরেশদাকে দেখে ওস্তাদজী গানের মধ্যেই ঘাড় নাড়লেন। তিনি চেনেন। আসরে তবলা আছে, ঢোলও আছে। খুব সেজে-গুজে পাকা চেহারার এক মহিলা বসে আছেন। অবাঙালি। পরেশদা কানে কানে বললেন, 'নাচও হবে। এর নাচ দেখলে তোমার ষড়রিপুর প্রথমটা একেবারে ছেতরে যাবে। চোখের কায়দা কি, যেন অর্জুন তীর ছুঁড়ছে।' ওস্তাদের গান যেন গলায় গামছার মোচড় মারছে, চিন্তা না করো শ্যাম। মহিলা বাবু হয়ে বসে আছেন মা ষষ্ঠীর মতো। উরুতে তাল দিচ্ছেন, সারা শরীরে ঢেউ খেলছে। ওস্তাদ যখন 'শ্যাম' বলে সমে পড়ছেন, মহিলাও গলা মিলিয়ে হাঁটুতে চাপড় মারছেন। শব্দটা শুনতে পাচ্ছি, যেন ক্ষীরসাগরে কেউ ডাইভ মারছেন। শ্রোতারা সব টান টান হয়ে আছে। আমার পক্ষে একটু গুরুপাক হয়ে যাচ্ছে। পরিবেশটা সহ্য হচ্ছে না। খালপাড়ের মশা মনে হচ্ছে তুলে নিয়ে যাবে। ছোট একটা কল্কে হাত ঘুরতে-ঘুরতে পরেশদার হাতে এসে গেল। শিশু যে-ভাবে ফিডিং বোতল চোষে সেই ভাবে তিনটে প্রবল টান মেরে বললেন, 'পরীক্ষা করবে না কি? শিববাবুর দাওয়াই।'

আমার মাতামহের মুখে তাঁর প্রথম গঞ্জিকাসেবনের গল্প শুনেছি, কঙ্খলের এক সাধুর আখড়ায়। টান মেরেই উল্টে পড়লেন। তারপর ফুলছে। পেট ফুলতে ফুলতে ফানুস। মনে হল আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছেন ধীরে ধীরে, দুলতে দুলতে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর স্বর্গের সিংহদুয়ার খুলে ডাকছেন, আইয়ে, আইয়ে। ভোরবেলা মনে হল, রম্ভা তাঁর বুকে মাথা রেখে শুয়ে আছেন। চোখ খুলে দেখলেন, তাগড়াই একটা কুকুর বুকের ওপর প্রেমসে ঘুমোচ্ছে। এর মধ্যেও তিনি করুণাময়ের প্রেম দেখতে পেয়েছিলেন। কুকুরটা জ্যান্ত জাম্পারের কাজ করেছিল। ওই প্রবল ঠাণ্ডায় তা না হলে নিউমোনিয়া হয়ে যেত!

পরেশদার মুখের একপাশে একটু আলো পড়েছে। চোখ দুটো সূচের মতো সরু, ধারালো। শুনেছি গাঁজা খেলে চোখের মণি আলপিনের মতো হয়ে যায়।

পরেশদা বললেন, 'বড়প্রসাদ হাতে আটকে রাখার নিয়ম নেই। টান মেরেই ছেড়ে দিতে হয়। আবার রাউন্ড মেরে ফিরে আসবে। সর্বধর্ম সমন্বয়। এক কল্কে বহু ঠোঁট। টানো না টানো, একবার টাচ্ করো। ছোট্ট কল্কে। সাংঘাতিক গরম। একবার মনে হল, মারি টান। জীবনটাকে একটু অন্য প্ল্যাটফর্মে দেখি। অনেকদিন তো ভদ্দরলোক ছিলুম, যারা মশারি ফেলে প্রেম করে। ভাগবতের মধ্যে 'পর্নোগ্রফি' পুরে, বলে কৃষ্ণকথা পড়ছি। জীবে দয়া

করো,বলে কাজের লোককে বেধড়ক জুতোপেটা করে। ব আর ভ, এক করে ফেলে, নিজের জিভেই দয়া করে। যাদের বাড়িতে দু'রকমের চালের ভাত হয়। বাবুদের জন্যে চামরমণি, কাজের লোকের জন্যে বোগড়া। পাওনাদার দেখলে বলবে, কাম-কাঞ্চনে আমার আসক্তি নেই, আর নিজের টাকা আদায়ের সময় কলার খামচে ধরবে। গোঁফ থেকে দুধের সর মুছতে মুছতে বলবে, ভোগ একপ্রকার রোগবিশেষ।

পাশের লোকটি ছোঁ মেরে কল্কেটা আমার হাত থেকে নিয়ে বললে, 'নালায়েক'।

পরেশদা কানে কানে বললেন, 'ভালই করেছ। এ হল মুটে-মজুরের নেশা। তোমাদের জন্যে বোতল। তবে কি জানো, গাঁজা খেলে কাম জয় করা যায়। ইন্দ্রিয় হল সাপ। দেখ, মহাদেব কেমন মাফলার করে গলায় পরে আছেন, যেন টনসিল হয়েছে। ওই গাঁজার জোরে। বউকে বলছেন, অন্ন দে মা।'

কল্কে উড়তে উড়তে চলে গেল নাচিয়ের কাছে। তিনি হাঁটু তুলে বসে, দু হাঁটুর চাপের মধ্যে হাতের কনুই রেখে তিনটি বেদম টান মারলেন। ওস্তাদ তখন গানের কলিতে অলঙ্কার সাজাচ্ছেন, চিন্তা না করো শ্যাম। কাফি আর সিন্ধু মিলে ফাটাফাটি ব্যাপার।

ছোট একটা টিনের কৌটো হাত ঘুরতে ঘুরতে পরেশদার হাতে এল। কি একটা ঘিয়ের মতো জিনিস আঙুলের ডগায় নিয়ে চুষে খেয়ে ফেললেন। কৌটো আমাকে টপকে চলে গেল পাশের লোকের হাতে। পরেশদা বললেন, 'ভেসলিন।'

'ভেসলিন খেলেন ?'

'গাঁজা খেলে ভেতরটা ড্রাই হয়ে যায়। ঘি, দুধ আমরা পাচ্ছি কোথায় !'

তিনটে তেহাই মেরে গান শেষ হল। নর্তকী দু'বার হাত ঝাঁকালেন। চুড়ি বেজে উঠল কিনকিন করে। রাতের শালু যেন দুলে উঠল। সমস্ত লোক নড়ে চড়ে বসল। যে ঢোল বাজাবে তার কোলে গিয়ে চড়ল ঢোল। দুদিকে গোটাকতক চাঁটা মেরে জানিয়ে দিলেন, জাগো, জাগো।

নাচিয়ে হাঁটু মুড়ে বসেছিলেন। ডান পা-টা সটান সামনে বাড়িয়ে দিলেন। যেন উল্টানো এক কদলীকাণ্ড। মসৃণ, নিটোল। অন্তরালে থাকে বলে অতিশয় শুভ্র। আকস্মিক আত্মপ্রকাশে সকলেরই ভেতরটা গেল, গেল, করে উঠল। পায়ের নিটোল গোছে পটি বাঁধা ঘুঙুর। সদম্ভে তিনবার পা ঠুকলেন তালে। এক, দো, তিন। ঝনঝন করে উঠল ঘুঙুর। শরীরের ওপর দিকে তরঙ্গ খেলে গেল। ঢোল ধরে নিল সেই ছন্দ, তবলা কাটতে লাগল তাল। সেই সাংঘাতিক পদশোভা ডাইনে-বামে দ্রুত আন্দোলিত হয়ে তালের পর তাল ছাড়তে লাগল। ঘুঙুরের ঝনাৎকার। নর্তকী কানে হাত রেখে তীব্র সুরে ধরলেন—'সৈঁইয়া না মারো লাথ। তেরি গোড় পড়ি সজনীয়া। শুনো মেরি বাত ॥'

কেমর থেকে নিতম্ব, জলস্তম্ভের মতো হিল্লোলিত করে নর্তকী উঠে দাঁড়িয়ে সপাটে একবার ঘুরে গেলেন। শাড়ি ফুলে উঠল ঘাঘরার মতো। আমার পাশের লোকটি 'উঃ' করে উঠল। ঠিক জায়গায় গিয়ে লেগেছে।

হঠাৎ আমার কানে বাজল পরিষ্কার কণ্ঠস্বর, 'বাঃ, বেশ হচ্ছে ! এই তো চাই ! এই তো চাই !'

স্পষ্ট হরিশঙ্করের কণ্ঠস্বর 'Virtue! a fig!' tis in ourselves that we are thus, or thus!

৯

কি সুন্দর—কি মহান—উদ্বেগে দাপটে !
কি অস্থির সংক্রমণ !
কি গভীর আলোড়ন !
বিস্মিত-স্তম্ভিত আমি দাঁড়াইয়া তটে ।

রাত কোথা দিয়ে কেটে গেল জানি না। সুরের নেশা, দেহের নেশা। ইন্দ্রিয়ের কিলিবিলি। গাঁজার ধোঁয়া। নাচিয়ে মহিলার নাম, জীরাবাঈ । শ'খানেক মানুষকে একেবারে লুটিয়ে দিলে। আমরা খাওয়া দাওয়ার কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলুম। হঠাৎ লতা এসে পরেশদার পিঠে এক চাপড় মেরে বললে, 'পেঁয়াজি বাঈয়ের শরীরের পেঁয়াজি দেখতে হয় তো, আমাকে উদ্ধার করে এসে দেখো।' ঘনিষ্ঠতা দেখে মনে হল, পরেশদাও লতার প্রেমমুগ্ধ। ছিপছিপে দীর্ঘাঙ্গী এই মহিলাও কম যান না। সবেতেই বেশ মাদকতা। শরীরের বাঁধুনি বোতলের নেশাকেও হার মানায়। পরেশদা গাঁজায় চুর হয়েছিলেন। গোপাল বালকটির মতো পিছু পিছু চলতে লাগলেন। পশ্চিমের গঙ্গাগর্ভ থেকে জোলো বাতাস বয়ে আসছে। বেশ ভারি। ভিজে আঁচলের মতো। লতার আঁচল উড়ে উড়ে ঝাপটা মেরে যাচ্ছে মুখে। মহুয়ার গন্ধ। গুনগুন করে গান ধরেছে—'তোমার আমার গোপন কথা শোনে শুনুক লোকে।' মেয়েটা যে নেশা করেছে বেশ বোঝাই যায়। কপাল চকচক করছে। চোখ দুটো ধকধক করছে। টুসকি মারছে। মাথায় অনেক চুল। থেকে থেকে খোঁপা ভাঙছে। খোঁপা বাঁধছে। কখনও সাপের মতো এঁকে বেঁকে চলছে।

পরেশদা সাবধান করছেন, 'এই কি হচ্ছে! লোকে মাতাল বলবে।'

লতা বললে, 'এই নাবালক মালটাকে জোটালে কোথা থেকে! বাঁদর ছানার মতো সেই থেকে আমার দিকে জুলজুল করে তাকাচ্ছে। আমার শরীরে সুড়সুড়ি লাগছে মাইরি।'

পরেশদা বললেন, 'অ্যায় লতু, হচ্ছেটা কি ? কাকে কি বলছ! ভদ্দরলোকের ছেলে।'

লতা খিলখিলিয়ে বললে, 'মাঝরাতে দুধের বাছা, আর বুড়ো হাবড়া ছাড়া কোন শালা ভদ্দরলোক!'

পরেশদা ধমক মেরে বললেন, 'লতু, হি ইজ মাই ফ্রেন্ড।'

আমার বেশ মজা লাগছিল। ভাগ্য আমাকে কি সুন্দর জায়গায় টেনে এনেছে। বলা যায় না, এইটাই হয় তো আমার বাকি জীবনের পরিবেশ। অন্য সময়ে আমি কি আসতুম এখানে। সাতদিন আগেও এখানে আসার কথা আমি ভাবতে পারতুম না। একেই বলে যোগাযোগ। তা সবই যদি ভগবানের ইচ্ছায় হয়, তাহলে এই খালপাড়ে আসাটাও তাঁরই ইচ্ছা। কেন, বলছি। ঠনঠনে গিয়েছিলুম মাকে প্রণাম করতে। হৃদয়ের ব্যথা জানাতে। মা

সেখানে আমার জন্যে খাড়া করে রেখেছিলেন পকেটমার জামাইকে। জামাই সব আবর্জনা সাফা করে দিলে। দেখা হল এই পরেশদার সঙ্গে। তিনি টেনে নিয়ে এলেন এই বিচিত্র জায়গায়। এমনই বরাত, শুরু হল গান। সঙ্গে আবার নাচ। ভগবান জানতেন, ছেলেটার মনে ছেঁদা হয়েছে। তালি মারতে হবে।

তালি মেরে, পা ঠুকে জীরাবাঈ গান ধরলে, 'সেঁইয়া না মারো লাথ। তেরি গোড়পড়ি সজনীয়া। শুনো মেরি বাত ॥' ঈশ্বর এতেও সন্তুষ্ট হলেন না। পাতে দিলেন চাটনি। মাতাল লতা। যা ভেবেছিলুম। খেলা কোয়ার্টার, সেমি নয় একেবারে ফাইনালে গিয়ে শেষ হল। খাদ্য যা জুটল সে আর বলার নয়। মাতাল রমণীর পোশাকআশাকের ঠিক থাকছে না। আঁচল খুলে পড়ে যাচ্ছে। চুল এলিয়ে যাচ্ছে। শোচনীয় অবস্থা। তার নয়, আমাদের। সেই অবস্থায় কাজ কিন্তু হয়ে চলেছে। এনামেলের থালায় ভাত, ডাল, আস্ত একটা পেঁয়াজ আর চাটনি। এই হল খাদ্য। মেয়েটির হাতের রান্নার পরিচয় পাওয়া গেল ডালে। অমৃতের স্বাদ। কি দিয়েছিল কে জানে!

যে-লোকটিকে কিছু আগে দেখেছিলুম, নির্বাক পশুর মতো বউয়ের পায়ে পায়ে ঘুরছে, মধ্যরাতে তার কি বিক্রম! সে-ও মনে হয় দুপাত্র চড়িয়েছিল। রাজার মতো বসে বসে হুকুম করছে 'অ্যায় ডাল দে।' চাইবার মতো একটা জিনিসই তো হয়েছে, সেটা ডাল। মদের একটা অদ্ভুত গুণ। পৃথিবীর সব প্রাণীকেই সম্বন্ধী মনে করায়। শালা ছাড়া সম্বোধন নেই। আর পরস্পরকে খুব নিকট করে। তুই ছাড়া মুখ দিয়ে আর কিছু বেরোয় না।

'ডাল দে', বললেই তো আর ডাল দেওয়া যায় না। সব শেষ। লতা হাতের চুড়ি দিয়ে অ্যালুমিনিয়ামের ডেকচিটা একবার বাজিয়ে দিলে। মাথার ওপর দু'হাত তুলে শরীরের ওপরটা নাচিয়ে বললে, 'ডাল নেই, মাল আছে।'

লোকটি অদ্ভুত কায়দায়, বসে বসেই ডান-পাটা ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মতো এমন ছুঁড়ল, ধাঁই করে লতার বুকে। শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ। স্থলে, জলে আকাশে। প্রথমে গোলা যুদ্ধ। গেলাস ছোঁড়াছুঁড়ি, ডালের বাটি, আধখাওয়া পেঁয়াজ। রাম-রাবণ তো নয়, রাম-সীতায় লড়াই।

পরেশদা বললেন, 'আর না। চলো, সরে পড়ি। প্রেম জাগছে।'

'এর নাম প্রেম?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। প্রেমের তুমি কি বোঝো হে ছোকরা? আলোড়ন, আলিঙ্গন, আক্রমণ, আন্দোলন, নিষ্পেষণ, নিপীড়ন।'

একটা গেলাস পরেশদার মাথা ঘেঁষে ঠিকরে চলে গেল বাইরে। দুটো নেড়ি কুকুর বসেছিল প্রসাদের আশায়। দুটোতেই তারস্বরে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল। লতা ছুটে বাইরে চলে যেতে চাইছিল। লতার স্বামী চুলের মুঠি ধরে মেঝেতে পেড়ে ফেলল। পরেশদা বললেন, 'হয়ে গেল। ফ্লোর করে দিয়েছে। আর না। এইবার পালাই।'

রাস্তায় নেমে বললুম, 'পরেশদা, আবার ওই গানের আসর! শরীরের সমস্ত রক্ত যে খালের মশা শুষে নিলে। আর যে পারছি না।'

'ওই জন্যেই বলেছিলুম ছিলিমে মারো টান। মশা কেন, কাঁকড়া বিছে কামড়ালেও টের পেতে না। এত রাতে তুমি ফিরবে কি করে? হেঁটে! দিনকাল ভাল নয়। রাত আর বেশি বাকি নেই, কোনও রকমে কাটিয়ে দাও।'

গানের আসরের কাছাকাছি এসে পরেশদার মত বদলে গেল, 'আমরা একটা কাজ অবশ্য করতে পারি। তবে? তবে?'

বার কতক তবে শুনে বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করলুম, 'তবে কি ?'

'তোমার হয় তো খারাপ লাগবে। ভাববে, তোমাকে আমি খারাপ করে দিচ্ছি। তবে, সবরকম অভিজ্ঞতাই হওয়া ভাল। একবারই তো জন্মেছি। পরেশ নামে আর তো দ্বিতীয় বার আসা হবে না। জীবনের সব দিক দেখে যাবো। আমার ভাই এই মত। তোমার মত অবশ্য অন্য রকম হতে পারে। আচ্ছা একটা সত্যি কথা বলবে ?'

'মরার ভয় না থাকলে নিশ্চয় বলব।'

পরেশদা আমার কাছে সরে এলেন আরও। হাতটা চেপে ধরে বললেন, 'শরীরটা একটু কেমন কেমন লাগছে না ?'

'তা তো লাগছেই। সারা দিন টোটো করে ঘুরছি।'

'আরে ধুর। সে তো আমিও ঘুরছি। শ্যামবাজার ধর্মতলা, ধর্মতলা শ্যামবাজার। সে নয়। জীরাবাঈ যা দেখালে তাতে একটু ইচ্ছে ইচ্ছে করছে না ? তারপরে তোমার ওই লতা। ভেতরটা একটু টাল খেয়েছে না ? সত্যি বলবে। ভণ্ডামি করবে না মাইরি।'

বেশ বেকায়দা হয়ে গেলুম। এর উত্তরে সত্যি কথা বলা যায় না। ঝট করে বলে ফেললুম, 'আমার কিছুই হয়নি।'

'তোমার তা হলে অসুখ আছে। তুমি পুরুষ নও। তুমি সেই।'

খপ করে আমার দুটো হাত চেপে ধরে বললেন, 'চরিত্র দেখাচ্ছ। চরিত্র ! ওই শরীরের ঝটকা দেখে, তোমার চটকা ভাঙেনি ! মিথ্যে বলার জায়গা পাওনি ? চলো আমার সঙ্গে।'

'কোথায় আমাকে নিয়ে যাবে পরেশদা ?'

'তুমি আমাকে কতটা খারাপ ভাবছ ?'

'একটুও না।'

'তোমার কিছু নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছে কি না ?'

'হয়েছে।'

'এই এতটা সময় আমরা দুঃখকষ্ট ভুলে ছিলুম কি না ?'

'ছিলুম।'

'কে ভোলালে ?'

'গান।'

'গানের সঙ্গে ?'

'নাচ।'

'ওকে নাচ বলে ? এইবার আমি খিস্তি করব। চলো। বেশি দূরে যেতে হবে না। কাছেই।'

'আপনি আমাকে খুলে বলুন আগে।'

'ওই কালী মন্দিরের পাশের গলি দিয়ে ঢুকে গেলেই অন্য এক জগৎ। বিশাল এক বস্তি। সেই বস্তিতে জেগে আছে রাত-রূপসীরা। সাংঘাতিক এক মজার জায়গা। তোমাকে বলতে লজ্জা নেই আমি মাঝে মাঝে যাই ভাই। একটু আদরটাদর করে, একটু আদর খেয়ে, ফ্রেশ হয়ে চলে আসি। এতে তো কারোর কোনও ক্ষতি হচ্ছে না। কারোর কোনও ক্ষতিও আমি করছি না। তোমারও কেউ নেই, আমারও কেউ নেই। আমাদের এইসব নিয়েই থাকতে হবে। একা তো আর থাকা যায় না ! আমার যুক্তিটা তুমি মানো কি না !'

'পরেশদা ওখানে আমি যেতে পারব না। আর এই এত রাতে আমাকে আপনি একা ফেলে পালাবেন না। একটা রাত আমার জন্যে একটু কষ্ট করুন। তাছাড়া, আমার পকেটে

আপনারই দেওয়া একটা মাত্র টাকা পড়ে আছে। একটাকায় তো আর ফুর্তি হয় না!'

পরেশদার প্রবল উৎসাহে একটু ভাটা পড়ল। বুঝলেন, যেখানে যাচ্ছেন, সেখানে বিনা পয়সায় কেউ আদর করবে না। ফেলো কড়ি মাখো তেল। একপাক পায়চারি করে নিলেন। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ব্যাড লাক। আমার কাছে আমার মতন আছে। অন্যদিন থাকে। ভেরি ব্যাড লাক। আজকের রাতটা বেশ নরম ছিল। জমতো ভাল। আমি যার কাছে যাই একেবারে ঘরের বউয়ের মতো ব্যবহার করে। যাক গে, আর একদিন হবে। চলো তাহলে ওই মশার ডিপোতে গিয়েই বসি।'

জীরাবাঈয়ের নাচ শেষ হয়ে গেছে। তিনি সাহাবাবুর গদিতে গিয়ে ঢুকেছেন। ওস্তাদজী একটা কাওয়ালির মুখ নিয়ে কসরত করছেন। আমার ভেতরে বেশ একটা ছটফটানি অনুভব করছি। পকেটে আজ টাকা থাকলে সময়টা কি সুন্দর কাটত! অনেকদিনের একটা ব্যাকুল ইচ্ছা, প্রবল কৌতূহল পূর্ণ হত। ওরা কেমন কি করে? কি বলে? কেমন হাসে! কত কি শুনেছি! দূর থেকে দেখেছি। আজ চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জন হত। এ তো পাপ নয়। একটা অনুসন্ধিৎসা। ভেতরটা তোলপাড় করছে। সবই তো তাঁর ইচ্ছাতেই হচ্ছে। তিনি এটারও মালিক, ওটারও মালিক। তাহলে পাপ ভেবে কুঁকড়ে যাচ্ছি কেন? এটা তো ঠিক, ওই একটা জিনিস কিছুক্ষণের জন্যে মানুষের সব কিছু ভুলিয়ে দিতে পারে! হরিশঙ্করের নিষ্ঠুরতা, মুকুর অনিশ্চয়তা, কেউ না থাকার নিঃসঙ্গতা। বলাও তো যায় না, প্রকৃত প্রেম হয় তো ওই জায়গা থেকেই পাশ ফিরে জেগে উঠবে। কার বরাতে কি লেখা আছে, কেউ কি বলতে পারে। সেদিন এক ভদ্রপাগল দু'চরণ কবিতা হাঁকছিল, হয় তো তারই লেখা: চলতে চলতে মাঝপথে গেলে তার দেখা পাওয়া যায়। সেই পথে জোনাকিরা দেয় আলো। পাগল পরের চরণটা আর শেষ করলেন না। তড়বড় তড়বড় করে বলে উঠলেন, যে-জন দিবসে মনের হরষে জ্বালায় মোমের বাতি তার শালা কিস্যু হয় না। আমার ওইটা ভাল লেগেছিল, চলতে চলতে। চলতে চলতে তার দেখা পাবো। ওই যে বারোদির ব্রহ্মচারী, বিখ্যাত সাধক, তাঁর এক শিষ্যকে বলেছিলেন, যদি মনে হয় আর পারছ না, তাহলে নিজের সঙ্গে অকারণে লড়াই না করে বেশ্যাগমন করো। তাঁর এই যুক্তি শুনে সারা বৃন্দাবনে হইচই পড়ে গেল। বৈষ্ণবসমাজ অতিশয় অসন্তুষ্ট হলেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজী, কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীজী তখন বৃন্দাবনে প্রবল সাধনায়। তাঁরা হায় হায় করে উঠলেন। তাঁদের দাওয়াই ছিল অন্য, দৌড়োও, কোদাল পাড়ো, গায়ে জল ঢালো। কষ্ট দিয়ে, না খেতে দিয়ে মেরো ফেলো। সনাতন পথ। বিদেশীরা বললেন, মরে না। বিকৃত হয়ে বেরিয়ে আসে। মারতে নেই। খাইয়ে খাইয়ে খিদে মেরে দিতে হয়। অরুচি করে দিতে হয়। বাঘের মোটা নেজও নড়বে, রোগা নেজও নড়বে। টিকটিকিও ছুটবে, কুমীরও ছুটবে। করবেটা কি? ভগবানের যেমন কাণ্ড! এ কি তোমার ইচ্ছে? এ যে তাঁর ইচ্ছে। মনে পড়ছে সেই গান। বাউল গাইছেন:

বিবাদী তোর দেহে সকল,
অহর্নিশি করছে রে গোল,
যথা যাবি, তথায় পাগল করবে তোরে ॥
নারী ছেড়ে জঙ্গলে যায়,
স্বপ্নদোষ কি হয় না তথায়,
সাধের বাঘে সবারে খায়,
তখন আর কে ঠেকায় রে ॥

সঙ্গে আছে রিপু ছয়জন,
তারা সদাই করে জ্বালাতন,
কোন্ দেশে যাবি মনা চল দেখি যাই।
আমি দেখবো, কোথায় পীর হও তুমি রে,
তীর্থে যাবে সেখানে কি পাপী নাইরে ॥

হঠাৎ কানে সুর লেগে গেল। খারাপ ভাবটা শীতের পাতার মতো খুস করে ঝরে পড়ল। মনে হল আমিও একটু গান গাই। কিন্তু আমাকে কি গাইতে দেবে ? পরেশদার কানে কানে বললুম, 'আমাকে গান গাইতে দেবে ?' পরেশদা বললেন, 'সে কি, তুমি গান জানো ?'

'অল্প অল্প।'

'দাঁড়াও, ব্যবস্থা করে আসি।'

পরেশদা উঠে গিয়ে ওস্তাদজীর কানে কি বললেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে গান থামিয়ে বললেন, 'আইয়ে, আইয়ে।' উঠে গেলুম। তিনি হারমোনিয়ামটা ঠেলে দিলেন আমার দিকে। প্রথমে একটু ভয় ভয় করছিল। গুরুকে স্মরণ করে নিলুম চোখ বুজিয়ে। ওস্তাদজীকে নমস্কার করলুম। তিনি খুব খুশি হলেন। রাত ভোর হয়ে আসছে। ভৈরবীটা আমার গলায় আসে ভাল। ভৈরবীর পর্দা লাগালুম। সুর ঝলমল করে উঠল। মনে মনেই বললুম, আহা ! ওস্তাদজী আমার মাথার পেছনে হাত বুলিয়ে ছিলেন একবার। ধরে ফেললুম সেই বিখ্যাত গান, দয়ানী ভবানী। তিন সপ্তকে গলা বলছে। নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছি। ছেলের মাথায় আপেল বসিয়ে বাবা তীরবিদ্ধ করেছিলেন। আমার অনেকটা সেই অবস্থা। গলির ভেতর বস্তি, সেই বস্তির আধময়লা বিছানায় একটা মেয়ে,সেই মেয়েটিকে ভৈরবী দিয়ে মন থেকে ফেঁড়ে ফেলে দিতে হবে। ভবানী, তুমি দয়া করো। যাক, ভোর হয়ে আসছে। অন্ধকার ফিকে হয়েছে। বেশ ভাল লাগছে এই ভেবে, যুদ্ধে জয়লাভ করেছি। ওস্তাদজী দয়া করে হারমোনিয়াম ছেড়ে না দিলে, আংটিটা শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেত পাপের পথে। খোঁচা মেরেছিল। চল্ চল্ করেছিল, আরে আমি তো আছি আঙুলে !

রাজা পরীক্ষিতের কথা মনে পড়ে গেল। তাঁরই কীর্তি। আমার তো কিছু করার নেই। পরীক্ষিতের সঙ্গে দেখা হল। প্রথমে চিনতে পারেননি। কে এই বিকট দর্শন পুরুষ ! হাতে দণ্ড, চোখ ক্রোধে রক্তবর্ণ। ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ। একটি বৃষ ও একটি ধেনুকে নির্দয়প্রহার করছে। বৃষ ও ধেনুটিকে দেখে রাজা আরও অবাক হলেন। এ কেমন বৃষ ! সুন্দর ধবল বর্ণ ; কিন্তু তার একটি মাত্র পা। প্রহারে জর্জরিত ধেনুটির চোখে জলের ধারা। রাজা প্রশ্ন করলেন, 'বর্বর, তুমি কে ?'

'আমাকে চিনতে পারছেন না ? আমি কলি। আমি এসে গেছি।'

রাজা স্তম্ভিত হলেন। আমার রাজ্যসীমায় কলি ! কী স্পর্ধা ! রাজা তখন প্রশ্ন করলেন বৃষকে, 'তুমি কে ?'

বৃষ বললেন, 'আমি ধর্ম।'

'আপনার এই অবস্থা কেন ধর্মরাজ ?'

'মহারাজ, কলিতে ধর্মের এই অবস্থাই হবে। কলিযুগ অধর্মের যুগ। ধর্মের তিন ভাগ চলে গিয়ে থাকবে মাত্র একভাগ। তাই আমার একটি মাত্র পা।'

রাজা ধেনুকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কে ?'

ধেনু বললেন, 'আমাকে চিনতে পারলে না পরীক্ষিত ! আমি মাতা ধরিত্রী। আজ আমি

ভাগ্যহীনা। আমারই বুকে সংঘটিত হবে যত অনাচার। দুর্বৃত্তরা নৃত্য করবে। সাধু-সজ্জন নিপীড়িত হবে।' রাজা পরীক্ষিত গর্জন করে উঠলেন, 'তুমি কলি! তোমার সংহার হবে আমার হাতে।' রাজা অস্ত্র ধারণ করলেন। মহাতেজা পরীক্ষিত। কলি ভীষণ ভয় পেলেন। রাজা পরীক্ষিতের সঙ্গে লড়াই করার শক্তি তাঁর নেই। তিনি করজোড়ে আশ্রয় চাইলেন, 'মহারাজা কালের নিয়মে আমাকে আসতেই হবে। না এসে উপায় নেই। আমাকে শুধু একটু থাকার স্থান নির্দেশ করুন।'

বিচক্ষণ রাজা বুঝলেন, কালকে হনন করা যায় না। রাজা তখন কলির স্থান নির্দেশ করলেন। কোথায় থাকবেন কলি! পাশাক্রীড়ায় অর্থাৎ দ্যূতসভায়, মদ্যপানে, পরস্তরী অনুগমনে আর প্রাণীহিংসায়। কলি সবিনয়ে বললেন, 'রাজন, দয়া করে আরও একটি আশ্রয় দিন। আপনি যা দিলেন, তা যথেষ্ট হল না।'

মহারাজ পরীক্ষিত সামান্য চিন্তা করে বললেন, 'ঠিক আছে, সুবর্ণেও আপনার স্থান হোক।' কলি সন্তুষ্ট হলেন। আমার আঙুলের আংটিটার দিকে তাকিয়ে মনে হল, এই সেই সুবর্ণ। ঘোর কলি। আমাকে আর একটু হলেই দুই 'ম'-এ মজিয়ে মারত।

এক লাফে সূর্য উঠল টালার দিকের আকাশে। আমি বসে আছি বাগবাজারের ঘাটে। পরেশদা আর বেগ ধারণ করতে পারেননি। আমার গান শেষ হবার আগেই চলে গেছেন সেইখানে, যেখানে যাবার জন্যে প্রাণ ছটফট করছিল। ওস্তাদজী আর জীরাবাঈ সাহাবাবুদের গাড়িতে চেপে চলে গেছেন। ওস্তাদজী যাবার আগে ঠিকানা দিয়ে গেছেন। বলেছেন যদি যাই, তাহলে ঠিক ঘরানায় ফেলে দেবেন। জীরাবাঈ চাঁপাফুল রঙের কোমর বের করে পেছনের আসনে এলিয়ে ছিলেন। শরীর খুবই বে-এক্তার। কথা জড়িয়ে যাচ্ছে।

ঘাটের কিনারায় জল ছলাত-ছলাত করছে। পশ্চিম আকাশের ঘুম ভেঙে গেছে। মরকত নীল আকাশ। বড়-বড় বিচিলির নৌকো মৃদুমন্দ দুলছে। ভোরের স্নার্থীরা কেউ জলে, কেউ ঘাটে। কেউ বলছেন হরি, কেউ রাম, কেউ তারা। সারারাত বিশ্রীভাবে জেগে থাকার ফলে, চোখ দুটো ফুলুরির মতো হয়ে আছে। এইখানে বসে থাকার ফলে, নিজের জীবনের সুরটা ধরতে পারছি। একদিকে মন্দির। মাঝে মাঝে টিং করে ঘণ্টা বাজিয়ে চলে যাচ্ছেন ভক্ত। শিবলিঙ্গের মাথায় জল ঢেলে চিৎকার করছেন কেউ, জয় বাবা বিশ্বনাথ। ঘাটের ধাপ, কাপড়ের আর পায়ের জলে ক্রমশই ভিজে উঠছে। দু'হাত দিয়ে জল ঠেলার শব্দ। ঢেউয়ের ওপর প্রথম সূর্যের আলো চিকমিক করছে। গাঁজা নেই, গান নেই, শরীর দোলানো নাচ নেই। কোনও কু-প্রস্তাব নেই। লতার শাড়ি খোলা আধ ময়লা সাদা ব্লাউজ ফাটা বুক নেই। এই পবিত্রতাই আমার জীবনের সুর। আমি ধরে ফেলেছি। এই জীবনের সুর চিরকালের জন্যে বেঁধে দিয়ে গেছেন আমার পিতা, খ্যাপা হরিশঙ্কর। নিজেকেই নিজে টাইট করে বাঁধো, নইলে ফসকে যাবে। জীবন বড় গোল, পৃথিবীর চেটো বড় সমতল। বেশি নড়াচড়া কোরো না, গড়িয়ে পড়ে যাবে।

বসে থাকতে থাকতে মনে হল বারাণসী যাবো। সেই দশাশ্বমেধ ঘাট। সেই বাড়িটা খুঁজে বের করব, যে বাড়িতে যৌবনে আমার পিতা, পিতামহের সঙ্গে কিছুকাল বাস করেছিলেন। যে-বাড়িতে বাঁদরের তাড়ায় ছাদের খাড়া সিঁড়ি বেয়ে পড়ে গিয়ে, নাকের ওপরে, কপালে অর্ধ চন্দ্রাকৃতি একটি ক্ষত চিহ্ন তৈরি হয়েছিল। যেন মহাদেবের কপালের শশাঙ্ক তিলক। প্রতিজ্ঞাটা তাহলে এই হল, রাত যাকে প্রলোভন দেখায় তাকে দিনের সুরে বাঁধতে হবে। সন্ন্যাসই তার আদর্শ। কাঁটা পেরেকের মতো ভেতরে গজগজ করছে কদিচ্ছা। রাতে কত রকম যুক্তি খাড়া করি! সকালে শঙ্কর, রাতে খৈয়াম। এমন ছেলেই

বংশের মুখে চুন-কালি মাখায়।

হঠাৎ পেছন দিক থেকে মাথার ওপর আলতো একটা হাত এসে পড়ল। চমকে ফিরে তাকালুম। গেরুয়াবসনের প্রান্ত। মুখ তুলে তাকালুম। স্বামীজী। স্বামী নির্মলানন্দ। বুকের ভেতরটা ধক্ করে উঠল। অতিশয় অপবিত্র হয়ে আছে আমার এই দেহ। স্পর্শ মাত্রই তিনি অনুভব করবেন। পড়ে ফেলবেন আমার চিন্তা। এঁদের সামনে মানুষ কাঁচ হয়ে যায়। আমি দাঁড়িয়ে উঠে প্রণাম করলুম নিচু হয়ে।

তিনি বললেন, 'কি ব্যাপার, এই সময়ে তুমি এইখানে বসে?'

প্রসন্ন স্নিগ্ধ, গম্ভীর মুখ। পরিষ্কার টকটকে গেরুয়া। একটু ইতস্তত করে বললুম, 'কাল সারাটা রাত আমি পথেই কাটিয়েছি।'

'সে কি? কেন? অ্যাডভেন্চার?'

'আজ্ঞে না, সে অনেক কথা।'

'চলো, চলো, আশ্রমে চলো।'

মহারাজ তরতর করে হাঁটাতে লাগলেন। ভীষণ দ্রুত হাঁটেন। তাল রাখা শক্ত। কাছেই আশ্রম। সকালে প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। হাঁটতে হাঁটতে চলে গিয়েছিলেন নিমতলা। শুনেছি রোজই তিনি এই পথপরিক্রমা করেন। বাগবাজারের ঘাটে অল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে ফিরে যান আশ্রমে। তিনতলার ঘরে। সেখানে সারাদিন জ্ঞান-তপস্যা। পত্রিকার সম্পাদনা।

কোনও দিকে তাকাবার অবকাশ নেই। পেছন-পেছনে চলেছি। সিঁড়ি। মহারাজ তরতর করে উঠছেন। ফর্সা পায়ের ওপর টকটকে গেরুয়া, কি সুন্দর শোভা! টেবিলের সামনে চেয়ার টেনে বসে আমাকে বললেন, 'বোসো।'

ভয়-ভয় করছে। স্বামীজীর বিশাল ব্যক্তিত্বকে আমি ভীষণ ভয় পাই। আবার ভীষণ আকর্ষণও বোধ করি। মনে হচ্ছে পাহাড়ের সামনে থম মেরে বসে আছি। স্বামীজী হাড়ের ছুরি দিয়ে একটা খামের মুখ কাটতে-কাটতে বললেন, 'আমার যতদূর মনে হচ্ছে, তোমার মুখ ধোয়া, প্রাতঃকৃত্য সবই বাকি আছে।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

স্বামীজী স্প্রিং-এর মতো চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন। এমন এনার্জি আমি একমাত্র হরিশঙ্করের ভেতরেই দেখেছি। কিছু একটা করার সময় একেবারে ছিলে-ছেঁড়া ধনুক। স্বামীজী আলমারি খুলে একটা তোয়ালে বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'আগে প্রাকৃতিক কর্ম সারো। তারপর সব কথা শোনা যাবে।'

ইতস্তত ভাব এল, 'আপনার বাথরুম, আপনার তোয়ালে!'

হাসেন যখন একেবারে ছেলেমানুষ! সে হাসি আবার কড়া সুরে বাঁধা। বললেন, 'কর্মটা একই। আশা করি পশ্চিমী পরিচ্ছন্নতাটা জানো? সেইভাবেই ব্যবহার কোরো। আর তোয়ালে? ওটা তোমার। নারী-সুলভ লজ্জা ছেড়ে পুরুষ মানুষের মতো চলে যাও। একেবারে স্নান সেরে বেরিয়ে এসো।'

১০

I do none of the things I promised I would
I listen to exculpations of every imaginable sort—

একটা মিষ্টি বাতাস বয়ে আসছে গঙ্গার দিক থেকে। ঝাঁঝালো মধুর মতো রোদে ঝলমল করছে দিন। সেগুন কাঠের ঝকঝকে টেবিল। চৌকো একটা কাঁচ পাতা রয়েছে। মহারাজ বসে আছেন চেয়ারে। চোখের সামনে পরপর তিনটি ছবি। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী। র‍্যাকে, আলমারিতে অজস্র বই। বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা-ভাষ্য, শ্রীরামকৃষ্ণ সাহিত্য, সংস্কৃত মহাভারত, রামায়ণ, আরও কত কি! মহারাজের উল্টোদিকের চেয়ারে আমি বসে আছি। স্নান করলেও একটা অস্বস্তিতে ভুগছি। জামা, কাপড়, অন্তর্বাস বদলান হয়নি।

স্বামী নির্মলানন্দজী আমার দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'যাও, নিচে গিয়ে মায়ের মন্দিরে মাকে প্রণাম করে এস। কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসবে। ছটফট করবে না। তারপর চরণামৃত নিয়ে, ওপরে আসবে।'

একটা ব্যাপার আমি লক্ষ করেছি, ধর্ম ধর্ম করি বটে, আমার ভক্তিটা কিছু কম। মহারাজের নির্দেশে সিঁড়ি দিয়ে তিনতলা থেকে দোতলায় নামছি বটে, মনে তেমন কোনও উৎসাহ নেই। বরং একটা বিরক্তির ভাব। জোর করে আমাকে লোক-দেখান বসে থাকতে হবে অন্তত পনের মিনিট চোখ উল্টে। কতই যেন ধ্যান লেগেছে! সমাধি হল বলে। চোখ বোজাতে আমার ভয় করে। যাঁকে ভাববো, তিনি আসবেন না। আবোলতাবোল নানা দৃশ্য ভেসে আসবে। অদ্ভুত অদ্ভুত সব চিন্তা দুধের মতো মনে উতলে উঠবে। অবস্থাটা হবে এইরকম, ঝোলার ভেতর থেকে বেড়ালটা বেরিয়ে আসতে চাইছে, তাকে জোর করে চেপে ধরে আছি। থলেতে জায়গায় জায়গায় ফুলে ফুলে উঠছে। না আসে চোখে জল। না জাগে মনে পুলক। বড় শুকনো লাগে। মনে হয় বসে আছি ডেন্টিস্টের চেম্বারে দাঁত তোলাবার জন্যে।

শ্বেতপাথরের ঝকঝকে মেঝে। প্রশস্ত ঘর। সামনেই কাঠের বেড়া। বেড়ার ওপাশে সিংহাসন। সিংহাসনে মায়ের বিশাল পট। সামনেই পূজার আয়োজন। ধূপের গন্ধ বাতাসে পাক মারছে। মায়ের মূর্তির দিকে চোখ পড়ার আগেই, চোখের এমনই ট্রেনিং, চলে গেল অন্যদিকে। আটকে গেল আকাশী রঙের পিঠে। চওড়া একটি পিঠ। সামনে ঝুঁকে চরণামৃত নিচ্ছে একটি মেয়ে। মুকুর বয়সী। চোখ কেড়ে নেবার মতোই চেহারা। পরনে

আকাশী রঙের ফিনফিনে শাড়ি। জিভ দিয়ে মানুষের লালা পড়ে। যদি চোখ দিয়ে পড়ত, আমার বুক ভিজে যেত। কি ভয়ঙ্কর দুর্বল আমার মন! এই মন নিয়ে তো বেশি দূর যাওয়া যাবে না! মেয়েটি চরণামৃত খেয়ে হাত ধোয়ার জন্যে উঠে গেল। আমার চোখও পায়ে পায়ে চলল লেজ তোলা বেড়ালের মতো। মনে মনে নিজেকেই নিজে ঠাস করে একটা চড় হাঁকড়ালুম। রাসকেল, চরিত্রহীন!

বসে পড়লুম একপাশে। আবার যে-সে বসা নয় একেবারে পদ্মাসনে। আসলে যার কিছু হবে না, তার বাড়াবাড়িটা তো খুব হবে। সাধে মুকু বলেছে, আমি একটা ভণ্ড। মায়ের দিকে তাকিয়ে বললুম, 'মা, আমার মন থেকে পাপটা বের করে দাও মা। ভয়ঙ্কর জ্বালাচ্ছে। দগ্ধে দগ্ধে মারছে। এ এক অদ্ভুত অসুখ মা। এর কোনও ডাক্তার নেই। আমাকে শাসন করার কেউ নেই তো, প্রাণ যা চাইছে তাই করে বেড়াচ্ছি! মা, তুমি আমার হাত ধরো।'

কষকষে করে চোখ বুজিয়ে আছি, যাতে খুলে না যায়। গায়ে একটা বাতাস লাগল। নতুন রকমের একটা গন্ধ। চোখ খুলে গেল। সেই মেয়েটি আমাকে আঁচলের বাতাস মেরে, আমারই সামনে গিয়ে বসেছে সোজা হয়ে। চওড়া কাঁধ, চওড়া পিঠ। না, আমি দেখব না। কিছুতেই দেখব না। মেয়েটি যদি ধ্যানে বসতে পারে, আমিও পারি। হেরে আমি যাব না। দাঁতে দাঁত চেপে আমি আবার চোখ বোজালুম। প্রথমেই লাঠালাঠি বেধে গেল মনে। মাকে কোথায় দেখব? ভ্রূমধ্যে, না হৃদয়ে, না মাথার ওপর সহস্রারে। ঝামেলা কি একটা! নানা মুনির নানা মত। মা আসতে চাইছিলেন, শেষে বসার জায়গা না পেয়ে, আসন না পেয়ে, ধ্যুত্ তেরিকা বলে একেবারেই বেরিয়ে গেলেন। কোনও জায়গাই খালি নেই। হৃদয়! হৃদয়ে বসে আছে মুকু। ভুরুর মাঝখানে আপাতত বসে আছে সদ্য দেখা মেয়েটি। সেখানে, তিনজনের লাঠালাঠি চলেছে, জীরাবাঈ বলছে নাচব, লতা বলছে খেলব, নীল-বসনা বলছে আমি পিঠ দেখাব, পাশ থেকে আমার ধারাল, একটু পুরুষালী মুখ দেখাব। আয় কে হারে, কে জেতে! একটাকে তাড়াই তো আর একটা এসে ঢোকে। জোর ধ্যান হচ্ছে! আমি হাল ছেড়ে বসে আছি। এ তো ভাল জ্বালা যা হোক! একবার পিটপিট করে তাকালুম। ঘরে আরও কয়েকজন একটি ফুল হাতে নিয়ে সঙ্কল্প করছেন। মেয়েটি আমার চোখের সামনে খাড়া ধ্যানস্থ। একটুও বুঝতে পারছে না, সে একই সঙ্গে ওখানেও আছে, আবার আমার মধ্যেও আছে। এর মাঝে কোথাও হরিশঙ্করকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মহারাজ আমাকে সুন্দর একটা গল্প বলেছিলেন: একজন সাধু, সর্বদা তাঁর জ্ঞানোন্মাদ অবস্থা। কারো সঙ্গেই কথাটথা বলতেন না। লোকেরা বলত, পাগল। একদিন লোকালয়ে এসেছেন। ভিক্ষে করে কিছু খাবারও জুটেছে। একটা গোদা কুকুর শুয়েছিল। পাগল বেশ জুত করে সেই কুকুরের ওপর বসে, নিজে খাচ্ছেন, কুকুরকেও খাওয়াচ্ছেন। ভিড় জমে গেল। সবাই হাসাহাসি করছে। বলছে, পাগলার কাণ্ড দেখ। সাধু তখন গম্ভীর গলায় একটি মাত্র প্রশ্ন করলেন, 'বাবা, তোমরা হাসছ কেন?' সবাই বললে 'হাসব না? হাসছি তোমার কাণ্ড দেখে।' সাধু তখন একটি শ্লোক বললেন,

বিষ্ণুপরি স্থিতো বিষ্ণুঃ
বিষ্ণু খাদতি বিষ্ণবে।
কথং হসসি রে বিষ্ণো
সর্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ॥

সেই গল্প আর শ্লোক একসঙ্গে মনে পড়ল, একটু অন্য অর্থে, অন্যভাবে। আমিও এক

উন্মাদ। তবে জ্ঞানোন্মাদ নই। জ্ঞানপাগল নই, মেয়ে পাগল। আর আমার শ্লোক হল, মুকুপরি স্থিতো লতা/ জিরা খাদতি লতবে। কথং হসসি রে মনো। সর্বং নারীময়ং জগৎ ॥

শাস্ত্র বলছেন, বিচার করবে। রমণী কেন এত রমণীয় ভাবছ ? শ্রীরামকৃষ্ণের ধমক ভেসে এল কানে, 'লজ্জা হয় না ! পশুর মতো ব্যবহার ! লাল, রক্ত, মল, মূত্র এসব ঘৃণা করে না ! যে ভগবানের পাদপদ্ম চিন্তা করে, তার পরমাসুন্দরী রমণী চিতার ভস্ম বলে বোধ হয়। যে শরীর থাকবে না, যার ভিতর কৃমি, ক্লেদ, শ্লেষ্মা, যত প্রকার অপবিত্র জিনিস। সেই শরীর নিয়ে আনন্দ ! লজ্জা হয় না !'

বুকের ভেতরটা চাপা আগ্নেয়গিরির মতো গুম গুম করে উঠল। পিঠ দেখছি পিঠ। পিঠে কি আছে ? কিছুই নেই। মন তুমি বিচার করো। পিঠ হল যে কোনও মানুষের শরীরের একটা অংশ। মেয়েদের পিঠ চওড়া। বেশ একটা ভর-ভর্তি শোভা আছে। এর বেশি তো কিছু নয়। পিঠ তো আর পীঠস্থান নয়। এইবার পিঠের উল্টোদিক, মানে পিঠের অপর পিঠ। সেখানে ? মন একটু থমকে গেল। বিচার কতক্ষণ চলত কে জানে ? আর সেই বিচারে মন কতটা সরে আসত না আরও ঢুকে যেত, তাই বা কে জানে ? হঠাৎ একটা চাপা কান্নায় চোখ খুলতে হল। মেয়েটি কাঁদছে। মনে, মনে খুব লজ্জা পেলুম। পৃথিবীতে কত মানুষ কত দুঃখ নিয়ে ফিরছে। তার কোনও খবরই আমি রাখি না। আমি কেবল আমার তালেই ঘুরছি। মনে মনে সম্ভোগ করছি। মানুষের মন না দেখে দেহটাই দেখছি। আরে ছিঃ ছিঃ। মাথায় আঙুলের স্পর্শ। মহারাজ আমার পেছনে। ইশারা করলেন, উঠে পড়ার।

মহারাজের ঘরে, আর একটা ছোট টেবিলে খাদ্য অপেক্ষা করছে। চা ধোঁয়া ছাড়ছে ফুসফুস। মহারাজ প্রশ্ন করলেন, 'ধ্যান তাহলে বেশ ভালই জমেছিল ?'

ঠোঁটের কোণে যেন সামান্য মুচকি হাসি। ইস্পাতের মতো ধারালো, কঠিন চেহারা। অন্তর্ভেদী চোখ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিস্ট্রির ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। সব ছেড়ে সন্ন্যাসী। ধনজন বিত্ত মান। এক মহান সন্ন্যাসীর সংস্পর্শে জীবন ঘুরে গেল সংসার থেকে সন্ন্যাসে। সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী। বিজ্ঞানের মানুষ সংস্কৃতে কেমন করে এমন সুপণ্ডিত হলেন ! আসলে ব্রহ্মচারীর পক্ষে সবই সম্ভব। পিতা হরিশঙ্কর বারে বারে আমাকে বলতেন, শিশ্নবান হও। সমস্ত সাফল্যের চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে ওইখানে।

সহসা হ্যাঁ বলতে পারলুম না। আমার সত্য-মিথ্যা জ্ঞান অতিশয় কম। কথায়, কথায় মিথ্যা ঢুকিয়ে দিই। একবারও মনে হয় না, ছি ছি, মিথ্যা বললুম। স্বামীজীর ক্ষুরধার চোখের দিকে তাকাবার সাহস হচ্ছে না। ধরা পড়ে যাবো।

স্বামীজী বললেন, 'নাও জলখাবার খেয়ে নাও। চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। চা অবশ্য বেশি গরম খাওয়া উচিত নয়।'

ভীষণ লজ্জা করছে। অপরিসীম একটা অস্বস্তি। আমার জন্যে কেউ কিছু করলে, খাতির করলে ভীষণ কুঁকড়ে যাই। দুঃখ, বঞ্চনা, তিরস্কার, অপমান এইসবই আমার খাদ্য। পেটে সয় ভাল। আমার জন্যে কেউ কিছু করবে কেন ? মাথা নিচু করে, যে ভাবে মেয়েরা অনেকের সামনে খায়, আমি সেইভাবে খেতে শুরু করলুম।

স্বামীজী তখন অন্য প্রসঙ্গে। বলছেন, 'ধ্যানে বসলেই মন ছটফট করবে। মনের ধর্মই সেটা। স্বামীজী বলছেন, ধ্যানে বসলে, মনে যে-সব নিচু চিন্তা ঠেলে ঠেলে ওঠে, সে-সবই হল আমাদের পূর্ব জন্মের সংস্কার। মনের সঙ্গে লড়াই করে লাভ নেই। আলগা ছেড়ে দাও। দেখো কি করে ! একটা চিন্তা এল। অনুসরণ করো। দেখ কোথায় যায়। কত দূর

যায় ! তারপরেই ফুটবলের মতো লাথি মেরে পাঠিয়ে দাও মাঠের বাইরে। আবার একটা চিন্তা আসবে ; কারণ মন কখনও খালি থাকে না। সেটাকেও ওই ভাবে লাথি মেরে বের করে দাও। এই ভাবে একদিন তোমার চিন্তাশূন্য অবস্থা আসবে। জান তো, যোগ দু'রকমের—কর্মযোগ আর মনোযোগ। যাক, সে সব কথা পরে। অযাচিত কারোকে জ্ঞান দিতে নেই। জ্ঞানের মূল্য কমে যায়। একমাত্র প্রার্থীকেই দিতে হয়। তোমার চোখ বলছে, তোমার মনের অবস্থা ভাল নয়। তোমার এই বয়সটা বড় সাংঘাতিক ! আবার কোন বয়সটাই বা সাংঘাতিক নয় ! আবার সাংঘাতিকের সংজ্ঞাটাই বা কি ! যে যার জীবন বেছে নেয়। যে যার ঘর বেছে নেয়।' আমার খাওয়া শেষ। প্লেট, কাপ-ডিশ নিয়ে বিব্রত। এমনি রাখব, না ধুয়ে রাখতে হবে ! এখানে নিয়ম-কানুন খুব সাংঘাতিক।

আমার বিব্রত অবস্থা দেখে স্বামীজী বললেন, 'যাও, ছাদের একপাশে রেখে দাও। হাত ধুয়ে এসো।'

'ধুয়ে রাখব না'

'তোমাকে ওসব কিছুই করতে হবে না। নিজেকে অত অচ্ছুৎ ভাবছ কেন ? তোমার মধ্যে বিশ্রী একটা মেয়েলী ভাব আছে। ওটাকে চেষ্টা করে তাড়াও তো। এফিমিনেসি।'

অভিমানে বড় লাগল। ভাল ভেবে যা করতে যাই, সঙ্গে সঙ্গে একটা ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসি। এই আমার বরাত। যেখানে যা কিছু করতে যাব। পিতা হরিশঙ্করকে ভাল ভেবেই সাবধান করতে গেলুম, একজন পরস্ত্রী, সদ্য বিধবা, যুবতী, একই বাড়িতে একসঙ্গে থাকলে আপনারই নিন্দা হবে। হবে কেন হয়ে বসে আছে। আমার নিজের কত বড় একটা ত্যাগ। মহিলার সঙ্গে কাকিমা-সম্পর্কের আড়ালে আমারই আর একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। পিতা ভুল বুঝলেন। রেগে নিরুদ্দেশ। পৃথিবী জুড়ে 'উল্টো বুঝলি রামেদের' রাজত্ব।

ছাতের একপাশে একটা কল। কলের তলায় সব রেখে চলে এলুম। মহারাজ বললেন, 'এইবার বলো তোমার কি সমস্যা হয়েছে ?'

'কয়েকদিন আগে বলা নেই কওয়া নেই আমার বাবা বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন শেষ রাতে।'

'কোথায় গেছেন বা যেতে পারেন বলে তোমার অনুমান ?'

'আমি সম্পূর্ণ অন্ধকারে। আমাদের আত্মীয়-স্বজন এমন কেউ নেই যেখানে তিনি যেতে পারেন। বন্ধুবান্ধব দু' একজন থাকলেও তিনি যাবেন না ; কারণ তাঁর নেচারটাই একটু অন্য ধরনের।'

'তোমার মুখেই শুনেছি, ভেরি আপরাইট। তেজস্বী পুরুষ। তুমি কি অ্যাকসান নিয়েছ ?'

'আমি শুধু ভাবছি।'

'বাঃ, বাঃ, আর পথে পথে ঘুরছ, আর মানুষের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছ। বাঃ ! সাবাশ বাঙালি !'

'আমি কি করব বলুন। থানায় ডায়েরি করলে তাঁকে ছোট করা হয়।'

মহারাজ টেবিলের দিকে তাকিয়ে সামান্য সময় ভাবলেন। মুখ তুলে বললেন, 'কথাটা তুমি ঠিকই বলেছ। একজন শিক্ষিত, বিচারশীল, বিবেকসম্পন্ন মানুষ যা করেন ভেবেচিন্তে, পূর্বপরিকল্পনা মতোই করেন। এ তো খেয়ালের ঘর ছাড়া নয়। এ একধরনের বাণপ্রস্থ।'

মহারাজের কথা বন্ধ হয়ে গেল। ঘরে সেই মেয়েটি ঢুকছে। নিচে মায়ের ঘরে যার দিকে তাকিয়ে আমার ধ্যান মাথায় উঠেছিল। চোখ দু'টো ছলছলে হয়ে আছে। ইরানী ছুরির

মতো চোখ। ভীষণ ধার। এইরকম একটা পূত সংস্পর্শে বসেও মন প্রজাপতি হয়ে গেল। এ একেবারে অন্য রকমের, অন্য ধারার মেয়ে। লম্বা, ছিপছিপে, চাবুকের মতো চেহারা। কাঁধ, বুক, পিঠ পুরুষের মতো চওড়া। অ্যাথলিটদের এইরকম চেহারা হয়। চলনে-বলনে কোনও জড়তা নেই। আমার লজ্জা, আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

মহারাজ বললেন, 'এসো, এসো, সুরঞ্জনা এসো। কেমন আছো তোমরা ?'

মেয়েটি নিচু হয়ে প্রণাম করল। প্রণাম করতে করতেই বললে, 'ভাল আছি মহারাজ।'

'কোনও খবর পেলে ?'

'নাঃ, কোনও খবর নেই।'

'আশ্চর্য ব্যাপার। একটা জ্বলজ্যান্ত ছেলে স্রেফ উবে গেল !'

'সবাই বলছে খুন করে ফেলে দিয়েছে।' মেয়েটির চোখে জল এসে গেল। কান্নার কোনও শব্দ নেই। কুলকুল করে জল গড়িয়ে চলেছে দু' গাল বেয়ে।

মহারাজ বললেন, একেবারে একস্ট্রিমটা ভাবছ কেন ? হঠাৎ খুনই বা করতে যাবে কে !'

'আপনি তো জানেন, আমার বাবার অনেক শত্রু আছে। তাদেরই কেউ চরম প্রতিশোধটা নিয়ে নিলে। পুলিশ তো তিন মাস ধরে হন্যে হয়ে খুঁজেও কিছু করতে পারলে না।'

মেয়েটি একেবারে আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। আমার অস্তিত্বটাই যেন সে ভুলে গেছে। শাড়ির আঁচল কখনও আমার মুখে, কখনও মাথায়। শরীরের উত্তাপ, ঘ্রাণ সবই আমার অনুভূতিতে। মুঠোয় ধরা যায় এমন কোমর ঠিক আমার ডান কনুইয়ের পাশে। একবার আড়চোখে তাকিয়েছিলুম, দৃষ্টি সোজা গিয়ে ঠেকল নাভীতে। একে আমি পেটরোগা প্রেমিক। যাকে দেখছি তারই প্রেমে পড়ে যাচ্ছি, তারই বরাতে এই গেরো। উঠে যেতেও পারছি না। মহারাজ ভাববেন, মনে পাপ পুষছে, বাইরে পুণ্যের ভেক। আমার তো স্ত্রী-পুরুষ জ্ঞান থাকা উচিত নয়। আমি তো ভাল ছেলে ! ধর্মে মতি, দ্বিজে ভক্তি, মহা গুণবান।

মহারাজই বাঁচালেন। বললেন, 'বোসো মা সুরঞ্জনা !'

আমি আমার বাঁ পাশের চেয়ারে নিজেকে তুলে বসালুম। সুরঞ্জনা আমার চেয়ারে বসল। গা থেকে মিষ্টি একটা গন্ধ বেরোচ্ছে। শাড়িটা সিল্কের। হাতে একটা সোনার বালা ঝিলিক মারছে। বিশাল বড়লোকের মেয়ে। কোনও সন্দেহ নেই। চেহারায় এক শো ভাগ আর্য।

মহারাজ আমাকে বললেন, 'বুঝলে পলাশ, অনেকটা তোমার মতোই কেস। তোমার বাবা, এর দাদা। বোম্বাইতে ট্রেনে চেপেছিল এইটুকু নিশ্চিত খবর, তারপর সবই অনিশ্চিত।'

সুরঞ্জনা যেন ব্যথার ব্যথী পেল। আমার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বললে, 'আপনার বাবা !'

মুখটাকে করুণ থেকে করুণতম করে বললুম, 'কয়েক দিন হল আমার বাবা হারিয়ে গেছেন।'

মহারাজ বললেন, 'হারিয়ে গেছেন বোলো না, বলো নিরুদ্দেশ হয়েছেন।'

সুরঞ্জনা বললে, 'আপনি কি করছেন ?'

মহারাজ উত্তর দিলেন, 'কিছুই তেমন করা যাচ্ছে না। তিনি একজন নামী মানুষ, পণ্ডিত মানুষ, বিচক্ষণ মানুষ, স্বেচ্ছায় গৃহত্যাগ করেছেন, অনেকটা হঠাৎ বাণপ্রস্থের মতো, এ-ক্ষেত্রে থানা-পুলিশ, কাগজে বিজ্ঞাপন করা মানেই তাঁকে হেয় করা। ঘটনাটা মেনে নিতে হবে। সইয়ে নিতে হবে। এইরকম হয়। হঠাৎ বৈরাগ্য এসে যায়। অনেকে পরবর্তীকালে

এইভাবেই মহাপুরুষ হয়েছেন। আমাদের হিমালয় এক বিস্ময়কর, মায়াবী স্থান। মানুষকে ঘর থেকে ঘুম ভাঙিয়ে তুলে নিয়ে যায়। এই জন্যেই ভারত এক মহাপীঠস্থান, পুণ্যভূমি, পরমযোগের স্থান।'

সুরঞ্জনার বাঁ কনুইটা আমার ডান কনুইয়ে ঠেকে আছে। পুলক, শিহরণ সবই চলেছে যুগপৎ। আমি একটা ঘোরের মধ্যে চলে গেছি। মনে হচ্ছে খুব কারেন্ট আছে। অনেকের শরীরে এইরকম থাকে। শুদ্ধ সত্তা হলে এমন হয়। আমি শুনেছি, আজ অভিজ্ঞতা হল।

সুরঞ্জনা আবার আমার দিকে তাকাল। মনে হয় আমার করুণ মুখ দেখে তার করুণা হয়েছে। তার মুখও খুব করুণ গম্ভীর। এত কাছ থেকে এমন একটা ধারালো মুখ দেখলে শরীর কেমন করে। মনে নেমে আসে আরব্য রজনীর রাত। বাগদাদের বাজারে ঘুরছি। দেয়ালে দেয়ালে মশাল জ্বলছে। ছোট ছোট কুপিতে আলো। থরেথরে সাজানো বেদানা, আঙুর, খেজুর, কিসমিস, আখরোট, খরমুজ, খুবানি। হঠাৎ সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে বোরখাপরা সুন্দরী। আমি তার পায়ের গোড়ালি দেখতে পাচ্ছি। বোরখার ঝালর তুলে এক নজর যেই তাকাল মনে হল, ছুরি চালিয়ে দিলে বুকে আমার। মনে হয়, শীতের রাতে একই আলোয়ানের তলায় আমরা দু'জনে। আমি আর সে। বসে আছি যমুনার তীরে। শীত শীত পূর্ণিমা রাত। দূর থেকে ভেসে আসছে ঠুংরির চরণ। এইসব মনে হয় আমার। এ একটা অসুখ। দুরারোগ্য ব্যাধি। মাঝে মাঝে মনে হয় কোনও এক জন্মে আমি নবাব ছিলুম। এই অসুখের মনে হয় একটাই ওষুধ, বেধড়ক ধোলাই।

সুরঞ্জনা বললে, 'আপনি আমার বাবাকে একবার বলে দেখতে পারেন। উনি তো ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি কমিশনার। ভেতরে ভেতরে অনুসন্ধান চালিয়ে একটা কিছু করতে পারেন, যা আপনার বাবার পক্ষে অসম্মানজনক হবে না।'

আমি একটু কুঁচকে গেলুম। পুলিস অফিসারের মেয়ে। কোনও চালাকি চলবে না। আমি হ্যাঁ না কিছুই না বলে একটু সরে বসলুম। গায়ে গা না লেগে যায়। সুরঞ্জনা মহারাজকে বললে, 'অনুগ্রহ করে আমাদের বাড়িতে আজ একবার যাবেন। বাবা বিশেষ করে অনুরোধ করেছেন। আপনি না গেলে আমার মাকে সামলান যাচ্ছে না। আমি গাড়ি এনেছি।'

মহারাজ কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, 'তোমার বাবা আমার সহপাঠী ছিলেন। বন্ধুর অনুরোধ তো রাখতেই হবে। পলাশ তুমিও চলো আমার সঙ্গে। কোনও কাজ নেই তো!'

'আজ্ঞে না।'

'তোমার অফিস?'

'সেখানেও গোলমাল মহারাজ।'

'তোমার গ্রহ খুব বেঁকেছে পলাশ।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। বিদিগিচ্ছিরি সময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছি।'

'ঠাকুরকে ডাকো। জীবনের কাছ থেকে বাঁচার শিক্ষা নাও। আচ্ছা, তোমরা দু'জনে ছাদে যাও। আমি তৈরি হয়েই নি।'

ছাদের আলসের ধারে গিয়ে দাঁড়ালুম দু'জনে। চারপাশে গিজিগিজি বাড়ি। বাগবাজার যে কত ঘিঞ্জি এই ছাদে দাঁড়ালেই জানা যায়। আমার থেকে হাত দুয়েক দূরে দাঁড়িয়ে আছে সুরঞ্জনা। একটু পুরুষালী চেহারা; কিন্তু কি ভয়ঙ্কর আকর্ষণ! ভীষণ মন খারাপ হচ্ছে, ঈশ্বরলাভের সাধনা না করে এই মেয়েটিকে জীবনে পাওয়ার সাধনাই তো ভাল। কোনও পাহাড়ে, নিরালা কোনও নদীর ধারে, ঢেউ ভাঙা সমুদ্রের কিনারায় দু'জনে পাশাপাশি বসে

থাকা। গিরিশ গেয়েছিলেন, 'জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই। কোথা হতে আসি কোথা ভেসে যাই।' যেখান থেকে আসি আর যেখানেই ভেসে যাই, এসেছি, এইটাই বড় কথা। এমন সুন্দর পৃথিবী! নদী, পর্বত, সমুদ্র, বনানী, সুন্দরী রমণী, ঘুরন্ত ঘাঘরা, দুরন্ত নিতম্ব, চপল চরণ। গঙ্গার মৃদু বাতাসে সুরঞ্জনার দু'এক গুছি চুল কপালে এসে কাঁপছে। সুরঞ্জনার কণ্ঠস্বর অনেকটা বেগম আখতারের মতো। একটু ঘষাঘষা। তার ফলে আরও আকর্ষণীয়।

সুরঞ্জনা প্রশ্ন করলে, 'আপনি কি ছাত্র?'

'না, আমি একজন কেমিস্ট।'

'বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন, কোন কলেজে?'

'স্কটিশে। আপনি?'

'আমি এখনও ছাত্রী। বিজ্ঞানেরই। এ-বছর আমার ফাইনাল। পড়াশোনা তেমন কিছুই হচ্ছে না।'

'এই ঘটনাটার জন্যে?'

'হ্যাঁ। দাদার কি যে হল! অমন একটা ছেলে! গতবছর শিবপুর থেকে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বেরলো। সাংঘাতিক ভাল ছাত্র। তেমনি খেলাধুলোয়। দাদাই তো আমাকে পড়াত। আমার চেয়ে ঠিক দু'বছরের বড় ছিল। একেবারে বন্ধুর মতো। বড় একা হয়ে গেছি। বাড়িতে যতক্ষণ থাকি কেবল দাদার কথা মনে পড়ে। সব জায়গায় দাদার স্মৃতি। জানেন তো, আমার গভীর বিশ্বাস, এর পেছনে বাজে একটা মেয়ে আছে। ফেরোসাস। একই সঙ্গে গোটাদশেক ছেলেকে খেলাচ্ছে। এই নিয়ে এক বছর বাড়িতে খুব অশান্তি হচ্ছিল। দাদাও একটু অন্যরকম হয়ে যাচ্ছিল। মা আর বাবাকে চড়া চড়া কথা শোনাত। আপনিও আমার দাদার বয়সী। আপনার সঙ্গে আমার দাদার চেহারার ভীষণ মিল। ঠাকুরঘরে আপনাকে দেখে চমকে উঠেছিলুম। আপনাদের এই বয়েসটা খুব সাংঘাতিক।'

মনে মনে ভাবলুম, 'সে আর বলতে।'

সুরঞ্জনা বলতে লাগল, 'আমরা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত। দাদাকে কত চেষ্টা করেছি, এই পথে আনতে। হেসে উড়িয়ে দিত। বলত ও-সব বুড়ো বয়সে হবে, যখন শরীর ঝুলে যাবে, দাঁত পড়ে যাবে। মহারাজের কাছে একবার এনে ফেলতে পারলে, এই অবস্থা হত না।'

মনে মনে ভাবলুম, 'কিছুই কি হত! আমার কি কিছু হয়েছে! ভেতরে ঠিকই সে নড়ছে। সে আমার প্রবৃত্তি। যে-প্রবৃত্তিতে সুরঞ্জনার পাশে দাঁড়িয়ে থাকাটা স্বর্গসুখের মতো মনে হচ্ছে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের একদিন কথায় কথায় বলছিলেন, 'মনে করলেই ত্যাগ করা যায় না। প্রারব্ধ, সংস্কার—এ-সব আবার আছে। একজন রাজাকে একজন যোগী বললে, তুমি আমার কাছে বসে থেকে ভগবানের চিন্তা কর। রাজা বললে, সে বড় হবে না; আমি থাকতে পারি; কিন্তু আমার এখনও ভোগ আছে। এ-বনে যদি থাকি, হয়তো বনেতে একটা রাজ্য হয়ে যাবে। আমার এখনও ভোগ আছে।'

সেই ভোগ আমারও মনে হয় আছে। আমার এই ভোগের প্রবৃত্তি কোথা থেকে এল? উড়ে তো আর আসেনি। এসেছে জন্মসূত্রে। কার রক্তের ধারায় প্রচ্ছন্ন ছিল এই প্রবৃত্তি। পিতার? মাতামহের? একটু সত্য কথা, একটু মনের কথা সাহস করে কেউ বলবেন কি? একটা স্বীকারোক্তি! পিতা কেন বারে বারে সাবধান করতেন, 'দেখো, তোমার মাতুল বংশের দিকে যেয়ো না। অনেক ভাইস।'

মহারাজ বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। অপূর্ব দেখাচ্ছে। নিপাট, টকটকে গেরুয়া। কাঁধে ভাঁজ করা চাদর। মাথায় গেরুয়া টুপি, চোখে সোনার চশমা। বেরিয়ে এসেই বললেন, 'চলো-চলো। সময় খুব কম।'

সাদা রঙের গাড়ি। মহারাজই ঠিক করে দিলেন, কি ভাবে বসা হবে। পেছনের আসনে, একধারে মহারাজ, আর একধারে সুরঞ্জনা। মাঝখানে আমি। কামিনীর স্পর্শ থেকে সন্ন্যাসীকে দূরে রাখার দায়িত্ব আমার। আমার বাঁদিকে, আমারই পা ছুঁয়ে সিল্ক-ঢাকা মসৃণ জঙ্ঘা। তার ওপর লম্বা লম্বা আঙুল। অনামিকায় জ্বল-জ্বল করছে আঙটির বেদানার দানার মতো পাথর। মসৃণ কাঁধে ছুঁয়ে আছে আমার কাঁধ।

১১

As certain as stars at night.
Ordawn after darkness.
Inherent as the lift of the blowing grass
whatever your despair or your frustration
This too, will pass.

আমার অবস্থা কিঞ্চিৎ শোচনীয়। একপাশে সুরঞ্জনা, আর একপাশে মহারাজ। একপাশে সন্ন্যাস, অপর পাশে সংসার। মহারাজের দিকে চাপতে পারছি না। সঙ্কোচ হচ্ছে। ভাববেন, আমাকে একেবারে ঠেসে ধরছে। সুরঞ্জনার স্পর্শ বাঁচাবার চেষ্টাও করতে হচ্ছে। ভাববে, সুযোগ নিচ্ছে। সিল্ক জড়ানো ওই শরীরের স্পর্শ যে কি সাংঘাতিক, তা আমার বয়সী একটি ছেলেই কেবল জানে! বাতাস ছুটে আসছে উল্টো দিক থেকে। কাঁধের আঁচল মাঝে মাঝে অবাধ্য হয়ে আমার ঘাড়ে সুড়সুড়ি দিয়ে যাচ্ছে। দু'এক গুছি চুল খেলে যাচ্ছে বাঁ গাল ছুঁয়ে। কোনও ভাবেই বাঁ দিকে তাকাতে পারছি না। সিল্ক বড় অবাধ্য। জুতসই হয়ে বুকের ওপর থাকতে জানে না। বাঁ দিকে ঘাড় ঘোরালেই সুরঞ্জনা সচেতন হয়ে একটু চাপাচুপি দেবার জন্যে ব্যস্ত হচ্ছে। আমার বাঁ পাশে বড় অশান্তি। মহারাজ ভাবস্থ। তাঁর ধারণাই নেই, এক আঙুল তফাতে জীবনের কোন চোরা স্রোত বইছে। যতটা সম্ভব ছোট হয়ে বসে থাকার চেষ্টা করছি আমি। একেই বলে ছোট হওয়ার সাধনা। দেহের অবস্থা, আমার মনেরই মতো। ত্যাগ আর ভোগের মাঝখানে কুঁকড়ে বসে আছি। নিজের মনেই হাসছে জ্ঞানপাপী। স্বামী বিবেকানন্দের কথা মনে পড়ছে। অনেকে মনে করে, মেয়েমানুষ না দেখলেই হল। মেয়েমানুষ দেখে ঘাড় নিচু করলে কি হবে? যতক্ষণ আমার কাম, ততক্ষণই স্ত্রীলোক, তা না হলে স্ত্রী-পুরুষ ভেদ-বোধ থাকে না। শিশুদের তো নারী-পুরুষ ভেদ থাকে না। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের কোথা থেকে কি একটা বেরিয়ে আসে, আর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় বাঘের খেলা।

মহারাজ নির্দেশ দিলেন, গাড়ি যেন কলেজ স্ট্রিট ধরে যায়। কলেজ স্ট্রিটের আলাদা একটা আভিজাত্য আছে। গাড়ি সেই মতোই চলেছে। সুরঞ্জনা মৃদু গলায় কথা শুরু করল, 'অঙ্ক আপনার কেমন আসে?'

'খুব একটা খারাপ নয়।'

'বাবা তো অর্থনীতির। দাদা আমাকে অঙ্কটা দেখিয়ে দিত। ডিফারেনসিয়াল ক্যালকুলাসটা আমার একেবারে মাথায় ঢোকে না। বেশি না, সপ্তাহে একদিন আমাকে দেখিয়ে দেবেন?'

'কেন দেব না? আজ আমার বাবা থাকলে আপনার কোনও ভাবনাই থাকত না। তাঁর

মতো অঙ্কে পাণ্ডিত্য, শুধু অঙ্ক কেন, সব শাস্ত্রে, আমি খুব কম দেখেছি। আমাকে একেবারে নিঃস্ব করে দিয়ে চলে গেলেন।'

এইবার আমার কান্না আসছে। বুকের ভেতরটা মথিত করছে অপরিসীম এক নিঃসঙ্গতা। শেষ প্রিয়জনকে হারাবার বেদনা। হঠাৎ সুরঞ্জনা আমার হাতে হাত রাখল। আমার শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল। একেই বলে নারী!

সুরঞ্জনা বললে, 'আপনার আর আমার একই দুঃখ। কি আর করা যাবে বলুন!'

মৃত্যু যেমন সকলকে সমান করে, ডেথ দি ইকোয়ালাইজার, দুঃখও সেই রকম। সুরঞ্জনার মুখে এইরকম একটা কথা শুনে ভারি ভাল লাগল। মনের দিক থেকে এরই মধ্যে কতটা কাছে সরে এসেছে আমার। এই মুহূর্তে ঈশ্বরে বিশ্বাস ফিরে আসছে। তিনিই সব করান। আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে দেখতে আমি পাইনি/ বাহির-পানে চোখ মেলেছি, আমার হৃদয় পানে চাইনি ॥/ আমার সকল ভালোবাসায় সকল আঘাত সকল আশায়/ তুমি ছিলে আমার কাছে/ তোমার কাছে যাইনি ॥

সুরঞ্জনা ডান হাত দিয়ে আমার বাঁ হাতটা ধরে রেখেছিল। অনেক ইতস্তত করে মহারাজের দিকে একবার আড় চোখে তাকিয়ে আমার ডান হাতটা তার হাতের ওপর রাখলুম। মনে হল, জীবনটা যদি এই রকমেরই একটা নিশ্চিন্ত চলা হত! প্রথম অনুভূতি নিয়ে। পাশ দিয়ে বিপরীতে ছুটবে জগৎ জীবন। আমরা নিশ্চেষ্ট। 'ঘাটে বসে আছি আনমনা, যেতেছে বহিয়া সুসময়।'

সুসময় যে কত সহজে কত দুঃসময় হয়ে যেতে পারে আমার বোধবুদ্ধিতে ছিল না। সেই গানটার মতো, 'যাচ্ছ তুমি হেসে হেসে কাঁদতে হবে অবশেষে।' ঠিক মিরজাপুরের কাছে এসে গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল। পুলিস হাত তুলেছে। বাঁ দিকে তাকিয়েই শরীর হিম হয়ে গেল। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আছে মুকু। পাছে চোখাচুখি হয়ে যায়। আমি চোখ বুজিয়ে ফেলেছি। খট্ করে বাঁ দিকের দরজাটা খুলে গেল। একটা হাত আমার বুকের কাছের জামাটা খামচে ধরেছে। আমার চোখ খুলে গেল। মুকুর রুদ্রাণী মূর্তি, 'নেমে এস শয়তান। নেমে এস।' মুকু জামা ধরে হিড়হিড় করে টানছে। সুরঞ্জনা ভয়ে সিঁটিয়ে আছে। মুকুর শরীরের বেশ কিছুটা সুরঞ্জনার শরীর ছুঁয়ে গাড়ির ভেতর ঢুকে এসেছে। মুকুর রঙ যেন ফসফরাসের মতো জ্বলছে। মুকু আর একবার ঝাঁকানি মেরে বললে, 'নেমে এস শয়তান।'

পেছনের সব গাড়ি আটকে গেছে। ভ্যাঁ ভোঁ, প্যাঁ পোঁ হর্ন। মহারাজ যথেষ্ট বিরক্তির গলায় বললেন, 'নাটক না করে এখনি নেমে যাও। রাস্তার মাঝখানে এ কি অসভ্যতা! আমার একটা মানসম্মান নেই। ছিঃ ছিঃ, তুমি তো মহা বদ ছেলে!'

সুরঞ্জনার হাঁটু ছেঁচে কোনও রকমে রাস্তায় গিয়ে পড়লুম। ভালভাবে দাঁড়াবারও অবকাশ মিলল না মুকুর প্রবল আকর্ষণে প্রায় টলে পড়ে যাই আর কি! এরই মাঝে সশব্দে দরজা বন্ধ হল, গাড়ি চলে গেল। এইবার মুকু আর আমি মুখোমুখি। মুকু দু'হাতে আমার বুকে চাপড় মারতে মারতে ক্রমান্বয়ে বলে চলেছে, 'শয়তান, শয়তান, বলো কোথায় ছিলে, কোথায় ছিলে সারা রাত!'

মুকু জানে না কলকাতার মানুষ কি সাংঘাতিক কৌতূহলী! চারপাশে লোক জড়ো হয়ে গেছে। সবাই ভাবছে, কি না কি হয়ে গেছে! আমিও বুঝে উঠতে পারছি না, ব্যাপারটা কি। মুকু হস্টেলে ছিল। মুকু ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছিল, এইটুকু বুঝে নিতে অসুবিধে হল না; কিন্তু তারপর। ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন বলে উঠল, 'এই তো চাই। মেয়েরা না জাগলে বাঁদররা শায়েস্তা হবে না। জুতো, জুতো, জুতো লাগাও, জুতো।'

মুকু হঠাৎ ভিড়ের দিকে তাকিয়ে বৈদ্যুতিক করাত দিয়ে কাঠ কাটার গলায় বললে, 'মজা দেখছেন, খুব মজা ! যান এখান থেকে।'

ভিড় একটু থমকে গেল। মুকু বীরাঙ্গনার মতো আমার হাত ধরে টানতে টানতে কলেজ স্কোয়ারে ঢুকে পড়ল। এত জোরে টানছে, আমি সামলাতে পারছি না। মনে হচ্ছে, টাল খেয়ে পড়ে যাব। পায়ে পা বেধে যাচ্ছে। ভিড়ের কে একজন বলে উঠল, 'এ অন্য কেস, অন্য কেস।' কানে আর একটা মন্তব্য এল, 'বিয়ে করব বলে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল, আজ একেবারে ক্যাচ, কট, কট। বাছা ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখনি !'

লজ্জায়, অপমানে আমার চোখে জল এসে গেছে। সবচেয়ে প্রিয়জন, সকলের চোখের সামনে এই ভাবে অপমান করতে পারে ! এ তো প্রকাশ্য রাজপথে জামাকাপড় খুলে নেওয়ার মতো। মহারাজের শেষ কথা ছুঁচের মতো মর্মে বিঁধেছে, 'নামিয়ে দাও, নামিয়ে দাও।' যেন আমি তাঁর পাশে বসে কোনও অপকর্ম করে ফেলেছি।

মুকু টানতে টানতে আমাকে একটা নিরালায় নিয়ে এল। গাছের আড়ালে। সরোবরের জল আলোয় টলটল করছে। মুকু আমার বুকে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে উঠল, 'তুমি আমাকে ফেলে কাল সারারাত কোথায় ছিলে ? কোথায় ছিলে তুমি এতক্ষণ ! তুমি কোথায় যাচ্ছিলে !' আমার জামাটা খামচে ধরে আছে। সেটা ছাড়েনি।

যেখানে দাঁড়িয়েছিলুম সেইখানেই বসে পড়লুম ময়দার তালের মতো। প্রথমে মুকুর ওপরে রেগে আগুন হয়েছিলুম, এ কেমন ধারা অসভ্যতা ! মহারাজের সামনে, সুরঞ্জনার সামনে, রাস্তার কিছু উটকো লোকের সামনে একেবারে বে-ইজ্জত ! তার মুখ, চোখে জল, ভয়ঙ্কর একটা আবেগ দেখে রাগের ভাবটা চলে গেল। এইবার অবাক হবার পালা। মুকু জানল কি করে, সারা রাত আমি বাড়িতে নেই।

মুকু আমার সামনে বসেছে বাবু হয়ে। কোলের ওপর অলস ভঙ্গিতে পড়ে আছে ফর্সা ফর্সা নিটোল দুটো হাত। শিশু কান্না থেমে যাবার পর যে-ভাবে ফোঁপায় সেইভাবে থেকে থেকে ফুলে উঠছে। মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকাচ্ছে। দু'চোখে আকাশ। কোনও কথা বলতে পারছে না। দীঘির জলে গোটাকতক ছেলে খুব ঝাঁপাই ঝুড়ছে।

অবশেষে আমাকেই জিজ্ঞেস করতে হল, 'তোমার হঠাৎ কি হল ! সকলের সামনে এইরকম একটা বিশ্রী কাণ্ড করলে ! লোকে তো আমাকে কচুরি ধোলাই দিত আর একটু হলে !'

মুকু মুখ ফিরিয়ে রইল। এতক্ষণ যে এত সরব ছিল, প্রায় বাঘিনীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিল শিকারের ওপর, সে এখন শিথিল, নির্বাক। আমি বললুম, 'বলবে তো, কি হয়েছে ? তুমি সেই হস্টেলে ঢুকলে আর বেরলে না। আমি প্রায় দু'ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে চলে এলুম।'

মুকু এইবার সরাসরি আমার দিকে তাকাল। চোখ দুটো জ্বলছে। আবার রাগ আসছে। মুকু দাঁতে দাঁত চেপে বললে, 'তুমি রাতে বাড়ি ফিরেছিলে ?'

'না।'

'কোথায় ছিলে তুমি ? বলো মিথ্যে বলো। অম্লান বদনে বলো, টিপের বাড়িতে ছিলুম।'

'তা বলব কেন ? কাল আমার অনেক খোয়াড় গেছে। আমি সারা রাত পথেই ছিলুম।'

'আবার মিথ্যে কথা ! তাই তোমার এই তেল চুকচুকে চেহারা ! বাহারী টেরি ! একটা মেয়ের হাত ধরে গদগদ হয়ে, নতুন একটা গাড়ি চেপে কোথায় যাচ্ছিলে লীলা করতে ?'

'আমার ওপাশে মহারাজ ছিলেন, সেটা তোমার চোখে পড়েছিল !'

'তোমাকে আমার চিনতে বাকি নেই। তুমি ওরই মধ্যে তোমার কাজ সেরে নিতে পার। তোমার অসীম ক্ষমতা। সেই ক্ষমতার পরিচয় আমি অনেকবার পেয়েছি!'

এইবার আমার ভয়ঙ্কর রাগ এল। অকারণে মেয়েটা আমাকে তড়পাচ্ছে। অপরাধ করল নিজে, দোষ দিচ্ছে আমাকে। 'অফেনস ইজ দি বেস্ট ডিফেনস। সেই টেকনিক। আমি একটু ঝাঁঝের গলায় বললুম, 'চিরকালের জন্যে তুমি আমাকে মহারাজের চোখে ছোট করে দিলে। আমার আশ্রমে যাওয়ার পথ বন্ধ হয়ে গেল।'

'তোমার মতো চরিত্র আশ্রম-টাশ্রমে যত কম যায় ধর্মের পক্ষে ততই ভাল।'

'কেন বলো তো! আমার ওপর তোমার অত রাগ কেন?'

'রাত ন'টার সময় আমি তোমাদের বাড়িতে গিয়েছিলুম।'

'সে কি? কি করে?'

'যেভাবে সবাই যায়। বাসে করে।'

'তোমাকে তো পুলিসে ধরেছিল!'

'কোন অপরাধে? আমি চোর না ডাকাত!'

'তাহলে তোমাদের হস্টেলের সামনে পুলিশের গাড়ি ছিল কেন?'

'হস্টেলে একটা বড় রকমের চুরি হয়েছে। পুলিস এসেছিল অনুসন্ধানে।'

'তা তুমি আমাকে দু'ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রাখলে কেন?'

'জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হবে, সুপারিনটেন্ডেন্টকে বলব, অনুমতি নোবো, তারপর তো আসব!'

'সেই কথাটা আমাকে জানাতে কি হয়েছিল?'

'নিশ্চয় কোনও কারণ ছিল।'

'তাহলে আমার অপরাধটা কোথায়?'

'তোমার অপরাধ? তুমি একটা দায়িত্বজ্ঞানহীন স্বার্থপর। তোমার জন্যে আমাকে ট্যাকসি করে পড়ি কি মরি ছুটতে হয়েছে; কারণ তা না হলে তুমি বাড়ি ঢুকতে পারতে না।'

'কেন?'

'বাড়ির চাবিটা কার কাছে?'

সত্যিই তো চাবিটা কার কাছে? সে-খেয়াল তো আমার হয়নি। মুকু বলতে লাগল, 'হস্টেলে প্রথমে আমাকে একটা মুচলেকা লিখে দিতে হল। আমি আমার দায়িত্বে হস্টেল ছেড়ে আমার মেসোমশাইয়ের বাড়িতে যাচ্ছি। রাত ন'টার সময় ওই ভয়ঙ্কর ভৌতিক বাড়ির দরজা খুলে অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে দোতলায় উঠলুম। হঠাৎ সমস্ত বাড়ির আলো ফিউজ হয়ে গেল। না আছে একটা দেশলাই, না আছে একটা হ্যারিকেন। কোনওকিছুই হাতের কাছে নেই। তোমার বাবাও গেছেন, ঘরের লক্ষ্মীও চলে গেছেন। না আছে হাতের কাছে একটা টর্চ। এদিকে যাই তো চেয়ারের সঙ্গে ধাক্কা, ওদিকে যাই তো টেবিলের সঙ্গে ধাক্কা। উত্তরের বারান্দায় ধপাস করে কি একটা পড়ল। ভাগ্যিস ম্যাও করে ডাকল।'

'তুমি রান্নাঘরে গেলে না কেন? ছাতের সিঁড়িতেই তো হ্যারিকেন, তেলের বোতল সবই ছিল।'

'তোমাকে আর উপদেশ দিতে হবে না। তোমাদের বাড়ির ওই দিকটায় যেতে আলো থাকলেও বুক কাঁপে তো অন্ধকারে! তাও আমি গেলুম। উঁচু উঁচু চৌকাঠ। এখানে বালতি, ওখানে মগ। ঘুটঘুটে অন্ধকার। সিমসিম করছে গাছপালা। যাও বা একটা দেশলাই

পেলুম, কাঠি নেই। তোলা উনুনের ঝিকে লেগে শাড়ির তলাটা ফেঁসে গেল। বেড়ালটা ওঁত পেতে বসে আছে। অন্ধকারে চোখ দুটো ধক্‌ধক্ করছে। আবার হাতড়াতে হাতড়াতে ফিরে এলুম। একটা ছুঁচো উঠে এসেছিল নিচে থেকে। চিঁক চ্যাঁক করে পায়ের ওপর দিয়ে ছুটে পালাল। আমার অবস্থাটা তুমি একবার ভাবো! ঠোক্কর খেতে খেতে নেমে এলুম নিচে। তালা লাগালুম। দুটো ছেলে দাঁড়িয়েছিল। আমাকে বেরোতে দেখে এক কলি গান বেরলো। আমি গ্রাহ্য করলুম না। সোজা বিষ্টুদার দোকানে। দোকান ছেড়ে সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমার সঙ্গে চলে এলেন। দেশলাই আর মোমবাতি নিয়ে। সেই অন্ধকারে তিনি ফিউজ পাল্টে দিলেন। আলো আবার জ্বলে উঠল। বিষ্টুদা বললেন, একা তুমি থাকবে কেন, চলো আমাদের বাড়িতে। আমি বললুম, দেখি, এইবার হয় তো ফিরবে। দশটা তো বাজল। বিষ্টুদা বললেন, তোমার ভয় করবে না! বললুম, করলেও উপায় নেই। বিষ্টুদা চলে গেলেন। ওই ফাঁকা বাড়িতে আমি একা বসে আছি। দশটা বাজল, এগারটা বাজল। তোমার পাত্তা নেই। বিষ্টুদা আবার এলেন টিপকে নিয়ে। তোমার জন্যে আমাদের সে কি দুর্ভাবনা! কি হল, আসছে না কেন? কোনও অ্যাকসিডেন্ট হল! সারাটা রাত আমরা তিনজনে জেগে বসে রইলুম। তোমার একবারও মনে হল না, বাড়ি ফিরে দেখি সেখানে কি হচ্ছে! সারাটা রাত তুমি আঘাটায় ফুর্তি করলে। দশটা বাজল, সকাল দশটা। তখনও তোমার পাত্তা নেই। শেষে ধ্যাত তেরিকা, বলে বেরিয়ে পড়লুম। চাবিটা রেখে এলুম বিষ্টুদার কাছে। এইবার বলো, তোমাকে কি করা উচিত! ফুল, বেলপাতা দিয়ে পুজো! সারা রাত তুমি ছিলে কোথায়! ওই মেয়েটা কে যাকে জাপটে ধরে বসেছিলে?'

'তুমি এখানে কি করছিলে?'

'ইউনিভার্সিটির সামনে লোকে কি করে!'

'তুমি আমাকে ওইভাবে টেনে-হিঁচড়ে নামালে কেন? এতে কার সম্মান বাড়ল? তোমার না আমার? মহারাজ কি ভাবলেন? আর আমি কোনও দিন ওঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারবো?'

'আমি তো সেইটাই চাই, যাতে তুমি দাঁড়াতে না পারো, যাতে তুমি ধর্মের ভণ্ডামি ছেড়ে কর্মে আসতে পারো।'

'তোমার ধর্মের ওপর এত রাগ কেন মুকু?'

'ধর্মের ওপর রাগ নয়, রাগ তোমার ধর্মের ওপর। তুমি হলে কলির কেষ্ট। যেখানে যাচ্ছ সেইখানেই নববৃন্দাবন লীলা। তোমার গুণের তো ঘাট নেই!'

এইবার আমার কাহিনীটা একটু শুনবে?'

'কি হবে শুনে? নব্বই ভাগ মিথ্যে, দশ ভাগ হয় তো সত্য।'

এরপর আর কারো সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করে না। যে যার নিজেরটাকেই বড় করে দেখে। এমন একটা মেয়ের সঙ্গে জীবন গাঁথার চেয়ে, কোনওক্রমে সরে পড়াই ভাল। মনে হচ্ছে, মাথার অসুখ আছে। সংসারে থাকলে, যেখানেই থাকি ক্যাঁক করে ধরবে। গোখরোর কামড়। সন্ন্যাসীই হতে হবে। তবে স্বামী নির্মলানন্দজীর কাছে গেলে, তিনি আমাকে দূর করে দেবেন। তিনি মুকুকে চেনেন না। মুকুর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক তাও জানেন না। বোঝাতে গেলেও শুনতে চাইবেন না।

মুকু আবার জিজ্ঞেস করলে, 'মেয়েটা কে?'

আমি একটু রাগের গলাতেই বললুম, 'তোমার কি মনে হয়?'

'ওটি তোমার কত নম্বর?'

'তোমার এত সন্দেহ কেন মুকু ?'

'মেয়েরা সহজে নিজের অধিকার ছাড়তে চায় না।'

'তুমি কিছুই না জেনে সন্দেহ করছ কেন ? এটা খুবই খারাপ। নিজেকে ছোট করছ। মেয়েটির নাম সুরঞ্জনা। আজই পরিচয় মহারাজের আশ্রমে। সুরঞ্জনার বাবা পুলিসের বড় কর্তা। মহারাজকে নিয়ে আমরা সুরঞ্জনার বাড়িতেই যাচ্ছিলুম। ওঁদের খুব বিপদ। মাঝখান থেকে তুমি এই অসভ্যতা করলে।'

'আমি দেখিয়ে দিলুম, তুমি কার ? আমার চোখের সামনে দিয়ে তোমাকে নিয়ে যাবে ! তাও ওইভাবে ? একেবারে গদগদ যেন মোহনভোগ। কোলের ওপর হাত নিয়ে কি করছিলে ? ইকির মিকির-চাম-চিকির খেলা করছিলে ? তুমি নিমেষে অত দূর এগোও কি করে ?'

হেসে ফেললুম, 'আমার মনে কোনও পাপ নেই বলে। আমার ভেতরের শিশুটাকে আমি কখনও বড় হতে দিই না। সেই কারণেই সবাই আমার সঙ্গে সহজ হতে পারে। যেমন তুমি আমাকে সব সময় বকো। যেন, আমি তোমার ছেলে।'

'তুমি তো এক এক সময় আমার ছেলেই। কাল সারাটা রাত দু'চোখের পাতা এক করতে দাওনি।'

'কাল সারা রাত আমিও জেগেছিলুম মুকু। খালধারের মশা আমার বোতল বোতল রক্ত শুষেছে।'

আমাদের সামনে একটা ছায়া পড়ল। ছায়ার পেছন পেছন এক মহিলা এসে দাঁড়ালেন। বুকের কাছে তোয়ালে জড়ানো কি একটা ধরে আছেন। মহিলার বয়স বেশি নয়। মুকুর বয়সীই হবেন। চেহারায় একটু অযত্নের ছাপ। চোখের কোণে কালি পড়েছে। পরপর অনেকদিন রাত জাগলে যেমন হয়। শাড়িটা কিন্তু যথেষ্ট দামী। মহিলা মুকুকে বললেন, 'ভাই, আমার এই বাচ্চাটাকে একটু ধরবেন। এই পাঁচ দশ মিনিটের জন্যে। আমি একটা কাজ সেরে আসব, এই কাছাকাছিই। আর চাপতে পারছি না।'

মুকু স্পষ্ট জবাব দিল, 'সম্ভব নয়।'

মহিলা একটু থতমত খেয়ে গেলেন। আমার কেমন মায়া হল। উদাসী চৈত্রের মতো চেহারা। আমি মুকুকে বললুম, 'ধরো না একটু। কি হয়েছে ! বলো তো, আমি ধরছি।'

মুকু আমাকে এক ধমক লাগাল, 'চুপ করো।' মহিলার দিকে মুখ তুলে বললে, 'আপনি অন্য কোথাও দেখুন, আমরা উঠে যাচ্ছি।'

মুকু উঠে পড়ে বললে, 'চলো, চলো। আমার ক্লাস আছে।'

মহিলা অদ্ভুত একটা দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিছুটা এসে মুকু আমাকে বললে, 'তুমি সত্যিই একটা ছাগল। জগতের কিছুই বোঝো না !'

'কেন, এইরকম কেন বলছ ?'

'ওই বাচ্চাটাকে সারা জীবন তুমি ধরতে পারবে ?'

'তার মানে ? মহিলার বড় অথবা ছোট যে কোনও একটা বাইরে পেয়েছে।'

'তোমার মাথা। ছাগল একটা। এই বুদ্ধি নিয়ে সংসারে চলা যায় ! এমনও তো হতে পারে, ও ওই বাচ্চাটাকে কায়দা করে গছাতে চাইছে। অবৈধ সন্তান, অথবা মানুষ করার সঙ্গতি নেই।'

'তোমার কল্পনার দৌড় আছে মুকু। ভদ্রমহিলাকে দেখে তোমার কি সেইরকম মনে হল !'

'সেইরকমই মনে হল। তোমার চোখ থাকলে তুমিও বুঝতে পারতে। চোখের কোলে এক পোঁছ কালি। অসংযমীর জীবন। আর জানবে, মেয়েরা যখন সাধারণ অবস্থায় সিল্কের শাড়ি পরে, তখন শেষ অবস্থা। সবই তার গেছে।'

'তাই হবে। মেয়েরাই মেয়েদের বেশি বুঝবে। মুকু, আমার এখনও কিছু খাওয়া হয়নি।'

'খাওয়া আমারও হয়নি। চলো, কোথাও খেয়ে নি।'

'আমার পকেটে আছে একটি মাত্র টাকা।'

'একটা কেন? কাল তো অনেক টাকা ছিল। কোথায় ওড়ালে?

'ওড়াইনি, পকেট মেরে দিয়েছে।'

'বাঃ, খুব ভাল। সংসারে শনি লেগেছে। আমার কাছে কিছু টাকা আছে। দু'জনের খাওয়া হয়ে যাবে, কিন্তু খাবো না। বাইরে খাওয়া শরীরের পক্ষে ভাল হবে না, পয়সারও শ্রাদ্ধ। চলো, বাড়ি যাই, গিয়ে রান্না করি। এখন থেকে আমাদের বুঝেসুঝে চলতে হবে। কত গেল?'

'তা শ'তিনেক হবে।'

'তুমি কোন ভাবে ছিলে? কার ধ্যান করছিলে?'

'মা কালীর। ঠনঠনের কালী-মন্দিরে মায়ের আরতি হচ্ছিল। বিভোর হয়ে দেখছিলুম। আরতি শেষ হল। চোখ বুজিয়ে মাকে হৃদকমলে দেখার চেষ্টা করছিলুম। চোখ খুললুম, ট্রামে উঠলুম, ভাড়া দিতে গেলুম, পকেট ফাঁকা। ট্রামের কন্ডাক্টর একটা টাকা দিলেন।'

'যে-মা তোমার পকেট সামলাতে পারেন না, সেই মাকে ডেকে কি লাভ! বুঝতেই পারছ, একালে দেব-দেবীর কোনও ক্ষমতা নেই। অকারণ সময় নষ্ট।'

মুকুর সঙ্গে আমার আর তর্কযুদ্ধে যাবার ইচ্ছা হল না। তাহলে আমি বলতে পারতুম, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়, 'কি জানো, যার যা কর্মের ভোগ আছে তা তার করতে হয়। সংস্কার, প্রারব্ধ এ-সব মানতে হয়।' বলতে ইচ্ছা করল না। এখনি হয় তো বলবে, 'রাখো তোমার শ্রীরামকৃষ্ণ।' মগের দেশের মেয়ে। ঠাকুরের কথা খুব বলতে ইচ্ছে করছিল, 'সুখ-দুঃখ দেহধারণের ধর্ম। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে আছে যে কালুবীর জেলে গিছিল ; তার বুকে পাষাণ দিয়ে রেখেছিল। কিন্তু কালুবীর ভগবতীর বরপুত্র। দেহধারণ করলেই সুখ-দুঃখ ভোগ আছে। শ্রীমন্ত বড় ভক্ত। আর তার মা খুল্লনাকে ভগবতী কত ভালবাসতেন। সেই শ্রীমন্তের কত বিপদ। মশানে কাটতে নিয়ে গিছিল। একজন কাঠুরে পরমভক্ত, ভগবতীর দর্শন পেলে। তিনি কত ভালবাসলেন, কত কৃপা করলেন। কিন্তু তার কাঠুরের কাজ আর ঘুচল না। সেই কাঠ কেটে আবার খেতে হবে। কারাগারে চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী ভগবান দেবকীর দর্শন হল। কিন্তু কারাগার ঘুচল না।' এইসব আমি বলে একটা তর্ক জুড়ে দিতে পারতুম। মনে হল, কি হবে। যার যার বিশ্বাস, তার তার বিশ্বাস। এখন তোমার বয়স কম, তায় আবার সুন্দরী। রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে, এমন কেউ নেই যে না ফিরে তাকাবে। এইমাত্র একজন সাইকেল চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেল। নিজের দেমাকেই মটমট করছে। তোমার সমর্পণ আসে কি করে? তবে এ-কথা ঠিক, সাঙ্ঘাতিক তেজী মেয়ে। অন্য অনেক গুণ আছে।

ভয়ে ভয়ে বললুম, 'মুকু, বাড়ি গিয়ে রাঁধতে রাঁধতে বিকেল হয়ে যাবে। পেট জ্বলছে। দশ পয়সা, কি দু আনার ছোলাভাজা কিনব?'

'ছোলাভাজা ফুটো হয়, দাঁড়াও বাদামভাজা কিনি।'

'ফুটো হয় মানে ?'

'মানে একশোটা ছোলার পঞ্চাশটাই পোকা ধরা। কোনওটাই নিরামিষ নয় আমিষ।'

মুকুর বাদামভাজা কেনা শুরু হল। জীবনে এমন দেখিনি। প্রথমেই দর হল। তারপর দরাদরি। দরে যদিও বা পোষাল, মুকু বললে, 'বেছে নোবো। বাদামঅলা বললে, 'বাদাম কি বাছা যায় দিদি ?'

'খুব যায়। চালুনিতে ফেলে নাড়ো। বড়গুলো ওপরে চলে আসবে।'

তাই হল। বাদামঅলা ওজন করতে যাচ্ছিল। মুকু বললে, 'দাঁড়াও আগে খোসা ছাড়াই।'

'আগে ওজন করে খোসা ছাড়িয়ে দোবো দিদি।'

'আজ্ঞে না। ওজন বেড়ে যাবে। আর তুমি ফুঁ দেবে কি! সে-বাদাম আমি খাব' কেন ?'

বাদামঅলা হাঁ হয়ে গেল। এমন খদ্দের সে জীবনে দেখেনি।

১২

মা গো অত আদর, অত স্নেহ সব করিলি মাটি।
চোখ রাঙিয়ে করলে শাসন, হতাম আমি খাঁটি ॥

দূর থেকে দেখছি, বাড়ির সামনে রকের ওপর এক মহিলা বসে আছেন উদাস হয়ে। পাশে একটা ছোট টিনের সুটকেস। কোলে একটা পুটলি। কে ? এ আবার কে ? এইবার ঈশ্বর কোন খেলা খেলতে চাইছেন ! একেবারে চিনতে পারছি না। জীবনে কখনও দেখেছি বলেও মনে হচ্ছে না। আমি আর মুকু একটু আগু-পিছু হন হন করে হাঁটছিলুম। মুকুর গতি শ্লথ হল। জিজ্ঞেস করলে, 'কে বলো তো ?'

'ওই একই প্রশ্ন আমারও।'

'অন্য কোনও বাড়ির নয় তো ! কিংবা বিশ্রাম নিচ্ছেন অনাথ কোনও মহিলা !'

'আমার তা মনে হয় না। আমাদের বাড়িতেই এসেছেন। মুকু চলো পালিয়ে যাই। আমার লোকজন ভাল লাগছে না, মনের এই অবস্থায়।'

'বাঃ ! অসাধারণ ! কোনও তুলনা হয় না তোমার ! অসহায় এক মহিলাকে পথের ধারে বসিয়ে রেখে তুমি সরে পড়তে চাইছ ? অনেক স্বার্থপর দেখেছি, তোমার মতো স্বার্থপর খুব কম দেখা যায়। আমি তোমার দলে নেই।'

মুকু এইবার আমাকে পেরিয়ে চলে গেল। হাঁটার গতি হয়ে গেল দ্বিগুণ। বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই মধ্য বয়সী সেই মহিলা উঠে দাঁড়ালেন। কোথায় যেন এই পরিবারের মুখের সঙ্গে মিল আছে। পরে আছেন নরুন পাড় ধুতি। মুখটা কৃশ হলেও একটা আকর্ষণ আছে। চোখ দুটো অসাধারণ জ্বলজ্বলে। মহিলা লম্বার দিকেই।

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এইটাই কি হরিশঙ্করবাবুর বাড়ি ?'

হাতের মুঠোয় বহুকাল আগের একটা পোস্টকার্ড। দোক্তাপাতার মতো মুচমুচে হয়ে গেছে। অতি সাবধানে ধরে রেখেছিলেন সেটিকে।

বললুম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তোমরা কি তাঁর ছেলে, মেয়ে ?'

'আমি ছেলে। এ আমার মাসির মেয়ে।'

'তোমার মায়ের তো কোনও বোন ছিল না !'

আমার খুব রাগ হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল বলি, অত কথার কি আছে ? কোনও রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললুম, 'আমার মেজ জ্যাঠাইমার বোন ছিলেন।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। মনে পড়েছে। তাঁরা তো রেঙ্গুনে ছিলেন। আমি ছবি দেখেছি। তা আমি কে, নিশ্চয় চিনতে পারনি ?'

'আজ্ঞে না।'

'আমি তোমার বড় জ্যাঠামশাইয়ের বড় মেয়ে। তোমার যখন বছর তিনেক বয়স, তখন তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন।'

'আত্মহত্যা করবেন কেন ? তিনি দোতলার বারান্দা থেকে পড়ে গিয়েছিলেন।'

'আমার কাছে সত্য ঘটনা শুনে রাখো, এক বদ মেয়েছেলে তাঁকে ওষুধ খাইয়ে পাগল করে দিয়েছিল। সেই অবস্থায় তিনি একদিন লাফ মেরেছিলেন।'

মুকু বললে, 'রাস্তায় দাঁড়িয়ে এইসব কথা না বলে ভেতরে চলুন না।'

তালা খুলছি, মহিলা বললেন, 'ছোট কাকা কোথায় ?'

'কিছুদিনের জন্যে বাইরে গেছেন।'

আমরা একে একে ঢুকে পড়লুম। মহিলা ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে চলেছেন। বুকের কাছে দু'হাতে ধরে আছেন সেই পুটলি। মুকুর হাতে সুটকেস। মুকুর এই একটা গুণ, নিমেষে মানুষকে অধিকার করে ফেলতে পারে। সে এমন অধিকার যেন শিশুর আঁকড়ে ধরা পুতুল। কিছুতেই আর ছাড়িয়ে নেওয়া যাবে না নিজেকে।

মহিলা ওপরের বারান্দায় এসে বললেন, 'আমি তাহলে সম্পর্কে তোমাদের কে হলুম বলো তো ? দিদি।'

মুকু বললে, 'হ্যাঁ, তাই তো হলেন। দিদি।'

'তোমার নামটি কি ভাই ! ভারি মিষ্টি মেয়ে।'

মনে মনে হাসলুম, একটা ঘণ্টা যেতে দিন, তখন যেন আবার মন্তব্য বদল না হয় !

মুকু বললে, 'আমাকে আপনি মুকু বলেই ডাকবেন।'

'বাঃ, ছোট সুন্দর নাম। আমার ভায়ের নামটাও আমি ভুলে গেছি।'

আমাকে বলতে হল না, মুকুই বললে, 'পিন্টু।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, পিন্টু।'

মুকু সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করলে, 'দিদি, আপনার নাম ?'

'আমার নাম পাঁচী।'

মুকু থমকে গেল, এই রকম নাম হয় নাকি ! আমাদের দিদিটি আবার মেঝেতে বসতে যাচ্ছিলেন, মুকু হাঁ হাঁ করে উঠল, 'মেঝেতে নয়, মেঝেতে নয়। চেয়ারে, চেয়ারে।'

'মাটির মানুষ মাটিতেই বসি বোন, আমাকে অত খাতির কোরো না। আমি অত খাতিরের নই। আমাকে একটা ঝিয়ের বেশি সম্মান দেবার প্রয়োজন নেই। যা প্রথম থেকে পেয়ে আসছি তাই যেন পাই শেষে।'

'পাকা পাকা কথা না বলে এই চেয়ারটায় বসুন।'

মুকু এইবার বেরোচ্ছে। মুকু থেকে মুকু বেরোচ্ছে। খোল থেকে শামুক বেরনোর মতো। হাত ধরে বসিয়ে দিল চেয়ারে। বসিয়ে দিয়ে বললে, 'ঠিক ঠিক নামটা বলুন তো !'

দিদি একটু ঘাবড়েছেন। ইতস্তত করে বললেন, 'সে নাম শুনলে তোমরা অট্টহাসবে। তবু বলি, অপরাজিতা। সবেতেই যে পরাজিত, তার নাম অপরাজিতা !'

'আপনি সেই থেকে হাতে কি একটা পাঁপড়ভাজা ধরে আছেন ?'

'ও হ্যাঁ। এটা একটা পোস্টকার্ড। সেই কোন কালে আমার কাকা লিখেছিলেন মাকে। বিজয়ার নমস্কার। আমার মাকে, মানে তোমাদের বড় জ্যাঠাইমাকে তো কেউ দেখতে

পারতেন না। আর কেনই বা পারবে ! অহঙ্কারে, দেমাকে মটমট করছেন। রূপের অহঙ্কার, জমিদার বাপের টাকার অহঙ্কার। আমার বাবাকে তো তোমরা দেখনি। আমারও তেমন মনে নেই। মহাদেবের মতো দেখতে ছিলেন।'

বললুম, 'শুনেছি। ব্যায়াম আর কুস্তির ভক্ত ছিলেন। বিশাল শরীর ছিল। বাদাম আর সিদ্ধির সরবত খেতেন কাশীর পালোয়ানদের মতো।'

'ওই সিদ্ধি আর পালোয়ানীই তো কাল হল। কাকার মুখে শোননি ?'

'বাবা, অতীতের কোনও কথাই বলতেন না।'

'এই কারণেই। তোমার বড় জ্যাঠামশাই আর জ্যাঠাইমা, এই পরিবারের অতীতের মুখে আলকাতরা মাখিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। অতীত তো ওইটাই। ধ্বংসের অতীত।'

মুকু বললে, 'পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ কি দিদি ! অতীত কবরে আছে কবরেই থাক। এখন কাজের কথায় আসুন, এতদিন পরে আপনি কেন এলেন ? কি কারণে ? ভুলে যখন ছিলেন, ভুলে থাকতেই তো পারতেন।'

মুকুর সত্যি মুখের কোনও আঁট নেই। কতবার শুনেছে, অপ্রিয় সত্য বলতে নেই। মহিলাকে অপ্রস্তুত করা।

দিদি কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলেন। দৃষ্টি কোন উদাসে। শ্যামলা মেয়েটির শরীরে এখনও সৌন্দর্য ছড়িয়ে আছে। তপঃক্লিষ্ট এক সাধিকার মতো। চোখ দুটো ভারি সুন্দর। তাকিয়ে আছেন। হঠাৎ জল নামল। এক বিন্দু, দু' বিন্দু। নিঃশব্দে গড়িয়ে চলেছে গালের ওপর দিয়ে। এত খারাপ লাগছে ! মুকুর স্বভাবই হল খোঁচা মারা।

দিদি আঁচলে চোখ মুছে বললেন, 'যার কেহ নাই, তুমি আছ তার। যে-মানুষটির কাছে আমি ছুটে এসেছি, তিনি হলেন গিরি গোবর্ধনধারী। বুঝতেই তো পারছ বোন, আমি নিরাশ্রয়। মনে করো, আমি তোমাদের একজন কাজের লোক। চব্বিশঘণ্টার ঝি। আমি খুব ভাল রাঁধতে পারি। বাসন মাজতে পারি ঝকঝকে করে। ঝাঁট দিতে পারি পরিষ্কার করে, কোনও কিছুর তলায় ধুলো না জমিয়ে। দাগ না ফেলে মেঝে মুছতে পারি। বড়ি দিতে পারি, গুল দিতে পারি। আচার তৈরি করতে পারি। সেলাই জানি, রিফু জানি। সামান্য ছাঁটকাঁট জানি। সবার ওপরে রোগীর সেবায় আমাকে কেউ হারাতে পারবে না। টানা তিন বছর আমার মা, টানা দু'বছর আমার স্বামী বিছানায় পড়েছিলেন। আমি ঘৃণাকে জয় করেছি, জয় করেছি নিদ্রা। আমার আহার হল পাখির আহার। আমি যে কোনও জায়গায় ঘুমোতে পারি। যে কোনও অপমান সহ্য করতে পারি। একটু হয়তো জল বেরোবে চোখে। বুক ফাটবে তবু মুখ ফুটবে না। আমি বঙ্গরমণী। ঝ্যাঁটা, জুতো আর লাথি জন্ম থেকেই খাচ্ছি। বেঁচে আছি শুধু মরতে পারিনি বলে। আমি বঙ্গরমণী।' এইবার মুকুর পালা। হরিণের মতো চোখ। মা দুর্গার মতো মুখ। জল। পৃথিবীর যেমন তিন ভাগ জল, মেয়েদেরও সেইরকম তিন ভাগ জল, এক ভাগ খিলখিল হাসি। মুকুর জলের ফোঁটা অনেক বড়। দিদির হল মিহিদানা, মুকুর হল বড় দানা।

মুকু দিদির কাঁধ দুটো ধরে বললে, 'আমি ক্ষমা চাইছি। আমার রাগ হয়েছিল, আপনি আমাদের চেনেন না বলে। কেন চেনেন না। নিকট আত্মীয়দের আপনারা কেন কোনও খবর রাখেন না ! জানেন না এটা স্বার্থপরতা, এ ভাল নয়। আত্মীয়দের আজ প্রয়োজন না হলেও কাল প্রয়োজন হতে পারে। মানুষের এই ভুলে থাকায় আমার রাগ হয়েছিল ; যদিও এই ভয়ঙ্কর দোষ এই পরিবারেরও আছে। এরাও কারো খোঁজখবর রাখে না।'

'না বোন, এদের দোষ নেই দোষ আমাদের। বাবা মারা যাবার পর, মা শ্রাদ্ধ শেষ হওয়া

পর্যন্ত অপেক্ষা করল না। আমাদের দু'বোনকে নিয়ে অহঙ্কারে মটমট করতে করতে বাপের বাড়ি চলে এল। মেজকাকা, ছোটকাকা সম্পর্ক রাখার বহু চেষ্টা করেছিলেন।শেষে হাল ছেড়ে দিলেন। তার সাক্ষী এই চিঠি। এইটাই ছিল ছোটকাকার শেষ চিঠি। এ-যেন সম্পর্কের শেষ খেয়া। পড়ে দেখতে পারো। এখনও পড়া যায়।'

চিঠিটা সাবধানে হাতে নিলুম। কালো কালির লেখা, বাদামি হয়ে গেছে। আমার বাবার কতকাল আগের হাতের লেখা। বাবা লিখছেন,

পূজনীয়া বড় বৌদি,

এদিক থেকে এইটাই হবে শেষ চিঠি। তোমাকে বার বার অনুরোধ করা হল, নিজের সংসারে ফিরে এস। তুমি এলে না। প্রতিটি চিঠির বিলম্বিতউত্তরে তুমি আমার বড়দা, আমাদের পরিবারকে অকথ্য গালাগালই দিয়ে গেলে। একবারও বোঝার চেষ্টা করলে না, তোমারই অহঙ্কারে বড়দা ছিটকে গেলেন পরিবারের বাইরে। পড়তি জমিদারের অহঙ্কারের চেহারাটা কেমন জানো, ভিজে কাঠের আগুনের মতো। আগুন নেই শুধু ধোঁয়া। সেই ধোঁয়ায় তুমি আচ্ছন্ন। নিজেকেই নিজে দেখতে পাচ্ছ না। আমাদের পরিবার আপাতত রমণীশূন্য। তুমি যদি আমাদের পাশে এসে দাঁড়াতে, সংসারজীবনের পুরো স্বাদটা পেতে। তুমি কি খুব সুখে আছ! সুখের সন্ধানে পালিয়ে গিয়ে তুমি মহাদুঃখেই আছ। নিজের অহঙ্কারের জন্যে ভুল সংশোধন করতে পারছ না। আমার অবস্থা, ঝড়ের সমুদ্রে ফুটো জাহাজের ক্যাপ্টেনের মতো। কখনও পাম্প চালিয়ে জল ছেঁচছি, কখনও স্টিয়ারিং ধরে টালমাটাল সামলাচ্ছি। দু'দুটো বউ পরপর চলে গেল। সবচেয়ে আদরের ছোট বোন কাপড় শুকোতে দিতে গিয়ে ছাতের আলসে ভেঙে পড়ে মারা গেল। আমরা দু' ভাই একটা শিশু এই তিনটি প্রদীপ টিং টিং করে জ্বলছে। এখনও সময় আছে। এসে তোমার কর্তৃত্বের আসনে বোসো। বড়দাকে এইভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিও না। ভাইঝি দুটোকে লেখাপড়া শেখাই। ভালঘরে বিয়ে দি। সংসারে একটা পূর্ণতা আসুক। বিষয়সম্পত্তিতেও তোমার একটা অংশ আছে। তারও একটা ব্যবস্থা হওয়া দরকার। আর অধিক কি? প্রণাম নিও। ইতি,

চিঠি পড়া শেষ করে মুকুকে বললুম, 'একটা খাম দাও। চিঠিটা যত্ন করে রাখা উচিত।'

দিদি বললে, 'নিজের মা যে ছেলেমেয়ের কত সর্বনাশ করতে পারে আমার মা-ই তার উদাহরণ। বুড়ো নায়েবের পরামর্শে দুম করে আমার বিয়ে দিয়ে দিলে এক আধবুড়ো অকর্মণ্যের সঙ্গে। সে তো বিয়ে নয়, আমার কাশীবাস। সাতটা বছর বেঁচে ছিল শুধু কেসে কেসে। তখন আমার ভরা যৌবন। সেই জ্ঞানপাপী বুড়ো কেবল বলে, এ বউ তো আগুন, আমার তো তেমন ঘি নেই। শ্বাস নিত যখন মনে হত বাঁখারির খাঁচা। সব কটা পাঁজর ঠেলে ঠেলে উঠত। তার আবার একটা বখা ভাগনে ছিল। নাম তার পল্টন। মাঝেমাঝে অন্ধকারে আমাকে জড়িয়ে ধরত। মুখে ধেনোর গন্ধ। কানের কাছে মুখ এনে বলত, মামা বিয়ে করেছিল, আমার জন্যে। মামা তোমাকে ভাত-কাপড় দেবে, আমি তোমাকে আনন্দ দেবো। তুমি আমার ঘরের মুরগী। একদিন বেশ করে ঝ্যাঁটা-পেটা করলুম। কর্তা আমাকে চেলা কাঠ পেটা করলে। বললে, জানিস না, ভাগনে শব্দের অর্থ? ভাগ নে। পেটে যদি আসেই, তার জন্যে তো আমি আছি। আর যেন কোনও বেচাল না দেখি। বাঙলার বধূ, ত্যাগের জন্যে জন্মায়, ছাত পেটাই হবার জন্যে জন্মায়। সর্বংসহা শব্দটা কি অ্যায়সি এসেছে! সেই রাতেই ভাগনে বোতল বগলে মাইফেলে এল, গাইতে গাইতে, মামি নাচবে খেমটা নাচ। মামা ধরবে পোঁ।। তার পরের দুটো লাইন আমি বলতে পারব না তোমাদের।

আমি পেছনের দরজা দিয়ে, মাঠময়দান ভেঙে চম্পট। প্রথমে এক গির্জায় গিয়ে ফাদারের কাছে আশ্রয় নিলুম। তিনি আমার খুব করেছিলেন। পড়িয়েছিলেন, নার্সিং শিখিয়েছিলেন। বলেছিলেন, হিন্দুদের হাত থেকে যদি বাঁচতে চাও খ্রীশ্চান হও। গ্রামে রটে গেল, অপরাজিতা কুলত্যাগ করেছে। কুলটা। বুড়ো বরে শানালো না, তাই বেশ্যা হয়ে ঘর ছেড়েছে। তাকে যে বোতল বাবাজী খাবলাতে এসেছিল, সেই কথাটা কেউ একবারওমুখে আনলে না। শয়তান পুরুষ মানুষগুলো আর কত হাজার বছর ধরে যে আমাদের ছিঁড়ে খাবে! এই শয়তানদের ছেলে-মেয়েকে আমাদের গর্ভে ধারণ করতে হয়। পৃথিবীতে ভগবান আসবেন কি করে? শয়তানদের ছেলেরা তো শয়তানই হবে!'

লক্ষ করছি, মুকুর ফর্সা মুখ ক্রমশই লাল হয়ে উঠছে। গোলাপের মতো।

মুকু বললে, 'আপনি এই সংসারে আপনার মর্যাদায় থাকবেন। এত সব কাণ্ড যখন হচ্ছে, তখন আপনার ছোট কাকাকে কেন জানালেন না? তাঁর মতোমানুষ এক কথায় সব টিট করে দিতেন।'

'আমি তো তখন কিছুই জানতুম না বোন। আমার তখন উথালপাথাল অবস্থা। লম্পটের শিকার ফসকেছে। হায়নার মতো আমাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে।'

'কেন, এই সব লোকের জন্যে তো সব জায়গাতেই ঘর আছে?'

'ও, সে বুঝি জান না, ব্যাটাছেলেদের অদ্ভুত একটা মজা আছে, ঘরের বউকে খারাপ করে পথে বের করার আলাদা একটা আনন্দ আছে। আমি ওদের হাড়ে হাড়ে চিনে গেছি বোন। সেই ফাদার আমাকে রাতের অন্ধকারে হুগলীর গির্জায় পাঠিয়ে দিলেন। আর সেই ভাগনেচন্দ্র চার বছরে মামার যা কিছু ছিল সব ফুঁকে দিয়ে সরে পড়ল। তারপর হল ধর্মের কল বাতাসে নড়ল। একদিন দেখি অন্ধকার মাঠের ওপর দিয়ে সাদা একটা পুঁটলি গড়াতে, গড়াতে আসছে। প্রথমে ভেবেছিলুম ভুত।তারপর দেখি আমার সোয়ামী। ওগো! আমি এলুম। আমার যে কেউ নেই। তুমিই যে আমার সব। সে কি? আমি তোমার সব কি গো! আমি যে কুলত্যাগী, বেশ্যা গো! ধুঁকতে ধুঁকতে বললে, তুমি দেবী, তুমি অন্নপূর্ণা। সে একেবারে পায়ে পড়ে আর কি! বলে কিনা, আমি তোমার সন্তানের মতো। আর মেয়েদের মন! জানই তো! মেয়েদের মনে মায়ের বাসা। একবার মা বললে আর রক্ষে নেই। মানুষটাকে দেখে চোখ ফেটে জল এল। একেবারে জরাজীর্ণ। একটুখানি বাতাসের জন্যে শ্বাস টানছে, মনে হচ্ছে হাপর চলছে। নিজের শরীরস্বাস্থ্যের দিকে তাকিয়ে লজ্জা হচ্ছিল, আমি এত সুস্থ, লোকটা এত অসুস্থ! যতই হোক আমার স্বামী। সংস্কার যাবে কোথায়! জীবন আবার ঘুরে গেল পুরনো খাতে। নতুন জীবনের সন্ধান পেয়েও হারাতে হল একটা কারণে। জানো তো ভাই, বরাত জিনিসটা আগেই তৈরি হয়ে থাকে, পথের মতো। অদৃশ্য ভগবান ঠিক করে রাখেন কে কোন পথে হাঁটবে।'

মুকু বললে, 'ভগবান-টগবান সব বাজে। আসলে যা হয়, তাই হয়। মানুষ ভগবান, ভগবান বলে চেঁচায়। মানুষের যতরকমের দুর্বলতা, তারই নাম ভগবান! এ তো সবাই জানে, পৃথিবীটা লড়াই করার জায়গা। লড়তে গেলে অস্ত্র চাই। প্রথম হল শরীর, দ্বিতীয় হল শিক্ষা, তৃতীয় হল মনের জোর, চতুর্থ হল বিচার, পঞ্চম হল নীতি, ষষ্ঠ হল বুদ্ধি, সপ্তম হল মাত্রাজ্ঞান, অষ্টম হল সম্পর্ক তৈরি, নবম হল চেতনা, দশম হল সাহস। মা দুর্গা দশভুজা; কারণ এই দশ অস্ত্র ছাড়া লড়াই জেতা অসম্ভব। পৃথিবীতে সবাই অসুর। সবাই ভগবান ভাবলে মরতে হবে।'

দিদি বললেন, 'জীবনে ভিক্ষে ছাড়া সবই করেছি। হয় তো বরাতে সেটাও লেখা

আছে।'

'আবার বরাত!'

'তা কি হবে! আমার তো বিদ্যাবুদ্ধি নেই। মাঝবয়সী এক মেয়েছেলে। কিছুকাল খ্রীস্টানদের মধ্যে ছিলুম বলে, জড়ভরত ভাবটা তেমন নেই। আর বলতে পারি কইতে পারি, সে আমার বংশাবলীর ধারা। আমার মায়ের বাক্যির শেষ ছিল না।'

'তাহলে দিদি শুনুন, মনু কী বলে গেছেন, পৃথিবীতে যে নাচতে পারে সে নাচবে, যে গাইতে পারে সে গাইবে, যে পড়তে পারে সে পড়বে, যে যুদ্ধ করতে পারে সে যুদ্ধ করবে, যে কাপড় কাচতে পারবে সে কাপড় কাচবে, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, মুচি, মেথর বলে কিছু দেগে দেওয়া নেই। নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী বৃত্তি বেছে নিয়ে মানুষেরই সেবা করে মানুষকে বাঁচতে হবে। পৃথিবীতে কোনও তোলা-সিস্টেম নেই যে আরামে গড়াবো, সকালে রাজবাড়ি থেকে ভারে ভারে তত্ত্ব আসবে। যে ডাকাত সে ডাকাতি করবে, যার অনেক রূপ, যৌবন, সে মনোরঞ্জন করবে। যে ব্যবসা বোঝে সে ব্যবসা করবে। তাহলে শুনুন দিদি বাইবেল কি বলছেন :

He shall be like a tree
Planted by the rivers of water,
That brings forth its fruit in its season,
Whose leaf also shall not wither
And Whatever he does shall prosper.

ফাদারদের কাছে বাইবেল তো অনেক শুনেছেন দিদি, নিতে কি কিছু পেরেছেন?'

'তুমি এত জানলে কি করে?'

'খুব সোজা। বইয়ের শেষ নেই। পড়ো আর কপচাও। আমি তো দর্শনের ছাত্রী। তবে কথাটা খুব সুন্দর।'

'বলো শুনি। শুনে আর কি হবে! মরণকালে হরিনাম।'

'সে হবে গাছের মতো। কে? মানুষ। বীজ পুঁতেছে নদীর জল। নদীর জলে বীজ ভেসে এসেছে। ঢেউয়ের ধাক্কায় সেই বীজ ডাঙ্গায় উঠেছে। অঙ্কুরিত হয়ে ক্রমশ একটি বড় গাছ। ঠিক সময়ে বছর বছর তাতে ফল ধরবে। আর গাছটা কেমন, না তার পাতা কখনও শুকোবে না। পাতা হল মানুষের সৎকর্ম। আর তার কর্তব্য কি? না, সে যা-ই করুক তাতে যেন মঙ্গল হয়। উন্নতি হয়। মানুষকে হতে হবে গাছ। গাছের মতো সহিষ্ণু, ফলপ্রদ। কত সুন্দর সুন্দর কথা মানুষ বলে গেছে, লিখে গেছে।'

'ও কিছু না। শয়তানে মাঝে মাঝে ভগবান ভর করে। পৃথিবীটা কিন্তু শয়তানেরই।'

বিরক্ত হয়ে বললুম, 'মুকু আমরা কিন্তু এখনও উপোস করে আছি।'

'একা তুমি নেই, আমরাও সবাই আছি। দিদি, আপনি ক'দিন উপোসে আছেন? সত্য বলবেন।'

'একেবারে নির্জলা দেড়দিন, আর আধপেটা কদিন আমার মনে নেই।'

'শুনলে তো! আর খাই খাই কোরো না। বেলা চারটের সময় কেউ ভাত খায় না।'

'তা, যা হয় টুকটাক তো একটু কিছু হবে। পিত্তি পড়ে গেল। আমার আবার পিত্তর ধাত।' সত্যিই আমি আর থাকতে পারছি না। পেটে চোঁ চোঁ শব্দ হচ্ছে।

মুকু বললে, 'তোমার তো ধাতের শেষ নেই। পিত্তির ধাত, সর্দির ধাত, বাতের ধাত, অম্বলের ধাত। এখনও সময় আছে, রোজ সকালে উঠে মেসোমশাইয়ের মুগুর আর ডাম্বেল নিয়ে ভাঁজো, তা না হলে অকালে বুড়ো হয়ে যাবে।'

দিদি বললেন, 'আমাকে সব দেখিয়ে দাও, ছোটখাট জলখাবার একটা করে ফেলি।'

মুকু বললে, 'এই অবস্থায় তো আপনাকে আমি খাওয়ার জিনিস ছুঁতে দোবো না।'

'কেন ? আমি কিন্তু খ্রীশ্চান হইনি।'

'আমাদের জাতিভেদ নেই দিদি। আপনার রাস্তার কাপড়। আগে ভাল করে চান করুন। দেখি পুঁটলিতে কি আছে!'

মুকু পুঁটলিটা টেনে নিয়ে খুলতে শুরু করল। দু'খানা নরুন পাড় ধুতি, দুটো ব্লাউজ, একটা চাদর, গামছা আর একটা ঝকঝকে পেতলের ঘটি বেরলো। মুকু সব পরীক্ষা করে বললে, 'নাঃ, আপনার পরিষ্কার স্বভাব। গামছাটা তেলচিটে নয়, ধুতি, চাদর বেশ পরিষ্কার, আর ঘটিটা ঝকঝকে। ঘটির মায়া ছাড়তে পারেননি!'

'না, বোন, ওটা মায়া নয়। বড় কাজের। জায়গায়, অজায়গায় জল খাওয়া যায়। ধরতে পারলে জলটাই তো বিনাপয়সায় পাওয়া যায়। প্রয়োজনে বাঁধাও দেওয়া যায়। সোনার পরেই কাঁসা। এই ঘটিটা সাতবার বাঁধা পড়েছে। এক রেট, আড়াই টাকা। ভরনের কাঁসা। ফেলনা নয়। ঘটিটা সঙ্গে থাকলে মনে বেশ একটা বল পাওয়া যায়। ধার আর বাঁধা, এ ছাড়া বাঙালী বাঁচবে কি করে! বাপের সম্পত্তি বেচবে আর ফুর্তি করবে। চলো বোন, তোমাদের চানের জায়গাটা দেখিয়ে দাও আর এক টুকরো কাপড় কাচা সাবান দাও।'

'এখন আর কাপড়-জামায় সাবান দিতে হবে না। জলকাচা করে দিন।'

'সাবান আমি গায়ে মাখবো।'

'গায়ে মাখা সাবান বাথরুমেই আছে।'

'গন্ধ সাবান মাখবো বোন!'

'বেশি আদিখ্যেতা করবেন না, বিচ্ছিরি লাগছে। যা স্বাভাবিক তাই করুন। দুঃখ নিয়ে, দারিদ্র্য নিয়ে নাকে কাঁদবেন না। পৃথিবীতে কেউ দরিদ্র হবে, কেউ হবে ধনী। কেউ খেয়ে মরবে, কেউ না খেয়ে। এতে অবাক হবার কি আছে! কেউ চরিত্রবান হবে, কেউ দুশ্চরিত্র। যান চান করে আসুন। মাথা ভেজাবেন না। নতুন জল সহ্য হবে না।'

দু'জনেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমার আর একবার হা হা করে হাসতে ইচ্ছে করল। হায় ভগবান, ম্যান প্রোপোজেস গড ডিসপোজেস। হয়ে গেল। কোষ্ঠীতে একেই বলে বন্ধনযোগ। দুই রমণীকে এখন বহে বেড়াও। ঈশ্বর এক হাতে নেন, আর এক হাতে দেন। 'কল্য, অহো, গতকল্য করেছে প্রস্থান/ লইয়া বঙ্কিম মধু বিহারী ঈশান! আজ আমি আছি যবে, জগৎ-চষকে। প্রাণপণে প্রাণ ভরি করি সুধাপান।'

দিদির পুঁটলিটা খোলা পড়ে আছে মেঝেতে। একটি ধুতি, একটি ব্লাউজ, চাদর, ঘটি। ছোট টিনের সুটকেসে কি আছে জানি না। এত বছর সংসার করে এই মাত্র সম্বল! কি করতে মানুষ আসে এখানে! মাঝে মাঝেই আমার মাথায় একটা গানের লাইন খেলে যায়—'ট্যাঁ করে জন্মে আমি কি পেলাম!' একটু কৃশ হয়েছেন ঠিকই, তবু চেহারায় অভিজাত শ্রেণীর ধার। পরিচ্ছন্ন। যে-জীবনই কাটিয়ে আসুন, নিজেকে ধরে রেখেছেন, ভেসে যেতে দেননি। দরিদ্র, কিন্তু দারিদ্র্য দাঁত ফোটাতে পারেনি। একেই বলে, গ্রেট ফাইটার। ঈশ্বর যেন উদাহরণ ভেট পাঠালেন, 'দেখো, পিন্টু! সামান্য এক মহিলা! কোন শক্তিতে আজও যোদ্ধা! তুমি হলে কি করতে ? অবশ্যই আত্মহত্যা। দেখে শেখো। দুটো দিক, শ্রুতি আর দর্শন। শুনে শেখা আর দেখে শেখা।

১৩

ট্যাঁ করে জন্মে আমি কি পেলাম
প্রথমে মাসি-পিসি তারপরে ঘুংরি কাশি
উঠতে বসতে পড়ছে ড্যাঙ্গোস
কাছা ধরে টানাটানি ॥

বেশ রাত। দেয়াল ঘড়ি সময়ের পায়ে টকাস, টকাস হাঁটছে। মহাকাল যেন হাই হিল জুতো পরে সান বাঁধানো পৃথিবীতে বেড়াতে বেরিয়েছেন, কিংবা প্রজাদের কাছে খাজনা আদায়ে। খাজনা হল দিন। একটা করে দিন তুলে দিতে হবে তাঁর হাতে। ভাবতে বেশ রোমাঞ্চ হয়, আমি একটা গাছ। অনেক পাতা। রোজ একটা করে পাতা খসে পড়ে যাচ্ছে। একদিন শেষ পাতাটি পড়ে যাবে ; তখন আমি বলতে পারবো, আমার কথাটি ফুরলো, নটে গাছটি মুড়লো।

পাশের ঘরে মুকু আর দিদি একই বিছানায় পাশাপাশি শুয়েছে। দু'জনে খুব গজর গজর করছে এখনও। মেয়েদের কথা সহজে শেষ হয় না। রাতের রান্না দিদিই করলেন। কথাটা ঠিকই, অসম্ভব ভাল রাঁধেন। প্রথমে ঠিক হয়েছিল, ডিমের কারি আর রুটি হবে। মুকু হঠাৎ বললে, 'আজ থেকে এ-বাড়িতে নিরামিষ হবে।-দিদি খাবে না, আমরা মাছ মাংস খাবো, তা হতে পারে না। অসম্ভব।'

দিদি বলেছিলেন, 'তা কেন ? তোমরা মাছ মাংস খাও না। আমি আমিষ রান্নাও খুব ভাল পারি। আমার জন্যে তোমরা কেন সব ত্যাগ করবে ?'

মুকু বলেছিল, 'তাতে আমাদের খাওয়া হবে ; কিন্তু আনন্দটা কমে যাবে। একসঙ্গে বসে খেতে পারবো না। পাশাপাশি দুটো আলাদা ব্যবস্থা। হৃদয়হীনতার চূড়ান্ত। এক ধরনের অসভ্যতাও। ওরকম দুই দুই এ-বাড়িতে আমি অ্যালাউ করব না। আমি যা বলব তাই হবে। কোনও রকম তর্ক চলবে না।'

দিদি হাঁ হয়ে বসে রইলেন। নীল চৌখুপ্পি শাড়ি পরে মুকু হনহন করে চলে গেল। দিদি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এমন মেয়ে তো দেখিনি। যেমন রূপ, তেমন তেজ। তেমন মন তেমন হৃদয় ! এ কে !' আমারও তো সেই একই প্রশ্ন, এ কে ? এ যে দেখি হরিশঙ্করের নারী সংস্করণ। হরিশঙ্করের গুণাবলীর মধ্যে কয়েক পোয়া মমতা মিশিয়ে দিলেই মুকুর অন্তঃকরণ। নিখাদ এমন আবেগ, আবার এমন বিচার ও পরিচ্ছন্নতা সহসা দেখা যায় না। আবার এমন স্বার্থশূন্যতা !

বড় নেশাতে পড়েছি শ্যামের বাঁশিতে। জামা ধরে যখন গাড়ি থেকে টেনে নামিয়েছিল, ভেবেছিলুম মুখদর্শন করব না। নিদারুণ অসভ্যতা। পরে চিন্তা করে দেখলুম, যাকে আমি

অসভ্যতা ভাবছি, সেটা আসলে আবেগ। মুকু যা কিছু করে তার মধ্যেই জীবন-মরণ একটা নিষ্ঠা কাজ করে। অদ্ভুত এক আন্তরিকতা। কোনও ফাঁকি নেই। সেইটা ধরতে না পারলেই মনে হবে মেয়েটা বুঝি পাগলি।

সে যাই হোক। ভাবনা তো অনেক হল, আমার কি হবে। ব্রেক ডাউন গাড়ির মতো জীবনের একপাশে পড়ে থাকবো! ফ্যালফ্যাল করে দেখব, হাই স্পিডে সব বেরিয়ে যাচ্ছে জীবনের রাজপথ ধরে! ট্যাঁ করে জন্মে আমি কি পেলাম। সবাই ভাবলে আমি এক রেসের ঘোড়া। শিক্ষার রেসকোর্সে ছেলে আমার ডার্বি নেবে। সেই জোরে জীবিকার বিশাল মাঠে সবাই মেরে বেরিয়ে যাবে। সদরে মটোর গাড়ি, লোকজন, দাসদাসী। আজ ভারতে তো কাল বিলেতে! বউটি হবে ডানাকাটা পরী, ইউনিভার্সিটি ব্লু, আধুনিকা, কিন্তু চালচলনে সাবেকি। খোঁপায় তোলা ঘোমটা, বাতাসের স্বরে কথা, তুলোর পায়ে হাঁটা। পাশ ফিরতেও পারমিশান নেবে, হাসবে কিন্তু শব্দ হবে না, সাইলেনসার লাগিয়ে হাঁচবে। রাগবে না, আবহাওয়া যেমনই হোক, বসন্তের বাতাসের মতো বইবে। এমন ছেলে কই হলাম! ট্যাঁ করে জন্মে আমি কি পেলাম! প্রথমে মাসি-পিসি, এ মাসি-পিসি সেই মায়ের বোন মাসি, বাপের বোন পিসি নয়, এক ধরনের ফুস্কুড়ি। তারপরে ঘুংরি কাশি। স্মৃতি এখনও অমলিন। যে-পারে সে পিটিয়ে যায়। সকালে কানটানা। মাস্টারমশাই ভীষণ রাগী। পড়াবেন কি? ধৈর্য নেই। কান টানাই তাঁর মেডইজি। কান ধরে টানলে অঙ্ক বেরোবে। কান ধরে টানলে ইংরিজি ঝরবে। তিনি ছাড়লে কি হবে! স্কুলে ডাস্টার পেটা। সহপাঠীর ল্যাং। আমি যেন এক বেওয়ারিশ মাল।

পাশের ঘরে মহিলা দু'জন ঘুমিয়ে পড়েছে। দু'জনেরই মন পরিষ্কার। কোনও ঘোর প্যাঁচ নেই। বিছানায় পড়তে না পড়তেই ঘুমে কাদা হবে না কেন! বাইরের বারান্দায় আজ সেই শব্দ। বহুদিন পরে ফিরে এল। ভয় করে তবু উন্মুখ হয়ে থাকি। বুঝতে পারি না। সামনাসামনি যাওয়ার সাহসও নেই। শব্দের সঙ্গে শব্দকারীকে যদি দেখে ফেলি! আমার ঘর অন্ধকার। বিছানায় পড়ে আছি মড়ার মতো। ঘুমের পাত্তা নেই। মাথার ভেতর দিয়ে সারা কলকাতা শহর সশব্দে নেচে নেচে চলেছে। বারান্দায় সেই সাধবানী পায়ের শব্দ এ-পাশ থেকে ও-পাশ, ও-পাশ থেকে এ-পাশ করছে। বহুকাল কোথাও আবদ্ধ থাকলে, সেই বন্দী মানুষ যেমন নিরুপায় হয়ে এ-দেয়াল থেকে ও-দেয়াল পায়চারি করে, এ যেন ঠিক সেই রকম। মনে হয় কোনও রমণী। অকালে চলে যাওয়া এ-বাড়ির কোনও বধূই হয় তো! দেহ গেছে আত্মা এখনও যেতে পারেনি মায়ার বাঁধন খুলে। আগেও দেখেছি আজও দেখছি, পদশব্দ যেন এই ঘরেই আসতে চায়। বারে বারে ফিরে এসে এই ঘরের সামনেই থামছে। থেমে থাকছে বেশ কিছুক্ষণ, তারপর ফিরে যাচ্ছে আবার। আমার শরীরের সমস্ত লোম খাড়া হয়ে উঠছে। বন্ধ দরজার বাইরে তীব্র একটা আলো জ্বলে উঠল। আলোর রেখায় হিলহিল করে উঠল দরজার সমস্ত ফাঁকফোকর। আলোটা জ্বলেই মুহূর্তে নিবে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সারা ঘর ভরে গেল অপূর্ব সুবাসে। এর একটাই ব্যাখ্যা, শব্দকারী জাগতিক দরজার বাধা পেরিয়ে চলে এসেছে ঘরে। এই সুগন্ধই তার প্রমাণ। ভয়ে আমার কণ্ঠ, তালু শুকিয়ে গেল। ধূপ তো কেউ জ্বালেনি! আলোর উৎসই বা কি? বারান্দার পেছনে শুধুই ঝোপঝাড়, বাগান। সব কিছুরই তো একটা কারণ থাকবে। পাশের ঘরের দু'জন অঘোর ঘুমে অচৈতন্য।

হঠাৎ মনে হল, আমার এত ভয় কেন! কিসের ভয়! কাকে ভয়! ভয় পেয়েছি ঠিকই। দেহ অসাড় কিন্তু যুক্তি কাজ করছে। ভয় মৃত্যুকে। মরে যাওয়ার ভয়। এতদিন তাহলে

বৃথাই গুনগুন করেছি, আমি ভয় করব না ভয় করব না। দু'বেলা মরার আগে মরব না ভাই মরব না ॥ এই তো সেই পরীক্ষার সময়। আমি তো মরতেই চাই। আর একবার ভাল করে জন্মাতে চাই। এবারের সব ভুল-ত্রুটি শুধরে নিয়ে উজ্জ্বল, প্রোজ্জ্বল এক জীবনের প্রত্যাশী। যে-জীবনে কাম বলে কোনও আকাঙ্ক্ষা থাকবে না। রমণীর জন্যে থাকবে না কোনও ব্যাকুলতা। ওইটাই তো এইবারের জীবনে কাল হয়ে উঠেছে।

ঝেড়েঝুড়ে উঠে বসলুম বিছানায়। দেখি ধ্যান লাগাই। চেষ্টা করি, আলো আর সুগন্ধের উৎসটাকে ধরার। মনে হয় আমার মা এসেছেন। এসেছেন আমার পিতার খবর নিতে। শুনেছি, তিনি অতিশয় প্রেমিকা ছিলেন। জীবনকে ভয়ঙ্কর ভালবাসতেন বলেই, পঁচিশের আগে মৃত্যু নিয়ে গেল হাত ধরে। তিনি এসেছেন ফেলে যাওয়া লণ্ডভণ্ড এই সংসার দেখতে নিতান্তই এক পর্যবেক্ষকের মতো। ছেলেটা কত বড় হল ! পিতা হরিশঙ্কর উপস্থিত থাকলে জিজ্ঞেস করতেন মন দিয়ে মনে, 'এখনও তোমার শেষ হল না কর্তব্য ! জীবন নদীর ওপারে আর কতকাল আমাকে দাঁড় করিয়ে রাখবে একা ? চলে এসো। চলে এসো। তুমি বৃদ্ধ হয়েছ,. নিঃসঙ্গ সংগ্রামী। রাখো তোমার ধনুর্বাণ। জীবনেরে কে রাখিতে পারে ?/আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে। চলে এসো মহাসিন্ধুর এপারে। সমুদ্রস্তনিত পৃথ্বী, হে বিরাট, তোমারে ভরিতে। নাহি পারে—। তাই এ ধরারে। জীবন-উৎসব-শেষে দুই পায়ে ঠেলে। মৃৎপাত্রের মতো যাও ফেলে ॥'

মনে মনে বিছানাটাকে মন্ত্র দিয়ে ঘিরলুম। এখন আমি গণ্ডির ভেতরে। এইবার মন স্থির করে দেখি কি হয় ! কি পাই ! কে আসেন ! আজ এসপার, ওসপার। স্থির হয়ে বসলুম। ছেলেবেলার সেই মন্ত্রটাও আওড়ে নিলাম, অধিকন্তু ন দোষায়, বুকে আছে রামলক্ষ্মণ ভয়টা আমার কি ! এই হল মানুষ। আমার মা যদি এসেই থাকেন আমি তাঁর ছেলে, ভূত ভেবে ভয় পাচ্ছি কেন ? মানুষ মারা গেলে জীবিতের পৃথিবীতে তাঁর ফিরে আসার অধিকার নেই ! ধীরে, ধীরে আমার চোখ বুজে এল। তীব্র হল ঘুরেঘুরে বেড়ান সুগন্ধ। বুদ্ধি স্তব্ধ। ব্যাখ্যা অপহৃত। There are more things in heaven and earth Haratio/ Than are dreamt of in your philosophy.

ভয়ের ভাবটা ধীরে কেটে আসছে। শরীর শিথিল হচ্ছে। ভারি হচ্ছে ক্রমশ। যেন দেবে বসে যাচ্ছে বিছানার গদিতে, শ্বাসপ্রশ্বাস ক্ষীণ হয়ে আসছে। শরীরের উত্তাপ কমছে। হৃদস্পন্দন মৃদু থেকে মৃদুতর। ধ্যান জমছে। সমস্ত লক্ষণ সুস্পষ্ট। বেশ ভাল লাগছে। কিছুই যে পারে না, সে একটা অতিশয় কঠিন জিনিস পারছে। যে পারায় ধন-জন-বিত্ত-অর্থ কোনও কিছুই লাভ হবে না। শুধু একটা আত্মতৃপ্তি, ভিন্নতর একটা জগতের উপলব্ধি হবে। মনটাকে নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে দিয়েছি। তুলোর মতো ভেসে যাক। যেখানে যেতে চায়, যাক চলে। দেহ কোনও বাধা হবে না। দৃষ্টিকে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছি ভ্রূমধ্যে। সেইখানেই আছে আমার তৃতীয় নয়ন। তৃতীয় নয়নেই দেখা যায় হৃদয়-আকাশ। সেই আকাশের বর্ণ আর আলো সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের।

আমার দেহের নিম্নভাগ থেকে একে একে সব অদৃশ্য হতে লাগল। পা গেল, উদর গেল, বুক গেল, হাত দুটো গেল। নেই। কোনও অনুভূতিই আর রইল না। শুধু আমার মুণ্ডটা ভাসতে লাগল। অন্য ধরনের একটা ভয় এল। মরে যাব না তো ! একটা মাথার অনুভূতি ছাড়া আর কিছু রইল না। ভীষণ একটা শৈত্যের বোধ। কপালের সামনে শিশিরে বোনা একটা পর্দা দুলছে। মা বলে চিৎকার করতে ইচ্ছে করল। নড়ে বসতে চাইছি। ঝাড়া দিয়ে উঠতে চাইছি। পারছি না। আমি আর আমার হাতে নেই। মুণ্ডটা বেলুনের মতো

দুলছে। হঠাৎ দৃষ্টি-পর্দায় একটা চিড় ধরল। শিশিরের দানা ঝরে পড়ল ঝরঝর করে। জ্বলজ্বল করে উঠল একটা দৃশ্য :

একটা শুকনো নদী। জল নেই। শুধু নুড়ি-পাথর। কিছু দুধের মতো সাদা, কিছু শ্যাওলা সবুজ, কিছু নীল। অজস্র উপলখণ্ড, এ-পাশ থেকে ও-পাশে চলে গেছে। পরপারে পাহাড়। পাহাড় শুধু পাহাড়। স্পষ্ট দেখছি, একটি শিলাখণ্ডে নিবিষ্ট মনে উপবিষ্ট হরিশঙ্কর। আমি তাঁর মুখের একটা পাশ দেখতে পাচ্ছি। চোখে সেই সোনালী চশমা। শুভ্র বাস। দু'হাতে হাঁটু দুটি ধরে বসে আছেন। আমি তাঁর পায়ের কাছে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইলুম, সঙ্গে সঙ্গে তিনি সরে গেলেন অসীম দূরত্বে। আমার ধরা ছোঁয়ার বাইরে। আমি টাল খেয়ে বিছানার ওপর পড়ে গেলুম। সংবিৎ ফিরে এল। ভোর হচ্ছে। একটা পাখিই কোনওক্রমে বাসা ছেড়েছে। মৃদু মৃদু ডাকছে। পাশের ঘরে মৃদু স্বরে গান ধরেছেন দিদি। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ। একেবারে বাঁশির মতো গলা।

কোনও ক্রমে উঠে বসলুম। আর একটু হলেই খাট থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেতুম। সামনের দাঁত দুটো অবশ্যই ভাঙত। হাঁ হয়ে গেলুম, এ কি! ঘরের দরজাটা হাট খোলা। আমার বেশ মনে আছে, দরজা আমি ভেতর থেকে বন্ধ করে শুতে গিয়েছিলুম। কোনও কারণই খুঁজে পেলুম না। হয় তো ভুল হয়েছিল। বাতাসে খুলে গেছে। ছিটকিনি হয় তো সত্যই দিইনি। খাট থেকে মেঝেতে নেমে এলুম। ছোট্ট পাখির ডিমের মত জিনিস ভেঙে কুঁচোকুঁচো হয়ে পড়ে আছে। ভোরের আলোয় তার অপ্রাকৃত চেকনাই। সব কিছুই আমার কাছে অপ্রাকৃত মনে হচ্ছে আজ। এই লৌকিক জগৎ আর পারলৌকিক জগতের মধ্যে মাকড়সার জালের মতো যে সূক্ষ্ম ব্যবধান, সেই ব্যবধানে আমি একটু ছুঁচ ফোটাতে পেরেছি অন্তত। সামান্য এক ছিদ্র। সেই ছিদ্রপথে আমি দেখেছি, আলোর কি নীলিম ঔজ্জ্বল্য, বাতাসের কি সূক্ষ্মতা, বস্তুর কি ভারহীনতা!

এটা টিকটিকির ডিমের চূর্ণ আবরণ না অন্য কিছু, মুক্তোও তো হতে পারে! অ্যানালিসিস হবে পরে আপাতত তুলে রাখি সাবধানে। পাশের ঘরে দুই মহিলাই কীর্তন শুরু করেছে। ওদের মধ্যে কে একজন টিংটিং করে কি একটা বাজাচ্ছে। সম্ভবত কাঁসার গেলাসের গায়ে হাতের বালা ঠুকে শব্দটা তুলছে। বেশ ভালই লাগছে। মনে হচ্ছে কোনও এক আশ্রমে ঘুম ভাঙল।

বারান্দায় বেরিয়ে এসে চক্ষু স্থির। খুব মিহি, ধূসর কিছু ছাই পড়ে আছে। বাতাসে ঘুরপাক খেয়ে, তালগোল পাকিয়ে লম্বা লম্বা সাপের মতো, কিছু এখানে কিছু ওখানে, কিছু যেন ছাড়া ছাড়া শুঁয়ো পোকা। ঠিক আমার ঘরের দরজার বাইরে। বুকটা ছাঁত করে উঠল। ব্যাপারটা কি!

যার সাহায্যের কথা প্রথমেই মনে এল, সে মুকু। বেশ জোর গলায় ডাকতে হল। ওরা গান গাইছে গেলাস বাজিয়ে। মুকু আর দিদি দু'জনেই বেরিয়ে এল। মুকুর পোশাক দেখে অবাক। একটা সাদা চাদর দু বগলের তলা দিয়ে ঘুরিয়ে সামনে এনে আড়াআড়ি বুকের ওপর দিয়ে নিয়ে গিয়ে ঘাড়ের পেছনে একটা গাঁট বাঁধা। বাউলের মত দেখাচ্ছে মুকুকে অদ্ভুত এক মজার মেয়ে। একদিনেই দিদিকে অনেক তাজা দেখাচ্ছে। অনিশ্চয়তা কেটেছে আপাতত। একটা নির্ভরতার ভাব এসেছে।

মুকু মেঝের দিকে তাকিয়ে বললে, 'এসব কি?'

'সেই জন্যেই তো তোমাদের ডেকেছি। মনে হচ্ছে কোনও কিছুর পোড়া ছাই।' বললুম না, কাল রাতের দেখা তীব্র আলোর কথা।

মুকু উবু হয়ে বসে বললে, 'দাঁড়াও গোয়েন্দাগিরি করি।' আঙুল দিয়ে একটা ছাইয়ের নুড়ি নাড়াচাড়া করে বললে, 'এ তো মনে হচ্ছে ন্যাকড়া পোড়া ছাই। কে কি পোড়াল ? কালও তো কিছু ছিল না, শুতে যাবার সময়।'

হঠাৎ দিদি লাফিয়ে উঠলেন, 'আরে আমার থান ধুতিটা কি হল। কাল যে শুতে যাবার সময় এইখানে বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছিলুম।'

মুকু উঠে দাড়াল, 'সে কি ? সে আবার কি ! ধুতিতে আপনা-আপনি আগুন ধরে গেল !'

আমি চুপ মেরে গেলুম। অতীত ইতিহাস মনে পড়ল। সেই প্রথম ঘটনা। দেখিনি। শুনেছি। আমার মায়ের শাড়ি এইভাবেই জ্বলে গিয়েছিল। আমার মা তারপরে মাত্র তিন মাস বেঁচেছিলেন। এরই নাম 'ইল ওমেন'। মেনে নিতে ইচ্ছে করে না। যুক্তিবাদী মন ভৌতিক ক্রিয়াকলাপে বিশ্বাসী নয়। কিন্তু এই তো আর একবার ঘটল সেই একই ঘটনা। এদের সামনে অতীত প্রসঙ্গ তুলে মনোবল ভেঙে দিতে চাই না।

মুকু নাছোড়বান্দা। অনুসন্ধানের উৎসাহে নিচে নেমে গেল। তার ধারণা, চোর এসেছিল। চুরির আগে চোর অনেক খেলা দেখায়। নানা রকম তুকতাক করে। আমারও ডাক পড়ল পরক্ষণেই। মুকুর পক্ষে একলা কিছু করা সম্ভব নয়। সঙ্গে একজন অ্যাসিসটেন্ট চাই। তাকে বকবে, ধমকাবে। তবেই কাজ এগোবে। গলায় ওইভাবে চাদর বাঁধা। চুড়ো করা চুল। একেবারে অন্য রকম দেখাচ্ছে। চোর ধরব, না মুকুকে ধরব !

বললুম, 'তোমার এই অদ্ভুত সাজ কেন ?'

লাজুক, লাজুক হেসে বললে, 'কীর্তন করছিলুম যে।' মুকুরও লজ্জা আছে। 'কি রকম দেখাচ্ছে ?'

'ফ্যান্টাসটিক।'

'একটা একতারা কিনে দেবে। রোজ সকালে দিদি আর আমি গান গাইব, লাগ গুমাগুম। দিরি গলা যেমন সুন্দর, সেইরকম গানের স্টকও অনেক। সকালটা খুব জমে যাবে। আমার গলাটা কেমন ?'

'বেশ ভাল। গানের চর্চা করো না। বাড়িতে সবই রয়েছে, হারমোনিয়াম, তানপুরা, এস্রাজ, তবলা।'

'তাই তো করব। মেসোমশাই বলতেন, যার যা গুণ আছে, সব ফুটিয়ে তোলো। এমন মানব-জনম আর কি হবে। মন যা করো ত্বরায় করো এইভাবে ॥ কতো ভাগ্যের ফলে না জানি। মন রে পেয়েছ এই মানব-তরণী ॥'

মুকু সুরেই বলছে। গলা সাবলীল, হঠাৎ থেমে গেল, 'এই জায়গায় মন রে, বলে বিশাল একটা টান আছে, ওইটা আমি পারব না।' দোতলার বারান্দার দিকে তাকাল। উদাসী ভৈরবীর মতো সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন দিদি। মুকু বললে, 'আপনি পারবেন দিদি !'

'পারবো, তবে আমার এখন সুর কেটে গেছে। বড় খারাপ লক্ষণ, এই কাপড় পুড়ে যাওয়া। আমি আর বেশি দিন নেই।'

মুকু বললে, 'কুসংস্কার ছাড়ুন তো। যত বাজে ধারণা। এই দেখুন না, কারণ আমি খুঁজে পেয়েছি। লেডি শার্লক হোমস।'

মুকু নিচু হয়ে দুটো পোড়া দেশলাই কাঠি তুলে আমার চোখের সামনে ধরল, 'দেখেছ ! যা বলেছিলুম তাই। কাল রাত চোর এসেছিল।'

'ওটা কোনও প্রমাণ নয়। চোর এসে মশাল জ্বেলে জানান দেবে না, আমি এসেছি, আমি

এসেছি বধুঁয়া। তারা নিঃশব্দে আসবে, নিঃশব্দে কাজ সেরে পালাবে।'

'কেন ? তুমি শোননি, চোর এসে আগে বড় বাইরে করে। নিশ্চয় কোথাও করেছে। খোঁজো।'

'আমি স্যানিটরি ইনস্পেক্টর নই মুকু। চোরের বড় বাইরে খুঁজবো ?'

'এটা ইনভেস্টিগেশান। সন্দেহের শেষ রাখতে নেই। দেখছ না ! দিদি কি রকম ভয় পেয়ে গেছেন !' মুকু হঠাৎ নিচু হয়ে কি একটা তুলল। উৎসাহ দেখে মনে হল মাণিক পেয়েছে। আমার চোখের সামনে দু' আঙুলে তুলে ধরে বললে, 'হোয়াট ইজ দিস।'

একটা আধপোড়া বিড়ি। মুকু বললে, 'তুমি বিড়ি খাও। আমরা শুয়ে পড়ার পর কাল তুমি চুপকে চুপকে বিড়ি খেয়েছিলে ?'

'না, আমার কোনও নেশা নেই।'

'আমি খেয়েছিলুম ? দিদি ?'

'না।'

'তাহলে এই বস্তুটি এমন জায়গায় এল কি করে ? উত্তর দাও।'

'কেউ ফেলেছে।'

'বেশ, তাহলে একটা কারক আছে। কারক ছাড়া কার্য হয় না। ব্যাকরণের সাধারণ নিয়ম। কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, অধিকরণ।'

একেবারে হরিশঙ্কর কেটে বসান। পৃথিবীর যা কিছু তুচ্ছ, অতিতুচ্ছ, গুরু অথবা লঘু, ঘুরে যাবে শিক্ষার দিকে। দুটো গিয়ারে পৃথিবী ঘুরছে। গ্রামার আর ম্যাথেমেটিক্স। মানুষের দেহটা তো পারফেক্ট জিওমেট্রি, ইলিপ্স, স্কিয়ার, ট্র্যাঙ্গল, রেকট্যাঙ্গল, অ্যাকসিস, ফালক্রাম। পৃথিবীটা পিওর ম্যাথেমেটিক্স, মানুষ হল গ্রামার। একগাদা কারক একে আর একের সঙ্গে হাত মিলিয়ে মার্চ করছে।

মুকু বললে, 'কি হল ? বোবা মেরে গেলে কেন ? কর্তা ছাড়া কর্ম হয় !'

'কেউ বাইরে থেকে ছুঁড়ে মেরেছে।'

'বাইরে থেকে এত দূর ছোঁড়া যায়, একমাত্র আধলা ইট ছাড়া !'

'তাহলে কাকে এনেছে মুখে করে।'

'তোমার মুণ্ডু ! এখানে কাল রাতে কোনও এক ব্যাটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি ধরিয়েছিল। অন্ধকারে আন্দাজ করতে পারেনি। দপ করে ঝোলা কাপড়ে আগুন ধরে গেছে। মেরেছে চম্পট। কেস ডিটেক্টেড। এইবার চা।'

মুকু তরতরিয়ে উঠে গেল ওপরে। এইবার তার কাজ শুরু হবে ঝড়ের বেগে। কোনও থামাথামি নেই। কাজের বুলডোজার চালিয়ে দেবে। দিদি উনুন ধরাবেন। নিচে এসেছে কয়লার খোঁজে। ভাঙা একটা ড্রামে কয়লা। মুকু যতই কর্তা আর কর্ম দেখাক, আমার মনে ঘুরছে সেই এক কুসংস্কার। দিদির একটা কিছু হবেই। তারই বার্তা এসেছে ওই কাপড়ে আগুন ধরে যাওয়ার ইঙ্গিতে। দিদির দিকে তাকিয়ে মনে হল, একটা জাওলা মাছ দেখছি। যে কোনও দিন ছাই মাখিয়ে আঁশ বটিতে কুটবে সে। সে কে ? জানি না। মহামান্য। মহাপ্রতাপশালী তিনি। মানুষ পেছন ফিরে থাকলেও অনুভব করতে পারে। জাল ফেলে জলে বসে আছে জেলে।

দিদি টিনের দিকে হাত বাড়াতেই বলে ফেললুম, 'আপনি না আপনি না। আমি বার করে দিচ্ছি।'

দিদি থতমত হয়ে বললেন, 'কেন ভাই !'

'আপনার হাত কেটে যেতে পারে।'

'হাত কাটবে কেন?'

'যদি যায়।'

দিদি অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন। সুন্দর মুখটা। অনেকটা কৃষ্ণের মতো। ভীষণ ধারালো। এমন যার টিকলো নাক, তার নাকে রসকলি কেমন মানাবে! দিদির ঠোঁট দুটো থিরথির করে কাঁপল কয়েকবার। অতি কষ্টে বললেন, 'শেষকালে এত ভালবাসা! ঈশ্বর এতদিন যেমন কৃপণ ছিলেন, এবারে একেবারে মুক্তহস্ত। ভাই, একটু-আধটু কেটেকুটে গেলে কিই বা হবে! জীবনে কত চোট পেয়েছি!'

'আপনি জানেন না, মরচে ধরা টিন কি সাঙ্ঘাতিক!'

আমি ধুমধাম কয়েক ঢেলা কয়লা বের করে দিলুম। আমার ভয়, টিনের কাটা মানেই টিটেনাস। আর কাটবেই। একটা কিছু হবেই। স্বামী নির্মলানন্দজী আমাকে বারে বারে সাবধান করে দিয়েছেন, নেগেটিভ চিন্তা করবে না। থিঙ্ক গুড অ্যান্ড ইউ গেট পজিটিভ রেজাল্ট। কোথায় কি? আমার মন মানে না। লখীন্দরকে যেমন লোহার বাসর ঘরে রাখা হয়েছিল, দিদিকেও সেইরকম রাখতে পারলে কিছুটা শান্তি পাওয়া যেত। সে আর হয় কি করে! ঈগলের দৃষ্টি পড়েছে। মানুষ-ইঁদুরটিকে ছোঁ মারবেই।

দিদি কয়লা ভাঙছেন। মনকে বোঝালুম, ও কাজটা তেমন বিপজ্জনক নয়। দিদির পক্ষে ভয়ের হবে, আগুন, বারান্দা কি ছাতের আলসে ভেঙে পতন, ভাঙা টিনের খোঁচা, খাবারে বিষক্রিয়া। এই ক'টা থেকে যতদূর সম্ভব সাবধানে রাখতে হবে দিদিকে। এক দিনেই ভীষণ মায়া পড়ে গেছে। ভদ্রমহিলার মধ্যে অদ্ভুত একটা মায়া আছে। ভোরের আকাশের মতো। আমার মনে হল, এমন একজন মানুষকে এইভাবে সাত সকালে কয়লা ভাঙতে দেওয়া উচিত নয়। হাত থেকে হাতুড়িটা কেড়ে নিলুম।

'উঠুন আপনি। এ কাজ আপনার নয়। হয় মুকু করবে, না হয় আমাদের বাড়ি যে কাজ করে সে ভাঙবে।'

'কেন ভাই? আমার ঠিক হচ্ছে না বুঝি!'

'কেন হবে না! আমার এই দৃশ্য সহ্য হচ্ছে না।'

'তুমি কি জান ভাই, কিছু কাল আমি বাড়ি বাড়ি রান্না করেছি।'

'সে যখন করেছেন, তখন করেছেন, এখন আপনি আমার দিদি। আমাদের মাথার ওপর থাকবেন, আমাদের আদেশ করবেন। উঠুন আপনি।'

হাত ধরে তুলে দিলুম। একটু তত্ত্ব করলে চেহারাটা সুন্দর হবে। তখন আভিজাত্য একেবারে ফেটে পড়বে। একদিকে মুকু, একদিকে দিদি। আবার আমাদের সংসারে পুরনো দিন ফিরে আসবে। শুনেছি, আমাদের বাড়ির দুই বউ খুব বিদুষী ছিলেন। দুই সখীর মতো। নীল সোয়েটার আর ডোরা কাটা পাম শু পরে শীতকালের রোদে বেড়াতে বেরোতেন। সঙ্গে থাকত লোমঅলা সাদা কুকুর। পিতাকে যদি ভারত ঢুঁড়ে একবার ধরে আনতে পারি তাহলে তো কোনও কথাই নেই। সুখের বন্যা বইবে।

দিদি ছলছলে চোখে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে।

'কাঁদছেন কেন?'

'কাঁদিনি ভাই। মন দেখছি মন। এ-জল আনন্দের।'

কানের কাছে যেন দৈববাণী হল, 'ঠিক করেছ।'

ওপর দিকে তাকিয়ে দেখি, বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে মুকু। হাসছে। বেশ পাল্টে গেছে।

সেই চাদর জড়ানো বৈরাগীর বেশ আর নেই।

মুকু একটা ব্যাগ দোলাতে দোলাতে বললে, 'বাজারের ব্যবস্থা করো। দিদির আজ জন্মদিন।'

'ও মা সে কি ? আমার জন্মদিন ! তুমি কি করে জানলে ! আমার জন্মদিন তো আমিই জানি না।'

'আমার মন বলছে, আমার দিদির আজ জন্মদিন। এখন দয়া করে দু'জনে ওই ঢ্যাবঢ্যাবে জায়গা ছেড়ে ওপরে উঠে এসো। আমার চা হয়ে গেছে।'

দিদি আমাকে বললেন, 'তোমাদের নিচে একটা বাথরুম রয়েছে না ! আমি বরং সেটাই ব্যবহার করি।'

'দিদি, আবার শুরু করলেন ! ওটায় খুব বিপদে না পড়লে আমরা যাই না। তাও যাই ভয়ে ভয়ে। ওখানে অন্য অনেক প্রাণীর বসবাস। সাপও আছে। ওদের সুখের সংসারে নাই বা হামলা করলেন। ওপরে চলুন।'

'সারা বাড়িটা আমার একবার ঘুরে দেখা উচিত। এই বাড়িরই কোনও একটা ঘরে আমি জন্মেছিলুম।'

'বাড়ি তো আপনার ! সময় মতো ঘুরে দেখবেন। একটাই কথা, ছাতের আলসেতে ভর দিয়ে দাঁড়াবেন না। বাড়ি পুরনো হয়েছে। তেমন আর জোর নেই।'

বারান্দায় সবাই মিলে বসা হল চা নিয়ে। আমরা তিনজন কিন্তু চার কাপ। সুদৃশ্য একটা কাপডিশে আলাদা করে রাখা ; যেন একটু পরেই কেউ আসবেন। বড় একটা বাটিতে শুকনো মুড়ি। তুলে তুলে নাও আর খাও। খালি পেটে চা চলবে না। মুকুর কড়া নির্দেশ। বিস্কুট চলবে না। বিস্কুটা হল বিলাসিতা।

জিজ্ঞেস করলুম, 'ওই চা কার ? আমরা তো তিনজন।'

কপাল থেকে বাঁ হাতে চুল সরাতে সরাতে মুকু বললে, 'বুঝতে পারলে না। তোমার এত বুদ্ধি ! ওটা মেসোমশাইয়ের। এই সুন্দর সকালে, সুন্দর বারান্দায় বসে আমরা চুমুকে চুমুকে সুগন্ধী দার্জিলিং চা খাবো, আর তিনি ? তাঁকে কে চা করে দেবে। জানো, তিনি চা কত ভালবাসতেন ! দিনে সাত-আটবার চা খেতেন। আমি তাঁর ছায়ায় আছি। চিরকাল তাঁর ছায়াতেই বাস করতে চাই। আমি ভগবান জানি না। তিনিই আমার ভগবান ! আজ হতে মোর ঘরের দুয়ার। রাখব খুলে রাতে। প্রদীপখানি রইবে জ্বালা। বাহরি-জানালাতে ॥ মুকু কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে গেল। আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল স্বপ্নে দেখা সেই নদী। উপলখণ্ডের বিস্তার। জল নেই। শিলাখণ্ডে মুখ ফিরিয়ে বসে আছেন তিনি। সেই অভিমানী।

১৪

The man that runs away
Lives to die another day.

বড় লজ্জা নিয়ে নেমে এসেছিলুম গাড়ি থেকে। মুকু জামা খামচে ধরে টেনে নামাচ্ছে আর স্বামীজী মহা ঘৃণায় বলেছিলেন, 'নামিয়ে দাও, নামিয়ে দাও।' ইংরেজিতে বললে বলতেন, 'ক্লিয়ার আউট, ক্লিয়ার আউট'। ফেলে দাও, ফেলে দাও, ঘৃণার মাংসপিণ্ডটাকে। আনন্দ আর দুঃখের এমন দার্জিলিং, আসাম ব্লেন্ড কদাচিৎ দেখা যায়। উন্মাদ, ভালবাসা, অসহ্য ঘৃণা।

আমাকে যিনি ঘৃণা করেন, আমি তাঁর কাছে যাই না। ঘৃণার কাজ করলে ঘৃণা করুন, আমি মেনে নেবো, অকারণে ঘৃণা কেন! একটা দুঃখের স্মৃতি জেগে উঠছে। বয়েস পেছচ্ছে। আমার তখন আট বছর বয়স। আমার মেজ জ্যাঠামশাই খুবই অসুস্থ। আমার সেই জ্যাঠামশাই, যাঁর স্নেহ আর ভালবাসার স্মৃতি আমাকে আমার চিতা পর্যন্ত অনুসরণ করবে। শীতের রাতে লেপের তলায় কোলের কাছে নিয়ে গল্প বলা, যতক্ষণ না ঘুমিয়ে পড়ছি। আমার ক্ষুদ্র হাতটি ধরে বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছেন খেলার মাঠে। বড়দের বলখেলা হচ্ছে, আমরা বসে আছি দুজনে একপাশে। মাঠের উত্তরদিকের শেষ মাথায় এক বয়স্ক বেল গাছ, যে গাছটার খ্যাতি সর্বত্র ব্রহ্মদৈত্যের আস্তানা বলে। শীতের অপরাহ্নে ফুটবল খেলা যখন বন্ধ, তখন আমরা দুজনে ওই মাঠের মাঝখানে এসে বসতুম। চারপাশে জোড়া জোড়া পুকুর। শেষবেলার শীতে জল কালো হয়ে গেছে। বিদেশী হাঁসের দল উড়ে এসেছে আরও কোনও শীতের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে। কেউ জলে মাথা গুঁজছে পেছন উলটে। কেউ জল থেকে শরীর সামান্য উঁচু করে ডানার জল ঝাড়ছে। প্রান্তর পেরিয়ে ছুটে আসছে শীতের শীতল বাতাস। আমার মাথার রঙীন টুপি কান পর্যন্ত টেনে নামিয়ে দিচ্ছেন জ্যাঠামশাই। গলার মাফলার ঠিকঠাক করে দিচ্ছেন। সবে এসেছি পৃথিবীতে। সব-ই আমার চোখে তখন নতুন। চারিদিকে ছড়ান পৃথিবীর যাবতীয় বিস্ময়। একপাশে বিশাল খড়ের গাদা, মাথায় চড়ে নাচছে, চড়াই, শালিক, ছাতারে। দুগ্ধ-ধবল দুটি গাভী রোমন্থনে নেশাতুর। আমারই মতো সদ্য আগত দুটি ছাগশিশু সামনের দুটি পা তুলে নেচে নেচে উঠছে। জ্যাঠামশাই বসে আছেন। আমি সারা মাঠে ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছি। আমি ছুটছি, আমার পেছনে ছুটছে ছাগলছানা। হঠাৎ ঘাসের মধ্যে থেকে কুড়িয়ে পেলুম নিটোল গোল, মসৃণ একটা গুলি। পোড়া মাটির গোল গুলি। একটি শিশুর কাছে কি বা মাটি, কি বা

হীরে ! একটা কিছু পাওয়াটাই মহা বিস্ময়ের । কুড়িয়ে পাওয়া সেই অসাধারণ গুলি আমার কাছে বহুদিন ছিল । সেই গুলির নির্মাতাও আমার শ্রদ্ধেয় ছিল । অমন নিটোল, অমন মসৃণ কেমন করে করা সম্ভব হয়েছিল ! আমার জ্যাঠামশাইও ছিলেন অদ্ভুত এক মানুষ । বয়স্ক এক শিশুর মতোই । গুলির আনন্দে তিনিও বিভোর । অমন একটা জিনিস কে করেছে, কিভাবে করেছে ! পোড়াবার পর একটুও ফাটেনি কেন ! মহা গবেষণার পর গুলিটা নিজের পকেটে রেখে বললেন, রবিবার ওইরকম একশোটা গুলি তিনি আমাকে করে দেবেন, পুকুর থেকে এঁটেল মাটি তুলে । কিছুক্ষণের মধ্যেই ওই মাঠ থেকে আবিষ্কার করলুম আর এক বিস্ময় । গোলাপী মাঞ্জা দেওয়া অনেকটা ঘুড়ির সুতো পড়ে আছে । কড়কড়ে তাজা । হাতের আঙুলে গুটিয়ে আমার হাতে দিয়ে জ্যাঠামশাই বললেন, একে বলে চ্যাঁ-ভোঁ মাঞ্জা । শিশুর কল্পনা বুড়ি হয়ে ঘুড়ি হয়ে উড়ে গেল আকাশে । একের পর এক প্যাঁচ লড়ে যাচ্ছি । সবাই ভোকাটা হয়ে যাচ্ছে । আমি নীল আকাশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক । সেই বিকেলেই জ্যাঠামশাই আমাকে একটা নীল ঘুড়ি কিনে দিলেন । পাতলা কাগজ কাঁপকাঠি আর বুককাঠির বাঁধনে টান টান । কাগজের কি সুন্দর গন্ধ ! ঘুড়িটা হাতে নিয়ে মনে হয়েছিল, নিজের টান-টান হৃদয়টাকেই যেন ধরে আছি । সেই কত দিন আগের কথা । আজও মনে আছে । স্মৃতি এক অসাধারণ ব্যাঙ্ক !

সেই জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে বায়ুপরিবর্তনে হাজারিবাগে গেলুম । তখন তিনি ভীষণ অসুস্থ । পরে জেনেছিলুম, অনেক পরে বড় হয়ে, তাঁর টিবি হয়েছিল । কোনও ওষুধ তখনও আবিষ্কার হয়নি । যক্ষা থেকে রাজযক্ষা অবশেষে মৃত্যু । ডাক্তারবাবুরা বলেছিলেন স্বাস্থ্যকর জায়গায় নিয়ে যান । ভালমন্দ খাওয়ান । এ ছাড়া আর কিছু করার নেই । সেই ভয়ঙ্কর গরমে আমরা হাজারিবাগ হাজির হলুম । আশেপাশে সুন্দর সুন্দর সব বাগানবাড়ি । বাগান, বাগানে থরে থরে ফুটে আছে গোলাপ । গাছে দুলছে পাকা পাকা পিচফল । একটা বাগানবাড়ির নাম ছিল সুরিয়া হাউস । হলদে রঙের বাড়ি । সাদা ইটের কেয়ারি । সেই বাগানে বেশ কিছু আমগাছ ছিল । সিপিয়া ল্যাংড়া । বাগানের দিকের বারান্দায় বেতের আরামকেদারায় ড্রেসিং গাউন পরে এক গম্ভীর চেহারার ভদ্রলোক বসে থাকতেন । ফর্সা রঙ । সুন্দর স্বাস্থ্য । একদিন জ্যাঠামশাইকে বললুম, ওই বাগান থেকে আম চেয়ে আনব ? জ্যাঠামশাই তখন ভীষণ অসুস্থ । বেশিরভাগ সময় শুয়েই থাকেন । মুখ শুকনো । চোয়ালের হাড় জেগে উঠেছে । চোখ দুটো ঢেকে গেছে । ছোট আমি । কেমন করে বুঝবো তাঁর কি হয়েছে । কি দুশ্চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে তাঁর মনে । অফিস গেছে । বিদেশে পড়ে আছেন । কলকাতায় সংসার টানছেন হরিশঙ্কর । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দাপটে পৃথিবী কাঁপছে । চিকিৎসায় জলের মতো টাকা খরচ হচ্ছে । অসুখের লজ্জায় জ্যাঠামশাই মরমে মরে আছেন । আমার কথা শুনে, জ্যাঠামশাই স্থির চোখে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে । শেষে বললেন, 'ছি ছি বাপি, তুমি চেয়ে আম খাবে ? আমরা এত গরিব হয়ে গেছি ! ভিক্ষে করতে হবে ?'

এতই স্পর্শকাতর আমি, জ্যাঠামশাইয়ের সেই মুখ, চোখ আর ছি ছি বলার ধরনে আমি কুঁকড়ে গেলুম । ছুটে বেরিয়ে এলুম ঘরের বাইরে । আমরা যে বাড়িতে ভাড়া ছিলুম, তারও একটা ন্যাড়া ন্যাড়া বাগান ছিল । খুব একটা যত্নের নয় । সেই বাগানে একা একা ঘুরে বেড়ালুম অনেকক্ষণ । একটা পিচফলের গাছ ছিল । ফল ধরেছে অনেক । একটা পেড়ে খেলুম । মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলুম, জীবনে জ্যাঠামশাইয়ের সামনে আর কখনও খাব না । কথা তো বলবই না । হঠাৎ আকাশের দিকে নজর গেল । রোদ ঢেকে আসছে মেঘে ।

কালো মেঘ হু হু করে এগিয়ে আসছে। বিনবিন একটা আওয়াজ। মেঘ তো আওয়াজ করে না। এ আবার কি ? মেঘের তো ডানা থাকে না ? হঠাৎ দূরে একটা সোরগোল উঠল, পঙ্গপাল, পঙ্গপাল। পঙ্গপাল নামটা শোনা ছিল। দলছুট কয়েকটা আমার দিকে উড়ে এল। বিশাল বড় ফড়িং-এর মতো। ভয়ে ছুটে পালিয়ে এলুম ঘরে। চারপাশ অন্ধকার। সূর্যে যেন গ্রহণ লেগেছে। ফিরফির আওয়াজে কানের পর্দা কাঁপছে। বাইরে হইহই চিৎকার।

মানুষ কিছু ভোলে না। বেঁচে থাকাটা আর কিছুই নয়। অভিজ্ঞতার সঞ্চয়। গাছে যেমন ফল ধরে, মানুষে তেমনি স্মৃতি ধরে। শেষকালে মানুষ একেবারে নুয়ে পড়ে। বিশাল একটা কেতাবের মলাট বন্ধ হয়ে যায়। জীবিতের সংসারের একপাশে পড়ে থেকে থেকে একদিন কীটদষ্ট বিস্মৃতি। জ্যাঠামশাই হাজারিবাগে এসেছিলেন হেঁটে হেঁটে, ফিরে চললেন স্ট্রেচারে শুয়ে। এই বাড়ির দক্ষিণের ঘরে তিনি বিছানা নিলেন। দরজার পাশ থেকে উঁকি মেরে মেরে দেখি। সংসার একেবারে এলোমেলো। অনবরতই ডাক্তার-বৈদ্যের আসা যাওয়া। বড়র বড়, তারও বড়। গম্ভীর মুখে আসেন, ফিরে যান গম্ভীরতর মুখে। গোটা বাড়িতে ফিনাইল আর কার্বলিকের গন্ধ। মহা আহ্লাদে আমি ঘুরি। শাসন নেই কোনও। জ্যাঠামশাইয়ের ঘরের পাশে খোলা বারান্দায় ক্যারামবোর্ড পেতে সমবয়সী ইয়ারদের সঙ্গে সারা দুপুর পিটি। কোনও দৃকপাত নেই। কে মরে আর কে বাঁচে। এক কিশোরের সঙ্গে জীবনমৃত্যুর কি সম্পর্ক ? হাজারিবাগের অভিমান কলকাতায় এসে যেন দুধে ফোলা পাউরুটি ! কেন জ্যাঠামশাই আমাকে ডেকে বললেন না, বাপি রাগ কোরো না ! বোধের কি অভাব ! একবারও বুঝলুম না। জ্যাঠামশাইয়ের তখন কথা বলার কোনও ক্ষমতা নেই। তরী ভেসে চলেছে নিঃশব্দে জীবনমৃত্যুর মোহানার দিকে। একদিন ক্যারামের আসর খুব জমেছে, ক্ষীণ একটা ডাক কানে এল, বাপি।

কি আনন্দ ! আমার সবচেয়ে প্রিয়জন অবশেষে ডেকেছেন। স্ট্রাইকার ফেলে ছুটলুম। জ্যাঠামশাই চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন। ঠোঁট দুটো অল্প ফাঁক। চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। জ্যাঠামশাই বলে কাছে ছুটে গেলুম। তিনি তখন বহু দূরে চলে গেছেন। জীবনের ধনুক থেকে প্রাণের তীর ছিটকে বেরিয়ে গেছে। বহু, বহু দূর থেকে ডাক ভেসে এল, বাপি তোমার সঙ্গে ভাব হয়ে গেল। তবে এখানে নয় ওখানে। তোমার খেলা শেষ করে এস। বাকি কথা হবে পরে।

সেই অভিমান ! আজও আমি অতিশয় অভিমানী। জীবনের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে পারিনি। স্বামী নির্মলানন্দ? আমি কি করি ? আপনার কাছে যেতে চাই। আমার অভিমান টেনে ধরে আছে। তবে আমি আর কিশোর নই। পোড় খাওয়া এক যুবক। আমি যাব। আমার হৃত গৌরব উদ্ধার করতে। সঙ্গে হরণকারিনীকেও নিয়ে যাব।

কোমরে আঁচল জড়িয়ে মুকু রান্নাঘরের কাছে বীর দর্পে ঘোরাঘুরি করছে। দিদি ঘরের ভেতরে। টুংটাং খুটখাট নানা শব্দ সংসারের শব্দ। মুকু আবার মাঝে মাঝে গান গাইছে, হরি দিন তো গেল, সন্ধ্যা হল, ঘোল খাওয়ালে মোরে !

'মুকু, শেষটা হল পার কর আমারে।'

'সে-কথাটা এই আমার কাঁচা বয়সে বলি কি করে ! জীবনের কত সাধ আহ্লাদ বাকি আছে ভাই। এখনই যাই কি করে ! আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তোমাকে জ্বালিয়ে তারপর যাব, যতদিন না তোমার মুখ দিয়ে বেরচ্ছে, লোহারি বাঁধনে বেঁধেছে সংসার, দাসখত লিখে নিয়েছ হায় !'

দিদি কুটনো কুটছিলেন, মুখ তুলে বললেন, 'হ্যাঁ রে ! তোরা কি বিয়ে করবি ?'

মুকু বললে, 'সেইরকমই ইচ্ছে আমাদের।'

'বাঃ বেশ হবে। মানাবে ভাল। তা কাকা ঘি আর আগুন পাশাপাশি রেখে চলে গেলেন!'

'তার কারণ আছে। আমরা সংযমী। কুকুর, বেড়াল নই।'

দিদি একটা বেগুন নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন, 'যাক বাবা, ভালই হয়েছে। আমার একটা এক ভরির মতো সোনার বালা আছে, সেইটা ভেঙে তোকে একটা সুন্দর গয়না গড়িয়ে দোবো। চল আজই কোনও স্যাকরার কাছে যাই।'

'একেই বলে উঠল বাই তো কটক যাই। বিয়ের এখনও দেরি আছে। আগে আমরা মেসোমশাইকে খুঁজে বের করব। তারপর আমি এম· এ পাস করব। তারপর।'

দিদি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'মেসোমশাইকে খুঁজে বের করবি মানে?'

আমরা দুজনেই থতমত। সত্য বেরিয়ে পড়েছে। সত্যের যা ধর্ম। আর চেপে রাখা সাজে না। প্রকাশ করে দেওয়াই ভাল।

আমিই বললুম, 'দিদি, আপনাকে আসল কথাটাই বলা হয়নি। আমরা হাসছি, খাচ্ছি, কথা বলছি, কিন্তু আমরা আজ অনাথ। বাবা কারোকে কিছু না বলে হঠাৎ ভোর রাতে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন। কোথায় গেছেন আমরা জানি না।'

দিদির আনাজ কোটা বন্ধ হয়ে গেল। তারার মতো চোখ মেলে বলল, 'সে কি রে! কাকা নেই!'

'আছেন। কোথাও না কোথাও আছেন, আমরা এখনও জানি না।'

'তাহলে কি হবে!'

'আমাদের জানা নেই। ভগবানকে মানুষ যেমন ডাকে, আমরাও মনে মনে অনবরতই তাঁকে স্মরণ করছি। দেখা দিন, দেখা দিন।'

দিদি মাথা নিচু করলেন। পিঠের দিকটা ফুলছে। মুখ তুললেন। চোখে জল। ধরা গলায় বললেন, 'অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকায়ে যায়।'

'আপনার কোনও ভয় নেই দিদি। আমরা আপনাকে মাথায় করে রাখব।'

'তা তো হল; কিন্তু আমার কাকাকে ফিরিয়ে আনার কি হবে!'

আমাদের দুজনের মুখেই আর কোনও কথা সরল না। এই সুবিশাল ভারতভূমে কত গুহা, নদী, প্রান্তর, মন্দির, আশ্রম! তিনি কোথায় আছেন! জায়গার তো অভাব নেই আত্মগোপন করার। কেমন করে জানবো। দিদি মসৃণ বেগুনটা হাতে তুলে নিয়ে খুব আন্তরিক গলায় বললেন, 'একটা কিছু কর ভাই।'

মুকু বললে, 'আজ রাতে আমরা পরামর্শে বসব।'

মুকুকে ইশারায় ডেকে আমার ঘরে নিয়ে এলুম, 'আমার একটা অনুরোধ রাখবে?'

'বলো।'

মুকু কি পরিশ্রম করেছিল কে জানে, ঘেমে গেছে! মুখটা মোমের মতো চকচক করছে। প্রাণের দীপ্তিতে চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। সারা শরীর ঘিরে থমকে আছে উষ্ণ আকর্ষণ। বড় দুর্বল মনে হচ্ছে নিজেকে।

আবার এও মনে হচ্ছে, 'Love's way is life, without it humans are but bones skin-clad. প্রেমই জীবন। প্রেম ছাড়া মানুষ চামড়ার আস্তরণে হাড়ের খাঁচা।

মুকু বললে, 'কই বলো। কি দেখছ অমন করে। আমার অস্বস্তি হচ্ছে।'

'তুমি আমাকে পাগল করে দেবে দেখছি!'

'পাগলকে আর কি আর পাগল করব বলো! তোমার অনুরোধটা তাড়াতাড়ি বলে ফেল। আমার প্রচুর কাজ।'

'তোমাকে আমার সঙ্গে একবার স্বামী নির্মলানন্দজীর কাছে যেতে হবে।'

'আমাকে? আমি গিয়ে কি করব!'

'আমার সম্মান বাঁচাবে।'

'তোমার অসম্মানের কি হল!'

'আমার জামা খামচে ধরে তুমি আমাকে গাড়ি থেকে টেনে নামাচ্ছিলে, তিনি ভীষণ ঘৃণায় বলেছিলেন, নামিয়ে দাও, নামিয়ে দাও। যেন আমি কত খারাপ, চরিত্রহীন যুবক। আসল ব্যাপারটা তাঁকে জানান দরকার।'

'না জানালে!'

'আমার যাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে চিরকালের জন্যে।'

'যায় যাবে। তাতে তোমারই বা কি, আর আমারই বা কি!'

'ও কথা বোলো না। আমি কোন জলের মাছ জানো?'

'খুব জানি। গভীর জলের মাছ। তুমি গাছেরও খাবে, তলারও কুড়োবে।'

'তুমি একটা অধার্মিক, নাস্তিক।'

'তোমার মতো আস্তিক হওয়ার চেয়ে নাস্তিক হওয়া ভাল।'

'তুমি তা হলে যাবে না?'

'অবশ্যই যাব। কখন যেতে হবে বল?'

'বিকেলের দিকে।'

'বেশ তাই হবে।'

মুকু চলে গেল। কিছুক্ষণ থম মেরে বসে রইলুম। অদ্ভুত একটা আলস্য এসে যাচ্ছে। নিজের ভবিষ্যতটাকে কেমন তিল তিল করে নষ্ট করছি! কেবল ভাবছি। ভেবেই চলেছি। চাকরিবাকরি লাটে উঠে গেল। পড়াশোনা গোল্লায়। নিজেকে কখনও শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবছি, কখনও বিবেকানন্দ। আর বুকে হাত মুড়ে গোল্লা গোল্লা চোখ করলেই কি স্বামীজী হওয়া যায়! সংস্কার চাই, প্রারব্ধ চাই। পৃথিবীতে কত রকমের ইডিয়েট আছে? আমি একটা রকম। যা হতে পারব না, তা হবার চেষ্টায় মরছি। নিজের সম্মান বাঁচাবার চেষ্টায় একবার থানায় গেলুম না। কি? না, লোক জানাজানি হয়ে যাবে। সবাই বলবে, ছি ছি, ছেলের জন্যে বাবা গৃহত্যাগী। মাসতুতো বোনকে এনে ফুর্তি লুটছে। ভগবানের অসীম কৃপা। কোথা থেকে এক দিদিকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। বদনামের হাত থেকে কিছুটা বাঁচা যাবে অন্তত।

বেলা চারটের সময় আমরা আশ্রমে গিয়ে পৌঁছলুম। আশ্রমের দরজার সামনে কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে রইলুম দুজনে। স্বামীজীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালে তিনি কি বলবেন! কঠিন তিরস্কার। মুকু বললে, 'কবে যে তোমার জড়ভরত ভাবটা যাবে! চলো না। যা হবার তা হবে। চিবিয়ে খেয়ে ফেলবেন না তো! বড় জোর বলবেন, গেট আউট। বেরিয়ে চলে আসব। ঈশ্বর তো কারোর একার সম্পত্তি নয়। নিজেদের চেষ্টাতেই তাঁকে ধরব। গেরুয়া পরলেই কি তাঁকে পাওয়া যায়। অত সহজ নয়! শুনবে, তুলসীদাসজী কি বলছেন, তুলসী পিঁদনে হরি মেলেতো, মেয় পেঁদে কুঁদা আউর ঝাড়। পাথর পূজনে হর মেলেতো ময় পূজে পাহাড়। তুলসীর মালা পরলে যদি জগদীশ্বর হরিকে লাভ করা যায় তা হলে গলায় আমি তুলসীগাছের একটা কুঁদো ধারণ করি, কি তুলসীর একটা ঝাড় ঝুলিয়ে রাখি। আর যদি মনে

করে থাক একটা শিলার অর্চনা করলেই মহেশ্বরকে পাওয়া যাবে, তাহলে আমি একটা পাহাড়কেও পুজো করতে প্রস্তুত আছি। যা চাইছ তা অত সহজ নয়। চেলা মিলে লাখ তো গুরু মিলে এক।'

আমরা দুজনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা গজগজ করছি, কারণ আমাদের মতের মিল তো কোনওদিন হবে না। যদি আমরা কোনওদিন স্বামী-স্ত্রী হই, এটা তো তারই লক্ষণ। অস্কার ওয়াইল্ডের কথা মনে পড়ছে, ম্যারেজ ইজ এ পার্মানেন্ট ডিসএগ্রিমেন্ট।

এক সরল চেহারার মানুষ রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ভাবলেন আমরা ঢুকতে ভয় পাচ্ছি। সাহস দিলেন, 'যান না, যান, ভেতরে যান, কেউ কিছু বলবে না। মহারাজরা খুব ভাল। রাত্তিরবেলা ভোগে গাওয়া ঘিয়ের লুচি হয়। খাঁটি গাওয়া। আমি সবদিন পাই না, তবে রোজ গন্ধ পাই। ভুর ভুর ভুর ভুর। রান্নাঘরের পাশেই তো আমি থাকি। যান, যান, ভেতরে গিয়ে দেখে আসুন। জুতো সাবধান। ভীষণ জুতো চুরি হয়।'

মুখে অদ্ভুত একটা হাসি ঝুলিয়ে মানুষটি চলে গেলেন। আমরা নিজেদের ঝাড়াঝাড়ি করে ভেতরে ঢুকে পড়লুম। বাঁদিকের অফিসঘরে আর গেলুম না। সোজা দোতলার মন্দিরে। ফুলের মালা পরে মা হাসছেন। দুচারজন ভক্ত। মুকু বেশ অভিভূত হয়ে থেবড়ে বসে পড়ল। হাত জোড় করে প্রথমেই বললে, 'মা তোমার যদি ক্ষমতা থাকে মেসোমশাইকে ফিরিয়ে এনে দাও।'

এই কথাটা তো আমি মাকে বলতে পারিনি। আমি আসি যাই, নিজের কামনাই জানাই। বড় স্বার্থপর আমি। মুকুর মুখের দিকে তাকালুম। অদ্ভুত একটা ভাব খেলছে। ভীষণ হিংসে হল। মুকুর মন কত পরিষ্কার। আমি কত কুচুটে। সবসময় নিজের ধান্দা। মুকু যে-ভাবে বসেছে, সহজে উঠবে না। ফিসফিস করে বললুম, 'চলো, মহারাজের কাছে যাই।'

'মহারাজ আগে, না মা আগে।'

থমকে গেলুম। সত্যই তো, মা-ই তো সব। মাকে সব নিবেদন করে আমরা তো ফিরেও যেতে পারি। যাই হোক মুকুর দয়া হল। প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল। আমরা তিন তলার সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়ালুম। ভয়ে বুক কাঁপছে। কপালে কি লেখা আছে জানি না।

দুরু দুরু বুকে মহারাজের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালুম। লাল ঝকঝকে মেঝে। চকচকে টেবিল। চেয়ারে টকটকে গেরুয়া পরে বসে আছেন মহারাজ। মুখ নিচু করে কিছু একটা লিখছেন। মুকু হঠাৎ আমাকে ঠেলে ঘরে ঢুকে গেল। মহারাজ মুখ তুলছেন। মুকু ততক্ষণে মাটিতে গড় হয়ে প্রণামে।

মহারাজ বললেন, 'কে তুমি ? ' আমাকে দেখেও দেখলেন না।

মুকু সোজা হয়ে হাত জোড় করে বললে, 'আমি মুকু। মায়ের মেয়ে।'

মহারাজ থতমত। মুখ অতিশয় গম্ভীর। এই গাম্ভীর্য ভীষণ ভয়ের। থমথমে মুখ। তীক্ষ্ণ চোখ। সামনে দাঁড়ালে কেঁচো হয়ে যেতে হয়। মুকু কিন্তু নির্ভয়। এমন উত্তর মহারাজ কখনও শোনেননি, মায়ের মেয়ে।

মহারাজ বললেন, 'অনিশ্চিত পরিচয়কে নিশ্চিত করো। দেশ-কাল-পাত্রের সীমায় বাঁধো।

'পেছনে লেজ গুটিয়ে যে ভীরু দাঁড়িয়ে আছে, আমি তার বোন। এইবার কেমন বোন ? না মাসতুতো বোন। আরও এক ধাপ এগোলে, আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

এম· এ· দর্শনের ছাত্রী। এইবার আরও একটু সংযোজন, সেদিন আপনার গাড়ি থেকে জামার বুক খামচে ধরে যে মেয়েটা ওকে টেনে নামিয়েছিল, সেই মেয়েটাই আমি। এইবার প্রার্থনা, প্রণাম করেছি, আশীর্বাদ করেননি। গম্ভীর মুখ। একটু হাসি আশা করি। আশীর্বাদ চাই, স্বামীজী ভারতীয় নারীকে যে-রূপে দেখতে চেয়েছিলেন আমি যেন সেইরকম হতে পারি। স্বামীজী বলেছিলেন, আমাদের মেয়েরা বরাবরই প্যানপেনে ভাবই শিক্ষা করে আসছে। একটা কিছু হলে কেবল কাঁদতেই মজবুত। বীরত্বের ভাবটাও শেখা দরকার। সর্বশক্তিমত্তা, সর্বব্যাপিতা ও অনন্ত দয়া—সেই জগজ্জননী ভগবতীর গুণ। জগতে যত শক্তি আছে, তিনিই তার সমষ্টিরূপিনী। জগতে যত শক্তির বিকাশ দেখা যায়, সবই সেই মা। তিনিই প্রাণরূপিনী, তিনিই বুদ্ধিরূপিনী, তিনিই প্রেমরূপিনী।' মুকু একটু থেমে মহারাজের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত মিষ্টি গলায় বললে, 'মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করবেন না মহারাজ!'

১৫

There are only three things to be done with a woman.
you can love her, suffer for her, or turn her into literature.

মহারাজ চেয়ারটা আস্তে পেছনে ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন। মুকুর প্রখর বোলচাল স্তম্ভিত। টকটকে গেরুয়া কাপড় ভাঁজে ভাঁজে খুলে পায়ের পাতা ঢেকে দিল। মুকু মেঝেতেই বসে রইল থেবড়ে। মহারাজ তাকিয়ে আছেন তার দিকে।

মুকুর মাথায় একটা আঙুল আলতো ভাবে স্পর্শ করিয়ে তুলে নিলেন। বললেন, 'উঠে বোসো চেয়ারে। তোমার এই বীর ভাব আমার ভাল লাগছে। তবে কি জানো, তোমার কাণ্ডজ্ঞানের একটু অভাব আছে। আমি সন্ন্যাসী। গাড়িতে বসে আছি। তুমি একবারও খেয়াল করলে না, পাঁচজনে কি ভাববে!'

মুকু চেয়ারে বসতে বসতে পটাং করে বলে বসল, 'মহারাজ, কাণ্ডজ্ঞানের অভাব নয়, আমার আবেগ। অপরাধীকে আমার চাবকাতে ইচ্ছে করে। আপনি যে গাড়িতে আছেন লক্ষ করিনি। গাড়িতে একটি মেয়ে ছিল আর আপনার এই ছেলে তার কোলের ওপর মেয়েটির হাত নিজের হাতে নিয়ে মহা আরামে বসেছিল। যে গাড়িতে আপনি সেই গাড়িতে এমন ঘটনা ঘটে কি করে? ইংরেজিতে একেই বলে কমপ্রোমাইজিং পজিসান।'

'ও! ও তো সুরঞ্জনা! সুরঞ্জনা ছিল গাড়িতে।'

'সুরঞ্জনা তো একজন মহিলা আর ও তো একটা ছেলে। যে সন্ন্যাসী হবে সে অত ঘন হয়ে বসেছিল কেন? ঠাকুর বলে গেছেন, আগুন আর ঘি পাশাপাশি রাখতে নেই মহারাজ। ঠাকুর কত সাবধান হতে বলেছেন! বলেছেন, সর্বাঙ্গে চাদর মুড়ে মেয়েদের পাশে যেতে হয়, যদি অ্যাট-অল যেতেই হয়। বলেছেন, মেয়েদের ছবি দেখলেও চিত্ত চঞ্চল হতে পারে। যে সন্ন্যাসী হবে তার এই সব অবশ্যই মানা উচিত। এই দু নৌকোয় পা দেখে আমার মাথায় রক্ত চড়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া তার আগের সারাটা রাত কোথায় ছিল তার কোনও সন্তোষজনক উত্তর নেই। মিথ্যা কথায় অতিশয় পারদর্শী। গল্প তৈরিতে মহা ওস্তাদ। ওকে দেখার মতো কেউ নেই, তাই আমাকেই কড়া হাতে শাসনের ভার নিতে হয়েছে। ওর মাথায় সদাসর্বদাই অদ্ভুত সব মতলব খেলা করে।'

আমার এইবার আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছু বলা উচিত। যে-ভাবে চিত্রিত হচ্ছি তাতে প্রায় চরিত্রহীনের পর্যায়ে চলে যাচ্ছি। 'মাতাল, লম্পটরাই রাতে বাড়ি ফেরে না। মেয়ে দেখলেই ল্যাল ল্যাল করে এগিয়ে যায়। ঘোঁতর ঘোঁতর করে। ও কি তাই? মহারাজ গাড়িতে

আপনি আছেন, আমি একবারও লক্ষ করিনি। আমার চোখ ছিল শুধু ওদের দু'জনের দিকে। আমাকে আপনি ক্ষমা করবেন আমার অসভ্যতার জন্যে।' মুকু ভাবের আবেগে আমার চরিত্র আরও কিছুটা বিপর্যস্ত করে দিল। মেরামতের বদলে ভেঙে দিল অংশে অংশে, খণ্ডে খণ্ডে।

মিউ মিউ করে স্বর বেরলো, যেন ছুঁচো, 'আমার কিছু বলার ছিল। আমি সুরঞ্জনার দিকে চেপে ছিলুম কোনও বদ মতলবে নয়, মহারাজের কারণে, পাছে মহারাজের গায়ের সঙ্গে আমার গা লেগে যায়! উনি সন্ন্যাসী আমি গৃহী।'

মুকু সঙ্গে সঙ্গে বললে, 'দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না।'

আমি হতাশ হয়ে বললুম, 'দেখছেন মহারাজ। আমার কেস হাজির করার সুযোগই দিচ্ছে না।'

'শোনো, তোমাকে একটা অপ্রিয় কথা বলি। প্রথমে ইংরেজিতেই বলি। পুস্তু প্রবাদ,

The ungrateful son is a wart on his father's face;
to leave it is a blemish, to cut it off is pain.

অকৃতজ্ঞ পুত্র হল পিতার মুখে একটা আঁচিলের মতো। রাখাটা কলঙ্কের মতো, কাটা যন্ত্রণাদায়ক। তুমি যদি তোমার আচরণে পিতার মানসম্মান, পরিবারের আদর্শ ধুলোয় লুটিয়ে দাও, সেটা হবে এমন কলঙ্ক যা স্বীকার করা যাবে না, অস্বীকারও করা যাবে না; কারণ তুমি পুত্র। আমি তো দেখছি এই মেয়েটির যা তেজ, যা বোধ-বুদ্ধি, তোমার তা নেই। রাগ কোরো না, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, তুমি এফিমিনেট, তোমার চরিত্র দুর্বল। আমি তোমার ডান পাশে বসে আছি, আর তুমি তোমার বাঁ পাশে সুরঞ্জনার হাত নিয়ে খেলা করছ? ঠাকুর বলতেন, মেয়েরা যতই ভক্তিমতী হোক, তাদের সংস্পর্শে মন টলে যেতে বাধ্য। যুবতী সম্পর্কে ভয়ঙ্কর সাবধানতার প্রয়োজন। নির্জনে তাদের সঙ্গে ধর্মালোচনাও বিপজ্জনক! তোমার এমন দুঃসাহস, আমার উপস্থিতি সত্ত্বেও তুমি এমন কাজ করতে পারলে! তুমি তো সাঙ্ঘাতিক ছেলে!'

আমার খুব রাগ হচ্ছিল। টিনের চালে বৃষ্টি পড়ার মতো, চটরপটর এন্তার কথা আমাকে অকারণে দাগরাজি করে দিচ্ছে। আশ্চর্য বরাত আমার! একটু উষ্ণ ভাবেই বললুম, 'আমার মনে কোনও পাপ নেই। যে-হাত আমি ধরেছিলুম, সে-হাত কোনও মেয়ের নয়, বন্ধুত্বের হাত। সুরঞ্জনার দাদা নিরুদ্দিষ্ট, আমার পিতা নিরুদ্দিষ্ট। দু'জনেরই এক অবস্থা। সেই কথাই হচ্ছিল।'

মুকু সঙ্গে সঙ্গে বললে, 'কথা তো মুখে মুখে হয় মহারাজ। আর হাতে হাতে হয় হাতাহাতি।'

আমি বললুম, 'সুরঞ্জনা আমার কাছে লেখাপড়ায় সাহায্য চেয়েছে। দাদা অঙ্ক দেখিয়ে দিত। আমাকে অনুরোধ করেছে, অঙ্ক বোঝাবার জন্যে।'

মুকু বললে, 'এত শিক্ষক থাকতে তোমাকে কেন? তুমি তো কেমিস্ট্রির লোক। অঙ্কের তুমি কি বোঝো! মেসোমশাই তো তোমাকে উঠতে-বসতে ধমকাতেন। অঙ্কের মাথা তোমার মোটেই ভাল নয়।'

মহারাজ বললেন, 'প্রসঙ্গটা আর এগোতে দেওয়া ঠিক নয়। এটা আশ্রম। তোমাদের ঝগড়া করার প্ল্যাটফর্ম নয়। কি চাও তোমরা? আমার কাজ আছে। নষ্ট করার মতো সময় নেই।'

মুকু বললে, 'আপনি ওকে ভালবাসেন। আমিও ভালবাসি। একটা কথা ওকে আপনি

বুঝিয়ে দিন, সংসারই ওর জায়গা, আশ্রম নয়। চাকরি-বাকরি ছেড়ে বাড়িতে বসে থাকলে কেউ খাওয়াবে না। সন্ন্যাসী হওয়া অত সহজ নয়!'

মহারাজ টেবিলে দেহের ভার রেখে দাঁড়িয়েছিলেন এতক্ষণ। এইবার চেয়ারে বসলেন আবার। মুখ থমথমে। মুকুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার পক্ষে সন্ন্যাস ছাড়া অন্য কোনও পরামর্শ দেওয়া সম্ভব নয়। যে-পাখি যে-গান গায়, যে-বাদ্যযন্ত্র যেমন আওয়াজ করে! এই ভোগের পৃথিবীতে আমিও একজন গৃহী হতে পারতুম। এই চেয়ারে গেরুয়া পরে বসে না থেকে কোনও এক বড় কোম্পানির চেয়ারে স্যুট-বুট, টাই পরে বসে থাকার যোগ্যতা আমার ছিল। আমার যৌবনে আমি এক মহাপুরুষের সংস্পর্শে এসেছিলুম। সে আমার ভাগ্য। তিনি আমাকে প্রথম যে-কথা বলেছিলেন ভারি সুন্দর। বলেছিলেন, পৃথিবীতে একবারই এসেছ, মেয়েদের আঁচল ধরে না ঘুরে, ঈশ্বরের হাত ধরে ঘোরো। হয় তো পাবে না কিছুই, যতই না পাবে, তত পেতে চাবে, ততই বাড়িবে পিপাসা আমার, ওগো ফুরাবে না তুমি, ফুরাবো না আমি, তোমাতে আমাতে হব একাকার। তিনি অনন্ত। অনন্ত হয়েছ, ভালই করেছ, থাকো চিরদিন অনন্ত অপার। ধরা যদি দিতে ফুরাইয়া যেতে, তোমারে ধরিতে কে চাহিত আর। ভুলায়েছ যারে তব প্রলোভনে, সে কি ক্ষান্ত হবে তব অন্বেষণে? না পায় না পাবে, যায় প্রাণ যাবে, কভু কি ফুরাবে অন্বেষণ তার? এই অন্বেষণই জীবন। চিদানন্দের চেয়ে বড় আনন্দ পৃথিবীতে আর কি কিছু আছে? কিন্তু? একটা মহা কিন্তু আছে, সংসারদুঃখজলধৌ পতিতস্য/কামক্রোধাদিনক্রমকরৈঃ কবলীকৃতস্য। দুর্বাসনানিগড়ি তস্য নিরাশ্রয়স্য/চৈতন্যচন্দ্রমম দেহি পদাবলম্বম ॥ আমি সংসারে দুঃখসমুদ্রে পড়েছি। পড়েছ তো ওঠার চেষ্টা করো। চেষ্টা করবো কি? কাম ক্রোধ প্রভৃতি হাঙর কুমীর আমায় গিলে ফেলেছে। তাতে কি হয়েছে, বেঁচে তো আছ, নাড়াচাড়া দাও তাহলেই তো ওরা উগরে দেবে। সে তো জানি, কিন্তু আমি যে নিজের দুর্বাসনায় নিজেকে শৃঙ্খলিত করেছি। অন্যে বাঁধলে নাড়াচাড়া দিয়ে ছাড়ানোর চেষ্টা করা যেত। এ যে নিজেই নিজেকে কোনও । তা হলে অন্য কোথাও যাও। কোথায় যাব? আমি যে নিরাশ্রয়। তুমি ছাড়া আর কোনও আশ্রয়স্থল নেই আমার। বেশ, তা হলে আমার চরণ ধরো! প্রভু! আমি বদ্ধ। আমি যাব কি করে! তুমি এসো। এসে তোমার চরণ-তরী দিয়ে আমায় উদ্ধার করো। শ্রীরামকৃষ্ণ মম দেহি পদাবলম্বম্ ॥ আমি এই জানি। তা তুমি যদি অন্যরকম জানো তো তাই জানো। যার যার জীবন, তার তার জীবন। এখানে তো জোরজবরদস্তির কোনও ব্যাপার নেই। কে তোমাকে সন্ন্যাসী হতে বলেছে! কেনই বা হবে! সৎ গৃহীই হও না। ঠাকুর বলেছেন, গৃহদুর্গে থেকে সাধনভজন, সে তো খুবই ভাল কথা। সকলকেই সন্ন্যাসী হতে হবে এমন তো কোনও কথা নেই। সন্ন্যাসী হতে হলে, তোমাকে অনেক কিছু ত্যাগ করতে হবে। সব চেয়ে বড় ত্যাগ হল কামিনীকাঞ্চন। মনে মুখে এক হতে হবে। ভীষণ একটা রোখ চাই। আমাকে পেতেই হবে। মিনমিনে, ম্যাদামারা হলে হবে না। হাজার বই, হাজার উপদেশেও কিছু হবে না। ক্ষুরধার বুদ্ধি দিয়েও হবে না। নায়মাত্মা বলহীনে ন লভ্য। কে তোমাকে সন্ন্যাসী হতে বলেছে বাপু!'

মুকু বললে, 'ও চাইছে ওর বাবাকে কপি করতে। ওর কম্পিটিসান তো মেসোমশাইয়ের সঙ্গে। অসম প্রতিযোগিতা! জীবনে যা পারবে না কোনও দিন। শেয়াল কোনও দিন বাঘ হতে পারে, না পারবে?'

রাগে আমার গা জ্বালা করছে। মুকু আমাকে একবার করে তুলছে, একবার করে ফেলছে। আছড়ে আছড়ে আমাকে মেরে ফেলতে চায়।

মুকু বলেই চলেছে, 'ও ভীষণ নিজের প্রশংসা শুনতে ভালবাসে। ও যে একটা কেউকেটা, জগৎকে দেখাতে চায়। আপনার মতো মহারাজ হবে। সবাই শ্রদ্ধা করবে, ঢিপ ঢিপ প্রণাম করবে। কি ? না সন্ন্যাসী হয়েছেন ?'

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলুম, 'মুখে আর নয়, এইবার কাজে। এক ঝটকায় নিজেকে বের করে নিয়ে চলে যাব।' একজনের পরিবার বললে, 'অমুক লোকের ভারী বৈরাগ্য হয়েছে, তোমার কিছু হল না !' যার বৈরাগ্য হয়েছে, সে লোকটির ষোলজন স্ত্রী, এক-একজন করে তাদের ত্যাগ করছে। স্বামী নাইতে যাচ্ছিল, কাঁধে গামছা, বললে, 'ক্ষেপী ! সে লোক ত্যাগ করতে পারবে না,—একটু একটু করে কি ত্যাগ হয় ? আমি ত্যাগ করতে পারব। এই দেখ, আমি চললুম'। সে বাড়ির গোছগাছ না করে, সেই অবস্থায়, কাঁধে গামছা, বাড়ি ত্যাগ করে চলে গেল। এরই নাম তীব্র বৈরাগ্য। জ্ঞানই হবে আমার আশ্রয়। আমি যদি জ্ঞানী হতে পারি, আমার আচরণে দুটো লক্ষণ দেখা যাবে। আমার কূটস্থ বুদ্ধি হবে। সে-বুদ্ধি আবার কেমন বুদ্ধি, হাজার দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-বিঘ্ন হোক—নির্বিকার, যেমন কামারশালার লোহা, যার ওপর হাতুড়ি দিয়ে পেটে। আর দ্বিতীয়, পুরুষকার—খুব রোখ। কাম-ক্রোধ আমার অনিষ্ট করছে তো একেবারে ত্যাগ ! কচ্ছপ যদি হাত-পা ভিতরে সাঁদ করে, চারখানা করে কাটলেও আর বার করবে না।

মহারাজ আমার চিন্তাকে টেনে নিয়ে গেলেন, বললেন, 'বৈরাগ্য দু'প্রকার। তীব্র বৈরাগ্য আর মন্দা বৈরাগ্য। মন্দা বৈরাগ্য হচ্ছে হবে—ঢিমে তেতালা। তীব্র বৈরাগ্য—শাণিত ক্ষুরের ধার—মায়াপাশ কচকচ করে কেটে দেয়। এইবার নিজের অবস্থা নিজেই বিচার করো। ফেরিঅলার মতো দোরে দোরে ঘুরো না। প্রচারধর্মী হয়ে সন্ন্যাসের আদর্শকে হাস্যকর করে তুলো না। অবিশ্বাসকারীর সংখ্যা কম নয়।'

আমি খুব বিনীত ভাবে বললুম, 'মহারাজ আজ তা হলে আমরা আসি।'

'এসো। তোমার চেয়ে এই মেয়েটিকে আমার বেশি ভাল লেগেছে। ভেতরে একটা ফায়ার আছে। কি নাম মা তোমার ?'

'আমার ডাক নাম মুকু, মহারাজ।'

'বাঃ বেশ সুন্দর নাম।'

মহারাজ পর মুহূর্তেই লেখায় মুখ নামালেন। আমি অপরাধীর মতো, মুকু বীরের মতো, বেরিয়ে এলুম দু'জনে। মুকু রাস্তায় নেমে বললে, 'তোমার কেসটা মোটামুটি ড্যামেজ করতে পেরেছি। মেরামতের বাইরেই চলে গেছে ধরে নাও। এবার একা-একা এলে তোমার যা রিসেপসান হবে, ভাবা যায় না। তবে হ্যাঁ, আমি এলে অন্যরকম হবে। বুঝতেই পারছ, এখন থেকে সংসার ত্যাগ করতে হলেও তোমাকে আমার সাহায্য নিতে হবে। রাম লক্ষ্মণ সীতা, দৃশ্যটা একবার কল্পনা করো। যাঁর কাছে এসেছিলে তাঁর কথাতেই বলি। তোমার তো কিছু মনে থাকে না। ভাসা ভাসা পড়া। পড়লে আর ভুললে'।

আমরা বেড়াতে বেড়াতে হাঁটছি। গঙ্গার দিকে, ট্রাম ডিপো লক্ষ্য করে। সামনেই কালীবাড়ি। বহু প্রাচীন। সেখানে এক জ্যোতিষী মায়ের সামনে বসে এক মহিলার হাত দেখছেন। আমারও ইচ্ছে করছিল হাতটা মেলে ধরি। মুকু ধমকাবে, কুসংস্কার ! বলবে, পুরুষকারই ভাগ্য। বলবে,মেসোমশাইবলতেন, রোজ সকালে, পর পর সাত দিন দুটো করে হাফবয়েল চালাও, ভাগ্যবিশ্বাস চলে গিয়ে পুরুষকারে বিশ্বাস ফিরে আসবে।

আমরা এক ঝলক গঙ্গাদর্শনের জন্যে, জল ঢোকার স্লুইস গেটের দিকে এগিয়ে গেলুম। মুকু বললে, 'এসো একটু বসি দু'জনে। ধর্ম আলোচনা করা যাক।'

জায়গাটা তেমন পরিষ্কার নয়। একটু ইতস্তত ভাব হচ্ছিল। মুকুর শাড়িটা একেবারে পাটভাঙ্গা। আবার এক দাবড়ানি, 'অত পিটপিটে স্বভাব হচ্ছে কেন ? এই নাও ফুঁ দিয়ে ধুলো উড়িয়ে দিলুম, বোসো।'

বসেই পড়লুম, যা থাকে বরাতে। মুকু হাত দুয়েক তফাতে বসল। সূর্য ডুবে গেছে। পশ্চিম আকাশের তলার দিকটা ঘোলাটে। গঙ্গার জলে অন্ধকার গুলছে। নৌকো যাচ্ছে অলস গতিতে, 'হরি দিন তো গেল'-র ছন্দে।

মুকু বললে, 'শোনো, ছোট মুখে বড় কথা শোনো। জীবাত্মা আর পরমাত্মার মধ্যে এক মায়া-আবরণ আছে। এই মায়া-আবরণ সরে না গেলে পরস্পরের সাক্ষাৎ হয় না। পরস্পর মানে জীবাত্মা আর পরমাত্মা। যেমন আগে রাম, মধ্যে সীতা আর পেছনে লক্ষ্মণ। রাম হলেন পরমাত্মা আর লক্ষ্মণ হলেন জীবাত্মা, মধ্যে জানকী মায়া-আবরণ হয়ে রয়েছেন। যতক্ষণ মা জানকী মধ্যে থাকেন, ততক্ষণ লক্ষ্মণ রামকে দেখতে পান না। জানকী একটু সরে, পাশ কাটালে তখন লক্ষ্মণ রামকে দেখতে পান। শোনো, আমি হলুম সেই মায়া। তোমার আর তোমার ঈশ্বরের মাঝখানে আমি আঁচল মেলে দাঁড়িয়ে আছি। হয় আমাকে সরতে হবে, না হয়, না হয় কি ?'

প্রশ্নের উত্তর না জানা বিব্রত ছাত্রের মতো আমি হাঁ করে তাকিয়ে রইলুম। তা হলে কি ?

মুকু অসাধারণ একটা হাসি ছাড়ল। উদাস, মিষ্টি। আমার সতীমা ধ্যান ভেঙে যাবার পর ঠিক এইরকম আধ্যাত্মিক হাসি হাসতেন। মুকু বললে, 'পারলে না তো সমস্যার সমাধান করতে ! বৃথাই হল তোমার পড়া লেখা। খনার মতো তোমাকে আমি সবেতেই হারিয়ে দিচ্ছি। আবার শোনো, ট্র্যান্সফরমেশান, রূপান্তর, তোমার কেমিস্ট্রিতে আছে। মায়ার দুটো রকম—বিদ্যা আর অবিদ্যা। তার মধ্যে বিদ্যা মায়া আবার দু'প্রকার— বিবেক এবং বৈরাগ্য। আর অবিদ্যা মায়া ছ'প্রকার—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য। বিদ্যা মায়াকে আশ্রয় করলে তুমি ঈশ্বরের সন্ধান পেলেও পেতে পারো।আর যদি অবিদ্যা মায়াকে আশ্রয় করো তা হলে বুঝতেই পারছ, আমি আর আমার করতে করতেই মরবে। কামের শেষ নেই। সেও এক ভিসিয়াস সার্কল। এক থেকে আর এক। গীতা নিশ্চয় পড়া আছে ? দ্বিতীয় অধ্যায়ের বাষট্টিতম শ্লোকটা বল।'

আবার হাঁ করে তাকিয়ে রইলুম, 'মুখস্থ নেই।'

'তোমার আর সন্ন্যাসী হয়ে কাজ নেই। ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে, মনে পড়ছে ?'

'সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।'

'এই তো, খোকার আমার মনে পড়েছে। এইবার চেনটা মনে করো। বিষয়ের চিন্তা করতে করতে জন্মায় আসক্তি। আসক্তি থেকে কাম, কাম প্রতিহত হলে ক্রোধ, ক্রোধ থেকে বিবেকনাশ, বিবেকনাশ থেকে শাস্ত্রজ্ঞান লোপ, শাস্ত্রস্মৃতি লোপ, স্মৃতিবিভ্রম মানে সদসদ্‌বিচারবুদ্ধি বিনষ্ট, বিচারবুদ্ধি গেলে রইলটা কি ? পুরুষার্থের অযোগ্য। তা হলে ? একটাই পথ। আমার হাতে পায়ে ধরো। প্রার্থনা করো। আমি মায়া, কিন্তু আমি যেন তোমার বিদ্যা-মায়া হই। তা হলে যদি কোনও রাস্তা হয়।'

'আমি কেমন করে করব। ও তো তোমার হওয়ার ব্যাপার। তুমি হবে। তুমি আমাকে বিবেক আর বৈরাগ্য দেবে।'

'বিবেক তোমাকে আমি অনবরতই দিচ্ছি আর বৈরাগ্যের পথ খুলে দিয়ে গেছেন

মেসোমশাই। তুমি তো মহাভাগ্যবান। সংসারে তোমার কেউ নেই। সব ফাঁকা। তোমার সব বাঁধনই তো তিনি কেটে দিয়েছেন। আর আমি ?' মুকু খিলখিলিয়ে হেসে উঠল। বাতাসে চুল উড়ল। কাঁধের কাছের শাড়ির আঁচল কাঁপল। হাসিতে শান বাঁধানো ব্যঙ্গ।

মুকু বললে, 'যে করে তোমার আশ তাকে তো তোমার মতোই করে দেবেন ভগবান। তুমি দেবতার মতো পিতা দেখেছ। মহারাজেরও মহারাজ। তুমি সঙ্গমরত পিতা দেখেছ ? বয়েসের ভারে স্থবির তবু' মুকু হঠাৎ গান গেয়ে উঠল সুন্দর গলায়,

এখনো গেল না আঁধার, এখনো রহিল বাধা।
এখনো মরণব্রত জীবনে হল না সাধা ॥
কবে যে দুঃখজ্বালা হবে রে বিজয়মালা।
ঝলিবে অরুণরাগে নিশীথরাতের কাঁদা ॥
এখনো নিজেরই ছায়া রচিছে কত যে মায়া।
এখনো কেন যে মিছে চাহিছে কেবলই পিছে,
চকিতে বিজলি-আলো চোখেতে লাগালো ধাঁদা ॥'

গান শেষ করেই মুকু বললে, 'আই হেট মাই ফাদার। পরিচয় দিতে লজ্জা করে। পরিচয় মুছে ফেলাও যায় না। এক জরদগব গদগদে এক মহিলাকে আঁকড়ে আঁকড়ে ধরছে। সে-দৃশ্য সারা জীবনেও ভোলা যাবে না। প্রেম এক জিনিস, কাম আর এক জিনিস। একটা স্বর্গীয় আর একটা পাশবিক। একটা আলো আর একটা অন্ধকার। তোমার মধ্যে কাম দেখলে আমার পেটাতে ইচ্ছে করে। চলো, এই সংসারে কিছু নেই, বেরিয়ে পড়ি দু'জনে। যথা বালস্য বেতালো মৃত্যুপর্যন্ত দুঃখদঃ। অসদেব সদাকারং তথা মূঢ়মতের্জগৎ ॥ অবশ্যই মানে বুঝলে না। বুঝলে তারিফ করতে। বালকের কল্পনায় আছে ভূত। আমরণ সেই ভূত তাকে ভয় দেখায়। ঠিক সেইরকম অজ্ঞানীর কাছে এই জগৎ এক ভীষণ সত্য। মৃত্যুপর্যন্ত সে এর সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকে। সোমশর্মার পিতার গল্প জানো? জানো না। কেমিস্ট্রি ছাড়া কিছুইজানো না।একমুখী জ্ঞান। অতি দরিদ্র কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষী। দেশে তখন আকাল, দুর্ভিক্ষ। এক মুঠো ছাতু কাপড়ে বাঁধা। কোনও ক্রমে সংগ্রহ করেছে। ভীষণ শ্রান্ত। একটা গাছের তলায় এসে বসেছে। ছাতুর পুঁটলিটা খুলে হাতে সব ঢেলেছে। এইবার সেই ছাতুর দিকে তাকিয়ে সে ভাবছে, ছাতুটা সে বিক্রি করবে। যে-পয়সা পাবে সেই পয়সায় সে গরু কিনবে। ক্রমে গরুর বংশ বৃদ্ধি হবে। অনেক বলদও হবে। সেই বলদ দিয়ে হবে চাষবাস। ধনে ধান্যে সে তখন বড়লোক। বিশাল বাড়ি, দাসদাসী। ঐশ্বর্য দেখে সুন্দরী কন্যার পিতা ছুটে আসবে। বিয়ে হবে। একটি ছেলে হবে।ছেলের নামরাখবো সোমশর্মা। প্রিয়পুত্র। তার অনাদর হলেই বউকে মারবো এক চড়। হাতের সব ছাতু মাটিতে পড়ে, বাতাসে উড়ে গেল হুস করে। লোকটি তখন বিলাপ করতে লাগল, হা কষ্ট ! আমি কি মন্দভাগ্য। এত কষ্টের সংগ্রহ আমার সব ছাতু কোনও কাজেই লাগল না। তখন শাস্ত্রকার বলছেন, অভুতাভিনিবেশেন স্বাত্মানং বঞ্চয়ত্যয়ম। অসত্যপি দ্বিতীয়েছর্থে সোমশর্মপিতা যথা। যা মিথ্যা, যা কল্পনা, তাতে মশগুল হয়ে গেলে, আসল জিনিস হারাতে হয়। সব মিথ্যা। সব ভ্রান্তি। কামুক কি ভাবে জানো, আহা ! কি সুন্দর ভুরু, কি সুন্দর নাক, কি সুন্দর মুখ, কি অপূর্ব চোখ, কি মোহিনী হাসি, হাঁচরপাঁচর করে জড়িয়ে ধরলে। আসলে কি, একটা শরীর। তোমার কেমিক্যাল অ্যানালিসিসে কি বেরবে, হাড়ের খাঁচা, মেদের স্তর, মাংসের প্রলেপ, চামড়ার আস্তরণ, লিভার, পীলে, মল, মূত্র, কফ। অবিদ্যার এই হল প্রভাব। অনিত্যে নিত্যবুদ্ধি, অশুচিতে শুচিবুদ্ধি, অনাত্মাতে আত্মবুদ্ধি, দুঃখে সুখবুদ্ধি করিয়ে

ছাড়ে। মানুষকে উট করে দেয়। কাঁটা গাছ চিবোচ্ছে, রক্ত গড়াচ্ছে দু'কষ বেয়ে। চলে তোমাকে আজ আকণ্ঠ মদ খাওয়াবো।'

'মদ!'

'হ্যাঁ মদ। মদ খেলে মানুষের আসল প্রবৃত্তি জেগে ওঠে। আমি পরীক্ষা করে দেখবে তোমার ভেতর ঠিক ঠিক কি আছে? কে আছে?'

মুকু ঝেড়ে ঝুড়ে উঠে পড়ল।

১৬

We're always too much out or too much in

মুকু বললে, 'সময় নষ্ট না করে ট্রামে উঠে পড়। শ্যামবাজারে নেমে আমরা একটা ভাল দোকান থেকে বোতলটা কিনবো। আজ তোমার পরীক্ষা। দেখতে চাই শয়তান বসে আছে, না দেবতা! কে বসে আছে।'

আমি প্রতিবাদ না করে পারলুম না, 'আমাকে কি তুমি মানুষ গিনিপিগ ভাবলে মুকু? তোমার মাথার সব স্ক্রু ঢিলে হয়ে গেছে। কেউ ওই ভাবে মদ খায়! বেশি মদ খেলে মানুষ মাতাল হবেই। জানা কথা। ওটা কোনও পরীক্ষা নয়। পাগলামি। আমার এই দুর্দিনে আমাকে নিয়ে আর খেলা কোরো না। তুমি যেন বেড়াল, আর আমি একটা ইঁদুর। তুমি কেমন করে ভাবলে, তোমার পরীক্ষার জন্যে আমি মদ গিলবো। আমার একটা মান-সম্মান নেই!'

'তোমার উচিত নিজেকে চেনা। নিজেকে নিজে ঠকিও না।'

'তা বলে আমাকে মদ খেয়ে পরীক্ষা করতে হবে?'

'মদ খেলে কি হয় জানো? আমি দেখেছি। কেউ ভেউ ভেউ করে কাঁদে। কেউ হো হো করে হাসে। কেউ কাঁচা খিস্তি করে। কেউ ভোম মেরে বসে থাকে। কেউ তার ব্যর্থ প্রেমের কথা বলে। কেউ তার দুঃখ ও আশঙ্কার কথা বলে। কেউ পরিবারকে গালাগাল করে। কেউ তার গোপন পাপের কথা বলে গড় গড় করে। কেউ মা মা বলে চিৎকার করে, শ্যামা সংগীত গায়। কেউ আবার মেয়েছেলের জন্যে ক্ষেপে ওঠে। মানুষের ভেতরটা বেরিয়ে আসে। প্লিনি সেই কোন কালে বলে গেছেন, *In vino veritas. Truth is in wine.* আমি একবার খুব খেয়েছিলুম। মীরাবাঈ হয়ে সারা রাত সে কি নাচ! ময় সে গরজ নিশাত হৈ কিস রূসিয়াহ কো।/ ইক গুনা বেখুদী মুঝে দিন রাত চাহি এ ॥ মজা লুটতে মদ খেয়েছে কোন সে মুখপোড়া? দিবারাত্তির একটু ভুলে থাকার জন্যেই মদ খায় গালিব।'

মদ নিয়ে ডিবেটের ফাঁকেই ট্রামটা গড় গড় করে ডিপো ছেড়ে বেরিয়ে গেল। ট্রামের আর কিসের মাথা ব্যথা। পৃথিবীর যাবতীয় মূল্যবান সমস্যার মধ্যে আমাদের এই অদ্ভুত সমস্যা পড়ে না। খাওয়া-পরা আর মাথা গুঁজে বেঁচে থাকার সমস্যা ছাড়া পৃথিবীতে আর কোনও সমস্যা তেমন পাত্তা পায় না। আত্মার সমস্যা তো শৌখিন সমস্যা! ভরা পেট,

নরম বিছানা, গরম ঘর, নিত্যানন্দ সঙ্গী, তখনই ওইসব ভুতুড়ে উপদ্রব শুরু হয়। আত্মানং বিজালিখ। জানলেই বা কি ? না জানলেই বা কি ! পাঁয়তাড়া কষতে কষতেই জীবন ফৌত। নচিকেতা যদি এই শতাব্দীতে জন্মাতেন, তা হলে কি মৃত্যুমহারাজের সঙ্গে অমন অপার্থিক আলোচনা হত। রাজার ছেলে ক্যাডিলাক চেপে লাসভেগাসে ঘুরে বেড়াতেন। সঙ্গে টমটম। বেলোয়ারী সুন্দরী। মার কাটারি। আত্মা তো আছেই। অবিনশ্বর। পুলি পিঠের মতো। দাঁত বসানো যায় না। পটলের মতো, টর্পেডোর মতো আকৃতি। গেলাও যায় না। যমরাজ বারকতক পাগলে উগরে দেন। অতি অখাদ্য। কনসেন্ট্রেটেড মহাজীবন। আত্মা যে দেহের ক্যাপসুলে বৈঠকখানা করেছে, সেইটাই তো সব। একবারের খেলা। একবারই হরিশঙ্করের পুত্র। একবারই মুকুর সঙ্গে মেলামেশা। কখনও তিরস্কার, কখনও ভালবাসা। সব একবার। অদূরেই কাশীমিত্রের শ্মশান। এই মুহূর্তে সেখানে দাহ হচ্ছে আত্মার খোল। নামরূপ পুড়ছে পড় পড় করে। ছেলে কাঁদছে। মেয়ে কাঁদছে। বউ কাঁদছে। সব একবার। জন্ম একবার। সম্পর্ক একবার। পরের বার যদিও আসি, পিতা হবেন না হরিশঙ্কর। মুকু আসবে না ভালবাসতে। আমি থাকবো না, তবে মানুষ থাকবে। অসংখ্য মানুষ। পিতাপুত্রের সম্পর্ক থাকবে। প্রেম থাকবে। প্রেমিকা থাকবে।

ঝটিতি একটা ভাবনার স্রোত বয়ে গেল। আর খ্যাঁস করে একটা মটোর গাড়ি আমাদের পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে থেমে গেল। পেছনের জানালা দিয়ে একটা মুখ বেরিয়ে এল।

সর্বনাশ ! সুরঞ্জনা !

নিমেষে দরজা খুলে নেমে এল সুরঞ্জনা। গাড়িটা একটু এগিয়ে গিয়ে রাস্তার ধার ঘেঁষে দাঁড়াল। খেল দেখল মুকু। আমি মুকুর ভয়েই কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিলুম। মুকু প্রায় ছুটে গিয়ে সুরঞ্জনাকে জড়িয়ে ধরল, 'সুরঞ্জনা, আমার নাম মুকু। আমিই সেদিন তোমার গাড়িতে হামলা করেছিলুম। আমি একটু পাগলি আছি তো। তুমি কিছু মনে কোরো না।'

রাস্তার মাঝখানে সুন্দরী সম্মেলন। আমি বললুম, 'সরে এসো, গাড়ি চাপা পড়বে।'

দুজনে প্রায় জড়াজড়ি অবস্থায় পাশে সরে এল। ফরফর করে দখিনা বাতাস বইছে। সুরঞ্জনার সিল্কের শাড়ির আঁচল উড়ছে। আজ যেন সেদিনের চেয়ে সুন্দরী দেখাচ্ছে। সুরঞ্জনা মুকুর চেয়ে লম্বা। বিলিতি ফিগার।

সুরঞ্জনা বললে, 'সেদিন খুব রাগ হয়েছিল। এই মুহূর্তে সব রাগ জল হয়ে গেল। তুমি ওঁর কে হও ?'

'মাসতুতো বোন।'

'তাই না কি ? সেদিন ভেবেছিলুম অন্য রকম। ইন ফ্যাক্ট ওঁর ওপর আমার একটা খুব খারাপ ধারণা হয়ে গিয়েছিল। কোন অপরাধে তুমি অমন খামচাখামচি করে নামালে ?'

'ওনার মাথায় ঢুকেছে সন্ন্যাসী হবেন। মাঝেমাঝেই বিবাগী হয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। সাধু সন্ন্যাসীদের আখড়ায় গিয়ে পড়ে থাকে। ঠিক মতো খাওয়াদাওয়া হয় না। আর আমরা ভেবে মরি। একে মা-মরা ছেলে, তায় আবার পিতা নিরুদ্দেশ। গত কয়েকদিন বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিল। সেদিন পড়বি তো পড় আমার সামনে। পাছে পালায় তাই চেপে ধরেছিলুম। তুমিই বলো, আমি কিছু অন্যায় করেছিলুম ?'

'অবশ্যই না। তুমি যা করেছিলে আমিও তাই করতুম। এত বড় ছেলে, তার কোনও বোধবুদ্ধি থাকবে না ?'

'তুমিই বলো ভাই, আমাকে বিশাল একটা বাড়িতে একা ফেলে রেখে উনি উধাও হয়ে গেলেন। সেই বাড়িতে আবার ভূত আছে।'

'একদিন আমাকে নিয়ে যাবে তোমাদের বাড়িতে।'

'আজই চলো।'

'আমি যে মহারাজের কাছে যাচ্ছি। তোমরা যাবে না?'

'আমরা তো ঘুরে এলুম। মহারাজ আজ ভীষণ ব্যস্ত লেখা নিয়ে। মুখ তুলে কথা বলার সময় নেই। কারোকে দেখলেই ভীষণ বিরক্ত হচ্ছেন।'

'তাহলে?'

'তাহলে আজ আর বিরক্ত না করাই উচিত।'

সুরঞ্জনা আমার দিকে তাকাল। কিছুক্ষণ ভাবল। শেষে বললে, 'তোমরা আমাদের বাড়িতে চলো না। আজ বাবা বাড়িতে আছেন, ওঁর পিতার নিরুদ্দেশের ব্যাপারে কথা বলা যাবে। একটা কিছু করা দরকার তো?'

মুকু বললে, 'তিনি কি ভাবে সাহায্য করতে পারেন?'

'তিনি তো পুলিসের বড় অফিসার। আমার দাদাকেও তো পাওয়া যাচ্ছে না।'

'নিরুদ্দেশের ধুম পড়ে গেছে।'

মুকু আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'কি, যাবে না কি?'

'যেতে পারি। আমাদের তো এখন কোনও কাজ নেই।'

আমার মতলব অন্য। সুরঞ্জনাদের বাড়িতে গেলে বেশ কিছুটা সময় কেটে যাবে। মুকু যা একগুঁয়ে আজ রাতে তা না হলে আমাকে মদ খাইয়ে দিদির সামনে একটা কেলেঙ্কারি করিয়ে ছাড়বে।

মুকু বললে, 'বেশ তাহলে চলো।'

সুরঞ্জনা বললে, 'তাহলে আমি মাকে প্রণাম করে আসি। তোমরা গাড়িতে বোসো।'

'তুমি এসো না। আমরা এখানেই আছি।'

সুরঞ্জনা হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে গেল। গাড়িটা রাস্তার পাশেই দাঁড়িয়ে রইল।'

মুকু সেই দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললে, 'ভীষণ স্মার্ট মেয়ে। এর প্রেমে তো তুমি পড়বেই। চাবুকের মতো চেহারা। হাত কেন, পায়ে ধরতেও তুমি প্রস্তুত, কি বলো?'

'আমি সহজে অত· টলি না মুকু।'

'তাই না কি মহারাজ? গোল্লা-গোল্লা চোখে তো তাকিয়ে আছ?'

'আমার হঠাৎ মনে হল, আসন না করলে এমন স্লিম চেহারা হয় না?'

'সব জরীপ করা হয়ে গেছে? ভাইট্যাল স্ট্যাটিস্‌টিকস?'

'তোমাকে আমি পারব না মুকু। তুমি আমার মনের আয়না। ধরেছ ঠিক। কি করব বলো? আমি পারি না। বারে বারে হেরে যাই।'

'এসো আজ আমরা একটা কাজ করি। আমরা গাড়ির ড্রাইভারকে বলে সরে পড়ি। তোমার এই সেতুটাও পুড়ে যাক। মহারাজের কাছে তো তোমার দফারফা করে দিয়ে এসেছি। এটাও শেষ করে দি। তা না হলে এই আকর্ষণও তোমাকে কিছুদিন ঘুরিয়ে মারবে। এই মেয়েটির নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবার ক্ষমতা আছে। এর দেহ-লক্ষণ ভাল নয়।'

'তোমার ওটাও কি সাবজেক্ট ছিল?'

'আমার মায়ের কাছে শেখা। হস্তিনী, পদ্মিনী, শঙ্খিনী। এ তোমার শঙ্খিনী। লম্বা, একহারা। পুরুষালি চেহারা। হাত, পা লম্বা লম্বা। বুক তেমন উঁচু নয়। সাপের ফণার মতো গলা। ধারালো মুখ। গাদা গাদা ছেলেকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবে। বেশ স্বার্থপর।

কাজের সময় কাজি, কাজ ফুরোলেই পাজি। যে কোনও কাজ আদায়ের জন্যে এর হলাকলার শেষ থাকবে না। এর পক্ষে পর পর তিন চারবার বিয়ে করাও অসম্ভব নয়। কোনও দিনই সেই অর্থে সংসারী হবে না। এর খপ্পরে যে পড়বে হয় তাকে আত্মহত্যা করতে হবে, না হয় সারা জীবন কেঁদে বেড়াতে হবে। ধরবে সব শুষে নিয়ে ছিবড়ে করে ফেলে দেবে। এর আকর্ষণও হবে ভয়ঙ্কর। ভীষণ রাগী। এখন দেখ কি করবে ?'

'যা মনে এল, জ্যোতিষীর মতো গড় গড় করে বলে গেলে। যার এত ভক্তি, মায়ের সামনে বসে যে ভাবে কাঁদে, সে কেমন করে ছেলেধরা হয় মুকু ?'

'তুমি কেমন করে মেয়েধরা হলে প্রভু ? নিজেই দেখো। তুমি নিজেই কত রকমের। কত রূপ তোমার ? চলো ক্লিন সরে পড়ি।'

'সেটা খুব খারাপ হবে। প্রচণ্ড অভদ্রতা হবে। অশিক্ষিতের মতো কাজ হবে। তোমাকে আজ আমি এই মন্দিরের সামনে বলছি, মা আমার সাক্ষী, তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা তুমি আমাকে বিশ্বাস করো।'

'ওদের বাড়ি একবার যাওয়া মানে, তুমি বারেবারে যাবে। তোমার ধর্মকর্ম, লেখাপড়া, জীবন যৌবন সব যাবে।'

'তোমার মাথা !'

'এখন আমার মাথা তো ! কয়েকদিনের মধ্যেই তোমার মাথা হবে, এইটা তুমি লিখে রাখতে পারো। এই মেয়ে তোমাকে ভালবাসবে না, তোমাকে ব্যবহার করবে, জুতোর মতো, তোয়ালের মতো, চিরুনির মতো, হাত ধোয়ার গামলার মতো, গা রগড়াবার ছোবড়ার মতো। এইবার কি করবে দেখো।'

'আমরা যাবো। আমার পিতার শিক্ষা, ডোন্ট বি ইনডিসেন্ট। কথা দিলে কথা রাখবে। হ্যাঁ বলবে তো হ্যাঁ, না বলবে তো না। ভদ্রতা, সভ্যতা তোমার নিজের অলঙ্কার।'

'তা হলে চলো। দেখা যাক তোমার বরাতে কি আছে ? দেখি ইঁদুর শেষ পর্যন্ত কলে পড়ে কি না !'

আমাদের গবেষণা থামতে না থামতেই সুরঞ্জনা ফিরে এল। সামনে থেকে দেখে একবারও মনে হল না, মুকু যা বললে, তা সত্যি হতে পারে ! সুস্থ, সবল, চোখা একটি মেয়ে। তরোয়ালের মতো এগিয়ে আসছে। ঝকঝকে মুখ, ঝকঝকে শরীর। কবিতার মতো।

আমি বুদ্ধি করে সামনের আসনে গিয়ে বসে পড়লুম। সুরঞ্জনা কয়েক বার বললে, 'পেছনে আসুন, পেছনে আসুন। তিজনে এক সঙ্গে বসি।' এড়িয়ে গেলুম ও চক্করে আমি নেই। কোথা থেকে কি হয় কে জানে বাবা ! দুজনের গজর গজর লেখাপড়ার আলোচনা চলেছে। মাঝে মাঝে হাসি হচ্ছে। গাড়ি চলছে। আমি কলকাতার চলমান দৃশ্য দেখছি। সন্ধ্যা নেমেছে। পুট পুট আলো জ্বলে উঠছে। একটু পরে আলোর চোখ আরও ফুটবে। অন্ধকার আরও একটু ঘন হোক।

সুরঞ্জনাদের সাবেক বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়াল। বিশাল বাড়ি। ফটকে মার্বেল স্ল্যাব। লেখা রয়েছে, 'শান্তিধাম'। বড় বাড়ি দেখলে ভয় করে। ভেতরে কোন অহঙ্কারের পরিবেশে গিয়ে পড়ব কে জানে ! পুলিসের বড় কর্তা মানে আই· পি· এস·। সায়েবী মেজাজের মানুষ হওয়াই স্বাভাবিক। ড্রেসিং গাউন। মুখে পাইপ কি চুরুট। চিবিয়ে চিবিয়ে কথা। সেই মানুষের স্ত্রীর ঠাট আর ঠমক কেমন হবে তাও তো জানি না।

ভয়ে ভয়ে প্রবেশ। চক মেলানো বাড়ি। মাঝে বাঁধানো উঠান। লাল রক। ঘর। ঘরের

পর ঘর। সবই বেশ পরিষ্কার। ঝকঝকে তকতকে। কোথাও অর্গান বাজছে। গম্ভীর সুরে। চওড়া সিঁড়ি ধাপে ধাপে দোতলায় উঠছে। লোহার ঢালাই রেলিং। অর্গানের সুর আরো সুস্পষ্ট হল। দোতলার বারান্দা। আমরা এগিয়ে চলেছি। দরজার পর দরজা। সুরঞ্জনা সামনে পেছনে মুকু, সব পেছনে আমি। বারান্দার বাহার দেখে মুগ্ধ আমি। বড়লোকরা বাঁচতে জানে। বারান্দায় চিক ঝুলছে। গোটানো। প্রয়োজনে নামান হবে। পেতলের টবে ভাল ভাল গাছ। ফার্ন। পাম। অর্কিডও ঝুলছে ছাড়া ছাড়া। সাদা শ্বেত পাথরের মেঝে। কোথাও এতটুকু দাগ নেই। আমার মাথা ঘুরে যাচ্ছে। কি কাণ্ড রে ভাই! ক্রমশই আমি যেন ছোট হয়ে যাচ্ছি। লেংটি ইঁদুরের মতো। এই বাড়ির মেয়ে সুরঞ্জনা। আমি তার আঙুল নিয়ে খেলা করেছি। অল্প অল্প ডিগবাজি খাওয়ার ভাবও হয়েছিল। মিথ্যে কথা বলব না। ইংরেজি ফিল্মের নায়িকার মতো দেখতে যাকে, সে তো টাল খাওয়াবেই।

আমি পায়ে পায়ে শহরের রাস্তায় গাঁয়ের লোকের মতো লম্বা লম্বা বারান্দা ধরে এগোলেও, মুকু একেবারেই স্বাভাবিক। তর তর করে চলেছে। যেন নিজের বাড়ি। এই বাড়ির সঙ্গে মুকুকে বেশ মানিয়ে গেছে। সুরঞ্জনা আর মুকু দুজনেই সমানে সমান। হঠাৎ আমার মাথায় আর একটা চিন্তা খেলে গেল। সুরঞ্জনার দাদা যদি ফিরে আসেন তাহলে আমি নিজে সম্বন্ধ করে মুকুকে এই বাড়ির বউ করে দেবো। যা মানাবে! সাঙ্ঘাতিক!

আমরা অবশেষে একটা বড় ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালুম। সামনের দেয়ালে, একেবারে মেঝে থেকে ছাত পর্যন্ত লম্বা বিশাল এক পেন্টিং। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ। ছবিটি দেখামাত্রই মনে হল নিজের পরিবেশ ফিরে পেলুম। ঘরে খুব কাজ করা পুরু একটা কার্পেট পাতা। কার্পেটে দশ বারোজন মহিলা বসে আছেন বিভিন্ন বয়সের, ঘর আলো করে। শ্রীরামকৃষ্ণের ছবির একপাশে মা সারদা, অন্যপাশে স্বামী বিবেকানন্দ। সিলিং-এ একটা ঝাড়বাতি। ঠাকুরের পায়ের কাছে একটা পাথরের বেদী। ধূপ জ্বলছে। ঠাকুরের দিকে মুখ করে লম্বা চওড়া এক ভদ্রলোক উপবিষ্ট। সিল্কের ধুতি উত্তরীয়। একপাশে অর্গানে বসেছেন এক মহিলা। ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেহারা। দেখলেই মনে হয় পাঞ্জাবী। বাঙালির এমন দীর্ঘ, ওয়ালনাটের মতো চেহারা কদাচিৎ দেখা যায়। সুরঞ্জনার মুখের সঙ্গে ভীষণ মিল। সুরঞ্জনার মা-ই হবেন। আমরা পা টিপে টিপে প্রায় নিঃশব্দে কার্পেটের একপাশে বসে পড়লুম। আর সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হল আরত্রিক ভজন, খণ্ডন ভববন্ধন বন্দি তোমায়।/ নিরঞ্জন নররূপধর নির্গুণ গুণময় ॥ সাদা মার্বেল পাথরের বেদী। সারসার ফিনফিনে লাল গোলাপ। ধূপের ধোঁয়ার কুণ্ডলী। অর্গানের গম্ভীর সুরেলা আওয়াজ। ইমনে বাঁধা ভজন। দখিনা বাতাস। রমণীয় রমণীকুল। স্বর্গ যেন স্লিপ করে পৃথিবীতে নেমে এসেছে। আমার একপাশে মুকু, অপর পাশে সুরঞ্জনা। একেবারে সামনে রক্ত লাল ব্লাউজপরা একটি মেয়ে। সামনে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ। জননী সারদা। বিশ্ববিবেক বিবেকানন্দ। মাথার ওপর টিংলিং ঝাড। বড় নেশা। জীবনের নেশা। বেঁচে থাকার কারিগরি। সবাই গাইছেন। আমি আর স্থির থাকতে পারলুম না! ধরে ফেললুম নিখুঁত সুরে। কোনও জায়গাতেই ছুট হবার সম্ভাবনা নেই। বহুবার গেয়েছি এই আরত্রিক সঙ্গীত। আমার গলা ডি শার্পে খেলে। এঁরা ধরেছেন সিতে। আমার কাছে মাখন। ভজন এক সময় শেষ হল। ভদ্রলোক আরও কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন ধ্যানে। নিশ্চল প্রস্তর মূর্তি। একসময় সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালেন। যেন অ্যাটলাস। অর্ধনিমিলিত চোখে একবার তাকালেন সকলের দিকে। খুব ছোট, নিটোল চমচমের মতো প্রসাদ হাতে হাতে আমার হাতেও এল। অপূর্ব স্বাদ।

ভুরভুরে গোলাপের গন্ধ।

সুরঞ্জনা ভদ্রলোকের সামনে আমাকে হাজির করল। পরিচয় আর কি দেবে! আমার পরিচয় আর কতটুকু জানে। নিজেকেই নিজের পরিচয় দিতে হল। কিই বা আমার পরিচয়। আমার পিতার পরিচয়ই পরিচয়। যেই বললুম আমার পিতার নাম, শ্রীহরিশঙ্কর, তাঁর কপালে তিনটে ভাঁজ পড়ল

'হরিশঙ্কর! স্কটিশে পড়তেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ!

তিনি সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। বিশাল বুকে আমি এক ঘুঘু। আমার মাথাটা তাঁর বুকের কাছে। এত লম্বা তিনি।

আমাকে বুকে চেপে ধরে বললেন, 'তুমি হরিশঙ্করের ছেলে! হরিশঙ্কর আমার এক বছরের সিনিয়ার। হি নেভার স্টুড সেকেন্ড ইন এনি এগজাম। যেমন অঙ্কে তেমনি ইংলিজিতে। আমি হরিদার কাছে অঙ্ক শিখেছি। হি ওয়াজ মাই টিচার। তুমি আমার গুরুপুত্র।'

আমি আর মুকু তাঁকে প্রণাম করলুম।'

'মেয়েটি কে?'

'আমার মাসতুতো বোন।'

'বেশ দেখতে তো। দেবীর মতো। যোগাসন করো?'

'আজ্ঞে না।'

'আসন করবে। অ্যান আউন্স অফ একস্ট্রা ফ্যাট। আমি, সুরঞ্জনা, আমার স্ত্রী, আমরা সবাই আসন করি। একটা দিনও ফেল করি না।'

সুরঞ্জনার মা এসে দাঁড়িয়েছেন। আমরা তাঁকেও প্রণাম করলুম। ঠাকুর ঘর ছেড়ে বসার ঘরে এসে বসলুম। দেয়াল দেখা যাচ্ছে না সবই বই। সুন্দর একটা লাইব্রেরি। ভদ্রলোক ধুতি আর পাঞ্জাবি পরে, এসে বসলেন। মেহগনি কাঠের ঝকঝকে সুন্দর টেবিল। সুন্দর টেবিলে ভীতিপ্রদ একটা জিনিস পড়ে আছে। ভয়ে ভয়ে আমাকে সেদিকে তাকাতে দেখে ভদ্রলোক বললেন, 'রিভলভার আগে কখনও দেখনি, তাই না? বড় সুন্দর জিনিস। মসৃণ। শক্তিশালী। ক্লোজ রেঞ্জ থেকে একবার ট্রিগার টিপলেই ভবের খেলা শেষ। আমার দুই সঙ্গী, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ আর এই মারণাস্ত্র। দুটোই মুক্তির পথ। জীবন্মুক্তি আর দেহমুক্তি। তোমার চোখের সামনে থেকে এটা সরিয়ে রাখব?'

মুকু আমার পাশে বসেছিল, সে বললে, থাক না। বেশ সুন্দর দেখতে। গুলি কি ভরা আছে কাকাবাবু?' মুকু সম্পর্ক স্থাপন করে ফেলল। মুকুর নিমেষে এই আপন হয়ে যাবার ক্ষমতা তুলনাহীন।

'হ্যাঁ মা। লোডেড। তবে লক করা আছে। এখন বলো, হরিদার জন্যে কি করা যায়? সুরঞ্জনা আমাকে বলেছিল তোমার কথা। তবে ও তো আমাকে তখন নাম বলতে পারেনি! হরিদার হঠাৎ কি হল! সে তো জীবনকে ভালবাসত। আমাদের বলত, সমুদ্রে নামলে ঢেউ তো খেতেই হবে। যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই তো করতেই হবে। ইউনিভার্সিটি ইনস্ট্যুটে আমাদের সঙ্গে ব্যায়াম করত। বলত নড়বড়ে রুগণ্ শরীর নিয়ে ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম কোনওটাই হয় না। পৃথিবীটা কল্পনার জায়গা নয়, কাজের জায়গা। ঘোড়াকে দেখে শেখো। ঘোড়া কি কবিতা লেখে! অলওয়েজ অন দেয়ার লেগস। ঘোড়ার শোয়া মানেই মৃত্যু। গতি, বীরত্ব, বিশ্বস্ততা এই তিন গুণের চেহারা হল ঘোড়া। আমরা হরিদাকে কখনো বসে থাকতে,

গালগল্প করতে দেখিনি। ডে ড্রিমিং-এর ঘোরতর বিরোধী। মহাত্মা গান্ধীর মতো সত্যের পূজারী। বলত, মাই এক্সপেরিমেন্ট উইথ ট্রুথ। সেই মানুষের হঠাৎ কি হল!'

চায়ের ট্রে নিয়ে ঢুকছে কাজের মহিলা। সুরঞ্জনার মা আমাদের সামনে কাপ রাখতে রাখতে বললেন, 'শুধুই চা। অন্য কিছু নেই। কারণ যতদিন না আমার ছেলেকে পাওয়া যাচ্ছে ততদিন অতিথি আপ্যায়ন বন্ধ।'

মুকু বললে, 'চায়েরই বা কি প্রয়োজন ছিল কাকিমা?'

'এই সময় আমরা সবাই চা খাই। এটা আলাদা কিছু নয়।'

ভদ্রমহিলাকে যতই দেখছি, ততই মনে হচ্ছে, বাঙালি নন। মুখের গড়ন, শরীর, গায়ের রঙ। যদিও খুব সুন্দর বাংলা বলছেন।

চায়ে চুমুক দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'আমার ছেলের জন্যে সারা ভারতে তল্লাসি চালিয়ে কোনও সুরাহা হল না আজও। নিজের ক্ষমতার ওপর অবিশ্বাস এসে যাচ্ছে। সেই ছাত্রজীবনে হরিদা আমাকে একটা কথা বলেছিল, আজও সেই কথার জোরে অচল, অটল আছি। বলেছিল, নিজের শক্তিকে একটা ওয়ালনাটের মতো হৃদয়ে ধরে রাখবে। বিক্ষিপ্ত ঘটনা যখন উল্টে ফেলে দিতে চাইবে, তখন চোখ বুজিয়ে ভেবে নেবে, একটা শক্তির বেল্ট সাপের মতো পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে তোমার শরীরের নিচের দিক থেকে ওপরে উঠছে। শরীরের এক ইঞ্চিও ফাঁকা থাকছে না। সোজা ওপরে উঠে গিয়ে পেছন দিক থেকে মাথার ওপর ফণা তুলে দুলছে। কি অপূর্ব! ওই প্রক্রিয়ায় আমি যে কি শক্তি পাই, বলে বোঝাতে পারব না। হি ওয়াজ এ যোগী। সেই আজ আমার গুরু। বলেছিল, মনের টালমাটাল অবস্থায় অঙ্ক নিয়ে বসবে। অঙ্কে আর ধ্যানে মন স্থির হয়। মন যত চঞ্চল হবে পৃথিবীকে ততই চঞ্চল মনে হবে। হরিদা বলত, গণিতের মতো পৃথিবীর সব সমস্যাকে বিচার দিয়ে সহজ করে নেবে। যা আসে তাই যায়। কি সুন্দর কথা! জীবনের সামনে, জীবনের পেছনে মৃত্যু। সত্য একটাই অনস্তিত্ব। তুমি কেন কেউই থাকবে না। থাকার একটা নির্ধারিত সময়সীমা আছে। না থাকাটাই অনির্ধারিত আকাশের মতোই অনন্ত। জীবনের হাসা আর কাঁদা কন্ডিশানাল। না হাসা না কাঁদাটাই সাধনা। বি নিউট্রাল। হৃদয়বান, হৃদয়হীন, একটা নেগেটিভ, একটা পজেটিভ। হৃদয়টাকে সমর্পণ করে দাও। হিন্দি হাম আর ইংরেজি হিম প্রায় একরকম ধ্বনি। হাম মানে হিম। হা এ আকার আ মানে আমি। আ থেকে দু বর্ণ স্বরপার্থক্যে ই বসে আছে। ই দীর্ঘ হলেই ঈ। ঈতে ঈগল। ঈগলও ঈশ্বর। ইঁদুরের মতো জীবের অহঙ্কার ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। হরিদাকে আমি খুঁজে বের করবই। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে সেই জন্মযোগী নিজের জীবনে একাকার করে ফেলেছে। তোমার কাছে তার ছোট ছবি আছে?'

আমার মাথা নিচু। এর চেয়ে লজ্জার কি আছে? তাঁর একটাও ছবি নেই।

'ছবি নেই? ছোটখাট কোনও ছবি?'

'আজ্ঞে না। তিনি ছবি তোলাতে দিতেন না।'

'একটা ছবি রাখনি? আশ্চর্য। তাহলে অনুসন্ধান হবে কি করে?'

'আমি ভাবছি নিজেই একবার বেরবো। সব তীর্থস্থান ঘুরে ঘুরে দেখব। আচ্ছা আপনি বলতে পারেন, কোন্ সে নদী! দুপাশে পাহাড় শ্রেণী। নদীতে জল নেই। শুধু নুড়ি পাথর। বড় ছোট নানা মাপের। হঠাৎ হুড় হুড় করে জল নামে। কূল ছাপিয়ে যায়। পরক্ষণেই আবার সেই নুড়ি। জায়গাটা খুব শীতল।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, 'মনে হচ্ছে লিডার। পহেলগাঁওতে ওই নদী। পাহাড়ের

ওপরে বৃষ্টি নামলেই জলে ভরে যায়। জল গড়িয়ে নিচের দিকে চলে যাবার পরেই শুকনো। কেন বলো তো।'

না এমনি। হঠাৎ মনে হল তাই।'

হঠাৎ টেলিফোন বাজল। ভদ্রলোক ঝটিতি রিসিভার তুলে বললেন, 'হ্যাললো।'

১৭

As face reflects face in water
So the mind of man reflects man.

আমি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। কানে রিসিভার। ওপাশ থেকে কোন সংবাদ ভেসে আসছে বোঝার উপায় নেই। তবে সুরঞ্জনার বাবার মুখের চেহারা যেন পাল্টাচ্ছে। টেলিফোন ধরা বা করার সময় বোঝা যায় নিজের ওপর একজন মানুষের কতটা নিয়ন্ত্রণ। সুরঞ্জনার বাবা শান্ত, স্থির, সংযত। শুধু শুনে যাচ্ছেন। কোনও কথা নেই। সব শেষে স্থির গলায় একটি কথাই বললেন, 'আমি আসছি। ধরে রাখুন।'

ফোন নামিয়ে আমাদের কাছে এসে বসলেন। পরিবারের সকলের এমন ট্রেনিং, কেউ কোনও কৌতূহল প্রকাশ করলেন না, কার ফোন, কি ফোন? সবাই কিন্তু টান টান হয়েছিলেন। সকলেই একটি সংবাদের প্রতীক্ষায়। কোথায় সে? নিজের মন দিয়ে অন্যের মন বুঝতে পারি! দূর থেকে যখন দেখি বাড়ির দিকে পিওন ভদ্রলোক এগিয়ে আসছেন, আমার হৃদস্পন্দন দ্রুত হয়।

গলা শুকিয়ে আসে। সুরঞ্জনার বাবা কিছুক্ষণ বসে রইলেন স্থির হয়ে।আমরা সকলে নীরবে তাকিয়ে আছি তাঁর মুখের দিকে। হয় তো কিছু বলবেন। সুরঞ্জনার মা কাঠের পুতুলের মতো হয়ে গেছেন। সুরঞ্জনার বাবা অবশেষে বললেন, 'একটা খবর এল। বিলুর ব্রিফকেসটা পাওয়া গেছে।'

সুরঞ্জনার মা সামান্যতম উত্তেজনা না দেখিয়ে শান্তভাবে বললেন, 'আর বিলু?'

কোনও সন্ধান নেই।

ব্রিফকেসটা খড়গপুরের লেফট লাগেজে জমা পড়েছিল। টোকেন নাম্বার টুথ্রি। কেসটা কলকাতায় এসেছে। আমি একবার যাই। দিস ইন্ডিকেটস, বিলু আর নেই। তাকে মেরে ফেলা হয়েছে। মোটিভ? হয় নির্ভেজাল ডাকাতি, না হয় কোনও ষড়যন্ত্র। হোয়াটেভার ইট মে বি, বিলু আমাদের জীবনে আর ফিরছে না! ক্লোজড্ চ্যাপ্টার। ঠিক এই সময় আমি ফিল করছি হরিদার অভাব। হরিদার গিয়ার যদি আমি পেতুম! হিজ ব্যালেন্স অ্যান্ড কন্ট্রোল। তার ডাইভারসান ট্যাকটিকস। তার বিচার।'

কিছুক্ষণ নীরব থেকে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কিছু করার নেই। টেক ইট ইজি, টেক ইট ইজি। মানুষের জীবনে কখনো কখনো এইরকম হয়। অন্য পরিবারে না হয়ে আমাদের পরিবারে হয়েছে। দি চপার ফেল অন আস।'

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন ভদ্রলোক। সমস্ত বাতাস কে যেন শুষে নিল। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। সুরঞ্জনার মায়ের মুখে কালো একটা ছায়া দুলছে। সুরঞ্জনা আমার ডান হাত চেপে ধরেছে। হাত বরফের মতো শীতল। এত জোরে ধরেছে, কোনও খেয়াল নেই, মানুষের হাত না লোহা!

আমার ভেতরে আবার সেই বিদ্রোহ, কি হয়? ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে লাভ কী, যে ঈশ্বর মানুষকে রক্ষা করতে জানেন না। শুধু ভক্তি নেবেন, পূজা নেবেন, ত্যাগ নেবেন, বৈরাগ্য নেবেন, দেওয়ার বেলায় কিছুই দেবেন না! তিনি কি আছেন? সেই অলমাইটি! হিজ লর্ডশিপ। God is dead! Heaven is empty, weep, children, You no longer have a father. একটু আগে যাঁরা অত বিশ্বাস নিয়ে গান করলেন, ধ্যান করলেন, তাঁদের জন্যে একটু ভাল খবর কি আসতে নেই! বিধির বিধান অতি বিচিত্র! এই সংশয়েরও উত্তর আছে। যাঁরা আছেন মহামানবের দলে তাঁরা জানেন। বলবেন, 'কি জানো, সুখ-দুঃখ দেহধারণের ধর্ম। কবিকঙ্কন চণ্ডীতে আছে যে, কালুবীর জেলে গিয়েছিল; তার বুকে পাষাণ দিয়ে রেখেছিল, কিন্তু কালুবীর ভগবতীর বরপুত্র। দেহধারণ করলেই সুখ-দুঃখ ভোগ আছে।' আবার, 'শ্রীমন্ত বড় ভক্ত। আর তার মা খুল্লনাকে ভগবতী কত ভালবাসতেন। সেই শ্রীমন্তের কত বিপদ। মশানে কাটতে নিয়ে গিয়েছিল।' আরো আছে, 'একজন কাঠুরে পরমভক্ত, ভগবতীর দর্শন পেলে; তিনি কত ভালবাসলেন, কত কৃপা করলেন। কিন্তু তার কাঠুরের কাজ আর ঘুচল না। সেই কাঠ কেটে আবার খেতে হবে। কারাগারে চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী ভগবান দেবকীর দর্শন হল। কিন্তু কারাগার ঘুচল না।'

হাতে এক ফোঁটা জল পড়ল। তাকিয়ে দেখি সুরঞ্জনার দু'গাল বেয়ে জল নামছে। ফোঁটা ফোঁটা। একের পর এক গড়িয়ে চলেছে। প্রথামতো কিছু বাঁধা বুলি এই সময় মুখে আসতে চায়, 'ভাবছ কেন?' বিচলিত হচ্ছ কেন?' 'মন শক্ত করো।' যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে।' 'ভাগ্যে যা থাকে তাই হয়।' 'এখনই কেন ভাবছি তিনি নেই।' এইসব ফাঁকা ফাঁকা বহু ব্যবহৃত কথা।

সুরঞ্জনা আমার পাশের চেয়ারেই বসেছিল। ধীরে ধীরে তার মাথাটা আমার কাঁধে নেমে এল। আলতো, আলগোছে। একমাথা চুল, কিছু আমার গালে, কানের কাছে, এক স্তবক আমার বুকের কাছে, রেশমের চামরের মতো দুলছে বুকের কাছে। অদূরেই মুকু। আমার ভয় করছে। আমার শিথিল বাঁ হাত চাইছে সুরঞ্জনার মাথায় উঠে যেতে। সুরঞ্জনার মনের ভাব আমি পড়তে পারছি না।

সুরঞ্জনার মা বললেন, 'তোমার সঙ্গে আমার বিলুর চেহারার অনেক মিল। মুখটাতো একেবারে কেটে বসানো। ও কেমন করে বলছে, বিলু নেই! ব্রিফকেসটা কেমন করে না-থাকার প্রমাণ হয়! আমি ঠাকুরকে এত ডাকি! তবু আমার এই সর্বনাশ কেন হবে! তিনি আমার কথা শুনবেন না!'

সুরঞ্জনার মায়ের মুখ উদাস, বর্ণহীন। কথাগুলো ভাবে বলছেন। স্বগতোক্তির মতো। সুরঞ্জনার বাবা ফুল ইউনিফর্মে ঘরে এলেন! রিভলভারটা তুলে নিয়ে ভরে দিলেন কোমরের খাপে। আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সরি! তোমাদের সব কথা শোনার সময় আমার হল না আজ। পরে শুনবো। আর একদিন এসো। কি করব বল? বড় বিপাকে পড়েছি।'

সুরঞ্জনার মা বললেন, তোমার সঙ্গে যাব?'

'না না, তুমি কোথায় যাবে ? আগেই খারাপটা ভাবছ কেন ? তোমরা বোসো। অন্য প্রসঙ্গ করো।'

একেবারে অন্য একজন মানুষ। সেই কোমল ভাব অদৃশ্য। ঋজু, কঠিন। স্প্রিং-এর মতো বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে। সুরঞ্জনা এগিয়ে গেল, পেছন পেছন। আমি মুকুকে তৎক্ষণাৎ ইশারা করলুম, 'চলো, আমরাও উঠি।'

মুকু হাতের ইশারায় বললে, 'আর একটু !'

সুরঞ্জনার মা উদ্দেশ্যহীনভাবে সারা ঘরটা একবার ঘুরে এলেন, তারপর টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, এখন আমি কি করি ? আমার ভেতরটা যে ভীষণ ছটফট করছে। মনে হচ্ছে ফেটে যাবে।'

মুকু বললে, 'জপ করুন ! স্থির হয়ে বসে নিরবচ্ছিন্ন জপ !'

'অ্যাঁ, তুমি তো ঠিক বলেছ ! কেমন করে বললে ? এইটুকু মেয়ে, তুমি জানলে কি করে। তুমি কি দীক্ষিতা !'

'আমার একজন গুরু আছেন। তিনি কোথাও লুকিয়ে আছেন আমাদের পরীক্ষা নেবার জন্যে। একলা আমরা পথ হাঁটতে পারি কিনা দেখার জন্যে। যাঁর খোঁজে আজ আমরা এখানে কাকাবাবুর কাছে এসেছি। আমার সব শিক্ষা তাঁর কাছে। তিনি আমাকে বলেছিলেন, ভেতরে আলো জ্বালাতে পারলে বাইরে আর অন্ধকার থাকে না। কোনও দিনই মেঘলা নয়। সেই দিনই মেঘলা যেদিন তাঁকে স্মরণ করা হয়না। একদিন দুপুরে খুব মন খারাপ করে বসে আছি জানালার ধারে, তিনি এস্রাজের খোল সেলাই করছিলেন, আমাকে কাছে ডাকলেন, কি হয়েছে তোমার ? বললুম, আমার কেউ নেই। থেকেও নেই, আমি অনাথ। তিনি বললেন, তোমার এই বিশ্বাস নেই, পৃথিবীতে কেউ অনাথ নয় ? আমরা সবাই রাজা, সেই রাজার রাজত্বে। বলতে পারছ না, যার কেহ নাই তুমি আছ তার ? আমারই বা কে আছে ? কিন্তু আমি আত্মসমর্পণ করেছি। যথার্থ আত্মসমর্পণ। তিনি আমাকে একটা উদাহরণ দিলেন, জনক রাজার। তিনি অষ্টাবক্রের কাছে আধ্যাত্মিক বিষয়ে উপদেশ চাইতে গিয়েছিলেন। উপদেশলাভের পর জনকরাজা যখন ফেরার জন্যে ঘোড়ায় চড়তে যাচ্ছেন, একপা জিনের পাদানিতে রেখেছেন সেই সময়ে অষ্টাবক্র বললেন, 'কই, আমার গুরুদক্ষিণা দিলে না যে !' জনক বললেন, 'আমার সর্বস্ব আপনাকে দিলাম। আমার রাজ্য, আমার বলতে যা কিছু আছে সব, এমন কি নিজেকে পর্যন্ত গুরুদক্ষিণারূপে আপনাকে দিলাম।' অষ্টাবক্র সে দক্ষিণা গ্রহণ করলেন। রাজা জনক এক পা পাদানিতে রাখা অবস্থাতেই দাঁড়িয়ে রইলেন, ঘোড়ার পিঠে চড়তে পারলেন না। কিছুক্ষণ পর অষ্টাবক্র তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হল, ঘোড়ায় উঠছ না কেন ? মিথিলায় ফিরবে না ?' জনক বললেন, 'যাই কি করে ? আমার সর্বস্ব তো আপনাকে সমর্পণ করেছি, আমার নিজের বলতে কিছুই তো নেই। কাজেই নিজের ইচ্ছা বলতেও কিছু নেই আর। ঘোড়ায় চড়ার ও মিথিলায় ফিরে যাবার শক্তিই আমার নেই।' অষ্টাবক্র তখন জনককে সব ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমার হয়ে তুমি রাজ্যশাসন কর।' এরই নাম যথার্থ আত্মসমর্পণ! তুমি সব দিয়ে দাও তাঁকে, দেখবে, তোমার সব কিছু ফিরে আসবে। কেউ নেই মানে ? তিনি আছেন, ভয়ঙ্করভাবে আছেন। আছ অনল-অনিলে চিরনভোনীলে ভূধর-সলিলে গহনে/ আছ বিটপী-লতায় জলদেরি গায় শশী-তারকায় তপনে ॥ অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে। সে পায় তোমার হাতে। শান্তির অক্ষয় অধিকার। কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিতে। শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে। আপন ভাণ্ডারে।'

মুকু হুহু করে কেঁদে ফেলল। এ কী ভাব! সুরঞ্জনার মা মুকুকে জড়িয়ে ধরলেন দু'হাতে। তিনিও কাঁদছেন। অপূর্ব দৃশ্য। অপরাধীর মতো আমি একপাশে চুপ। অপরাধী, কারণ আমার চোখে এক ফোঁটা জল নেই। আমার পিতার প্রসঙ্গে দু'জনে কাঁদছে। আমি কেন কাঁদতে পারছি না? আমি কি এমনই পাষণ্ড! সুরঞ্জনা ঘরে ঢুকল। আমার পাশে এসে ফিশফিশ করে বললে, 'কি হয়েছে?'

উত্তর দিতে গিয়ে আমার গলা দিয়ে স্বর বেরলো না। পুঁটলির মতো কি একটা আটকে গেল স্বরযন্ত্রে। জল আসছে চোখে। দীর্ঘ খরার পর বহুকাঙ্ক্ষিত বর্ষণ। সুরঞ্জনা অবাক হয়ে বললে, 'কি হল আপনাদের?'

অতি কষ্টে বললুম, 'কিছুই হয়নি। তেমন কিছু নয়।'

সুরঞ্জনা এগিয়ে গিয়ে তার মায়ের পিঠে হাত রেখে বললে, 'তুমি কেঁদো না মা। শরীর খারাপ হবে। আবার তুমি বিছানায় পড়বে।'

মুকু একপাশে সরে গিয়ে চোখ মুছল। ভারি গলায় বললে, 'আমরা তাহলে আসি আজ?'

সুরঞ্জনা বললে, 'এখনই যাবে?'

'আমরা এখন বেরোলে বাড়ি পৌঁছতে রাত দশটা বাজবে। আমাদের দিদি একলা আছেন। কাল আমরা খবর নোবো। আমার গভীর বিশ্বাস, দাদা ফিরে আসবেন।'

'লুকিয়ে থাকার তো কোনও কারণ নেই!'

'হয়তো আছে, আমরা জানি না। আমারমেসোমশাইয়েরঅদৃশ্য হবার কারণ কি? কেউ জানে না।' আমরা রাস্তায় নামলুম। মুকু বললে, 'সুন্দর পরিবার! তবে কোথাও একটা পাপ লুকিয়ে আছে। সুরঞ্জনার মা মনে হয় মারাঠি মহিলা। সুরঞ্জনার বাবা তাঁর দ্বিতীয় স্বামী। এই পয়েন্টে একটা গোলমাল আছে।'

'তুমি একেবারে সবজান্তা। বিকেল থেকে খুব অকাল্ট পাওয়ার দেখাচ্ছ। তোমার অত ক্ষমতা নেই।'

'এটা অলৌকিক ক্ষমতা নয়, চোখ। চোখ খোলা রাখলে তুমিও দেখতে পেতে।'

'কি দেখতে পেতুম?'

'একটা গ্রুপ ফটো। ছবিতে সুরঞ্জনার মা, আর একজন ভদ্রলোক ও একটি শিশু। ওই শিশুটি হল সুরঞ্জনার দাদা। প্রথম পক্ষের ছেলে।'

তোমার শার্লক হোমস হওয়া উচিত ছিল।'

'পিওর ডিডাকসান মাই ডিয়ার ওয়াটসন।'

'ট্রাম, ট্রাম' বলে মুকু ধড়ফড়িয়ে ছুটল। রাতের প্রায় খালি ট্রাম। আমরা বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলুম। একটু শীত শীত ভাব। মুকু পাশে থাকায় বেশ একটা নির্ভরতার ভাব আসছে। মনে হচ্ছে, মায়ের একটু হাত ধরে বেড়াতে বেরিয়েছে ছেলে। পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন কাজ নিজের জীবন বয়ে বেড়ানো। সামনে কত চড়াই, উৎরাই। কত বছর যে হাঁটতে হবে। চোখ বুজিয়ে ভাবছি। হঠাৎ এক চিমটি, 'ঘুমচ্ছ কেন?'

'ঘুমোইনি তো! ভাবছি!'

'সুরঞ্জনার দাদা হল প্রথম পক্ষের ছেলে। তিনি তাঁর বাবার কাছে ফিরে গেছেন, কারণ সেই মানুষটি মহারাষ্ট্রের কোনও শহরে নিঃসঙ্গ জীবন কাটাচ্ছেন! এক নারীর বিশ্বাসঘাতকতায় সমস্ত নারীর প্রতি তাঁর ঘৃণা! মেয়েদের সাধারণত মাথার ঠিক থাকে না। জানো তো, আবেগও একটা বেগ।'

মুকু হঠাৎ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'তোমার চশমা ?'

'আমার চশমা ? চশমা আমার চোখে নেই ?' চোখে হাত দিলুম। ফাঁকা।

'তোমার চোখে চশমা আছে কি নেই বুঝতে পারছ না ?'

'তাই ! তাই ভাবছি, আলোগুলো কেমন যেন ছেতরে গেছে ! মানুষের মুখগুলো বড় বড় আর অন্ধকার।'

'কোথায় ঘুচিয়ে এলে প্রভু !'

'এখন মনে পড়ছে। তখন চোখে জল এসে গিয়েছিল। চোখ মোছার জন্যে চশমাটা খুলে টেবিলেই রেখে এসেছি।'

'বেশ করেছ। আবার নামো। আবার ফিরে চলো। একটা কাজ যদি সুষ্ঠুভাবে হয় ! বিরক্তি !'

ট্রাম আট-নটা স্টপ চলে এসেছে। আমরা নেমে পড়লুম। উল্টোদিকের ট্রাম ধরে আবার সুরঞ্জনাদের বাড়িতে। সদর দরজা বন্ধ। কলিং বেল টিপে দাঁড়িয়ে আছি। সুরঞ্জনাই দরজা খুলল। বেশবাস পাল্টে গেছে। আমাদের দেখে অবাক, 'কি হল ? ফিরে এলেন ?'

'আমার চশমা, আপনাদের ওপরের টেবিলে। যদি দয়া করে এনে দেন।'

'ভেতরে আসবেন না ?'

'আর না। সেই কোথা থেকে ফিরে আসছি !'

'ছি ছি, আমারই লক্ষ করা উচিত ছিল।'

মুকু বললে, 'যার চশমা তারই যদি খেয়াল না থাকে, আমরা কি করতে পারি ! ফ্যাশানের চশমা।' সুরঞ্জনা চলে গেল। দরজার মাথার ওপর ঘষা কাঁচের শেডে আলো, জ্যোৎস্নার মতো ছড়িয়ে গেছে। আমরা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। বাড়িটা বড় বেশি নির্জন। যেন সব ঘটনা থমকে গেছে ! একটা গাড়ির হেডলাইট আমাদের ওপর দিয়ে ঘুরে গেল। বাঁক নিচ্ছিল। দরজার সামনে এসে থামল। পেছনের দরজা খুলে সুরঞ্জনার বাবা নামছেন। মুকুর কি হচ্ছে জানি না। আমি পাথর হয়ে গেছি। কি খবর বাড়িতে ঢুকছে কে জানে !

ভদ্রলোক এগিয়ে এসে অবাক হলেন, 'কি ব্যাপার ! তোমরা দাঁড়িয়ে ?'

মুকু বললে, 'কাকাবাবু কি খবর ?'

মুকুর পিঠে হাত রেখে হাসিমুখে ভদ্রলোক বললেন, 'ওটা আমার ছেলের ব্রিফকেস নয়, নামটা যদিও এক। ভেতরের কন্টেন্টসও সব অদ্ভুত। সিগারেটের প্যাকেট, দেশলাই। বিলু স্মোক করে না। একটা ময়লা রুমাল। কিছু চিঠি। ছোট্ট একটা নোটবুক। লোহালক্কড়ের হিসেব। একই নাম আর টাইটেলের কত লোক আছে !'

সুরঞ্জনা এসে গেছে। হাতে চশমা। মুকু বললে, 'কি বলেছিলুম সুরঞ্জনা ! ওটা দাদার ব্রিফকেস নয়। আমি একটা কথা বলব কাকাবাবু ?'

'বলো মা।'

'কিছু মনে করবেন না ?'

'কেন করব ?'

'দাদাকে খোঁজ করুন তাঁর বাবার কাছে।'

ভদ্রলোক একেবারে স্তব্ধ। সুরঞ্জনা চশমাটা এগিয়ে দিল আমার হাতে। হাত কাঁপছে।

ভদ্রলোক নিজেকে সহজ করে নিয়ে বললেন, 'তুমি এই সিক্রেটটা জানলে কি করে মা ? কেউ বলেছে ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। একটা গ্রুপ ফটো। দেয়ালে ঝুলছে।'

'উঃ, তোমার সাঙ্ঘাতিক অবজার্ভেসান! কিন্তু দ্বিতীয়টা? কি করে বললে, সেখানেই গেছে?'

'কাকাবাবু, আমার ইনটিউশান।'

'তুমি আজ আমাকে মস্ত বড় একটা কিউ দিয়ে গেলে। চলো, তোমাদের পৌঁছে দিয়ে আসি।'

'না কাকাবাবু, সে অনেক দূর। আমরা লজ্জায় মরে যাব। আপনাকে আবার অতটা পথ ফিরে আসতে হবে। আমরা এমনিই বেশ ফিরে যেতে পারব। তেমন বেশি রাত হয়নি কাকাবাবু!'

'তুমি কি পড়ছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি এম-এ দিচ্ছি, ফিলজফিতে।'

'তোমাকে আমি বলে রাখছি, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসে পরীক্ষা দিয়ো। তুমি খুব সাইন করবে। তোমার মতো বাঙালি মেয়ে আমি খুব কম দেখেছি!'

আমাদের বাড়ি ফিরতে রাত প্রায় এগারোটা হয়ে গেল। সদর দরজা বন্ধ। ওপরের ঘরে একটা মাত্র আলো। সদরের কড়া দুটো বিশাল বালার মতো। তাইতে আবার নানা কারুকার্য। একবার মাত্র নাড়তেই দিদির গলা পাওয়া গেল।

দরজা খোলামাত্রই আমরা অবাক, দিদি হঠাৎ মন্ত্রবলে ছেলে হয়ে গেলেন না কি? বিশাল বড় নাক। ঝোলা গোঁফ। ইনি আবার কে? খাঁকি ইউনিফর্ম। প্রশ্ন করার আগেই তিনি বললেন, 'রাখলে ভেতরে থাকবো, তাড়িয়ে দিলে রকে রাত কাটাবো। লোক খারাপ নই, তবে একটু চরিত্রদোষ আছে। এখন যেমন বিধান দেবেন, আপনারাই মালিক।'

আমি তো আমি, মুকু পর্যন্ত হতভম্ব। এ আবার কে? শরীরে নাকটাই যার সর্বস্ব। যেন ভগবান ম্যানুফ্যাকচার করার সময় গণ্ডারের ওয়ার্কশপ থেকে একটা নাক এনে ফিট করে দিয়েছেন। মুকু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনি কে ভাই?'

মানুষের স্যাম্পলটি হাসলেন! অসম্ভব ঝকঝকে দু'সার দাঁত। বললেন, 'আমি মনে হয় ঠিক ভাই নই। ভাগনে হতে পারি। আপনারা আমার দূর সম্পর্কের মামা আর মামি!'

মুকু বললে, 'মামি কি করে হলুম? মামি তো এমনি এমনি জন্মায় না! মামা হতে পারে। মামি হতে হয়। কোনও এক মামাকে বিয়ে করলে তবেই মামি হওয়া যায়। অবিবাহিতা মামি হয় না!'

'দিদির কাছে, তোমাদের দিদির কাছে আমি সব শুনে নিয়েছি।' ছেলেমানুষের মতো হই হই করে নেচে উঠল। 'মামার তুমি মামি হবে। আমি সব শুনে নিয়েছি।'

মামার মামি হবে কি রে! বলো,মামার বউ হবে। ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না, এই বড় খোকাটি কে? মুকু পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গেল। আমি পড়লুম মহাবিপদে। লোকটি খপ করে আমার হাত দুটো ধরে ফেলল সাঙ্ঘাতিক জোর। তেমনি খসখসে। হাত দুটো ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললে, 'বলো মামা তুমি আমাকে চরণাশ্রয় দিলে?'

ভয় পেয়ে গেলুম, আশ্রয় মানে, কতদিনের আশ্রয়! শক্ত গলায় বললুম, 'ওপরে চলো। আগে জানা দরকার, তুমি কে? হঠাৎ কোথা থেকে এলে? কেনই বা এলে?'

'এটা কোনও কথা হল? মাকে ছেড়ে ছেলে থাকতে পারে? যেখানে মা, সেইখানেই ছেলে।'

কোনওরকমে নিজেকে মুক্ত করে ওপরে এলুম। দোতলার সিঁড়ির ওপরের ধাপে

বাইশো বাইশ একটা বুট জুতো, মালিক অবশ্যই ওই ছেলেটি। ছেলে বলব, না লোক বলব ? বয়েস তো বুঝতে পারছি না ! মুখ বলতে তো নাক, আর কাঠবেড়ালির ল্যাজের মতো গোঁফ !

ওপরে এসে বুঝতে পারলুম, দিদি কেন নিচে নামেননি। ময়দা মাখছেন। ঠেসছেন তো ঠেসছেন ! মুকু রাস্তার কাপড়ে রান্নাঘরে ঢুকবে না। আমার পিতার নির্দেশ। রান্না মানে পুজো। সবার আগে কাপড় ছাড়তে চলে গেছে। আমাকে দেখেই দিদি উঠে পড়লেন। আমার খুব কাছে এসে বললেন, 'ছাতের সিঁড়ির কাছে চলো।'

অন্ধকারে তিন-চার ধাপের মতো ওপরে উঠে গেলুম। একটা খুরি ছিল কোথাও। গড়াতে, গড়াতে নিচে পড়ে গেল। দিদি আমার খুব কাছে সরে এসে বললে, 'ভাই, আমি বড় অপরাধী ! আমার ভীষণ লজ্জা করছে। পাগলটা খুঁজে খুঁজে ঠিক এখানে চলে এসেছে। এখন কি উপায় হবে ভাই ?'

'এ কে ?'

'আমার মতোই এক অভাগা। এর মায়ের স্বভাবচরিত্র ভাল ছিল না। এ যখন বছর তিনেকের, মা ফেলে পালিয়েছিল। মিশনারীদের অরফ্যানেজে মানুষ। ও আমাকেই মা বলে জানে ! ওর অনেক গুণ ! বলে, আমি হলুম মানুষ কুকুর। এঁটোকাঁটা খেতে পারি। রাস্তার ধারে ঘুমোতে পারি। নর্দমার জল খেতে পারি চক চক করে। আর আমাকে যে ভালবাসে তার জন্যে জীবন পর্যন্ত দিতে পারি। স্কুলে দরওয়ানের কাজ করে। আজ তোমরা চলে যাবার পর এসে হাজির। বলে, কুকুর তো, গন্ধ শুঁকে শুঁকে চলে এসেছি। এখন লাথি মেরে তাড়াও, আমি বসে থাকবো। মাকে ছেড়ে থাকি কি করে ! কি করব ভাই ! আমি তাড়াতে পারলুম না ! পাগলকে বোঝাই কি করে, আমার নিজেরই চালচুলোর ঠিক নেই। আপনি পায় না খেতে শঙ্করাকে ডাক।'

'মাথা কি খুব খারাপ ? একেবারে পাগল ?'

'না, অল্প ছিটিয়াল ! যা বলবে তাই করবে। গাধার মতো খাটতে পারে। রুগির মাথার কাছে বসে সারারাত জাগতে পারে। নিজের মুখের খাবার অপরকে তুলে দিতে পারে। লক্ষ গালাগাল দাও হ্যা হ্যা করে হাসবে। রাগ নেই, মানসম্মান বোধ নেই।'

'কি নাম ?'

'গগন !'

রান্নাঘরের কাছ থেকে গগনের গলা এল, 'কোথায় গেল সব। আঁচ বইছে ! ময়দার তাল পড়ে আছে। গেল কোথায় ? মা।'

দিদি তাড়াতাড়ি তিন ধাপ নেমে গিয়ে বললে, 'এই তো আমি। ষাঁড়ের মতো চেল্লাচ্ছিস কেন ?'

'তুমি থেকে থেকে কোথায় যাও মা ! আঁচ বইলে কয়লা পোড়ে তা জানো কি ?'

'জানি বাবা !'

'করবে লুচি, আলুর দম, সেই সন্ধে থেকে খুচুর খুচুর করছ। সরো তো, আজ আমি রাঁদি ! আমার রান্নার বহুত সুনাম ! আমি থাকতে তুমি কষ্ট করবে কেন ?'

ঠিক সেই সময় মুকু এসে হাজির। তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল, 'এ কি, এ কি, রান্নাঘরে কেন ? এটা মেয়েদের এলাকা। হাত ধোয়া নেই, পা ধোয়া নেই, কাপড় ছাড়া নেই, খাওয়ার জিনিসে হাত !'

গগন নিচু হতে গিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। মুখে স্বর্গীয় হাসি, 'মাইমা, তুমি আমার

গুরুজন, রাগ কোরো না, তোমার একটু ছুঁচিবাই আছে। সামনে এটা কি দেখছ ? আগুনে পড়লে সব শুদ্ধ। পচা মড়া, টাটকা মড়া, জ্যান্ত মড়া, চিতায় ফেল, পরিষ্কার ছাই, তুমি দাঁতও মাজতে পারবে সেই ছাই দিয়ে ! তুমি জানো কি,রোজ আমি দশটা করে তুলসীপাতা খাই !'

দিদি এক ধমক লাগালেন, 'মুখে, মুখে তর্ক করছিস ? যা বাইরে যা। ঘর থেকে বেরো।'

তর্ক করব না কেন, ব্যাপারটা বুঝে নিচ্ছি। ছুঁচিবাই থাকলে হাতের আঙুলে হাজা হয়।'

মুকু বললে, 'আমি মুখে মুখে তর্ক, বাজে কথা, ফাজলামো একদম সহ্য করতে পারি না। তোমাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি। তোমাকে আমি বেরোতে বলেছি বেরোবে। বেরিয়ে আসবে এক কথায়।'

গগন এইবার খেপা খোকো হয়ে গেল, 'না আমি বেরবো না ! আমি রান্না করব। তোমাকে খাওয়াবো।'

মুকু আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'বেআদবটাকে ঘাড় ধরে বের করে দাও !'

মুকুর সম্পূর্ণ অন্য চেহারা ! মুখ থমথমে, যেন দ্বিতীয় হরিশঙ্কর। এ-নির্দেশ পালন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। শিশুর মতো জেদী এক যুবক। দুর্গার মতো এক শক্তি। দিদি এক কোণে মহা অপরাধী।

মুকু বললে, 'কাজটা তাহলে আমাকেই করতে হয়, কারোরই মুরোদে যখন কুলোচ্ছে না।'

মুকু যেই এগোতে গেল, দিদি ছুটে এল, 'আমি, আমি। আমি ঝেঁটিয়ে বের করছি।'

দিদি যেই ঘুরতে গেল। আঁচলটা ঝপ করে উনুনে পড়ল। গনগনে আঁচ ! দপ করে আগুন ধরে গেল।

১৮

If one calls you a donkey, ignore him
If two call you a donkey, check for hoof prints
If three call you a donkey, get a saddle.

আগুন, আগুন, বলে ধেই ধেই করে আমি একটা বাঁদর নাচ নাচলুম। তারপর এক লাফে ঘরের বাইরে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করলুম। মুকু এক ধাক্কা মেরে আমাকে নিজের অজান্তেই সাহায্য করল। যে থালায় ময়দার তাল, তারপাশেই বিশাল এক ঘটিতে জল ছিল। দিদির আঁচলে আগুন তখন সাপের মতো কিলবিল করছে। চুল পর্যন্ত লাফিয়ে উঠছে। মুকুর হাতে ঘটি। দিদি দু'হাত তুলে সতীদাহের সতীর মতো স্থির। পুরো ঘটির জল দিদির গায়ে ঢেলে দিল মুকু। তারপর দু'হাতে জাপটে ধরে মেঝেতে উল্টে পড়ে দু'জনে গড়াগড়ি, জল সপসপে মেঝেতে। গগন কোথাও কিছু নেই, একটিন ময়দা উপুড় করে দিল দু'জনের গায়ে। দুটো বিশাল আকারের পুলি পিঠে যেন মেঝেতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। আগুন যখন নিবে গেছে, তখন আর ভয় কি! আমি বীর দর্পে ঘরে ঢুকলুম। আর মোচার খোলার মতো সড়াক করে হড়কে পড়ে গেলুম। জলেতে, ময়দাতে যে মেঝেটা এত পিচ্ছিল হয়ে আছে, আমি ভাবতেও পারিনি। গগন ছেলেমানুষের মতো হাততালি দিতে, দিতে সুর করে বলতে লাগল, 'পড়েছে, পড়েছে। উল্টে তো পড়েছে।' মনে হচ্ছে, উঠে কষে এক থাপ্পড় লাগাই। ওই হতভাগার জন্যেই এত কাণ্ড। দুটো মেয়ে এখনই পুড়ে মরত।

মুকু উঠে বসেছে। দিদি ওঠার চেষ্টা করছে। দু'জনকেই বৃদ্ধার মতো দেখাচ্ছে। মুকু আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'তোমার লজ্জা করে না! তখন ভয়ে পালাচ্ছিলে, এখন চালাকি করতে এসেছ। তুমি এই মুহূর্তে আমার চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যাও। তোমাকে দেখলে, আগুনে পোড়ার চেয়েও শরীর জ্বলে উঠছে। তুমি এত স্বার্থপর! আত্মপর! কাপুরুষ! ওপরচালাক! দয়া করে ওই পাঁঠাটাকে নিয়ে ঘরের বাইরে যাও। গেট আউট ফ্রম হিয়ার। কাওয়ার্ড। নিনকমপুপ!'

'কতটা পুড়ল একবার দেখি। ফার্স্ট ডিগ্রি, না সেকেন্ড ডিগ্রি? হসপিট্যালাইজ করতে হবে কি?'

'তোমাকে আর ডিগ্রি দেখতে হবে না। দয়া করে সরে পড়ো। যা করার আমি করব।'

রাত তখন প্রায় বারোটা। অগ্নিপর্ব শেষ করে মুকু ঘরে ফিরে এল। খাওয়া-দাওয়া মাথায় উঠেছে। দুজনেই অল্পবিস্তর পুড়েছে, তবে তেমন মারাত্মক নয়। দেহের চেয়ে মন

পুড়েছে বেশি। বিশ্রী একটা এলোমেলো কান্ড। কোথা থেকে একটা চটাস চটাস শব্দ আসছে কানে। মুকুর মুখ ভয়ঙ্কর গম্ভীর। তবু সাহস করে জিজ্ঞেস করলুম, 'শব্দটা কিসের ?'

'গিয়ে দেখে এস। আমি জানি না।'

মুকু সোফার ওপর গোঁজ হয়ে বসল। বাইরে থেকে গগনের গলা ভেসে এল, 'একে খাওয়া-দাওয়া নেই, যেটুকু রক্ত ছিল, সব শালা মশায় শুষে নিলে। এরা মাছের চাষ না করে মশার চাষ করেছে। বাড়িটা দেখছি পাগলের আখড়া।'

'আমি হেসে ফেললুম। মুকু উঠে গিয়ে দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ফিরে এল।

'কি করলে ? এ যে চরম অভদ্রতা ! দিদি কি মনে করবে !'

'মনে করুক। আমি সেইটাই চাই। এ বাড়িটা মগের মুলুক নয়। ভবিষ্যতে এই বাড়িটা আশ্রম হবে। এটা পাগলা-গারদ নয়। অনাথ আশ্রম নয়।'

'তোমার হঠাৎ মন ঘুরে গেল কেন ?'

'কারণ আমি ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি। একের পেছনে আর এক, তার পেছনে আর এক আসবে। আমার গভীর সন্দেহ, এই পাগলটা তোমার দিদিরই ছেলে। ভদ্রমহিলা ডাহা মিথ্যে কথা বলছেন।'

'নিজের ছেলে থাকলে কেউ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় না। ছেলের ওপর নির্ভর করে নিজেই সংসার পাতে।' 'আমার পিতারও ছেলে আছে, কিন্তু তিনি আজ পথে পথে ঘুরছেন। ছেলের ওপর কিসের ভরসা ?'

'মেসোমশাইয়ের ওটা স্পিরিচুয়াল ক্রাইসিস। তিনি বেরিয়েছেন অন্বেষণে। পরমার্থের সন্ধানে। আমাকে প্রায়ই বলতেন, পাহাড় আমি ভালবাসি। ভালবাসি নদীর উৎসমুখ। হরিদ্বার আমার প্রিয় জায়গা। শ্রবণনাথ ঘাট, হর-কি-পৌরি, কঙ্খল, নিরঞ্জনী সাধুদের আখড়া। চণ্ডীপাহাড়। অলকানন্দা। মৃত্যু আমাকে বাঁচতে শিখিয়েছে। ভাগ্য আমার প্রিয়জনদের একে একে কেড়ে নিয়েছে। সন্তানটিকে স্বাবলম্বী করাই ছিল আমার শেষ কর্তব্য। করেছি। এইবার শিকল কাটার সময়। সময় হয়েছে নিকট, এবার বাঁধন ছিঁড়িতে হবে। এর সঙ্গে ওটাকে এক করে ফেল না ! সংসার হরিশঙ্করের পক্ষে একটা অত্যন্ত ছোট জায়গা। তোমার এই মহিলাটি মোটেই সুবিধের নয়। এই ছেলেটির জন্মবৃত্তান্তে গভীর কোনও রহস্য লুকনো আছে। দিদির মুখের সঙ্গে অনেক মিল। পিতার পরিচয় ছেলের পক্ষে জানা সম্ভব নয়, একমাত্র মা-ই বলতে পারে পিতা কে !'

'তুমি কি বলছ মুকু ?'

'ঠিকই বলছি পিন্টু। তুমি সর্ব অর্থে একটা গবেট।'

'যাই হোক, আমাদের একটা কর্তব্য আছে। কোথায় শোবে, কি খাবে, দিদির যন্ত্রণা হচ্ছে কি না ?'

'যেখানে খুশি শোবে। বাড়িতে শোয়ার জায়গার অভাব নেই। আর খাওয়া ! একদিন উপোস করলে মানুষ মারা যায় না। ঘড়া ঘড়া জল আছে, তাই খাবে।'

'শোয়ার জায়গাটা ঠিক করে দিয়ে এসো।'

'আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার হাত দুটোর কি অবস্থা দেখেছো ! আমার গালেও আগুনের আঁচ লেগেছে। তোমার যদি অতই চক্ষুলজ্জা, নিজে গিয়ে বিছানা পেতে শুইয়ে দিয়ে এসো। পদসেবা করতে চাও তো, তাও করে এসো।'

আমি গুম মেরে গেলুম। এরপর আর আমার কিছু করা চলে না। যা হয় হোক। আমি

পরিস্থিতির কাছে একেবারে বিকিয়ে গেছি ব্যক্তিত্বের অভাবে। কোনও স্বধীনতাই আমার নেই। এ বলছে ওই করছি, ও বলছে এই করছি। আমিও এক চরিত্রহীন। আমার পিতার ভাষায় ক্রিস্ট্যালাইজড্ ইডিয়েট। সংসারের বাইরে আশ্রমজীবনই আমার ভাল। আটকে গেছি তো গেছিই। দাঁড়ের চন্দনা। পায়ে রিং লাগানো। সোনার শেকলও শেকল। বিষয়ের কথা ছেড়ে দিলে, লোকে বলে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। ঈশ্বরের কথা বললে, বলে ভণ্ড। বিষয়ী লোক দেখলে পালাতে ইচ্ছে করে। সংসারে পঁচিশ বছর হল, সব ফক্কাবাজি। সব অসার। সব দু'দিনের জন্যে। সংসারে আছে কি ? আমড়ার অম্বল ; খেতে ইচ্ছে করে ; কিন্তু আমড়াতে আছে কি ? আঁটি আর চামড়া খেলে অম্লশূল। কোথাও এতটুকু শান্তি নেই, নির্জনতা নেই। সবাই হটটেম্পার। বন্ধ দরজার বাইরে হঠাৎ খঞ্জনি বেজে উঠল, সঙ্গে হেঁড়ে গলা, হরে কৃষ্ণ, হরে রাম, নিতাই গৌর রাধেশ্যাম। মুকু সঙ্গে সঙ্গে টান টান। মুখ লাল। এইবার কি হয় কে জানে ! দু'পাল্টা গাইতে না গাইতেই, ধড়াধ্ধড় মারের শব্দ। লাঠি দিয়েই পেটাই হচ্ছে। গান থেকে কান্না, 'মা আর মেরো না। মহাপ্রভু নাম সংকীর্তন করতেন আর কাজী ধোলাই দিত। তুমি কি মা সেই কাজী ! বিধর্মী খ্রীশ্চান ! আর মেরো না মা। তুমি কি নালিকুল থানার বড় দারোগা।' মার থামছে না। হরেক রকম আওয়াজ। বেশ খেলিয়ে মার চলেছে। মুকু ঝড়াক করে উঠে পড়ল। সোজা এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

দু'জনেই বেরিয়ে এলুম। ছাতে ওঠার সিঁড়ির ধাপে দু'হাতে মাথা ঢেকে বসে আছে গগন। পাখার হাতল দিয়ে দিদি পেটাচ্ছে। মারে কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। এলোপাথাড়ি চলছে। দিদির পরনে কোনও শাড়ি নেই। শায়া আর ব্লাউজ। দৃশ্যটা হজম করা শক্ত। এলো চুল। মুকু এক ঝট্কায় পাখাটা ছিনিয়ে নিল। ছুঁড়ে ফেলে দিল দোতলার বারান্দা থেকে নিচে। পাখাও পাখা মেলে। মুকুর পরবর্তী আক্রমণ হল খঞ্জনির ওপর। একটানে গগনের কোল থেকে সেটা ছিনিয়ে নিয়ে, তারও সেই এক দশা করে দিল। সোজা বাগানে, ঝোপঝাড়ের মধ্যে। আঁচলটা কোমরে ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে বললে, 'এইবার ? আর কি কি খেলা তোমরা দেখাতে চাও ? সারারাত আমরা জেগে থাকি ক্ষতি নেই, পাড়ার আর পাঁচটা মানুষ একটু ঘুমোবে তো ? না তাও তোমরা দেবে না ? এটা গ্রাম নয় শহর ! একটু আক্কেল হবার মতো বয়েস হয়েছে।'

দিদি একেবারে বিস্মৃত। কি পরে আছেন সে খেয়ালকুটুও নেই। থাকলে এইভাবে কোমরে দু'হাত রেখে দাঁড়াতে পারত না। চোখের সামনে দুটো ছেলে। শরীরের বসন্ত এখনো বিদায় নেয়নি। এখানে আসার আগে যথেষ্ট তোয়াজে ছিলেন বলেই মনে হয়। আমাকে চোখ নামাতে হল। নিজের লজ্জা নিজের কাছেই।

দিদি বললে, 'এই জানোয়ারটাকে দূর না করা পর্যন্ত আমাদের শান্তি নেই। নড়া ধরে বাইরে বসিয়ে দিয়ে এস।' গগন অত ধোলাই খাওয়ার পরেও বলতে পারলে, 'কুপুত্র যদি বা হয়, কুমাতা কখনো নয়। আয় মা সাধনসমরে। দেখি মা হারে, না পুত্র হারে। ভ্যাঁপ্পোর, প্যাঁপ্পোর, পোঁ।'

দিদি প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, 'আজ বোধ হয় একাদশী। একাদশী, অমাবস্যাতে ও একেবারে পাগল হয়ে যায়।'

মুকু ঝাঁজিয়ে উঠল, 'জানোই যখন,তখন ঠিকানাটা দয়া করে দিয়ে এলে কেন ? ঝাড়ের বাঁশ ঝাড়েই থাকত।'

গগন বললে, 'আমি ডিটেকটিভ মোহন। ঠিকানা ছাড়াই চলে এসেছি। এর আগে

তিনবার তুমি আমাকে ফেলে পালিয়েছিলে। সেখানেও আমি গিয়েছিলুম। তুমি আমার কি করতে পেরেছিলে মা? তোমার সেই রেলের গার্ডসায়েব আমাকে পিটিয়ে পানাপুকুরে ফেলে দিয়েছিল। তবু আমি মরিনি। আমি মরছি না, মরব না।'

দাঁত কিড়মিড় করে দিদি বললে, 'মাঝে মাঝে মনে হয়, তোর গলা টিপে শেষ করে দি। যতদিন বাঁচবি, ততদিন জ্বালাবি!'

'এখন আমাকে কিছু খেতে দাও। আমার পেট খালি থাকলে আমি ঘুমোতে পারি না। সেই কাল রাত্তিরে আমি মুড়ি তেলেভাজা খেয়েছি। আর আজ এই রাত্তির। আমার যে ভীষণ খিদে পেয়েছে মা!'

গগনের শেষ মা ডাকটা হাহাকারের মতো শোনাল। যে কোনও নিষ্ঠুর বুকও ফেটে যাবে।'

মুকুর টানটান শরীর একটু আলগা হল। মুকু বললে, 'পেট পুরে খাইয়ে দিলে লক্ষ্মী হয়ে ঘুমোবে?'

গগন দু'হাতে মাথা ধরে বললে, 'আমি পাগল। তাই খেতে চাইলে সবাই আমাকে মারই খাওয়ায়।' মুকু কিছুক্ষণ থমকে থেকে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। আমি আর থাকতে না পেরে বললুম, 'দিদি, একটা কাপড় পরে এসো।'

দিদি একটু থতমত হয়ে বললেন, 'পরতে পারছি না ভাই। কোমরের কাছটা পুড়ে গেছে। কোনওরকমে শায়াটা ধরে আছি। সবই তো সহ্য করছ, ক'দিন এইটুকু সহ্য করে নাও।'

মুকুর ডাক এল, 'গগন, খাবে তো এদিকে আলোয় এসো।'

বিশাল বাটি। দুধে মুড়ি ভিজছে বিজবিজ শব্দে। তার ওপর গোটা চারেক দানাদার। গগনের সত্যিই খিদে পেয়েছিল। হুপুস, হাপুস করে খাওয়া শুরু করল।

মুকু বললে, 'হাত ধুয়ে, বাটি ধুয়ে, সোজা কোথাও গিয়ে শুয়ে পড়বে। শোওয়ার জায়গার অভাব নেই। অভাব মশারির। একটা চাদর দিচ্ছি, আপাদমস্তক মুড়ি।'

'মশা আমার কি করবে! তখন চটাস চটাস করছিলুম ইচ্ছে করে, বদমাইশি করে।'

'আজ রাতে আর কোনও বদমাইশি কোরো না ভাগনে।'

গগন লক্ষ্মী ছেলের মতো মাথা নাড়ল। তার দু ঠোঁটে দুধ। কোণের দিকে একটা মুড়ি। ডান হাত বাটিতে। কপালের একটা পাশ সুপুরির মতো ফুলে উঠেছে। পাখার বাঁটের নির্দয় প্রহারে। মুকু আমার সঙ্গে ঘরে এসে দরজার ছিটকিনি তুলে দিল,

'তোমার সঙ্গে আমার অনেক পরামর্শ আছে।'

'রাত অনেক হল।'

'তাতে আমাদের বয়েই গেল। বোসো আমার সামনে।'

'পেট চোঁচোঁ করছে, দাঁড়াও আগে জল খাই এক গেলাস।'

'অ্যায়, এইবার শুরু হল তোমার খেলা।'

জলযোগ সেরে ফিরে এলুম। মুকু বললে, 'দরজার ছিটকিনি তুলে দাও। আমাদের এখন ক্লোজড্ ডোর কনফারেন্স হবে।'

বিছানার ওপর বেশ জুত করে বসল মুকু, ষষ্ঠীঠাকরুনের মতো। আমি বসলুম কিছুটা দূরে। যাকে বলে সম্মানজনক দূরত্বে। মুকু উদাস হয়ে কিছুক্ষণ বসে থেকে বললে, 'এখানকার পাট আপাতত কিছু দিনের মতো ওঠাতে হবে। এইসব অবাঞ্ছিত চরিত্র আমাদের জীবন আর সাধনা একেবারে বরবাদ করে দেবে। মেসোমশাইয়ের এই মন্দির শেষ

হয়ে যাবে। এই তীর্থ আমাদের রক্ষা করতে হবে জীবন দিয়ে।'

'বলো, তোমার পরিকল্পনাটা কি ?'

'কাল সকালে আবার আমি হস্টেলে ফিরে যাব ।'

'নেবে কেন ?'

'অবশ্যই নেবে। এখন সেসান নেই, নতুন মেয়ে আসার সম্ভাবনাও নেই।'

'আর আমি কি করব ?'

'তুমি একটি বড় তালা ঝুলিয়ে সরে পড়বে কিছু দিনের জন্যে।'

'কোথায় ?'

'তোমার সামনে তিনটে পথ খোলা আছে। প্রথম পথ, তোমার জীবিকা। সোজা দেরাদুন। বসে থাকলে তোমাকে তো আর কেউ খাওয়াবে না ! তোমার জমিদারিও নেই। মেসোমশাইয়ের গচ্ছিত টাকায় মরে গেলেও হাত দেবে না। নিজের রোজগারের ওপর নির্ভর করবে। দ্বিতীয় পথ, তোমাকে আমি ছেড়েই দিলুম, তুমি আশ্রমে চলে যেতে পার। চেষ্টা করে দেখো সন্ন্যাসী হতে পার কি না ! মনে হয়, পারবে না। মনে হয় কেন, একেবারে সুনিশ্চিত, পারবে না তুমি। আজকের আগুন লাগার ঘটনায় তোমার চরিত্রের পুরো পরিচয় স্পষ্ট। তুমি ভীরু। আত্মকেন্দ্রিক। একেবারে নীচ ধরনের গৃহী। নিজেরটি ছাড়া তুমি আর কিছু বোঝো না। এই চরিত্রের মানুষ কখনো সন্ন্যাসী হতে পারে না। অসম্ভব। গেরুয়া, গেরুয়া খেলা করে। ভেতরে ভোগ বাইরে যোগ। গেরুয়ার ডেকরেশান। তৃতীয় পথ, তোমার জীবন-মরণের পথ। তুমি এদের নিয়ে এইখানেই পড়ে থাক। এরাই তোমাকে রান্নাবান্না করে খাওয়াবে। তোমার আধারটাকে নষ্ট করবে। তোমাকে বিয়ে করার মেয়ের অভাব হবে না। মেয়েরা তোমাকে সহজেই বাঁদর নাচ নাচাতে পারবে। তোমার প্রথম ইন্দ্রিয় অতিশয় প্রবল। কি হবে, হরিশঙ্করের জন্যে ব্যাকুল হয়ে ! প্রায় ভুলেই তো এসেছ। আর মাসখানেকের মধ্যে তিনি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন। তোমাকে নাকি সুরঞ্জনার দাদার মতো দেখতে ! ওখানে টোপ ফেল, বড়লোক শ্বশুর পাবে। হাতের কাছেও একটা মেয়ে আছে, টিপ। যাই বলো, যতই অস্বীকার করো, ওখানেও তোমার দুর্বলতা। তোমার মতো জামাই পেলে ওরা হাতে স্বর্গ পাবে। মেসোমশাইকে খুঁজে বের করার ধৈর্য, সাহস, ইচ্ছে, কোনওটাই তোমার নেই। তোমার সে ব্যাকুলতাই নেই। মৃত্যুর মতো ব্যাপারটাকে তুমি মেনে নিয়েছ। কি করে ভাবলে, তুমি ঈশ্বরের অন্বেষণে বেরোবে ! সে যে সহস্র গুণ কঠিন কাজ। এই বিশ্বরচনার কোন্ খানে তিনি বসে আছেন কেউ জানে না। সেই অধরাকে তোমার মতো ধৈর্যহারা ধরবে ? বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার শখ ! জেনে রাখো, আমি সারা জীবন বসে থাকব আমার মেসোমশাইয়ের জন্যে। সারা ভারত একা ঘুরে বেড়াবার সাহস আমার আছে। আমি তাঁর পায়ের কাছে বসে, ত্যাগ আর বৈরাগ্যের শিক্ষা নোবো। তোমার মতো অর্ধনারীশ্বরদের জীবনসঙ্গিনী হওয়ার চেয়ে ঈশ্বরের গলায় মালা দেওয়াই ভাল। এই আমার শেষ কথা। গুড নাইট।'

দমাদ্দম গোলা ছুঁড়লে দুর্গের যা অবস্থা হয়, আমার সেই অবস্থা। প্রাসাদ প্রাকার বিধ্বস্ত। তবু শেষ চেষ্টা। নিজের ইজ্জতের সওয়াল। হঠাৎ আবিষ্কার করলুম, মেয়েরা যত মারমুখী আর আক্রমণাত্মক হয় ততই তাদের আকর্ষণ বাড়ে। লুকিয়ে লুকিয়ে একটা বই পড়েছিলুম। লেখা ছিল, বিলেতে মানুষ পয়সা খরচ করে মেয়েদের হাতে চাবুক খেতে যায়। তাইতে না কি ভীষণ আনন্দ !

আমার শেষ চেষ্টা। যে-জাহাজ ডুবছে তাকে ভাসিয়ে রাখতে চাইছে কাপ্তেন। মুকু ছাড়া

আমার জীবন অচল, এটুকু বুঝে গেছি। বললুম, 'মুকু, আগুন আর সাপ মানুষকে দিশাহারা করে। একে বলে প্রিমিটিভ ফিয়ার। স্বীকার করছি, আমি তোমার মতো সাহসী নই। সকলেই সাহসী হয় না। তার মানে এই নয়, আমি স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক। আর মেয়েপাগল বললে আমাকে! ওটা পৃথিবীর একটা আদিব্যাধি। মুনি-ঋষিরাও নিস্তার পাননি। কোনও পুরুষই পুরোপুরি পুরুষ নয়, কোনও নারীই পুরোপুরি নারী নয়। শাস্ত্র বলছে, মূলে বসে আছেন ভগবান। সৃষ্টিই তাঁর খেলা। খেলাটা তুমি বিজ্ঞান দিয়ে বোঝার চেষ্টা করো। সৃষ্টিকে চালু রাখার জন্যে তিনি কি করলেন? মজা করলেন, দক্ষিণ অঙ্গ পুরুষ, বাম অঙ্গ স্ত্রী। একটিতে দুটি, দুটিতে একটি। দুজনে মিলে ধারণ করেন অনন্ত রূপ। এই কারণে পুরুষের আকর্ষণ নারীতে, নারীর আকর্ষণ পুরুষে স্বাভাবিক। এইটা প্রকৃতির কারসাজি। আমরা অসহায়। তুমিও অসহায়, আমিও অসহায়। পৃথিবীর তাবৎ মানুষ অসহায়। কিছুই করার নেই। পঞ্চভূতের ফাঁদে পড়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর কাঁদে।'

'আমি মোটেই অসহায় নই। আমার কোনও আকর্ষণ নেই। আমি নিজেকে সেইভাবে শিক্ষিত করেছি।'

'মুকু আমার সাফ কথা, তুমি চলে গেলে আমি একেবারেই অসহায় হয়ে যাব। তোমার প্ল্যান বাজে প্ল্যান।'

'আমাকে পরীক্ষা দিতে হবে।'

'অবশ্যই হবে। তুমি এই বাড়িতে থেকে লেখাপড়া করো। আমি এই অবসরে কাশ্মীর ঘুরে আসি।'

'কাশ্মীর? সেখানে কি?'

'আমার সেই স্বপ্নে দেখা নদী, যার তীরে বসে আছেন তিনি।'

'তোমার মাথা। স্বপ্ন কখনো সত্য হয় না। নিজের চিন্তাই স্বপ্ন হয়ে দেখা দেয়। সময় আর পয়সার অপচয় হবে।'

'হোক। তবু আমি স্বপ্নকেই অনুসরণ করব। স্বপ্নকে অনুসরণ করেই মানুষ বাস্তবে পৌঁছয়। কাল আমার অফিসে গিয়ে প্রথমেই চাকরিটা ছেড়ে দোবো। ওঁদের আর ঝুলিয়ে রেখে লাভ নেই। জীবনটাকে অনিশ্চিত না করতে পারলে আমার রোক আসবে না। নিরাশ্রয়, ছন্নছাড়া। তা না হলে আমার আত্মসমর্পণ আসবে না যাকে বলে রেজিগনেশান।'

'চাকরি ছাড়ার কি কারণ ঘটল?'

'কারণ একটাই, আমার আর ছুটি পাওনা নেই।'

'চাকরি ছাড়লে, চাকরি পাবে?'

'আমাদের লাইনে চাকরির অভাব নেই। যত পাল্টাবো তত মাইনে বাড়বে। তোমাকে শুধু একটাই অনুরোধ, আমার সঙ্গে তুমিও চলো।'

'কেন খরচ বাড়াবে? এ কি তোমার প্রমোদ ভ্রমণ?'

'তা কেন? আমরা একটা উদ্দেশ্য নিয়েই যাচ্ছি। তবে পেতেও পারি, নাও পারি। আমরা হরিদ্বার হয়ে ফিরে আসব।'

'সে তো এক মাসের ধাক্কা। আমার পরীক্ষা? আমার ক্লাস?'

'বিষয়টা আজ ধামাচাপা থাক। কাল আবার ভাবা যাবে।'

যাই ভাবো, কাল এই বাড়ির সদরে তালা পড়বে। অদ্যই শেষ রজনী।'

'দিদিকে দূর করে দেবে এই অবস্থায়, কোমর, পিঠ, সব পুড়ে গেছে? দেখলে তো, বিপদ আসার আগে কেমন ইঙ্গিত দিয়েছিল!'

মুকুর মুখ একটু গম্ভীর হল। ভাবতে বসল। ঘটনার প্রাথমিক উত্তেজনা কেটে আসছে। মুকু ক্রমশই স্বচ্ছ হচ্ছে। হৃদয় ফিরে আসছে হৃদয়ে। 'আমি তোমাকে একটা বিকল্প পরামর্শ দিচ্ছি মুকু। তুমি পনেরটা দিন, এই বাড়ির দায়িত্ব নাও, একটু কষ্ট কর, আমি কাশ্মীর থেকে ঘুরে আসি।'

মুকু একটা কিছু বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ দড়াম করে সদর দরজার খিলটা খুলে পড়ে যাবার শব্দে বাড়ি কেঁপে গেল।

১৯

Come let us ask life
To show a way out to those who are lost
on endless streets;

আমরা হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে এলুম ঘর থেকে। চোরে সদর দরজার খিল খুলেছে। তড়বড়িয়ে মুকু এগোচ্ছে নিচে নামার সিঁড়ির দিকে। ভয়ে আমার গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছে না। চোর শব্দটা শুনলেই মানুষের গলা বসে যাবে। যাবেই যাবে। চোর যেন ফ্যারেঞ্জাইটিস। ফিসফিস শব্দ বেরলো, 'মুকু অন্ধকারে একা নেমো না। ওদের হাতে অস্ত্র থাকে।'

'আমার মুঠোয় ঘুষি আছে। আলোটা জ্বেলে দাও।'

আমাদের গলা শুনে দিদি বেরিয়ে এসেছে, 'কি হল আবার ?'

'শুনতে পাননি, নিচে খিল খুলে পড়ার শব্দ হল ?'

'শব্দ একটা পেলুম বটে। অপেক্ষা করছিলুম, আবার হয় কি না ?'

মুকু ততক্ষণে নেমে গেছে নিচে। ভেসে এল তার চড়া গলা, 'কি হচ্ছে ? এই এতরাতে খিল খুলে তুমি যাচ্ছ কোথায় ? আবার শুরু করলে পাগলামি !'

আমরা তরতরিয়ে নেমে এসেছি। সদর হাট খোলা। বাইরে রাত রাস্তা হয়ে পড়ে আছে। আকাশ চোঁয়ানো নিশুতি আলো। জমাট ছায়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের গগনচন্দ্র। হাতে একটা ব্যাগ। হাত বাড়িয়ে নিচের গলির আলোটা জ্বাললুম। আলোয় গগনকে দেখে চমকে গেলুম। নিখুঁত সায়েবি পোশাক। চোখে চশমা। চশমা আগে ছিল না। মাঝ রাতের ফড়ফড়ে ফড়িং-এর মতো বাতাসে মাথার চুল এলোমেলো। গলায় নেকটাই। আমার প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাবার মতো অবস্থা। আলোয় ওই চেহারা দেখে মুকুও স্তম্ভিত। এ কে ? এই সুদর্শন যুবকটি ! এ তো সেই একটু আগের আধ-পাগলা গগন নয়। গগন হাসছে। পরিষ্কার বিশুদ্ধ বাংলায় বললে, 'আমাকে এইবার যেতে হচ্ছে। আমার কাজ শেষ। তোমরা একটা ভুল করেছিলে, বাইরেটা দেখে মানুষের বিচার। আমি এভাঞ্জেলিক্যাল সার্ভিসে আছি। আমি একজন ডি ডি। ডি ডি কি তা নিশ্চয় জানো ! ডক্টর অফ ডিভিনিটি। আমাকে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াতে হয়।'

আমি মনে মনে গুটিয়ে গেলেও, মুকু সমান তেরিয়া, 'আপনি আমাদের বোকা বানালেন কেন ? কাজ শেষ বলছেন ? কি কাজ ?'

'আমার মায়ের সঙ্গে দেখা করা। আজ সাত বছর পরে আমি ডেনমার্ক থেকে ফিরছি।'

'যাঁকে মা বলছেন, তিনিই বা কেন আমাদের বোকা বানাতে চাইলেন ?'

'লজ্জায়। নিজের পাপ চাপা দেবার জন্যে। ওই ভদ্রমহিলার আমি জারজ সন্তান। আমার বাবা একজন ড্যানিশ মিশনারী। এই পাপে তিনি বিতাড়িত হয়েছিলেন চার্চ থেকে। তিনি আর নেই। হি ইজ লং ডেড। আমার এই মা আজও আমাকে স্বীকার করে নিতে পারলেন না। নিজের পাপকে ঘৃণা না করে তিনি ঘৃণা করছেন আমাকে। এখনো সেই এক অভিনয়! যে-সমাজ দেখল না, সেই সমাজকে ভয়। অথচ মনে মনে সন্তানের অধিকার ছাড়তে পারছেন না। পাখা দিয়ে যখন পেটাচ্ছিলেন আমার ভীষণ আনন্দ হচ্ছিল—এই তো আমার মা। যীশুর চেয়ে মা বড়। ওই মুহূর্তে আমি শিশু হয়ে গিয়েছিলুম।'

'আপনিই বা কেন পাগলের অভিনয় করছিলেন!'

'তোমরা ছিলে না। আমি এলুম। এই বেশেই এসেছিলুম। আমাকে দেখে মায়ের কোথায় আনন্দ হবে, তিনি ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যান আর কি! তিনি আমার পিতার ঘোস্ট দেখছেন। সেই বিশাল নাক। সেই মুখ। পরিচয় প্রকাশ হয়ে গেলে এই শেষ আশ্রয় যদি চলে যায়। আমি অভিনয়ে রাজি হলুম। পরে আমার মধ্যে একটা বিদ্রোহের ভাব এল। ট্রুথ, সত্য, তাকে কি চাপা যায়! কেন এই অভিনয়! কার জন্যে এই অভিনয়? বোকা রমণী! তোমরা সাক্ষী রইলে। বিচারের ভার রইল তোমাদের ওপর।'

'বিচার তো আপনারই হওয়া উচিত। মা পথে পথে ঘুরছেন, আপনি নেকটাই চড়িয়ে বেড়াচ্ছেন!

'আমি অনুরোধ করেছি, হয়নি। প্রায়শ্চিত্ত করবেন। পাপের প্রায়শ্চিত্ত। আমার আর কিছু করার নেই। আমার কাজ আমি করে গেলুম।'

'বারে বারে কাজ বলছেন, কাজটা কি?'

'সত্য প্রকাশ। ছায়ার মতো আমি অনুসরণ করব।'

মুকু বললে, 'এটাও আপনার অভিনয়। আসলে আপনি একজন পাকা চোর। আর এই মহিলাটি আপনার এক সাগরেদ। আপনি আমাদের ঘরের আলমারির তালা ভেঙেছেন। কায়দা করে লক খুলেছেন। জিনিসপত্র হাঁটকেছেন। গয়নাগাটি পাননি কিছুই। আমরা খুবই লজ্জিত। এমন কিছু ঘটতে পারে জেনেই লকারে দিয়ে এসেছি। অতি চালাকের গলায় দড়ি। আপনি আজ আসেননি, এসেছেন কাল রাতে। কাপড়ে আগুন লাগিয়ে সিগন্যাল দিয়েছিলেন, আমি এসে গেছি, গেট রেডি। এই মহিলাকে নিয়েই পালাতেন। বিধি বাম। কাপড়ে সত্যিই আগুন লেগে গেল।'

মুকুর কথা শেষ হবার আগেই, সেই জোচ্চর রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। মুকু আমাকে ঝাঁজিয়ে উঠল, 'হাঁ করে দেখছ কি? ছুটে গিয়ে ধরো। ব্যাগটা সার্চ করতে হবে।'

আর ধরো। বহু দূরে ছুটে চলেছে এক ছায়ামূর্তি। একটু আগেই যে বলছিল, তোমরা মানুষ চিনতে ভুল করেছ। সত্যিই মানুষ চেনা অতিশয় কঠিন। সিঁড়ির একপাশে প্রায় বিবসনা এক রমণী স্থাণু হয়ে আছেন। পাথরের মূর্তি। এখন আর আমার তাকাতে লজ্জা করছে না। মহিলা আমার দিদি নয়। হয় তো বিগত যৌবনা দেহব্যবসায়ী। কোনো রাগ নয়, আমার দুঃখে বুক ফেটে যাচ্ছে। কি লজ্জা! যাচাই করার উপায় নেই, হয় তো সম্পর্কে দিদি। তুলসীদাসজি আপনাকে প্রণাম। সেই দোঁহা : উদর ভরণকে কারণে, প্রাণী ন করতয়ি লাজ্। নাচে বাচে রণ ভিরৈ, বাচে ন কাজ অকাজ ॥ পেটের জন্যে সব লাজ-লজ্জা বিসর্জন দিতে হয় মানুষকে, কেউ সভায় নাচছে, কেউ উত্তাল সমুদ্রে নৌকোর বাইচ খেলছে, কারোর শরীরে বল নেই তবু যুদ্ধে যাচ্ছে। পেট। সব পেট। কাজের বাছবিচার

নেই।

মুকু সিঁড়ির শেষ ধাপে দু'হাতে মাথা চেপে বসে পড়ে বিশাল এক দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল, 'আর কতভাবে পরীক্ষা করতে চান আপনি ? আর কত ভাবে ?'

দিদি মুকুর পায়ের কাছে বসে পড়লেন। হাঁটু দুটো ধরে বললেন, 'বিশ্বাস করো ভাই, ও কিছু নিতে পারেনি। চেষ্টা করেছিল। পায়নি কিছুই।'

'সোনার জরি বসানো মাসিমার বেনারসি ?'

'সন্ধান পায়নি।'

'এ আপনার সেই ভাগনের ছেলে ?'

'অনেকটা তাই।'

'অনেকটা আবার কি ? জানেন, আমি যদি থানায় যাই কি হবে ?'

'আমাকে ধরে নিয়ে যাবে ভাই। অত্যাচার করবে। পুরনো জীবন থেকে আমি আর বেরোতে পারবো না। আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানেই পেছন পেছন তেড়ে আসছে আমার পাপ। আমি কি করি ? যাই কোথায় ?'

'আমাদের কাছে চাপা দেবার চেষ্টা না করে, প্রথম থেকেই বললে পারতেন। আপনি কি জানেন না, সত্যকে চাপা দেওয়া যায় না !'

'আমি যে ফিরতে চাই। আমি ফিরে আসতে চাই সুস্থজীবনে। সংসারে। রান্নাঘর, ঠাকুর ঘর, মন্দির, মেলা, রুগির বিছানার পাশে। আমাকে তুমি একটু সাহায্য করো ভাই। যা জোর করে আমার ঘাড়ে চাপান হয়েছে, তার থেকে আমাকে আমার মুক্তির পথ বলে দাও। তুমি পারো, একমাত্র তুমিই পারো।'

মুকুর হাঁটুতে মাথা রাখলেন দিদি। আমার মনে হচ্ছিল, এক ধাক্কা মেরে সরিয়ে দি। আমাদের বংশের কলঙ্ক। যা শুনেছিলুম ছেলেবেলায় তা ঠিকই, বড় জ্যাঠাইমার চরিত্রে অনেক ছিদ্র ছিল। সেই ছিদ্রেরই একটি ফসল এই মেয়ে। বিষ জারুলের গাছে কি আর অমৃত ফল ধরে !

মুকুর ব্যবহারে কোনও ঘৃণা নেই, ক্রোধ নেই, হতাশা থাকতে পারে। দিদির মাথার পেছন দিকে হাত রেখে মুকু বললে, 'আমি কি করতে পারি দিদি ! আপনি যা করে এসেছেন, তার ফল তো ভোগ করতেই হবে। পাপ ভূমিসে ভারি। পৃথিবীর চেয়ে ভারি মানুষের পাপ। আপনি তো পড়ে আছেন অতীতের খপ্পরে। এখন কি হবে ! আমার মাথায় তো কিছু আসছে না !'

হঠাৎ মুকু গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। আপন মনেই বললে, 'তাই তো, এটা তো ভেবে দেখা হয়নি !'

মুকু দিদির মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। বেশ বুঝতে পারছি দিদির বেশ অস্বস্তি হচ্ছে। মুকু খপ করে দিদির ডান হাতটা চেপে ধরে বললে, 'তাই তো বলি, তুমি যাও ডালে ডালে আমি যাই পাতায় পাতায়। চলো ওপরে চলো, আমি তোমার পোঁটলা সার্চ করব।'

মুকু বলে কি ? পাগল হয়ে গেল না কি ! নিজেকে ভাবে কি সবজান্তা স্বর্গীয় পুরুষ ! পুরুষ তো নয়, নারী। পোঁটলা সার্চ করে পাবেটা কি ! মাথায় পোকা নড়েছে।

দিদি বললেন, 'সে আবার কি ? গরীব মানুষের পোঁটলায় তুমি পাবেটা কি ? তুমি এইভাবে আমাকে অপমান করছ কেন ? অভাবে পড়েছি বলে ? অসহায় বলে ?'

'অত কথার তো দরকার নেই। আমি দেখতে চাইছি দেখব। তুমি এই জায়গা ছেড়ে

এক পাও নড়বে না। আমি আগে ওপরে যাব।'

'অহঙ্কারে তোমার মাথা বিগড়ে গেছে। রূপের অহঙ্কার, শিক্ষার অহঙ্কার, পয়সার অহঙ্কার।'

'একটু পরেই তোমার মাথা বিগড়োবে।'

তারপর মুকু আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'ও নিচেই থাক। তুমি দোতলায় ওঠার সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ওপরে এসো আমার সঙ্গে। কাণ্ডটা দেখে যাও।'

অসহায় সেই মহিলার দিকে একবার ফিরে তাকালুম। আমার চোখে জল এসে গেছে। মানুষের হাতে মানুষের কি অপমান! কেন যে মানুষ এমন করে! মেয়েরাই মেয়েদের এইরকম অপমান করে। ছেলে হলে পারত না। দিদি জবুথবু হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমি মুখের ওপর সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ করে ওপরে উঠে এলুম।

দোতলার ঘরে মুকু ততক্ষণে পোঁটলা খুলে সব জিনিস ছড়িয়ে ফেলেছে। কি-ই বা আছে সম্বল! কিছুই তেমন নেই। আমি গিয়ে দাঁড়াতেই বললে, 'কি হল? আমার হিসেবে তো কেনো ভুল হবার কথা নয়। তা হলে?'

আমি ভয়ে ভয়ে বললুম, 'তা হলে কি মুকু! তুমি কি পাবে ভেবেছিলে?'

'চোরাই মাল।'

'চোরাই মাল মানে?'

'মানে খুবই সহজ। চুরি করে আনা মাল।'

'সে আবার কি?'

মুকু রেগে গেল, 'থেকে থেকে সে আবার কি, সে আবার কি কোরো না তো।'

মুকু এক লহমার জন্যে অন্যমনস্ক হয়ে তীর বেগে রান্নাঘরের দিকে ছুটল। আমিও অনুসরণ করলুম। মুকু ঘরে ঢুকেই ডেকচিটা উল্টে ফেলল। থালার ওপর বিশাল একতাল ময়দা। সেই ময়দার তালের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিল। কিছুক্ষণ। মুকু আনন্দে চিৎকার করে উঠল, 'ইউরেকা!'

আর্কিমিডিসের পর এই বোধহয় আর একবার উল্লাসের চিৎকার। 'ইউরেকা'। কি পেয়েছে? কিছু একটা বেরিয়ে আসছে তালের ভেতর থেকে।

মুকু বললে, 'দেখে যাও।'

পাশে গিয়ে বসলুম। পাথর সেট করা একটা হার বেরিয়ে এল। হারটায় কত যে পাথর! কত রকমের পাথর! ময়দা লেগে আছে জায়গায় জায়গায়। তবু মনে হচ্ছে বহুমূল্য। কোনও রানি, মহারানির গলায় ছিল। মুকু বললে, 'জলের ঘটিটা নিয়ে এসো।'

ঘটির জলে একবার ডোবাতেই রূপ বেরিয়ে পড়ল। পাথরের কি ঝিলিক!

মুকু বললে, 'এই চারটে হীরে। তিনটে দামী রুবি। এই দেখ, এইগুলো পোখরাজ। লাখখানেক টাকা দাম কি তারও বেশি। ব্যাপারটা এইবার বুঝলে, মোটা মাথা? রান্নাঘরে ঢুকে হুলুস্থূলুসের কারণটা। আমরা হঠাৎ এসে পড়ায় তোমার ওই দিদি মালটা ময়দার তালের ভেতর ঢুকিয়েছিল।'

'মালটা এল কোথা থেকে?'

'বুঝতে পারলে না! মালটা গগন চোর কোথা থেকে হাতিয়ে এনেছিল। জানতো এইখানে কিছুকাল চেপে রাখতে পারলে পুলিশ কোনও সন্ধান পাবে না। তারপর পাচার করে দেবে ঠিক মতো জায়গায়। ওই কারণেই গগন রান্নাঘর থেকে বেরোতে চাইছিল না। ছ্যাঁচড়ামো করছিল।'

ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে কাঠ। আওয়াজ বেরোচ্ছে না। চোরাই মাল রাখার অপরাধে জেলে যেতে হবে। বরাতে এইটাই বাকি ছিল। কোনও রকমে জিজ্ঞেস করলুম, 'এখন কি হবে মুকু ?'

'কি আবার ? পুলিস আসবে, তোমার কোমরে দড়ি দিয়ে নিয়ে যাবে।'

জিনিসটাকে হাতে নিয়ে দু'চারবার চোখের সামনে ঘুরিয়ে মুকু বললে, 'তাকে ডেকে আনো নিচে থেকে। মাল আর মালের জিম্মাদার দুটোকেই বিদেয় করতে হবে এখান থেকে। এখুনি, এই মুহূর্তে।'

বার্তাবাহক চল্ল নিচে। নিচের দালানের রকে বসে আছেন মহিলা। প্রেতিনীর মতো। আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকালেন। বেশ কঠিন গলায় বলার চেষ্টা করলুম, 'এ আপনি কি করলেন ?' কান্না এসে গেল। কারোকে অসহায় দেখলে মনে হয়, সে আমি। আমিই সেই অসহায় মানুষ। আমিই সেই ভুক্তভোগী। পৃথিবীটা কেন যে এমন বিশ্রী রকমের জটিল ! কেন জানি না, কেবলই মনে হচ্ছে, ওই কাজ এই মহিলার নয়। আর যাই হোক, আমাদের বংশের মেয়ে চোরের দলে ঢুকতে পারে না। পরিস্থিতির শিকার।

অতি কষ্টে বললুম, 'ওপরে আসুন।'

দিদি পায়ে পায়ে অপরাধী শিশুর মতো দোতলার ঘরের দরজার আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালেন। নিষ্পাপ মুখে অপরাধের ছায়া নেই, আছে ভয়। মুকুর গর্জন শোনা গেল, 'এটা কি ? ভেতরে এসো। এসে বলো, এটা কার, এলো কোথা থেকে ?'

দিদি ঘরে ঢুকে মেঝের ওপর ধপাস করে বসে পড়ে বললে, 'সত্যি বলছি, আমি কিছুই জানি না। আমার জানার কথা নয়।'

'এটা চোরাই মাল।'

'হতে পারে, আবার নাও হতে পারে।'

'এটা চোরাই মাল।'

'বেশ, তাই না হয় হল।'

'এখন কি হবে ? থানা-পুলিস কে সামলাবে ?'

'এতে থানা-পুলিস আসছে কোথা থেকে ?'

'খুব সহজেই আসছে। কাল না হয় পরশু। তখন কি হবে ?'

দিদি পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'কি হবে তখন ?'

'তখন হবার আগেই, এখন হবে। এখন রাত তিনটে প্রায়। এই মহামূল্য চোরাই মাল নিজের পোঁটলায় পুরে সোজা দক্ষিণমুখো হাঁটা দাও। ওই দিকেই যমের দক্ষিণ দুয়ার। আর তোমার কোনও ন্যাকা ন্যাকা কথা শুনতে আমি রাজি নই। এই মুহূর্তে তুমি এই বাড়ি ছেড়ে বিদেয় হয়ে যাবে। তোমার ওই পাপমুখ আমি দেখতে চাই না।'

দিদি অসহায় মুখে আমার দিকে তাকালেন। আমিও সমান অসহায়। সম্রাজ্ঞী মুকুর মুখের ওপর কথা বলার সাহস আমার নেই। মুকুর যুক্তি আর তর্কের সামনে আমি দাঁড়াতে পারি না। হরিশঙ্করের চেয়েও প্রখর।

দিদি বললেন, 'এই গভীররাতে আমি যাই কোথা ! আমাকে তো ছিঁড়ে খাবে। আমার একটা অনুরোধ তুমি রাখো। ভোর হলেই আমি চলে যাব।'

আমি বললুম, 'সেই ভাল। আর তো কিছুক্ষণ !'

মুকু গুম মেরে রইল। কি ভাবল, কে জানে ! সময় যেন থম মেরে গেছে। অবশেষে বললে, 'বেশ, ঠিক আছে, তাই হোক। সূর্যোদয়ের আগে, পাড়া জেগে ওঠার আগে, তুমি

ঠিক যেভাবে এসেছিলে, সেইভাবেই ফিরে যাবে। কোথায় যাবে আমার জানার দরকার নেই।'

সেই বহুমূল্য গয়নাটি মেঝেতে ফেলে দিয়ে মুকু উঠে গেল। আমিও চলে যেতে চেয়েছিলুম, দিদি আমার হাতটা চেপে ধরলেন, 'পলাশ, এ বাড়ি তো তোমার ? আমি তো তোমার আশ্রয়েই এসেছিলুম ভাই ! তুমিও কি আমাকে তাড়াতে চাও ? আমার শরীরের পেছন দিকের অবস্থাটা কি একবার দেখেছ ? আমার জ্বর এসে গেছে।'

'আমি কি করব ? আপনি নিজের পাপেই ভুগছেন।'

'যদি বলি, পাপ আমি করিনি। পাপই আমার ঘাড়ে এসে চেপেছে। পেছন, পেছন, ফিরছে তাড়া করে। কার দোষ ? দোষ আমার না দোষ তাদের ? কার বিচার হবে ? সেই ভাগনে, সেই ভাগনের বুড়ো মামা, আমার মা, সেই ফাদার, সেই পুরোহিতমশাই, সেই থানার বড় দারোগা, সেই কোল্ডস্টোরের মালিক, সেই নেতা, সেই স্কুলমাস্টার, হুগলি আদালতের সেই উকিল, এদের, এদের বিচার হবে না ভাই ?'

'আমি জানি না। আপনার সামনে সাপের মতো ওই যে জিনিসটা পড়ে আছে, সাপের চোখের মতো আলো ঠিকরোচ্ছে, ওটা আমাদের কোথায় নিয়ে যেতে পারে জানেন ? হাজতে। ওইটার জন্যে এখানকার আমাদের তিন পুরুষের বাস উঠে যেতে পারে। কেন, কেন আপনি আমাদের জেনেশুনে এই বিপদের মধ্যে টেনে আনলেন আমাদের পরিবার আপনার কি ক্ষতি করেছিল ?'

'একেবারেই কোনও ক্ষতি করেনি তা বলি কেমন করে ! এই পরিবারেরই এক পুরুষ আমার মাকে বিয়ে করেছিলেন। আমার মাকে ছেড়ে তিনি স্ফূর্তি করতে গিয়েছিলেন অন্য মেয়েছেলের সঙ্গে। হয়ে গেলেন পাগল। একবারও ভাবলেন না, তাঁর ছেলেমেয়েদের কি হবে ! তোমারই পরিবারের অন্যান্যরা আমার মাকে গুমোরে, ঠেকারে বলে বাড়ি ছাড়া করলেন। তারপর ? তারই তো সব পরপর, পরপর হয়ে গেল। এক থেকে আর এক। নিজেদের অত নিরপরাধ ভাবছ কেন পলাশ ? তুমি কতটুকুই বা জানো ! তোমাদের পরিবারের ভারী সুন্দর একটা গুণ, বিপদ দেখলেই সরে পড়া। যেমন আগুন দেখেই তুমি এক লাফে ঘর ছেড়ে পালালে। তোমাদের ধরন হল, যা শত্রু পরের পরের।'

'আপনি একটা অন্যায়কে আর একটা অন্যায় দিয়ে ঢাকতে চাইছেন। জেনে রাখুন, আপাতত মুকু যা বলেছে তাই হবে। অন্যরকম হবার উপায় নেই।'

আমি আমার ঘরে চলে এলুম। মাথা দিয়ে আগুন ছুটছে। পেছন দিকটা আগুনে যার ঝলসে গেছে, সে কেমন করে দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে কোথাও একটা যাবে ! সেই কোথাওটা কোথায় ! দিদি একটা কথাও ভুল বলেনি। অপ্রিয় সত্য। সহ্য করা শক্ত। সত্য এইরকমই। প্রখর আলোর মতো। বোধহয় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। যত দুশ্চিন্তাই থাক, ঘুমের প্রলেপ পড়বেই। প্রচণ্ড এক ঠেলায় ঘুম ভেঙে গেল। মুকু ডাকছে, 'শিগ্গির ওঠো, শিগ্গির ওঠো, সর্বনাশ হয়ে গেছে।'

জানালায় দুলছে ভোরের পর্দা। পাখির ডাকের অভ্রখণ্ড বসানো। এমন একটা গোলাপী শুরুতেই সর্বনাশ ! এত সর্বনাশের পরেও সর্বনাশ। ধড়মড় করে উঠে বসলুম ঘোর-লাগা চোখে। কোথায় এতক্ষণ পড়ে ছিলুম তাও জানি না। জানালার ধার। তক্তপোষ। ভোরের ভিজে বাতাস।

'আবার কি সর্বনাশ হল মুকু ? যা হবার, তা তো হয়েই গেছে।'

মুকু হঠাৎ আমাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে অঝোরে কাঁদতে লাগল। রুদ্ধ গলায় বললে,

'দিদি চলে গেছে।'

'তুমি তো তাই চেয়েছিলে, এখন আবার কাঁদছ কেন?'

মুকু ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললে, 'আমি তো বাড়ি ছেড়ে যেতে বলেছিলুম, দিদি যে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে।'

'সে কি? সে আবার কি?'

'দিদি গলায় শাড়ির ফাঁস লাগিয়ে নিচের ঘরে ঝুলছে। আমারই সিল্কের শাড়ি।'

'সে কি?'

আমার শরীর পাথরের মতো হয়ে গেল। অদ্ভুত একটা ধাক্কা। বজ্রের মতো। একই সঙ্গে একরাশ চিন্তা মাথায় খেলে গেল। সেই থানা, পুলিস। সেই পাড়ার লোক জড় হয়ে যাওয়া। ছি ছি, ধিক্কার। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলুম। কাঁপতে কাঁপতে পড়ে গেলুম। গৃহদেবতা হরিশঙ্কর চলে গেছেন। মাথার ওপরের ছাদ ধসে গেছে। দুর্যোগ থেকে বাঁচার রাস্তা নেই। বাঁচাবারও কেউ নেই। যা ঘৃণা করতুম, তাই ঘটছে একের পর এক।

২০

One learns to know oneself best behind one's back.

সেই বহু মূল্য হারটা মেঝেতেই পড়ে আছে অবহেলিত। প্রাণহীন দেহ মাটি থেকে কয়েক ফুট উঁচুতে ঝুলছে। কোনও এক রন্ধ্রপথে সকালের বাতাস ঢুকছে, দেহটা অল্প অল্প দুলছে। অভাবনীয় দৃশ্য। ঘণ্টা কয়েক আগেও মানুষটা ছিল। বাঁচতে চেয়েছিল করুণভাবে। জীবনকে কে আর স্বেচ্ছায় ফুরোতে চায়! আমি আর মুকু চলে যাবার পর, আমাদের ঘৃণা নিয়ে বসেছিল বহুক্ষণ। অবশেষে এই সহজ সিদ্ধান্ত। আবার কোথায় কোন্ অনিশ্চিত জায়গায় যাওয়া যায়, তার চেয়ে একেবারেই চলে যাই। অনেক খেলাই তো হল, আর কি হবে! আর সে তো কয়েক সেকেণ্ডের ব্যাপার! দেহের খাঁচা খুলে জীবন-পাখির উড়ে যেতে কতটুকুই বা সময় লাগে!

কে খুনী?

খুন তো বটেই। কিন্তু কে? আমাদের তিন জনের মধ্যে কে খুনী? আমি, মুকু, গগন? না চতুর্থ আর একজন কেউ? যে আমার দিদির অতীতকে তাড়া করে ফিরছে, অলক্ষ্যে বসে, তার এজেন্টের মাধ্যমে। আগুন দেখে যে লাফিয়ে ঘরের বাইরে চলে গিয়েছিল তার এই সাহস দেখে নিজেই অবাক। সামনে দু'হাত দূরে দিদির দেহ ঝুলছে। অল্প অল্প পাক খাচ্ছে। মুখটা সামান্য বিকৃত। চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। তবু আমার ভয় করছে না। আমি ভাবতে পারছি। স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ভাবনা। এরপর কি হবে! কি ভাবে পার পাওয়া যাবে আইনের হাত থেকে। এখন তো ডবল ফ্যাকড়া বেরলো। এক চোরাই মাল, দুই আত্মহত্যা। বুকের কাছে মাঝেমাঝেই কি একটা দলামতো ঠেলে উঠছে। আমার জমাট কান্না। একটা পুঁটলি, কয়েকখানা আটপৌরে কাপড়, দু-একটা ব্লাউজ, ছোট্ট একটা গীতা, এই সামান্য সম্বল ফেলে, জীবনের খেলা শেষ করে চিরতরে চলে গেল সংগ্রামী এক জীবন। এই দেখেই গাইতে ইচ্ছে করে, ট্যাঁ করে জন্মে আমি কি পেলাম!

মুকু দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে স্তব্ধ হয়ে। খুব কঠিন হতে গিয়েছিল। পাপ, পুণ্যের বিচারক। কেমন শিক্ষা দিয়ে গেলেন মহিলা। এইবার ঠেলা সামলাও। দেখাও তোমার তেজ। আঁচলে চোখ মুছে মুকু বললে, 'তাহলে তো থানায় যেতে হয়।'

'তা তো হয়ই। তুমি যাও। সারা পাড়া এইবার ভেঙে পড়ুক। অপমানের একশেষ। আমার পক্ষে আর কিছুই সম্ভব নয়। তোমার হাত ধরে চলতে গিয়ে আমার পতন হল

খানায়।'

'এই মুহূর্তে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া না করে সমস্যার সমাধানে লাগাই উচিত। মাথা ঠাণ্ডা রাখো।'

'উপদেশটা নিজেকেই দাও।'

'আমার মাথা খুবই ঠাণ্ডা। সবার আগে হারটা সরাও।'

'তাতে লাভ! পরে হারটা যখন আমাদের কাছ থেকে বেরোবে তখন কি হবে? হাজতে? যেখানে যা আছে ঠিক সেইরকমই থাক। চালাকি করে লাভ নেই। এতদিন তোমার কথায় চলেছে, এইবার আমার কথায় চলুক। আমি একটা গাড়ি ধরে সুরঞ্জনাদের বাড়ি যাই। সুরঞ্জনার বাবার সাহায্য এখন কাজে আসবে। পুলিসের ওপর মহলের মানুষ।'

'দেরি হয়ে যাবে। তুমি বরং তোমার বিষ্টুদার সাহায্য নাও। পুলিসকে জানাতে যত দেরি করবে, ততই তাদের সন্দেহ বাড়বে।'

'পুলিস যখন এসে দেখবে কোনও সুইসাইডাল নোট নেই, দেহের কিছুটা অংশ পোড়া, সামনে পড়ে আছে দামী একটা হার, তখন কেসটা কোন দিকে যাবে তুমি জানো?'

'যে দিকেই যাক, জানাতে তো হবেই।'

'অভিজ্ঞ মানুষের পরামর্শ নিয়ে জানাবো। সেইটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।'

'তুমি চলে গেলে আমি একা থাকবো না কি? এখুনি তো কাজের মেয়েটি আসবে।'

মুকুর কথা শেষ হতে না হতেই সদরের কড়া নড়ে উঠল। দু'জনেই ভয়ে কাঠ। সর্বনাশ করেছে। এখন কি হবে! যে বাসন মাজে সে এসেছে। এখুনি সারা পাড়ায় রাষ্ট্র হয়ে যাবে। কাতারে কাতারে লোক ছুটে আসবে গলায় দড়ি দেখতে। এর চেয়ে দর্শনীয় আর কি আছে!

মুকু বললে, 'আমি দরজা বন্ধ করে রাখছি, তুমি কোনও রকমে ওকে ভাগাও।'

দরজা খুলেই অবাক হয়ে গেলুম, সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন অক্ষয়কাকাবাবু। জীবন্ত স্তম্ভের মতো। পাঞ্জাবির ঝুল প্রায় হাঁটু পর্যন্ত। পরিষ্কার ধুতি। পায়ে চপ্পল। কাঁধে একটা গেরুয়া সাইড ব্যাগ। মনে হল, হাতে স্বর্গ পেলুম। পিতার সর্বাধিক প্রিয় বন্ধু পিতার মতোই। যেন হরিশঙ্করই ফিরে এলেন। ভেতরে প্রবেশ করতে করতে বললেন, 'অনেক দিন তোমাদের কোনও খবর নিতে পারিনি। তোমাকে একদিন অবশ্য ট্রামে দেখলুম মাথা নিচু করে একটি মেয়ের পাশে বসে আছ। বুঝলুম, আমাকে অ্যাভয়েড করতে চাইছ, তাই আর বিরক্ত করলুম না।'

অক্ষয়কাকাবাবুকে প্রণাম করে যখন উঠে দাঁড়ালুম তখন আমার দু'চোখে জল। তিনি তাঁর বিশাল চওড়া বুকে আমার মাথাটা টেনে নিয়ে বললেন, 'কিসের এত দুঃখ। সময় কি সব সময় সমান যায়! কখনো ভাল, কখনো খারাপ। নীলকণ্ঠের সেই গানের মতো, শ্যামাপদে আশ, নদীর তীরে বাস, কখন কি যে ঘটে ভেবে হই মা সারা। এক কূল নদী ভাঙে নিরবধি আবার অন্য কূলে আকুলে সাজায়। খবর আমি পেয়েছি, হরিদা চলে গেছেন। কোথায় গেছেন, সেইটাই হল প্রশ্ন।'

'কাকাবাবু তার চেয়ে বড় সমস্যা, এই মুহূর্তে ঘরে একটা ডেড-বডি ঝুলছে।'

'সে কি? এ তোমার কোনও হেঁয়ালি নয় তো!'

'না কাকাবাবু, আপনি জানেন না, কি ঘোর সঙ্কটের মুহূর্তে আপনি এসেছেন! ঈশ্বর আপনাকে পাঠিয়েছেন।'

কাকাবাবু ওপরে উঠতে উঠতে সংক্ষেপে সব শুনলেন। একটাই মন্তব্য করলেন,

'অজ্ঞাত কুলশীল কারোকে আশ্রয়ে রাখার আগে একটু খোঁজখবর নেওয়ার দরকার ছিল পিন্টু। তুমি যাকে কখনো দেখনি, যার ঠিকানাও তুমি জান না, তাকে সোজা বলে দিলেই পারতে, আমার বাবা নেই, আপনি পরে আসবেন।'

দোতলার বারান্দার রেলিং-এ হাত রেখে কাকাবাবু গুম মেরে দাঁড়ালেন। এক মুখ কাঁচাপাকা দাড়ি। সেকালের কোনও মুণি যেন একালে ছাড়া পেয়েছেন। মুকু এসে প্রণাম করল। আমার খুব অদ্ভুত লাগছে, সময় যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। দিদির মৃত্যু নয়, সময়ের মৃত্যু হয়েছে। প্রাণহীন ঘটনা ঘটে চলেছে। কাকাবাবুর আসা, মুকুর প্রণাম, কথাবার্তা, জল্পনা-কল্পনা, সবই যেন স্থিরচিত্র।

কাকাবাবুকে সামান্য ধরিয়ে দিতে হল, মুকুর পরিচয়। মৃদু হাসলেন। মৃতের হাসির মতো। আমরা সকলেই মরে গেছি যেন। দম নেই। আগের বেগেই চাকা ঘুরছে।

কাকাবাবু ঘরে এসে পিতার চেয়ারে বসলেন। হরিশঙ্করের মতোই এক ব্যক্তিত্ব। হাতের আঙুলগুলো বিশাল বিশাল। তর্জনী তুলে আছেন, মনে হচ্ছে সমস্ত ঘটনা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে পরবর্তী আদেশের অপেক্ষায়। টেবিলে একটা টোকা মেরে বললেন, 'আমার প্ল্যান রেডি। কোনও লুকোছাপা নয়, সোজা থানায় গিয়ে আমরা অফিসারকে বলব, মশাই এই এই ব্যাপার। তুমি বলবে আমার বিধবা দিদি আত্মহত্যা করেছে। কারণ একটাই—ছেলের অত্যাচার।'

'কাকাবাবু, ছেলের কথা বললেই প্রশ্ন হবে ছেলে কোথায় ? আমরা তো তার ঠিকানা জানি না কাকাবাবু। বাবা জানলেও জানতে পারতেন।'

'সেই প্রশ্নেরও উত্তর আছে, বাউণ্ডুলে ছেলে। কখনো আসে, কখনো হারিয়ে যায়।'

'পুলিস যখন পাড়ার লোককে প্রশ্ন করবে, তারা তো বলবে, এই মহিলা এখানে থাকতেন না। এই কয়েক দিন হল দেখছি। পুলিস আসা মাত্রই শয়ে শয়ে লোক এসে জুটবে। তখন কি হবে। তা ছাড়া পিঠের দিকে ওই আগুনে পোড়া। পুলিস যদি বলে, এটা আত্মহত্যা নয় খুন !'

কাকাবাবু নিজের কপালে তিনবার আঙুলের টোকা মেরে বললেন, 'উঃ, কি কঠিন সমস্যা ! এ যে দেখি ডাঙায় বাঘ, জলে কুমির। এগোলেও নির্বংশের ব্যাটা, পেছলেও নির্বংশের ব্যাটা। ঠিক আছে, দেখাই যাক না কি হয় ! জলে নেমেই দেখা যাক। সমস্যা আসুক তারপর দেখা যাবে। চলো, থানায় যাই।'

'কাকাবাবু ওই চোরাই হারটা ?'

'পড়ে থাক। অথবা ওটাকে আবার ময়দার তালেই ঢুকিয়ে দেওয়া যাক।'

'সেটা কি ঠিক হবে ? দ্বিতীয়বার যখন পুলিস আসবে হারের খোঁজে, তখন এই আত্মহত্যাটা হয়ে দাঁড়াবে খুন। আমি আর মুকু হারের লোভে মহিলাকে খুন করেছি। তখন সোজা হাজতে।'

কাকাবাবু আবার গুম। অবশেষে বললেন, 'আঃ, আচ্ছা একটা দাবার চাল চেলে গেছে। একেবারে কিস্তিমাতের চাল। তাহলে থাক। যেখানে পড়ে আছে সেইখানেই পড়ে থাক হারটা। আচ্ছা তাই বা কেন ? হারের সন্ধান পুলিস পাবে কি করে ?'

'সহজেই পাবে কাকাবাবু। যাঁদের হার তাঁরা থানায় ডায়েরি করবেন। পুলিস অনুসন্ধানে বেরোবে। গন্ধে গন্ধে চলে আসবে এখানে। তখন কেস আরো জটিল হবে।'

তোমার মাথা দেখছি আমার চেয়ে অনেক সাফ্। হরিশঙ্করদার মাথা। চলো, যা হয়েছে তাই বলব, তারপর যা হবার তাই হবে। কেমন ? সাহস আছে তো ?'

'আপনি সঙ্গে আছেন আর আমি ভয় পাই না।'

থানার বড় দারোগামশাই কোমরে বেল্ট বাঁধছিলেন। সব দারোগার মতোই, এঁরও ভুঁড়ি সমস্যা। এতটাই স্বাধীনতা পেয়ে এসেছে, যে এই মুহূর্তে আর শাসনে আসতে চাইছে না কিছুতেই। এত দুষ্টের দমন করেন, নিজের মধ্য প্রদেশকে দমন করতে পারছেন না কিছুতেই। বেল্ট বাঁধা হলে তিনি আসনে বসবেন। তিনিও দাঁড়িয়ে, আমরাও দাঁড়িয়ে, একজন হাবিলদারও দাঁড়িয়ে। সময়ও যেন দাঁড়িয়ে পড়েছে। রিভলভারটা টেবিলের ওপর। তারপাশেই শুয়ে আছে তেল চুকচুকে ব্যাটন।

পেছনের একটা জানালা খোলা। জানালার ওপাশে পাঁচিল। পাঁচিলের মাথায় স্বর্ণগোধিকার মতো একফালি রোদ। পাঁচিলের ওপিঠ থেকে ছোট্ট একটা লতা সবে তার দুটি পাতাকে জাগাতে পেরেছে, যেন গোপনে চুমু খাচ্ছে রোদ। কড়ির পাশে কোমল। অতি কষ্টে প্রথম ফুটোয় বেল্ট বেঁধে দারোগাসায়েব চেয়ারে বসে ভুরু কুঁচকে আমাদের দিকে তাকালেন। কাকাবাবুর শালপ্রাংশু চেহারা টেবিলে ছায়া ফেলেছে। কর্কশতম গলায় বললেন, 'কি চাই ?'

কাকাবাবু সামান্যতম ঘাবড়ে না গিয়ে বললেন, 'আপনার সাহায্য।'

'কে মরেছে ?'

'কি করে বুঝলেন ?'

'আরে মশাই এই সময় গলায় দড়ি দিয়েই তো সব আসে। এত বছর দারোগাগিরি করছি কি কারণে ? এইটুকুই যদি না বুঝবো ! ঠিকানা বলুন।'

কাকাবাবু খুব নরম গলায় বললেন, 'আপনার অদ্ভুত ক্ষমতা। এমন আমি দেখিনি কোথাও।'

দারোগাসায়েব গম্ভীর গলায় বললেন, 'বসুন।'

পুবের জানালা দিয়ে এক চিলতে রোদ চোরের মতো ঢুকেছে। টেবিলের তলায় অন্ধকার খুঁজতে এসেছে। শেষ শত্রুটিকেও আর আস্ত রাখবে না।

কাকাবাবু সবিনয়ে বললেন, 'আপনার যদি মন ভাল থাকে, তাহলে সামান্য কিছু নিবেদন করতে চাই।'

দারোগাবাবু বুক চিতিয়ে বললেন, 'আমি ঘুষ নিই না, এমন কি একটা চালকুমড়োও না।'

'আমি কিন্তু ঘুষ নিবেদন করতে চাইনি। এপাশে বসে আপনার হাতের যতটুকু আমি দেখেছি, আঙুল, বুড়ো আঙুল, নখ, তাতে আমি বুঝেছি, আপনি আধ্যাত্মিক জগতের মানুষ। সেন্টপারসেন্ট স্পিরিচ্যুয়াল। বৃহস্পতি তুঙ্গী, মঙ্গল স্বক্ষেত্রী। কেবল একটাই সমস্যা মাথায় আঘাত লাগতে পারে।'

'লাগতে পারে কি মশাই, লেগে গেছে একবার। আবার লাগবে ?'

'ওইটাই তো আপনার উইক পয়েন্ট। আর ওই পয়েন্ট থেকেই স্ত্রীর সঙ্গে অবনিবনা। ওইটাই আপনার জীবনের একটা কার্স। সংসারে ঢোকার আগে আমার সঙ্গে পরামর্শ করলে আমি আপনার রাইট পার্টনার সিলেক্ট করে দিতুম। আপনার স্ত্রীর বৃহস্পতিও প্রবল। প্রবলে প্রবলে একটু বেশি বলাবলি হয়ে যায়। তবে স্ত্রীভাগ্যেই আপনার জীবনের উন্নতি।'

দারোগামশাই কেমন যেন হাঁ হয়ে গেছেন। চোখ দুটো স্থির পটলের মতো।

কাকাবাবু কোনও রকম দয়ামায়া না করে একটা বম্বশেল ছাড়লেন, 'আপনার দ্বিতীয়বার

বিবাহ হবে এবং আপনার জীবন তখন মহাসুখে ভরপুর হবে।'

দারোগামশাই হাবিলদারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'অ্যায় তুমি বাইরে যাও।'

তিনি সঙ্গে সঙ্গে স্যালুট করে বেরিয়ে গেলেন। ভদ্রলোক কাকাবাবুর দিকে একটু ঝুঁকে এসে বললেন, 'এসব আপনি বলছেন কি করে ? সেন্টপারসেন্ট মিলে যাচ্ছে !'

কাকাবাবু হাতির দাঁতের মতো হেসে বললেন, 'আমার গুরু হলেন তারাক্ষেপা। সবই তাঁর কৃপা, তাঁরই শক্তি। আর যৎসামান্য জ্যোতিষী।'

'আপনি আমার হাত দেখছেন কি করে ? আমি তো টেবিলের এপাশে ?

'যা বলছি সব আপনার হাতের এপিঠ, এপারে বসে দেখে বলছি। ওপিঠে আরো কি আছে কে জানে ? তারপর বাঁ হাত ! বাঁ হাতে আছে আপনার প্রারব্ধ, যা নিয়ে এসেছেন। জানেন তো মানুষ নিয়ে এসে দিয়ে যায়। কি রকম জানেন, একজন সেলসম্যান, হাতে ফোলিও ব্যাগ, এসেছে। একে একে সব বের করে হাতে হাতে তুলে দিচ্ছে। এই নাও সাহিত্য, এই নাও সঙ্গীত, এই নাও চিত্রকলা, আচ্ছা এই নাও সেবা, পরোপকার, এই নাও ভালবাসা, এই নাও সাধনা, আবার, এই নাও নিষ্ঠুরতা, অত্যাচার, হত্যা। ব্যাগ থেকে সব একে একে নামিয়ে রাখছে। এই হল মানুষের জীবনের কাঠামো। জ্যোতিষীর সঙ্গে সাধনা, আধ্যাত্মিকতা যুক্ত না হলে মানুষকে স্টাডি করা যায় না। গুরুর কৃপায় আমি শতকরা নব্বই ভাগ মেলাতে পারি। কিন্তু আমার কোনও গর্ব নেই।'

দারোগাসাহেব একেবারে অভিভূত। আরো খানিকটা ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'চলুন না আমার কোয়ার্টারে ; কিছুক্ষণ হয়ে যাক। আমার বউয়ের হাতটাও একবার দেখবেন।'

'নিশ্চয় দেখবো, দ্যাটস মাই প্লেজার। শুধু আমাদের এই বিপদ থেকে উদ্ধার করে দিন। বড় সমস্যায় পড়ে গেছি। মান-সম্মান নিয়ে টানাটানি। কেসটা মন দিয়ে শুনুন।'

'অফকোর্স, অফকোর্স। দাঁড়ান চা আনাই আগে।'

পুলিসের হুকুম, সে যেন মাথায় ছাত ভেঙে পড়ল। যেন চা নয়, হাবিলদারকে তিনটে মুণ্ডু কেটে আনতে বললেন। চা এসে গেল। কাকাবাবু একটু একটু করে সব বললেন। স্তরে স্তরে। সব শুনে দারোগাসায়েব বললেন, 'র‍্যাশান কার্ড ছিল ?'

'র‍্যাশান কার্ড থাকবে কি করে ? এ বাড়িতে তো সবে এসেছিল।'

'একটা ঠিকানা, কিছু আত্মীয়স্বজন থাকলে জিনিসটার চেহারা অন্যরকম হত। কিছুটা রিস্ক থেকে যাবেই। যাক সে কি আর করা যাবে। লাশ নামিয়ে এনে পোস্টমর্টেমে ঠেলে দি। হাপিস করে দোবো ?'

'হাপিস কাকে বলে ?'

'একেবারে হাওয়া। আনক্লেমড্ বডি।'

দিদির মুখ ভেসে উঠল চোখের সামনে। পাঁচিলের মাথার ওপর দিয়ে উঁকি মারা লতার দুটো কচি পাতার মতো। নিষ্ঠুর পৃথিবীকে দেখতে চাইছে ভীরু মুখে। একটু বাঁচতে চাই। একটু রোদের ছোঁয়া। আমি ফুল হব, আমি ফল হব। আমি সংসার করব, ভালবাসব, ভালবাসা পাব। আমার একটা অর্থ থাকবে। আমার একটা মূল্য থাকবে। আমি আলোর অভিসারী। দিদির ধারালো মুখ দেখতে পাচ্ছি। সুরেলা কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি। দিদির এই আত্মহত্যার পশ্চাৎপটেও গভীর একটা রহস্য আছে আমি ধরতে পারছি না। আর যাই হোক অজ্ঞাত মৃতদেহ হিসেবে গাদায় ফেলে দেবে, তারপর কঙ্কাল করে বেচে দেবে ডাক্তারির ছাত্রর কাছে, এ আমি চাই না। মৃত্যু আমারও হবে— আজ হোক, কি চল্লিশ বছর পরে হোক। আমার মৃত্যু আমাকে তখন ক্ষমা করবে না। আচমকা গলা দিয়ে প্রতিবাদ বেরিয়ে

এল, 'না, না, তা কেন করবেন, যতই হোক আমার দিদি তো !'

দারোগাসাহেব মুচকি হেসে বললেন, 'এই হল হিন্দু। কিছুতেই সংস্কার ছাড়তে পারে না। বেশ ঠিক আছে। আমি লাশ নামিয়ে পোস্টমর্টেমে পাঠাচ্ছি। সন্ধেবেলা আপনারা ডেলিভারি নিয়ে আসবেন।' এক মুহূর্ত বিরতি। নিমেষে চলে গেলেন জ্যোতিষে, 'আচ্ছা কোনও স্টোন ধারণ করলে পারিবারিক অশান্তি কমা, কি কুইক প্রোমোশান, এই সব হতে পারে ?'

'কেন পারে না ?' কাকাবাবু আবার খেলাতে লাগলেন, 'জেম থেরাপিতে কিছু কাজ অবশ্যই হয়। তবে দেখেশুনে, কোষ্ঠীবিচার করে পাথর দিতে হবে। আপনার কোষ্ঠী আছে ?'

'শুধু কোষ্ঠী, গাছ কোষ্ঠী। আপনার আজ সময় হবে ?'

'এই যে এক ফ্যাচাং। সারাটা দিন তো এইতেই যাবে। তা না হলে আজ দিন তো ভালই ছিল।'

'আপনাদের কিচ্ছু করতে হবে না। সব আমি করিয়ে দিচ্ছি। এই থানা থেকেই বডি পাইয়ে দোবো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। আজ আপনি আমার গেস্ট। কি পছন্দ করেন চিকেন না মাটন ?'

'আমি তান্ত্রিক, মাটনই আমার পথ্য।'

আমরা সদলে বেরিয়ে এলুম থানা থেকে। কানে লেগে রইল একটি প্রশ্ন, চিকেন না মাটন ! পৃথিবী বেলাভূমির মতো, জীবনের ঢেউয়ে মৃত্যুর পদচিহ্ন মুছে যেতে এক লহমা সময় লাগে। গত সন্ধ্যায় দিদি লুচি ভাজার আয়োজন করছিলেন। ময়ান দেওয়া ময়দার তাল এখনও পড়ে আছে ডেকচি চাপা। কড়ায় পড়ে আছে শুকনো আলুর দম। পেটের খিদে, মনের খিদে, খিদে নিয়েই চির বিদায়। পৃথিবীর যতেক মানুষের খিদে কিন্তু রয়েই গেল। এঁরা কি করে চিকেন-মাটনের কথা ভাবছেন !

পুলিস, পুলিস করে সারা পাড়া ভেঙে পড়ল। যাঁরা বাজারে যাচ্ছিলেন তাঁরা থমকে গেলেন। কাজের মহিলারা ময়লা আঁচলে হাত মুছতে মুছতে বাড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। ট্যাঁক থেকে খইনির পুরিয়া বের করে নিচের দাঁত আর ঠোঁটের মাঝখানে পুরে পিচ পিচ করে থুতু ফেলতে লাগল। চারিদিকে দস্তু স-এর ছড়াছড়ি। শাড়ি আর তেলচিটে খোঁপা আর বিনুনির মেটেমেটে গন্ধ। বারান্দায় বারান্দায় বউ আর লুঙ্গিপরা কর্তাদের ঝুঁকে থাকা ঝুল মূর্তি। কারোর কারোর মুখে সিগারেট। গবেষণার অন্ত নেই। ইতিহাস নিয়ে নাড়াচাড়া। এ-পাড়ায় কবে কে আত্মহত্যা করেছিল। সেই মেনিদার খ্যানখ্যানে গলা।

দারোগাসায়েব ঘটনাস্থলে ঢুকেই জাত দারোগা হয়ে গেলেন। ঝুলে থাকা দিদির দেহটাকে যৎপরোনাস্তি পর্যবেক্ষণ করলেন। যে অংশে আগুনের ঝলসানি সেই অংশটা দেখলেন। মেঝে থেকে হারটা তুলে নিয়ে বললেন, 'এর দাম অনেক।'

কাকাবাবু বললেন, 'ওটার যা হয় একটা ব্যবস্থা করবেন। দেখবেন মালিক যেন ফিরে পায়।'

এরই ফাঁকে একবার বাইরে বেরিয়ে গিয়ে জমায়েতকে ধমকধামক লাগিয়ে এলেন। পুলিসের কালো গাড়ি চেপে দিদি চলে গেলেন কাটাই-ছেঁড়াই হতে। আমরা দু'জনে আবার থানায়। পাড়া থেমে পড়েছিল আবার চালু হয়ে গেল। উত্তেজনা থিতিয়ে গেল।

থানায় আমাদের একটা স্টেটমেন্ট লিখে সই করতে হল। যা জানি, যা ঘটেছে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। এক মহিলার চকিত জীবনকাহিনী। গগনচন্দ্রের চেহারার বর্ণনা। সব

জমা পড়ে গেল মহাফেজখানায়। দিদির সেই পোঁটলা পড়ে আছে একপাশে। হারের সঙ্গে আমাদের দু'জনের সই করা একটা স্টেটমেন্টও জমা পড়ল।

কাকাবাবু সবশেষে জিজ্ঞেস করলেন, 'এরপর কি ধরনের ঝামেলা আসতে পারে?'

দারোগাসায়েব ঠোঁটে সিগারেট গুঁজতে গুঁজতে বললেন, 'পুলিসে ছুঁলে আঠারো ঘা। প্রবলেম হল ওই পুড়ে যাওয়াটা। মনে হতে পারে প্রথমে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা হয়েছিল, তারপর ঝোলানো হয়েছে। এখন ঝুলতে গেলে একটা কিছুর ওপর উঠতে হয়। সেরকম কিছু কি ছিল ঘরে? খেয়াল করতে পারছি না তো। ছিল কি?'

আমরা তিনজনে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে বসে রইলুম। সিগারেটের ধোঁয়া রোদের রেখায় পাক মারছে ছিন্নমস্তার ধূমল চুলের মতো। দাঁড়িয়ে আছেন সেকেণ্ড অফিসার। হাতের তালুতে ব্যাটন ঠুকছেন।

২১

সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে আমি তখন জাগে, সেই আমিটা কে ?

আঠারো ঘা-এর এক ঘা। কিসের ওপর দাঁড়িয়ে দিদি গলায় ফাঁস আটকেছিল ? এই সন্দেহ তুলে দারোগামশাই জোরে জোরে সিগারেট টানতে লাগলেন। ওটা না কি একটা ইম্পর্টান্ট পয়েন্ট। একটা টুল, একটা চেয়ার, যা হয় একটা উঁচু কিছু থাকা উচিত ছিল ঘরে। নেই কেন ?

সিগারেটের ধোঁয়ায় পাক মারছে দারোগামশাইয়ের প্রশ্ন।

কাকাবাবু বললেন, 'তাহলে আপনি কি সন্দেহ করছেন ?'

সিগারেটের জ্বলন্ত টুকরোটা মেঝেতে ফেলে দিয়ে, ঠোঁট ছুঁচলো করে ধোঁয়া ছেড়ে অফিসার বললেন, 'বিশ্রী রকমের একটা সন্দেহ। ইট মে বি এ কেস অফ মার্ডার। আগে মেরেছে তারপর ঝুলিয়েছে।'

'কে মেরেছে ?' কাকাবাবুর প্রশ্ন।

'সেটা তো আপনারাই বলবেন।'

'কেন পোস্টমর্টেম বলতে পারবে না ?'

'তা অবশ্য পারবে। অপেক্ষা করে বসে থাকতে হবে। সেই সন্ধে পর্যন্ত। জটটা আমাদেরই ছাড়ানো উচিত, তা না হলে আর ইনভেস্টিগেশান কি হল। ভাবছি আর একবার যাই ঘটনাস্থলে।'

কাকাবাবু হাসতে হাসতে বললেন, 'সেই প্যাঁচ ! পুলিশী প্যাঁচ মারছেন ! ভুলে গেলেন আমাদের সম্পর্ক !'

দারোগামশাই ফিক্ করে হেসে বললেন, 'আইনের সঙ্গে মানুষের একটাই সম্পর্ক, বিচার অথবা অবিচার ? আমি যদি অবিচার করি পাঁচজনে বলবে, ব্যাটা ঘুষখোর ! পাঁচ হাজার পকেটে পুরে, নিজে খেয়ে, অন্যকে খাইয়ে, খুনকে আত্মহত্যা বলে চালাচ্ছে। পাবলিকও কিছু অন্যায় করবে না, এইরকমই তো হচ্ছে আজকাল। আর এ-পাড়ার পাবলিক তো একজন, মেনি মুখার্জি। এই এলো বলে, মুখে জর্দা-পান ঠুসে !'

কাকাবাবু বললেন, 'আর বলতে হবে না, একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেছে ; তবে পাঁচ হাজার পারব না, দেড় হাজার। দেড় একটা ভাল সংখ্যা। সব সময় এককে ঘিরে থাকবেন। একে চন্দ্র ! আমি আমার ভাইপোকে বলছি, এখুনি নিয়ে আসছে।'

'আপনি বুদ্ধিমান মানুষ। ধরেছেন ঠিক। যে-দেবতার যে-নৈবেদ্য! দেড় খুবই কম। কেস তো সিরিয়াস! অনেককেই খিলাতে-পিলাতে হবে। যাই হোক আপনাকে কি আর বলব! আপনি গুণী মানুষ!'

কাকাবাবু থানার বাইরে এসে আমাকে খুব আস্তে-আস্তে বললেন, 'বাড়িতে ক্যাশ কিছু আছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, হাজার পাঁচেক আছে।'

'যাও একটা খামে ভরে দেড় নিয়ে এস। যেমন কর্ম তেমন ফল। এবার তোমার একটু সাবধান হবার সময় এসেছে। আর ওই মেয়েটির খপ্পর থেকে বেরিয়ে এসো। ও তোমার জীবনের রাহু, গ্রাস করে বসে আছে। সংসার তোমার হবে না বাপু। একমাত্র সন্ন্যাস, সন্ন্যাসই তোমার পথ। গতানুগতিক জীবন তোমার নয়। তোমার কোষ্ঠী আমার মুখস্ত। যাও টাকাটা তুমি নিয়ে এসো। দারোগাকে ততক্ষণ আমি একটু মালিশ করি।'

বাড়ির সামনে থেকে ভিড় সরে গেলেও, মেনিদা ঠিক ঘুর ঘুর করছেন। চোখ-মুখ যেন পুরুষ্টু লাল একটি লঙ্কার মতো। চনমন, চনমন করছেন। মানুষের সর্বনাশে মহা উল্লসিত! আমি যখন চাকরি পেলুম, মেনিদা তখন বিষ্টুদার দোকানে চা খেতে খেতে বলেছিলেন, 'চাকরি পেলে কি হবে, মাইনে পাবে না।' এ-পাড়ায় কেউ পরীক্ষা দিলে মেনিদা তার জীবন অতিষ্ঠ করে তোলেন, 'কি হে তোমার রেজাল্ট কবে বেরোবে!' কেউ পাশ করেছে শুনলে ভীষণ দুঃখ পান। কারোর অসুখ করেছে শুনলে, দু'বেলা দেখতে ছোটেন! পরিবার, পরিজনকে নানাভাবে ভয় পাইয়ে দিয়ে আসেন। ইদানীং এক ভণ্ডামি ধরেছেন, ভোরবেলা একটা খঞ্জনি হাতে নগর-পরিক্রমায় বেরোন। খাঁই খ্যাঁচা শব্দে আর মিনমিনে গলার মিলনে সে এক অপূর্ব মহানাম। ভালভাবে উচ্চারণ করারও ক্ষমতা নেই। হরে কৃষ্ণ, হরে রাম হয়ে দাঁড়ায়, হচে কৃষ্ণ, হচে রাম। ঈশ্বরের কি মহিমা! হরে উচ্চারণ করলে যে উদ্ধার পেয়ে যাবেন। নাকের ওপর পাউডারের তিলক-সেবা। পাউডার আর সাবু একসঙ্গে ফেটিয়ে ওই শিল্পকর্মটি করেন। এক রাউন্ড মেরে এসেই তেলেভাজার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়েন। গনগনে উনুন। কড়ায় টইটম্বুর তেল। গোল গোল ফুলুরি সাঁতার কাটছে। সামনে মেনিদা আর ভোলা ষাঁড়। দোকানির নাম নিত্যানন্দ। মেনিদা তেল মারছেন 'নিত্যানন্দ প্রেম বিলোতে এসেছিলেন। তুমি এসেছ ভক্তজনকে প্রেমসে তেলেভাজা বিলোতে।' নিত্যানন্দ প্রথমে ষাঁড়কে একটি বেগুনি খাওয়াবে, পরে মেনিদাকে দুটি ফুলুরি শালপাতায় মুড়ে দেবে। সেটিকে কপালে ঠেকিয়ে মেনিদা মিনমিনে গলায় বলবেন, 'জয় রাধে!'

আমাকে দেখে মেনিদা এগিয়ে আসতে আসতে বললেন, 'স্কোয়্যার আপ, স্কোয়্যার আপ। সব শত্রুতা ভুলে যাও। জানবে, ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড, ডিভাইডেড উই ফল। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে মহামতি গোখলে অগ্নিযুগে আমাদের বলেছিলেন। আমরা তখন দেশের স্বাধীনতার জন্যে আলু-পটলের মতো প্রাণ দিচ্ছি। সংসার-টংসার সব চুলোয় গেছে। টেগার্টকে টার্গেট করে আমরা তখন ছাতা মাথায় ঘুরছি। জামার পকেটে রিভলভার। গলায় গুলির মালা। শ্রীরঙ্গমে যাই। এক একদিন এক এক মেকআপ। লালবাজারের সামনে ঘুরি। কাওয়ার্ড। সায়েব ভয়ে আর বেরোয় না। এর নাম ইংরেজের বাচ্চা! সাহস থাকে বুক পেতে দে রিভলভারের সামনে। আমরাও ছদ্মবেশে, সে ব্যাটাও ছদ্মবেশে। একদিন দেখি বোরখা পরে বেরিয়ে আসছে। ধরেছিলুম ঠিকই, ভেরিফাই করতে গিয়ে পালাল। ভেরিফাই করতে গেলুম কেন জানো, ক্ষুদিরামের কেস যেন না হয়ে

যায়—বড়লাটকে মারতে গিয়ে মারলাম ইংলন্ডবাসী। সত্যিই যদি মুসলমান রমণী হয় তাহলে তো কম্যুনাল রায়াট বেঁধে যাবে! বিপ্লবের পথ বড় কঠিন পথ! তা ওই মেয়েমানুষটি কে?'

গা আমার জ্বলে যাচ্ছিল। ভদ্রলোক আমার পিতার ভাষায় ক্রিস্ট্যালাইজড ইডিয়েট। তবু ভদ্রতার খাতিরে উত্তর দিতে হল, 'এই তো আপনিই বললেন, বোরখা পরা টেগার্ট।'

'আরে ধ্যুর!' মেনিদা কাকতাড়ুয়ার মতো নেচে উঠলেন, 'আরে আমি অতীত থেকে বর্তমানে চলে এসেছি, গলায় দড়িটা কে? তোমাদের বাড়িতে তো আগে দেখিনি কখনো।'

'জানার খুব প্রয়োজন?'

'বাঃ জানতে হবে না। বাইবেলে আছে, লিভ ফর আদার্স। অন্যের জন্যে বাঁচো। বি এ গুড স্যামারিটান। তুমি তো জানো আমি অক্ষরে অক্ষরে সেই নির্দেশ পালন করি। নিজের ঘর-সংসার তো ছেড়েই দিয়েছি। জনহিতকর কাজে সারা দিন ঘুরছি। আর মনে মনে বলছি, তোমার পকাতা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শতকি।'

কানে খট করে লাগল, এ আবার কি? পকাতা? শতকি?

না বলে পারলুম না, 'পকাতা, শতকি মানে?'

মেনিদা খ্যাঁত খ্যাঁত করে হেসে বললেন, 'একে বলে ম্যালাপ্রপিজম। রোগটা ইংরেজদেরই হয় তবে আমারও তো সাদা চামড়া। ক'জন বাঙালির এমন গায়ের রঙ ছিল বলো। এখন একটু পুড়ে গেছে পৃথিবীর শোকে-তাপে। তোমার বউদি তো বাসরঘরে প্রথম প্রশ্নটাই করেছিল ইংরেজিতে—হোয়াটস দ্যা টাইম নাও। বোক্‌কা মেয়ে, বোক্‌কা মেয়ে, ভেবেছিল পাঞ্জাবি পরা সায়েব! ওটা হবে পকাতা। না না পকাতা নয়, পতাকা, শতকি নয় শকতি। আরে লাইনটা তো তুমি বহুবার শুনেছো, তোমার পকাতা, না দাঁড়াও, ধরে ধরে বলি, তোমার পতাকা···।'

'আমার ভয়ঙ্কর তাড়া! পরে শুনবো।'

'আমারও অনেক কাজ; তবে কি জানো, বিপ্লবী ছিলুম তো, তাই নিজের স্বার্থে দিয়া বলি পরের স্বার্থে ছুটি।' এখন আবার মহাপ্রভু ঘাড় ধরেছেন। নিজের কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। নাম প্রচার। ঘুমন্ত মানুষের কানে ঢেলে দাও মধুর হরি নাম। উঃ, গায়ে কাঁটা দেয়, মহাপ্রভু স্বপ্ন দিলেন, ওরে যা, তাপিত, আর্তজনে নাম বিতরণ কর। আর ঘুমায়ো না মন। মায়াঘোরে কত দিন আর রবে অচেতন। কে তুমি কি হেতু এলে, আপনারে ভুলে গেলে। দেখ রে নয়ন মেলে অরুণ তপন। নিজেকে ভুলে যেয়ো না পিন্টু। সব আণ্ডিল বান্ডিল বেঁধে প্রভুর শ্রীচরণে নিবেদন করে দাও। বাই এনি চান্‌স, তোমার কাছে গোটাদশেক টাকা হবে? জানোই তো আমার দিন চলে মাধুকরী ক'রে।'

'এক টাকা আছে।'

'ঠিক আছে, নাইন শর্ট। নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল। আলু কিনে বাড়ি যাই; কিন্তু মেয়েমানুষটি কে ছিল? সাক্ষাৎ বৈষ্ণবী। ওই নাক, ওই কপাল। রসকলি করলে রস যা জমতো! হঠাৎ আত্মহত্যা করল কেন? গর্ভবতী হয়েছিল না কি?'

আবার আমার মনে হল, সেদিনের মতো মারি এক থাপ্পড়। লোকটা যেন বজ্জাতের জিলিপি। নিজেকে যথেষ্ট সংযত করে বাড়িতে ঢুকলুম। গোটা বাড়ির পরিবেশ থমকে গেছে। মৃত্যুর গন্ধ। সিঁড়ির প্রথম ধাপে মুকু বসে আছে। গালে হাত। কাজের মেয়েটি বলছে, 'একেই ভূতের বাড়ি, আরো একটা ভূত বেড়ে গেল। রাতের বেলা সব থাকবে কি করে! আমার তো এখনই গা ছমছম করছে। পুজোটুজো দাও। তোমাদের বাড়িতে গ্রহ

লেগে গেছে।'

মুকুর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করল না। পাশ দিয়ে সোজা উঠে এলুম ওপরে। দেড় হাজার টাকা নিয়ে এখনি আমাকে থানায় ছুটতে হবে। আলমারিতে কাপড়ের ভাঁজে আমার ব্যাগ আছে। সেই ব্যাগে আছে টাকা। আলমারি খুলে যথাস্থানে হাত বাড়াতেই ব্যাগটা পেয়ে গেলুম। চামড়ার ব্যাগ। সোনালি মনোগ্রাম, এইচ এস। হরিশঙ্কর। ব্যাগটার একটা ইতিহাস আছে। আমার জ্যাঠামশাই কোনো এক কালে আমার পিতাকে উপহার দিয়েছিলেন। তিনি আবার উপহার দিয়েছিলেন আমাকে। কারণ তাঁর ব্যাগের কোনও প্রয়োজন হত না। তিনি টাকা রাখতেন খামে। সোনার হাতঘড়ি খাপেই থাকত। কখনো হাতঘড়ি পরতেন না ; কারণ বিলাসিতা।

ব্যাগটা খুলেই চক্ষু স্থির। একটাও টাকা নেই। সব হাওয়া। পাগলের মতো আলমারি হাঁটকাতে লাগলুম। নিমেষে সব ওলটপালট। আমার স্পষ্ট মনে আছে ব্যাগে আমার সব জমানো টাকা অত্যন্ত সাবধানে রেখেছিলুম। আলমারির চাবি খোলা কেন ? খোলা থাকার তো কথা নয়। অদ্ভুত একটা শূন্যতা নেমে এল। সব ঝিমঝিম করছে। আমার নিজেরই আত্মহত্যা করার ইচ্ছে হচ্ছে।

আলমারির সমস্ত মাল মেঝেতে ছড়িয়ে ফেলেছি। কোথায় কি ? টাকার নামগন্ধ নেই। মুকু এল গম্ভীর মুখে। বিমর্ষ গলায় প্রশ্ন করল, 'কি খুঁজছো অমন লণ্ডভণ্ড করে ?'

'আমার টাকা। এই ব্যাগে আমার পাঁচ হাজার টাকা ছিল। ব্যাগ খালি।'

'তার মানে ?'

'তার মানে ব্যাগে টাকা নেই। আলমারি যদ্দুর জানি চাবি দেওয়া ছিল ; এখন দেখছি, চাবি খোলা।'

মুকু মেঝেতে বসে পড়ে বললে, 'আমি তখনই জানতুম, চিল যখন পড়েছে কুটো না নিয়ে উড়বে না। আলমারির তালা ভেঙে টাকা নিয়ে হাওয়া।'

'কি হবে এখন ? থানায় যে দেড় হাজার টাকা দিতে হবে !'

'আমার কাছে ঠিক দেড় হাজার টাকাই আছে, নিয়ে যাও। দিয়ে এসো খেসারত।'

নিচে নেমে এলুম। কাজের মেয়েটি বললে, 'দেখুন তো এটা কোনও দরকারি কাগজ কি ?'

এক টুকরো কাগজ। একটা ক্যাশমেমোর পেছন দিক। পরিষ্কার লেখা, 'পিন্টু, চলে যাওয়াই ভাল। তবে পৃথিবীর কোথাও নয়, একেবারে পৃথিবীর বাইরে। যে-হারটা নিয়ে এত সমস্যা, সেটা আমারই। আমার মামার বাড়ির বহু মূল্য চন্দ্রহার। আমার দিদিমা গোপনে আমাকেই দিয়ে গিয়েছিলেন। এতকাল বুকে করে আগলে রেখেছিলুম। শেষ পর্যন্ত পেরেওছি। গগন ওইটার সন্ধানেই এসেছিল। ময়দার তালের মধ্যে ঢুকিয়ে গগনকে বোকা বানিয়েছিলুম। আর যাই হোক আমি চোর নই। পিন্টু, ওই হারটা তোমার বিয়ের সময় মুকুর গলায় পরিয়ে দিয়ো। তোমার হতভাগিনী, গরিব দিদির উপহার। আমাকে মনে রেখো না। আমার জন্যে দুঃখ কোরো না। পৃথিবীতে আমরা এইভাবেই আসি, যাই। তোমার দিদি।'

স্বার্থপরতার কি খোলতাই রূপ ! কোথায় অসহায় এক মহিলার প্রতি অবিচারের জন্যে মর্মাহত হব, তা না, মনে হল হাতে স্বর্গ পেয়েছি। এই তো সেই আত্মহত্যার চিঠি। অপূর্ব ওই হারটার জন্যে মনে লোভও জেগেছিল। এখন সেইটা বুঝতে পারছি, যাক পুলিশের হেফাজত থেকে হারটা আমাদের হাতে এসে যাবে এই এক চিঠির জোরে। তীরবেগে

থানার দিকে দৌড়লুম। যেতে যেতে ভাবলুম, দেড় হাজার টাকাও তো বাঁচান যায়। সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ হাজারের শোক ভুলে গেলুম।

কাকাবাবু আর দারোগাসায়েব কেউই অফিসঘরে নেই। সেকেন্ড অফিসার বললেন, 'দু'জনেই কোয়ার্টারে। যান না, চলে যান। পাশের গলিতে ঢুকলেই দোতলার সিঁড়ি।'

বারান্দায় বসে আছেন দু'জনে মুখোমুখি। কাকাবাবুর হাতে সেই পরিচিত লেন্স। দরজার সামনে এক রাগী চেহারার ভদ্রমহিলা। দারোগাবাবুর স্ত্রী। মাঝে মাঝেই স্বামী-সম্পর্কে একটা-দুটো মন্তব্য ছুঁড়ছেন। প্রথম যেটা কানে এল, তার ভাবার্থ, গাধারাও না কি ওই ভদ্রলোকটির চেয়ে বুদ্ধিমান।

কাকাবাবুর কানে কানে বললুম, 'একটা চিঠি পেয়েছি।'

চিঠিটা তাঁর হাতে দিলুম। টেবিলের আড়ালে কোলের ওপর রেখে দ্রুত পড়ে নিলেন।

কানে কানেই বললুম, 'আর টাকা দেওয়ার প্রয়োজন আছে ? হারটাও চেয়ে নিন।'

কাকাবাবু চিঠিটা এগিয়ে দিলেন অফিসারের দিকে। দিয়ে বললেন, 'কেসটা মনে হয় একটু সহজ হল। এটা হত্যা নয়, আত্মহত্যাই। আর হারটাও আমাদেরই সম্পত্তি।'

দারোগাবাবু চিঠিটা পড়লেন ভুরু কুঁচকে। তারপর একটা প্যাঁচ মারলেন, 'দিদি কে ? নাম কোথায় ? সবাই তো দিদি। কোন দিদি ? এই চিঠিটা তো ম্যানুফ্যাকচার্ড হতে পারে !'

কাকাবাবু বললেন, 'হাতের লেখা মেলান।'

'হাতের লেখা পাবো কোথায় ? বেশ বললেন যা হোক !'

আমার মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। বললুম, 'পুঁটলিতে একটা পকেট গীতা আছে। তার মধ্যে হাতের লেখা থাকতে পারে।'

দারোগাসায়েব হেসে বললেন, 'অশান্তি করে লাভ কি ? কেস তো ফয়সালা হয়েই গেছে। তবে হারটা আমাদের কাস্টিডিতেই থাকবে। ওটার জন্যে সেপারেট ইনভেস্টিগেশান। অমন একটা মূল্যবান জিনিস এমন একজন রেচেড মহিলার অধিকারে আসে কি করে ? একটা সাধারণ সাদামাটা হার হলে কিছু বলার ছিল না। তা ছাড়া এর পেছনে আর একটা আননোন লোকের কানেকসান আছে। দেখতে হবে কোনও থানায় কোনও কেস জমা পড়ছে কি না ? উই আর টু ওয়েট। আমাদের এতটা রেসপনসিবিলিটি আছে। নিন আমার স্ত্রীর হাতটায় ঝপ করে একবার চোখ বুলিয়ে নিন।'

কাকাবাবু বললেন, 'টাকাটা কি তাহলে দেওয়ার প্রয়োজন আছে ?'

'অবশ্যই আছে। খরচ নেই ? কত খরচ ! গলায় দড়ি কি যে-সে জিনিস মশাই ? কটা গলায় দড়ি দেখেছেন ?'

কাকাবাবু আমার হাত থেকে টাকাটা নিয়ে ভদ্রলোকের হাতে তুলে দিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেটা চালান করে দিলেন স্ত্রীর হাতে। যেমন দ্যাবা তেমনি দেবী। তিনি যেন কপ করে মিড অনে একটা ক্যাচ ধরলেন। মুকুর দেড় হাজার আউট হয়ে গেল। ওই টাকাটা এখুনি আমাকে যেমন করেই হোক জোগাড় করে মুকুকে ফিরিয়ে দিতে হবে। একমাত্র উপায়, ব্যাঙ্কে চলে যাওয়া।

দারোগাসায়েব আমাকে জানালেন, 'আপনি এখন আসতে পারেন, আমাদের একটু অ্যাস্ট্রলজি হবে।'

কাকাবাবু আমাকে ইশারায় জানালেন, 'সরে পড়ো।'

ফিরে এলুম স্বগৃহে। মুকু ভীষণ ভেঙে পড়েছে। আমাকে জিজ্ঞেস করলে, 'চিরকুটে কি লেখা ছিল।'

'আর জেনে কি হবে ?'

'আমার ওপর রাগ করেছ ? তোমাদের ব্যাপারে নাক গলিয়েছি বলে ?'

'রাগ করিনি মুকু। আমার ভীষণ অভিমান হয়েছে একজনের ওপর, তিনি হলেন আমার পিতা। তিনি যদি আমাকে পরিত্যাগই করবেন ভেবেছিলেন, তাহলে সেই শৈশবেই ফুটপাথে বসিয়ে দিয়ে এলেই পারতেন ! জীবনটা ভিখিরি হয়েই শুরু করতুম। তাঁর নিজের অতীতটাও কেন আমার ঘাড়ে চাপিয়ে গেলেন। আমার অতীত আমিই তৈরি করে নিতুম। এই বর্তমানের ওপর দাঁড়িয়ে আমার কোনও ভবিষ্যৎ তৈরি হবে।'

মুকু ছলছলে চোখে বললে, 'তোমার ভবিষ্যৎ থেকে আমি নিজেই সরে দাঁড়াতে চাই। মনে হয় আমি একটু বাড়াবাড়িই করে ফেলছি।'

'দিদি আমাদের একটা জবরদস্ত আঘাত দিয়ে গেলেন। ওই হারটা চোরাই নয়। ওটা দিদিরই হার। গগনের গ্রাস থেকে বাঁচাবার জন্যে ময়দার তালের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। চিরকুটে সব লিখে দিয়ে গেছেন। চিরকুটে আছে, হারটা আমি মুকুকে দিয়ে গেলুম, বিয়ের উপহার। সেই হার এখন পুলিসের গ্রাসে। আমাদেরই পাকামোর ফল। নিজেকে সবজান্তা ভাবা উচিত নয়। সব সময় ইন্টিউশান কাজে লাগে না। অহঙ্কার বেড়ে যায়। মাঝখান থেকে কপর্দকশূন্য হয়ে গেলুম। পাঁচ, পাঁচ হাজার টাকা হাওয়া হয়ে গেল। তোমার কাছে ধার হয়ে গেল দেড় হাজার। তা ছাড়া এই আশ্রয়টুকুও গেল। এ-বাড়িতে থাকব কেমন করে ! কেবলই মনে পড়ে যাবে একটা মৃতদেহ ঝুলছে। কেবলই শুনতে পাবো পায়ের শব্দ, একটা গলার আওয়াজ। ওপরে উঠে আসার সময় তিনি আমাকে করুণ গলায় বলেছিলেন, পিন্টু, আমি তো তোমার আশ্রয়ে এসেছিলুম। বড় বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে মুকু। নিজেকে দৈবশক্তির অধিকারী ভাবলে এই হয় ! ঠাস্ করে গালে এক চড় মেরে ভগবান উচিত শিক্ষা দিয়ে যান !'

মুকু আমার হাত দুটো ধরে বললে, 'ক্ষমা করে দাও। আজই আমি চলে যাচ্ছি।'

ভীষণ রাগ হয়ে গেল। রণে ভঙ্গ দেওয়াটাই সহজ কাজ। বললুম, 'তা তো যাবেই। সব লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে চলে যাওয়াটাই সহজ কাজ, বুদ্ধিমানের কাজ। এক মুহূর্তও সময় লাগে না। তোমার যা মন চায় তাই করো, আমি এখন ব্যাঙ্কে যাই। এ-বাড়িতে তো আর হাঁড়ি চাপবে না।' কাগজপত্র নিয়ে নেমে এলুম পথে। গলগলে রাস্তা রোদে ভাসছে। সবাই আমার দিকে তাকাচ্ছে চোখে প্রশ্ন নিয়ে। রাষ্ট্র হতে আর বাকি নেই। মাননীয় হরিশঙ্কর। ততোধিক মাননীয় তাঁর পিতা। ঊনবিংশ শতকের নামী এক শিক্ষাবিদ। সুপণ্ডিত। সুলেখক। সাধকোপম এক চরিত্র। সেই বাড়িতে বিধবা রমণীর আত্মহত্যা ! সেই বাড়িতে পুলিশ ! আমার মনে হচ্ছে মাথায় ঘোমটা দিয়ে হাঁটি। একটা মানুষ নয়, পথ দিয়ে হেঁটে চলেছে মানুষের একটা খোলস। মন না মতিভ্রম ! কবিতা আর রোমান্টিক উপন্যাস পড়ে প্রেমিক হতে চেয়েছিলে জানোয়ার ! শ্রীরাধার সন্ধানে কলির কেষ্ট ! রাসলীলা হচ্ছিল। এইবার তুমি মরো। তোমার মানসম্মান পথের ধুলোয় লুটোতে লুটোতে যাক। এ তো বিবস্ত্র হয়ে যাবার মতোই একটা ঘটনা।

ব্যাঙ্কের কাউন্টারে গিয়ে চেক জমা দিয়ে হাতে একটা টোকেন নিয়ে ঘিজিমিজি ভিড়ে, বেঞ্চের একপাশে সরে এসে বসে আছি জড়সড় হয়ে। মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে। সারা রাত ঘুম নেই। দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা। ডাক পড়ল। চেক ফিরে এসেছে। সই মেলেনি। আবার সই করুন। চেকটা হাতে নিয়ে একপাশে সরে এসে ভাবছি, জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে কি সই ছিল, পুরো নাম, না ইনিসিয়াল ! একা একা এই আমার প্রথম টাকা তোলা।

পাশে এক মহিলা এসে দাঁড়লেন। প্রথমে গ্রাহ্য করিনি। হাতের ওপর ফর্সা একটা হাত এসে পড়ল। অবাক কাণ্ড, মুকু। 'তুমি! তুমি এলে কি করে?'

'সাইকেল রিকশা করে। বাড়ি চলো। তোমার টাকা পাওয়া গেছে। তুলতে হবে না।'

'কোথায় ছিল?'

'আস্তে! আস্তে কথা বলো। চলো, বলছি।'

২২

ভীষণ তৃষ্ণার্ত আমি। এই নদী, এই ছায়াবট
আমাকে ফিরিয়ে দেয় ফেরত চিঠির মতো বিবর্ণ বিকেলে ॥

সবই অদ্ভুত। কোথা থেকে কি হচ্ছে বোঝার উপায় নেই। টাকাটা বেরলো কোথা থেকে ? আলমারিতে কাপড়ের ভাঁজে ছিল না। ছিল রান্নাঘরের তাকে, একটা খালি কৌটোর ভেতরে। কারণটা কি ? কে সরিয়েছিল, ওখান থেকে এখানে !

মুকু আর আমি দুজনেই এলিয়ে পড়েছি বারান্দার মেঝেতে। সামনেই বিবর্ণ রেলিং। গাছপাতার আড়ালে আড়ালে ফালি ফালি নীল আকাশ। আমাদের শরীরে আর এক বিন্দু শক্তিও অবশিষ্ট নেই। মনের জোরটাই এখন আমাদের মেরুদণ্ড। আলগা হয়ে গেলেই শুয়ে পড়ব। হরিশঙ্করের ছেলে বলেই বসে আছি। মুকু বসে আছে হরিশঙ্করকে গুরু বলে মানার ফলে। সেই শক্তির নদী থেকে আঁজলাভর তুলে পান করেছে বলে।

দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে আছি। যেন আকাশ তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। আমার মনে যে অনুভূতি খেলা করছে তা বড় অদ্ভুত। যেন আমরা দু জনে স্বামী-স্ত্রী। এই মাত্র আদালতের রায় আমাদের হাতে এসেছে—বিবাহবিচ্ছেদের রায়। একটু পরেই আমাদের সম্পর্ক, সংসার সব ভেঙে যাবে। দুদিনের তরে মিলেছিলুম। দুদিনের খেলা শেষ।

মুকু বললে, 'আমার কি মনে হচ্ছে জানো, দিদি ছিলেন এক অসাধারণ চরিত্রের মহিলা। তিনি আমাদের বাঁচাতেই চেয়েছিলেন। গগনকে যখন পাখা দিয়ে পেটাচ্ছিলেন তখন ওই টাকাটা গগনের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। টাকাটা গগনই আলমারির তালা ভেঙে হাতিয়েছিল। আর গগনই দিদিকে কায়দা করে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল। আমরা আমাদের বন্ধুকে শত্রু ভেবে কি অন্যায়টাই করে ফেললুম ! আর তো তাঁকে ফেরানো যাবে না।'

সদর খোলাই ছিল। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। এক জোড়া পা উঠে আসছে ওপরে। প্রথমে টিপ। পেছনে টিপের মা। পা টিপে টিপে দুজনে এগিয়ে আসছেন। কারোর মুখে কোনও কথা নেই। উদ্বেগ মাখানো মুখ। কোনও শব্দ না করে নিঃশব্দে দুজনে মুকুর দুপাশে বসলে। আমি কোনওরকমে সামান্য একটু হাসি আনার চেষ্টা করলুম। ফল হল উল্টো। এতক্ষণের জমাট কান্না গলে বেরিয়ে এল। কিছুতেই আর থামাতে পারলুম না নিজেকে। টিপের মা এগিয়ে এসে আমার কাঁধে একটা হাত রাখলেন। কমলালেবু রঙের

শাড়ি। সবে স্নান করেছেন। পিঠে ছড়িয়ে আছে এলো চুল। ছোট্ট কপালে সিঁদুরের টিপ। চুলের তেলের মিষ্টি গন্ধ। ফর্সা হাতে মোটা শাঁখা। মনে হল আমার মা এসেছেন। তিনি কোনওরকম সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন না। তাঁর নরম , ভারী হাত আমার পিঠ বেয়ে নামছে আর উঠছে। আর আমার ভেতরটা ফেটে যাওয়ার মতো হচ্ছে। দম বন্ধ হয়ে আসছে। শাড়ির আঁচলের একটা কোণ দিয়ে তিনি আমার চোখ মোছাতে লাগলেন। বহুকাল পরে এই প্রবল দুঃখের মুহূর্তে আমি যে স্নেহ পেলাম, তা যেন নদীর মতো। ভোরবেলা মুকুলিত আম্রকুঞ্জে গেলে যে অনুভূতি হয় সেইরকম এক অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ছে আমার মনে। শীতল পূর্ণচন্দ্রের দিকে তাকালে এমন হয়। বহু ক্রোশ হেঁটে ক্লান্ত সন্তান ফিরেছে মায়ের কোলে। মনে হচ্ছে, কোলে মাথা রেখে তলিয়ে যাই গভীর ঘুমে। যেমন করে ঝিনুক তলিয়ে যায় সমুদ্রের অতলে।

এমন একটা নীরব সভা তছনছ হয়ে গেল। মূর্তিমান দৈত্যের মতো উদিত হলেন অক্ষয় কাকাবাবু। এগিয়ে আসতে গিয়ে থমকে গেলেন। এত মেয়ের মাঝে কেন বসে আছি আমি! আমাকে জড়িয়ে ধরে আছেন এক মহিলা। এ তো ভয়ঙ্কর অপরাধ! অক্ষয়কাকাবাবুর হাতে একটা ব্যাগ। ব্যাগটা নতুন। ব্যাগ কিনে বাজার করে ফিরেছেন। কাঁধে একটা নতুন গামছা। কোনও কথা না বলে একপাশ দিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন রাগ রাগ মুখে।

টিপের মা সরে বসলেন। টিপই প্রথম কথা বললে, 'আমরা ছুটে এসেছি রান্নাবান্নার ব্যবস্থা দেখতে। এই অবস্থায় তো আপনারা কিছু করতে পারবেন না। উঠুন, চানটান করুন। সকালে চা-টা কিছু খেয়েছেন?'

প্রথমে মনে হল মিথ্যে কথাই বলি। মুকু কিছুই খায়নি, আমি থানায় পাঁচনের মতো এক কাপ চা কোনওরকমে গিলেছি। উত্তর আর আমাকে দিতে হল না। কাকাবাবু গম্ভীর গলায় ডাকলেন, 'এদিকে উঠে এসো। নষ্ট করার মতো সময় নেই। আসল কাজই বাকি। সারারাত শ্মশানে জাগতে হবে।'

টিপের মা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে উনি?'

আমি ফিসফিস করে বললুম, 'আমার বাবার বন্ধু। আজই হঠাৎ এসেছেন। আসায় খুব উপকার হয়েছে। আমরা তো খুব বিপদে পড়েছিলুম।'

'আমরা তো কিছুই জানি না। এইমাত্র শুনলুম। শুনেই ছুটে এসেছি। রান্নার ব্যবস্থা করবো, আগে একটু চা খাবে?'

আমি ভয়ে ভয়ে বললুম, 'জানি না। আমরা এখন কাকাবাবুর হাতে।'

'ওঁকে জিজ্ঞেস করব?'

'যদি রেগে যান?'

'রাগবেন কেন?'

বউদি উঠে গেলেন। সোজা কাকাবাবুর সামনে গিয়ে পা স্পর্শ করে নমস্কার করলেন। কাকাবাবু আশীর্বাদ করার ভঙ্গিতে হাত তুললেন।

বউদি বললেন, 'উনুন ধরিয়ে আগে আপনাদের একটু চা করে দি।'

আমি জানি কাকাবাবু চা ভীষণ ভালবাসেন। দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি, মুখের ভাব নরম হল। প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কে?'

'আপনি বলবেন না। তুমি বলুন। আমার স্বামী পিন্টুকে ভীষণ ভালবাসেন।'

কাকাবাবু বললেন, 'বুঝেছি। একটু চা হলে মন্দ হয় না। আমি উনুনটা ধরিয়ে দি।'

'আমরা থাকতে আপনি উনুন ধরাবেন ? আপনি শান্ত হয়ে একটু বসুন। আমরা সব করে দিচ্ছি। রান্নাও আমরা করে দেবো।'

কাকাবাবু বললেন, 'ওইখানেই আমি একটু গোলমাল করে রেখেছি, স্বপাক ছাড়া আমি কিছু খেতে পারি না। আমার গুরুর নির্দেশ। একটু আগে থানার দারোগা আমাকে খুব চিকেন, মাটনের লোভ দেখাচ্ছিলেন।'

বউদি বললেন, 'স্বপাক খুব ভাল। আমার বাবাও স্বপাকে খান। তবে ভাত ছাড়া তরকারি অন্যের হাতে খাওয়া চলে।'

কাকাবাবু এইবার হাসলেন। হাসতে হাসতে বললেন, 'বউ মা, রান্না করতে আমার কোনও কষ্ট হয় না। রাঁধতে আমি ভালই বাসি। তুমি চিন্তা কোরো না। তুমি চা করো। বাকিটা আমরাই করে নোবো।'

কাকাবাবু ইশারায় আমাকে ডেকে ঘরে নিয়ে গেলেন। মুকুর দিকে তাকাচ্ছেনই না। আমার খুব খারাপ লাগছে। সে এমন কি করেছে যে তাকে এইভাবে হেয় করতে হবে ! একটা চেয়ারে তিনি বসলেন। আমাকে বললেন, 'বোসো।'

দুজনেই চুপচাপ বসে রইলুম কিছুক্ষণ। হঠাৎ কাকাবাবু বললেন, 'তোমার প্ল্যানটা কি ?'

'প্ল্যান মানে ?'

'তোমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাটা কি ?'

কোনও উত্তর দিতে পারলুম না। আমার তো কোনও পরিকল্পনাই নেই। ঘটনা যেদিকে নিয়ে যায় ঠেলতে ঠেলতে।

কাকাবাবু বললেন, 'তোমার পরিকল্পনা হল, ডেস্ট্রাকসান। ধ্বংস। তুমি ক্লীব হয়ে যাচ্ছ। মেয়েদের সঙ্গে অষ্টপ্রহর থাকলে পুরুষ ক্রমশ ভেড়া হয়ে যায়। আমার কথা শুনবে ?'

'বলুন।'

'ওই মেয়েটিকে প্রশ্ন করো, সে এখানে কেন আছে ? কিসের জন্যে আছে ? একটা যুবক ছেলে, একটা যুবতী মেয়ে একসঙ্গে রয়েছে, বাড়িতে তৃতীয় আর কোনও প্রাণী নেই। এ কেমন কথা ! এতটা অনাচার, এতটা স্বাধীনতা কি ভাল ? তোমার কি মনে হয় ?'

আমি মনে মনে হাসলুম। ভদ্রলোক কিছুই জানেন না। মুকুর চরিত্র সম্পর্কে মানুষটির কোনও ধারণা নেই। মানুষের চিন্তা বাঁধা রাস্তা ধরেই চলে। সহজ হিসেব, দুই আর দুয়ে চার।

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'আপনি কিছু জানেন না।'

বলেই চমকে উঠলুম, উত্তরটা বড় উদ্ধত হল। ভয়ঙ্কর অসম্মানজনক। তাই তাড়াতাড়ি যোগ করলুম, 'মুকুর চরিত্র আমার বাবার চেয়েও কঠোর। সে এখানে আছে, তিনি নেই বলে। আমাকে ধরে রেখেছে, যাতে আমি টলে না যাই।'

'স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী, বলে একটা প্রবাদ আছে শুনেছ ? নিজের সিদ্ধান্ত নিজে করার মতো বয়স তোমার হয়নি ? তুমি কি এখনো নাবালক ?'

'কাকাবাবু, কটা লোক নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিতে পারে ! পরামর্শ শব্দটা তাহলে আসত না।'

'মেয়েছেলের পরামর্শ !'

'কেন মেয়েরা কম কিসের ?'

'জানো, মেয়েদের শাস্ত্রে অধিকার নেই।'

'কোন শাস্ত্র ? সংসার শাস্ত্রে মেয়েদের দ্বিতীয় আছে ? বেদ-বেদান্ত নিয়ে কে মাথা ঘামায় কাকাবাবু ?'

'শোনো, বাঁচতে যদি চাও, ওকে বলো ওর জায়গায় ফিরে যেতে, আর তুমি বাড়িতে একটি তালা ঝুলিয়ে কিছুকালের জন্যে সরে পড়ো। তা না হলে বিপদে পড়ে যাবে। চাকরি-বাকরি ছেড়ে দিয়েছো ?'

'না ছাড়িনি, তবে ছাড়বো।'

'ছেড়ে ?'

'দেখা যাক।'

'আমার ইন্টারফিয়ারেন্স তোমার ঠিক সহ্য হচ্ছে না, তাই না ? হরিশঙ্করদার পরামর্শও তোমার পছন্দ হত না। জানো কি তোমার হাতে গার্ডল অফ ভেনাস আছে ?'

'দেখুন, জ্যোতিষে আমার তেমন বিশ্বাস নেই। যা আছে তা আছে। যা হবে তা হবে। আমি ভগবানকে বিশ্বাস করি। আত্মসমর্পণে বিশ্বাস করি। যা করার তিনি করবেন। তিনি করছেন।'

'তাহলে তুমি মেয়েদের নিয়ে স্ফূর্তি করো, চাকরিবাকরি ছেড়ে উচ্ছন্নে যাও, বিষয়সম্পত্তি বেচে দাও। ঘি আর আগুন পাশাপাশি থাকলে যা হয় তাই হোক। তুমি কি নিজেকে জিতেন্দ্রিয় ভাবো ?'

'আমি জিতেন্দ্রিয় নই। মুকু জিতেন্দ্রিয়।'

'মেয়েদের তুমি কিছুই চেনো না। যখন ফেলে দেবে তখন আর উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা থাকবে না। তোমার অবস্থা এখন অরক্ষিত সীমান্তের মতো। হু হু করে শত্রু ঢুকছে। রাজত্ব দখল হয়ে গেল বলে।'

'দেখাই যাক না, আপনার জ্যোতিষী জেতে, না আমার আত্মবিশ্বাস !'

কাকাবাবু বেশ অসন্তুষ্ট হলেন। বললেন, 'বিপদ আর ধ্বংস আসার আগে মানুষ বুদ্ধিভ্রংশ হয়, তোমারও তাই হয়েছে। আমার কথা যখন শুনবেই না, তখন আমারই বা কি দরকার পড়েছে বৃথা সময় নষ্ট করার ! আগে তুমি গুরুজনদের ভক্তিশ্রদ্ধা করতে। তোমার সেই ভাবটাও চলে গেছে। কাম এক প্রবল রিপু। তোমাদের এই বয়েসটা তো ভাল নয় ; তার মাথার ওপর কেউ নেই। সোনায় সোহাগা।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন কাকাবাবু। নিজেকেই প্রশ্ন করলেন, 'আমার তাহলে এখন কি করা উচিত ?' যেচে অপমানিত হওয়া, না কি নিজের মানসম্মান গুছিয়ে নিয়ে সরে পড়া !'

এইবার আমি একটু ভয় পেয়ে গেলুম। থানার দৃশ্য ভেসে উঠল। সন্ধের সময় ডেড-বডি আসবে। ডেলিভারি নিতে হবে। ডেথ সার্টিফিকেট, শ্মশান। দারোগা যদি আবার প্যাঁচ মারে ! একেবারে একা আমি। চারপাশ থেকে হিমশীতল ভয় আমাকে ঘিরে আসছে। এতক্ষণ নেশার ঘোরে তর্ক করছিলুম। অক্ষয়কাকাবাবুর জীবন সন্ন্যাসীর জীবন। নিজের কোনও সংসার নেই। যে সংসার যখন বিপদে পড়ে ছুটে গিয়ে হাল ধরেন। জীবনের রোজগার সবই পরার্থে। কোনও কিছুর ওপর নির্ভরশীল নন।

আমি উঠে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। বিশাল শরীর। একসময় প্রচণ্ড ব্যায়াম করতেন। তাঁর হাত দুটো ধরে বললুম, 'ঠিকই বলেছেন, আমার মনে পাপ ঢুকেছে। আপনি যা বলবেন, আমি তাই করব। তর্ক করেছি বলে ক্ষমা চাইছি।'

দু'কাপ চা নিয়ে টিপ ঢুকছে। আমাদের নাটক থেমে গেল। টিপ চায়ের কাপ হাতে

তুলে দিতে দিতে বললে, 'একেবারে খালি পেটে চা খাবেন ? কিছুই যে আর খুঁজে পেলুম না।'

কাকাবাবু টিপের মাথায় হাত রেখে বললেন, 'তুমি বড় ভাল মেয়ে, সর্বসুলক্ষণা। তোমার চন্দ্র তুঙ্গী। তোমার লেখা-পড়া খুব ভাল হবে। তোমার মন সরল। সেখানে সব সময় উচ্চ চিন্তা খেলা করবে।'

টিপ ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে রইল কাকাবাবুর মুখের দিকে।

কাকাবাবু চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, 'তোমার মা সংসারের লক্ষ্মী। বলশালী মঙ্গল। লটারি পাবার সম্ভাবনা আছে।'

টিপ আমতা আমতা করে বললে, 'মাকে ডাকবো ?'

আজ নয়। একদিন তোমাদের বাড়িতে গিয়ে ভাল করে সব দেখে, যা বলার বলব। শুধু শুনে রাখো, তোমরা দু'জন যেখানে থাকবে, সেই জায়গা স্বর্গ হয়ে থাকবে।'

কথা বলতে বলতে কাকাবাবু কেঁদে ফেললেন। এমন আবেগপ্রবণ মানুষ আমি দেখিনি। প্রশ্ন করলুম, 'কাকাবাবু আপনি কাঁদছেন কেন ?'

'আনন্দে। ভাল কিছু দেখলে আমার ইমোশন আমি সামলাতে পারি না। এই মেয়েটির চুল দেখেছো, মুখের গড়ন দেখেছো, বাদামের মতো চোখ, ভুরু দেখেছো, হাতের আঙুল দেখেছো, পায়ের পাতা দেখেছো, শরীরের শ্রী দেখেছো ? জ্যান্ত সরস্বতী।'

কাকাবাবুর চোখে আবার জল এসে গেল। আমার শরীর জ্বলতে লাগল। কাকাবাবুর এই উচ্ছ্বাসের কারণ আমি জানি। আমাকে প্রকারান্তরে জানাতে চাইছেন, তোমার মুকু টিপের পায়ের নখের যোগ্য নয়। টিপের সব ভাল। লক্ষ্মী, সরস্বতী কম্বাইনড্ । মুকুর সবটাই অলক্ষণের। মুকু অপয়া, টিপ পয়া। তুমি দেখে দেখে এমন এক মেয়ের পাল্লায় পড়লে কেন ? এখুনি ওকে বিদায় করো। বেরিয়ে এসো ওর খপ্পর থেকে। সমস্ত তীরই ছোঁড়া হচ্ছে আমাকে লক্ষ্য করে। আমাকে লজ্জা দেবার জন্যে। আমার অপদার্থতা প্রমাণ করার জন্যে। এই সব কায়দা আমার জানা আছে। আমি আর বসতে পারলুম না, ঘরের বাইরে চলে এলুম। এই মানুষটির অদ্ভুত জীবন আমি বুঝতে পারি না। নিজের সংসার ফেলে অন্যের সংসার সামলাতে ছোটেন। অযাচিত উপদেশ দেন সব মানুষকে।

চা শেষ করে কাকাবাবু রান্নায় লেগে গেলেন। মুকু কুটনো কুটে, বাটনা বেটে একটু সাহায্য করতে চেয়েছিল। হাঁ হাঁ করে তেড়ে গেলেন, 'কোনও প্রয়োজন নেই, কোনও প্রয়োজন নেই।' কোনও কোনও শাশুড়ী পুত্রবধূকে এইভাবে খেদিয়ে দেন। মুকুকে অপমান করা মানে আমাকেই অপমান করা। মুকু আমার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকালো। এ-ও সেই চোখ, যে চোখে দিদি আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, আমি তো তোমারই আশ্রয়ে এসেছিলুম ভাই। তফাত এই, মুকু আমাকে একটা কথাও বললে না। পরিস্থিতির কাছে কিভাবে আমি বিকিয়ে গেছি ! কাকাবাবুকে আমি জোর গলায় বলতে পারছি না, এ বাড়ি আমার, সংসার আমার, হু আর ইউ ! দিদির ডেডবডি আসবে। সৎকারের পরেও ঝামেলা শেষ হবে না। হারের সমস্যা। হার হাড় হয়ে গলায় ফুটে আছে। আমি অসহায়।

মুকু ঘরে গিয়ে সুটকেস গুছোচ্ছে। আমি তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছি মাত্র। হয় তো বলতেও চেয়েছিলুম, মুকু কিছুক্ষণের জন্যে একটু সহ্য করো। মুকু আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিলে। খুবই খারাপ লাগল। আমি যেন একটা পিংপং বল। একবার এ এদিক থেকে মারছে, তো ও ওদিক থেকে। মুকুর অন্তত বোঝা উচিত ছিল, আমি কোন অবস্থার শিকার।

ঘরের বাইরে চলে এলুম। মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার চেষ্টা আর করব না। এবার যা কিছু ঈশ্বরের সঙ্গে। বিশ্বাস কোনও বুদ্ধিগ্রাহ্য মানসিক অবস্থা নয়। ফেথ ইজ নট ইন্টেলেকচ্যুয়াল। পাহাড় চূড়া থেকে সমুদ্রে ঝাঁপ মারার মতো একটা সমর্পণ। যা করার তুমি করো। মানুষকে আর তেল দেবো না। মানুষের অনেক বাহানা, অনেক বায়নাক্কা। টিপ আর বউদি দুজনেই এইবার যাবে। মুকুর সঙ্গে দেখা করতে চায়। মুকু ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। দুজনেই মনমরা হয়ে সিঁড়িতে নামছে। টিপ আমার ডান হাতটা ধরে বললে, 'আমরা আবার আসবো।'

আমি কোনওরকমে ঘাড়টা নাড়লুম মাত্র। মনের পিত্ত হয়েছে। জীবনটা তেতো লাগছে। সব কিছু অর্থহীন তামাশা। একটু পরেই মুকু বেরিয়ে এল, শাড়িটাড়ি পরে একেবারে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত। হাতে সুটকেস।

আমি পথ আগলে বললুম, 'চললে কোথায় ?'

'তোমার জানার কোনও প্রয়োজন নেই।'

'কেন নেই ?'

'তুমি বেশ ভালই জানো, কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি ?'

'এই সময় রাগারাগিটা না করলেই নয় ?'

'কেন ? এটা কোন সময় ?'

'তোমাকে বোঝাতে হবে ? আমার কে আছে বলো ?'

'কেন ? তোমার ওই কাকাবাবু আছেন। তোমার সর্বসুলক্ষণা টিপও আছে, তার মা আছে, তুমি নিজে আছ। প্রশ্নটা বরং আমারই করা উচিত নিজেকে। আমার কে আছে ?'

'আমি আছি।'

'তুমি ? তুমি হলে এ-যুগের হ্যামলেট। সারাটা জীবন শুধু, টু বি অর নট টু বি করে যাও। তুমি হলে নাচের পুতুল। ঝড়ের এঁটো পাতা।'

এঁটোপাতা শব্দটা তীরের মতো ফুটলো। আমি এঁটো পাতা ! হরিশঙ্করের পুত্র আমি। যাও তোমার যেখানে যেতে ইচ্ছে করে সেইখানেই যাও। সারাজীবন অনেকের কাছে অনেক নাকে কেঁদেছি। পায়ে পায়ে ঘোরার চেষ্টা করেছি লেজ তোলা বেড়ালের মতো। মন দেখার মতো কেউ নেই। সবাই বাইরেটা দেখে। আমার বলতে ইচ্ছে করছিল, মুকু ভালবাসা বোঝো ? তারপরেই মনে হল, প্যানপ্যানে শোনাবে। ভালবাসা শব্দটাই ভালবাসার শত্রু। ভালবাসা একটা ভাবমিশ্রিত, সেবা, সাহচর্য, অবস্থিতি, সহ্যশক্তি। হাত ধরে নীরবে হাঁটা। ওটা বোধের ব্যাপার, বলার নয়।

মুকু নামছে সিঁড়ি দিয়ে। কাঁধের কাছে হাত রেখে কোনওরকমে বললুম, 'আমাকে ছেড়ে এই ভাবে চলে যাচ্ছ মুকু ? আমার যে কেউ নেই।'

মুকু এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল। জলভরা দুটি চোখ। পাতলা ঠোঁট দুটি থিরথির করে কাঁপল কয়েকবার। কোনও বাণী ফুটলো না। যেন পাখির ছানা, ওড়ার চেষ্টা করেও উড়তে পারল না।

২৩

If your only tool is a hammer, then all your problems look like nails.

অসহায় শিশুটির মতো সদরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম মুকুর চলে যাওয়া। বিলিতি স্যুটকেস হাতে সোজা হেঁটে চলেছে রিক্সা স্ট্যান্ডের দিকে। মনে হচ্ছিল ছুটে গিয়ে জাপটে ধরি পেছন দিক থেকে। শিশু যেভাবে জড়িয়ে ধরে মায়ের কোমর। 'জীবনের অক্ষমতা কাঁদিয়া করিব নিবেদন,/ মাগিব অনন্ত ক্ষমা। হয়তো ঘুচিবে দুঃখনিশা,/ তৃপ্ত হবে এক প্রেমে জীবনের সর্বপ্রেমতৃষা।' অভিমান এক দুর্ভেদ্য পাঁচিল। মুকু রিক্সায় উঠে বসল, পায়ের কাছে স্যুটকেস, দু'হাতে হাতলটা ধরে রেখেছে সামনে সামান্য ঝুঁকে। চওড়া পিঠ। আকাশী রঙের ব্লাউজ। এলো খোঁপা। তাকানো মাত্রই ভেতরের নিবে আসা আগুন আবার জ্বলে উঠল। অসম্ভব! মুকুকে ছাড়া আমার জীবন শূন্য, অর্থহীন। সিঁড়ি ছাড়া বহুতল বাড়ির মতো। রিক্সা চলতে শুরু করা মাত্রই আমি ছুটতে শুরু করলুম। একটা সাইকেল পেছন দিক থেকে আমাকে প্রায় ধাক্কা মেরেই চলে গেল। রিক্সাটাকে থামালুম।

মুকুর হাতটা চেপে ধরলুম। গায়ে হাত রেখেই বুঝলুম, মুকুর বেশ ভালই জ্বর হয়েছে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। নাকের ডগায় মতিচুরের মতো ঘামের বিন্দু। মধ্যদিনের দীপ্ত সূর্য ঝলসে দিচ্ছে চারপাশ।

মুকু দাঁতে দাঁত চেপে বললে, 'রাস্তায় নাটক কোরো না। ইচ্ছে থাকলে অনেক আগেই আমাকে আটকাতে পারতে!'

ভেতর থেকে একটা হাহাকার বেরিয়ে এলো, 'আমার কেউ নেই মুকু। তুমি ছাড়া।'

রিক্সার চালক সিটে বসে আছে একটু তেরছা হয়ে। প্রবীণ মানুষ। আমার চেনা। নাম, জগাদা। জগাদা আড়চোখে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। হঠাৎ বললে, 'কাজটা ভাল হচ্ছে না।'

কোন্ কাজ! প্রশ্ন করার সময় নেই। মুকু বললে, 'হাত ছাড়ো। বেরিয়ে যখন পড়েছি আর ফেরাতে পারবে না।'

'ওই ভদ্রলোকের ব্যবস্থা আমি করছি।'

'কিছুই করতে পারবে না ; কারণ লাঠি ছাড়া তুমি চলতে পারবে না। মনের দিক থেকে তুমি পঙ্গু।'

জগাদা বললে, 'তা হলে আমি চালাই!'

মুকু বললে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ চলুন। এখুনি লোক জড়ো হয়ে যাবে।'

রিক্সার চাকাটা আমার পায়ের ওপর দিয়ে চলে গেল। মুকু একবারও ফিরে তাকাল না! এই হয়। এরই নাম জগৎ। এরই নাম দুনিয়াদারি! সামান্য পান থেকে চুন খসলেই সব সম্পর্ক ফর্দাফাঁই। মুকুর যত রাগ আমার ওপর। এই কি রাগ করার সময়! বেশ রাগই না হয় করলে, তা বলে ছেড়ে চলে যাবে! সমস্ত দোকানপাট বন্ধ। রাজপথ নির্জন। খাঁখাঁ রোদ। বন্ধ দোকানের রকে ছায়ায় শুয়ে হাহা করছে একটা কুকুর। অসহায়, অনাথ বালকের মতো দাঁড়িয়ে আছি আমি। পায়ের পাতার ওপর দিয়ে রিক্সা চলে গেছে। জ্বালা করছে ভীষণ। আশ্চর্যই বটে। হায় মন, পিতা হরিশঙ্কর চলে যাওয়ায় এতটা অসহায়বোধ করিনি। হঠাৎ শূন্য মনে ভেসে উঠল একটা কবিতা :

"বাসনার লক্ষ্যে তুমি যাত্রী? তবে থেমো না নিখিলে,
স্বয়ং লাইলী যদি সঙ্গী হয় বসো না মহফিলে।
তুমি ঝর্না বয়ে চল, তুর্নগতি নদী হও তুমি,
তীর যদি পাও, তবু ছুঁয়ো নাকো সেই তীরভূমি।
হারিয়ে যেয়ো না, তুমি এ বিশ্ব-মন্দির মাঝে কোথা,
চিরমুক্ত তুমি বন্ধু, আসরেতে বসো না অযথা।"

কুকুরটা হঠাৎ ঝাড়াঝুড়ি দিয়ে রক থেকে নেমে এসে, আমার সামনে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়তে লাগল পুটুস-পুটুস করে। এই তো আমার ব্যথার ব্যথী। চিনতে পেরেছে। একজন ফেরিঅলা ধুঁকতে ধুঁকতে চলে গেল আমার পাশ দিয়ে। কোনও রকমে হাঁকছে, পানি ফলঅ, পানি ফলঅ।

ধীরে ধীরে ফিরে এলুম বাড়িতে। দোতলায় উঠতেই অক্ষয় কাকাবাবু বললেন, 'অতটা নরম হয়ো না। পেছন পেছন ছোটার প্রয়োজন ছিল কি?'

'একজন না খেয়ে এই ভরদুপুরে চলে যাচ্ছে!'

'তাতে কি? ডোন্ট মেক ইওরসেলফ্ সো চিপ।'

পিতা হরিশঙ্করও ঠিক এই কথাই বলতেন; কিন্তু তাঁর একটা বিশাল হৃদয় ছিল। মানুষের দুঃখ বুঝতেন। অসহায়কে বুকে জড়িয়ে ধরতেন। কারোকে অপদস্থ করতেন না। রাজসিক অহঙ্কার ছিল। তামসিক নয়। আমার সামনে শ্মশ্রুমণ্ডিত ছ'ফুট যে দৈত্যটি দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁকে চেনা খুব কঠিন।

আমি নীরবে সরে এলুম। হুড়হুড় করে অক্ষয়কাকাবাবুর চান শুরু হল। সঙ্গে সংস্কৃত স্তোত্র। ভারি গলার আওয়াজে বাড়ি কাঁপতে লাগল। প্রবল একটা শক্তি। সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হল আহার-পর্ব। সে এক বিশাল ব্যাপার। ভদ্রলোক একাহারী। সেই কারণে সবই বেশি বেশি। ডাল-ভাতের তাল দেখে মাথা ঘুরে গেল। যেন ছোট মাপের একটা বল। এই সেই মানুষ, যিনি আগে নিমন্ত্রণ বাড়িতে এক বালতি পোলাও অক্লেশে মেরে দিতেন। তারপর সারারাত ছাতে চিৎ হয়ে শুয়ে মুখে ড্রপারে করে ফোঁটা ফোঁটা জল ঢালতেন। জলের মাত্রা বেশি হলে পেট ফেটে যাবে। পিতা হরিশঙ্কর বলতেন, এইভাবেই একদিন অকালে মরবে, বেশি খেতে চাও তো কম খাও, আর কম খেতে চাও তো বেশিই খাও! খাওয়াটাই অক্ষয়কাকাবাবু বীরত্ব।

আমিও বসেছি, কিন্তু মুখে কিছু তুলতে পারছি না। দিদির কথা মনে পড়ছে। মনে পড়ছে মুকুর কথা। মেয়েটা কেমন একা একা চলে গেল! সকাল থেকে একফোঁটা জলও তার মুখে পড়েনি। কোথায় গেল? আবার কি সেই হস্টেলে। না কোনও বন্ধুর বাড়িতে!

কে এক সত্যেনের নাম কয়েকবার তার মুখে শুনেছি। সহপাঠী। জমিদারের ছেলে। আলিপুরে বাগানবাড়ি। তার ঠাকুরদা ছিলেন বিখ্যাত শিকারী। সত্যেনের বাবা একালের একজন বড় ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। মুকু কি সেই সত্যেনের বাড়িতে গেল! একটু যেন প্রেম প্রেম ভাব আমার মনে হয়েছিল। তা না হলে সত্যেনের অত প্রশংসা করবে কেন? যীশুর মতো রূপ। শিশুর মতো মন। ভাল না বাসলে মানুষ মানুষের নির্ভেজাল প্রশংসা করতে পারে না। মুকু ইদানীং আমাকে ঘৃণা করতে শুরু করেছিল।

কেবল তিরস্কার আর তিরস্কার। আমার সবই খারাপ। কাকাবাবু বিশাল একটা উদ্গার তুলে বললেন, 'দেহ আর মন। দুটোকে আলাদা আলাদা রাখার চেষ্টা করবে। দেহের এক ধর্ম, মনের এক ধর্ম। এখন দেহের ধর্ম পালন করো। রাতে কোনো খাবার জুটবে না। শ্মশানেই কাটবে। এখন একটু চেষ্টা করে খেয়ে নাও। মেয়েরা এক মোহ। শরীর নষ্ট করার শ্রেষ্ঠ কল। তোমাকে পেতনিতে ধরেছিল।'

আর আমার বসতে ইচ্ছে করল না মানুষটির সামনে। এখনি হয় তো কঠিন কোনো কথা বলে ফেলবো। বয়সের সম্মান রাখতে পারবো না। থালা নিয়ে ঝাঁ করে উঠে পড়লুম। ধ্যাততেরিকা খাওয়া। এই ভদ্রলোকই আমাকে গৃহছাড়া করবেন। উঠে দাঁড়ালুম। হাঁটুতে খট্ করে একটা শব্দ হল।

অক্ষয়কাকাবাবু সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য করলেন, 'শনি। তোমার কোষ্ঠীটা একবার ভাল করে দেখতে হবে। মনে হয় শনির দশা চলেছে। নীচস্থ শনি। জয়েন্টের শব্দ। মানে দারিদ্র্য আসছে। সব যাবে এইবার। ধন-জন-গৃহসুখ। ঘোর অমানিশা আসছে এইবার।'

এ তো অভিশাপ! আমার হাত থেকে থালাটা পড়ে গেল। ভাত, তরকারি, সব ছিটকে গেল। কিছু পড়ল কাকাবাবুর পাতে। ভদ্রলোক চমকে উঠেছেন, 'এ কি? ইচ্ছে করে ফেললে? আমার খাওয়াটা নষ্ট করে দিলে!'

কোনও উত্তর না দিয়ে আমি সোজা ঘরের বাইরে। মুকুর নীল শাড়িটা তারে ঝুলছে। শাড়িটা সে ফেলে গেছে। কাকাবাবু ঘর থেকে হেঁকে বললেন, 'জায়গাটা তো পরিষ্কার করা দরকার।'

একটু রাগের গলাতেই বললুম, 'যথাসময়ে হবে।'

কাঁধে একটা গেরুয়া রঙের ভিজে গামছা ফেলে তিনি বেরিয়ে এসে বললেন, 'এখন বুঝতে পারছি হরিদা কেন পালিয়ে গেলেন! কারণটা তুমি। তোমার তমোগুণই তাঁকে গৃহছাড়া করেছে।'

নিজের সংযমে নিজেই অবাক। কোনও রকম মন্তব্যই আমার মুখ দিয়ে বেরলো না। শুধু বললুম, 'বসুন, আমি আপনার খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

'কোনও প্রয়োজন নেই।' ভদ্রলোক বেশ রাগতভাবেই চলে গেলেন। মনে মনে বললুম, 'যা, যেখানে খুশি যা, আর জ্বালাসনি।' বলেই মনে হল, অন্যায় করেছি। পিতার বন্ধুকে অসম্মান করার অধিকার নেই আমার। যা হচ্ছে সবই হচ্ছে তাঁর ইচ্ছায়। এই খেলায় আমি এক দর্শক মাত্র। এদিক-ওদিক তাকিয়ে মুকুর শাড়ির আঁচলটা হাতের মুঠোয় ধরেই ভয়ে ভয়ে ছেড়ে দিলুম। দূরের তামাটে আকাশে তিনটে চিল উড়ছে। আকাশের আঁচলের আড়ালে যে-ঈশ্বর লুকিয়ে আছেন, তাঁকে বললুম, আমার মুকুকে ফিরিয়ে দিন, সে যে আমার মায়ের মতো। কে আমাকে শাসন করবে প্রতি মুহূর্তে! হেসে ফেললুম মনে মনে, হরিশঙ্কর নয় ফিরে আসুক মুকু। মুকুর জন্যে প্রাণ যত কাঁদছে, পিতার জন্যে কই কাঁদছে না তো! মুকুর হাত ধরে পিতাকে খুঁজে পেতে চাই।

এমন যদি হত, পিতা হরিশঙ্কর হঠাৎ ফিরে এলেন, সন্ন্যাসীর সাজে। দেহ বীরের মতো, মুখ প্রেমিকের মতো। আমি আর মুকু দুজনে এগিয়ে যাচ্ছি। তিনি হাসিমুখে দু হাত বাড়িয়ে বলছেন, 'এসো, এসো। আমি তো এই ভবিষ্যৎই চেয়েছিলুম। তোমরা সুখী হও। তোমাদের সুখই আমার সুখ।'

নিচে গভীর, গম্ভীর গলায় কে যেন বললেন, 'হরি নারায়ণ।'

কি ব্যাপার! স্বপ্ন বাস্তব হতে চলেছে বুঝি! দুদ্দাড় করে নেমে গেলুম। এক এক লাফে ডবল সিঁড়ি। সদর দরজা মনে হয় খোলাই ছিল। টকটকে গেরুয়াধারী এক সন্ন্যাসী। চাঁপাফুলের মতো গায়ের রঙ। অবাক হয়ে গেলুম। সেই হরিদ্বারের সন্ন্যাসী। যাঁর শরীর থেকে পবিত্র হোমের গন্ধ বেরোয়। বহুক্ষণের সাধ্যসাধনায় যাঁর কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হয় একটিমাত্র কথা, হরি নারায়ণ। সেই কতকাল আগে এসেছিলেন, মাতামহের মৃত্যুকালে। চেহারা সেই একই রকম আছে। বয়স যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। প্রণাম করা মাত্রই মাথায় হাত রাখলেন আমার। সারা শরীর যেন অবসন্ন হয়ে গেল। 'আলসার'-এর পেটে শীতল দুধ পড়লে যেমন স্নিগ্ধ একটা অনুভূতি হয় সেই রকম হল। তাপিত প্রাণে করুণাধারার মতো নীরব আশীর্বাদ। মনে হচ্ছিল, পায়ে মাথা ঠেকিয়ে পড়ে থাকি যতক্ষণ পারি। আর উঠবো না। হিমালয়ের কোলে এইভাবেই শুয়ে থাকি। ভব-রোগ-বৈদ্য এসেছেন কৃপা করে।

সাদরে তাঁকে নিয়ে এলুম ওপরে। পায়ে সেই পরিচিত গেরুয়া রঙের ন্যাকড়ার জুতো। জুতোজোড়া একপাশে খুলে রেখে ঘরে ঢুকলেন। তাড়াতাড়ি একটা কম্বলের আসন বিছিয়ে দিলুম চেয়ারে। তিনি বসলেন। এদিক-ওদিক তাকালেন জ্যোতির্ময় মুখে। গেরুয়া কুর্তার পকেট থেকে একটা প্যাড আর পেন্সিল বের করে লিখলেন কি সব। বুঝলুম মৌনী হয়েছেন। লেখাটা আমার হাতে দিলেন। পরিষ্কার ইংরেজি 'ইউ আর গোয়িং থ্রু এ ক্রাইসিস।'

'ইয়েস।' লেখাটা এগিয়ে দিলুম তাঁর দিকে।

লিখে লিখেই আলাপ চলল। প্রশ্ন করলুম, 'হিমালয়ের কোনো তীর্থে আমার পিতাকে কি দেখেছেন?'

'ওভাবে তো দেখা হয় না। বিশাল জায়গা। বেশিরভাগ সময় আমি আমার ডেরাতেই থাকি।'

'আমার পিতা কি ফিরে আসবেন? তিনি কি জীবিত আছেন?'

'সংসার যে ছেড়ে যায়, মুক্তজীবনের স্বাদ যে একবার পায়, সে কি আর বদ্ধজীবনে ফিরতে চায়!'

'সাধুজী আমি তা হলে কি করব?'

'তুমি তার আদর্শের প্রদীপটি ধরে রাখো। দেখো যেন নিবে না যায়!'

সন্ন্যাসী লিখলেন : Observe what a man has in mind to do when his father is living, and then observe what he does when his father is dead. If for three years, he makes no changes to his father's ways, he can be said to be a good son— Confucious.

অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলুম তাঁর লেখাটির দিকে। পিতা যতদিন জীবিত, লক্ষ্য রাখো তাঁর সন্তানের দিকে। তার মনের গতির দিকে। এইবার দেখো, তার পিতার মৃত্যুর পর সে কি করছে! যদি দেখা যায় টানা তিনটি বছর সে তার পিতার ধারা থেকে একটুও সরে আসেনি, তখনই বলা যাবে, সে সুসন্তান।

কে এই সন্ন্যাসী ! এঁর কোনও পরিচয়ই আমার জানা নেই। সামান্য সন্ন্যাসী নন। প্রভূত জ্ঞানী। আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছেন। আমি একটু থমকে গেছি। পিতা জীবিত। আমি কি করতে চেয়েছি ? ভোগ। দেহভোগ। যৌবনের নীচ আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি খুঁজেছি। দেহের বন্ধ কাঁচের জানালায় ডুমো মাছির মতো অবিরত ধাক্কা খেয়েছি। আর তিনি চলে যেতে না যেতেই তাঁর ধারা, তাঁর আদর্শ লোপাট করে দিয়েছি। এর নাম সুসন্তান ! এ তো একটা রাসকেলের জীবন-বৃত্তান্ত !

সন্ন্যাসী হাতের আঙুল তুললেন। চিন্তার আবর্ত স্থির হয়ে গেল। বোধহয় অভয় দিতে চাইলেন। বলতে চাইলেন হতাশ হয়ো না। তিনি হাত বাড়িয়ে প্যাডটা আবার টেনে নিয়ে স্থির হাতে লিখলেন, 'When you make a mistake, do not be afraid of mending your ways.'

ঠিক ধরে ফেলেছেন, আমার চিন্তা কোন্ পথে ছুটছে। অদ্ভুত তন্দ্রালু চোখে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন আপনমনে আমার দিকে। পাঞ্জাবির পকেটে আবার হাত ঢোকালেন। বেরিয়ে এল শুকনো একটা ফল। ফলটা আমার হাতে দিয়ে ইশারায় বললেন, 'খেয়ে ফেলো।'

আমি প্রথমটায় একটু ইতস্তত বোধ করেছিলুম। খাবো ? সন্ন্যাসী-প্রদত্ত ফল ! যদি কিছু হয়ে যায়। বলা তো যায় না। যা থাকে বরাতে ! মুখে ফেলে দিলুম। অপূর্ব স্বাদ। ক্ষীরের মতো গলে গেল। সুন্দর গন্ধ। প্রশ্ন করার আগেই সন্ন্যাসী লিখলেন, 'এর নাম অমৃত ফল। হিমালয়ের একটি মাত্র অঞ্চলে হয়। একমাত্র সাধু-সন্ন্যাসীরাই যেতে পারেন সেখানে। অনেক প্রতীক্ষায় পাওয়া যায়। এই ফল মানুষের মনে একটা সাইকোলজিক্যাল পরিবর্তন আনে। বিষণ্ণতা দূর করে। কুভাব আসতে দেয় না। ঈশ্বরের চিন্তা করো। কথাটা বলা সহজ, শোনা সহজ, করা শক্ত। একমাত্র অ্যাম্বিশান হওয়া উচিত, আমি হব, কি হব, কেমন হব ?

Like bone cut, like horn, polished,
Like jade carved, like stone ground.

কাগজের লেখা ক্রমশই বাড়ছে। ক্রমশই দুর্লভ হয়ে উঠছে আমার সংগ্রহ। আকাঙ্ক্ষা তো আছেই আমার। সংস্কার যাবে কোথায় ! আসলে সঙ্গদোষ। ঘেরাটোপে মানুষ। মাতামহ ঠাট্টা করে কতদিন বলেছেন, তুলোয় রাখা আঙুর। মাকে পাইনি। ছেলেবেলা থেকেই যে-সব মহিলার সংস্পর্শে এসেছি, তাঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন দেহল। তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাঁরা আমার মধ্যে বিকৃত রুচি তৈরি করে দিয়ে গেছেন। তাঁদের আলাপ-আলোচনা, দেহ-প্রদর্শন উঠতি বয়সের একটা ছেলের পক্ষে ক্ষতিকারকই ছিল। নিজের দুর্বলতা আমি জানি। শত্রু আমার অচেনা নয়। পরাভূত করতে পারি ; কিন্তু শত্রুকে আমি ভালবেসে ফেলেছি, গোলাপী নেশার মতো। মদ ক্ষতিকারক জেনেও লোকে মদ খায়।

সন্ন্যাসী আবার প্যাড টেনে নিয়ে লিখলেন। লেখাটা এগিয়ে দিলেন আমার দিকে,

A blemish on the white jade
Can still be polished away.

আমি তাঁর দিকে তাকালুম। করুণা ঝরেছে চোখে। প্রশ্ন করলুম, 'আমার কিছু হবে ?' তিনি সঙ্গে সঙ্গে লিখলেন, 'Heaven is author of the virtue that is in you.' কি অপূর্ব কথা ! আমি হাঁ করে তাকিয়ে রইলুম লেখাটার দিকে। যে-গুণ আমার মধ্যে

রয়েছে তার লেখক হলেন ঈশ্বর। অথবা ঈশ্বরই আমার মধ্যে লিখবেন আমার গুণাবলী। অথবা যে-গুণ আমার মধ্যে আছে তার বিকাশ ঘটাবেন তিনি। তাঁকে ধরতে হবে। কেমন করে মন যাবে তাঁর দিকে ?

উত্তরে সন্ন্যাসী লিখলেন, 'সাইলেন্ট প্রেয়ার। কৃপা করো, কৃপা করো। জপই একমাত্র পথ। নাম জপ। ঈশ্বর আর নিয়তি দুটোকেই বোঝার চেষ্টা করো। ঈশ্বরের মর্জি বুঝতে হলে বুঝতে হবে, কেন তাঁর এমন ইচ্ছে হল ! কেন তিনি করলেন এমন ? আর নিয়তিকে বুঝতে হলে জানতে হবে, আমাদের জীবনের অনেক কিছুই নিয়তির এক্তিয়ারে। নিয়তির হাতে যা, তার পেছনে না ছোটাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। জন্ম আর মৃত্যু নিয়তির হাতে, ধন, মান, মর্যাদা, মোক্ষ ঈশ্বরের হাতে।'

এতক্ষণ খুব আন্তরিক একটা নাসিকা-গর্জনের শব্দ আবহসঙ্গীতের মতো আমাদের ঘিরে ছিল, হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। পাশের ঘরে নাক ডাকিয়ে দিবানিদ্রায় যোগস্থ ছিলেন কাকাবাবু। তিনি এইবার ঘরে এলেন। এলেন বললে ভুল হবে। আবির্ভাব হল। আসনে সন্ন্যাসীকে দেখে প্রথমটায় হকচকিয়ে গেলেন। শেষে বুদ্ধিমানের মতো বললেন, 'আরে আপনি ? হঠাৎ কি মনে করে ? এবার কোন শিষ্যের বাড়িতে উঠলেন ?'

কাকাবাবুর কথা বলার ধরনটাই কেমন যেন। সন্ন্যাসী মৃদু মৃদু হাসছেন।

কাকাবাবু বলেই চলেছেন, 'বছরে একবার করে আপনাদের তো বেরোতেই হয় সংগ্রহে। আপনার শিষ্য-সামন্তের সংখ্যা কত হবে সাধুজী ? লাখ না হাজার ?'

উত্তরটা আমাকেই দিতে হল, 'উনি মৌনী আছেন।'

কাকাবাবু সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'সাধুদের অনেক লোকদেখানো কায়দা আছে। অবশ্য তা না হলে শিষ্যরা ভিড়বে কেন ?'

সন্ন্যাসী প্যাড টেনে নিয়ে লিখলেন, 'ভদ্রলোককে বলো, উনি কত জ্ঞানী। আরো বলো, আমার কোনো শিষ্য নেই। আমিই শিষ্য। শিষ্য হবার চেষ্টা করছি ; কারণ গুরু মিলে লাখ, তো শিষ্য মিলে এক। সময় পেলে কলকাতায় আসি পার্শ্বনাথজীকে দর্শনের জন্যে। জিজ্ঞেস করো, ওঁর ঘড়ি ঠিক চলছে তো !'

লেখাটা কাকাবাবুকে দিলুম। তিনি পড়লেন। পড়ে অহঙ্কারীর মতো বললেন, 'আমার ঘড়ি সুইস-মেক। অলওয়েজ গিভস কারেক্ট টাইম।'

সন্ন্যাসী আবার স্মিত হাসলেন। প্যাডে লিখলেন, 'আই কেম ফর ইউ। কলকাতায় সাতদিন আছি। পারলে, পার্শ্বনাথজীর মন্দিরে সকালের দিকে আমার সঙ্গে দেখা কোরো। তোমার জীবনে ভাল সময় আসছে। ইউ আর স্ট্যান্ডিং অন দি থ্রেসহোল্ড। অ্যাভয়েড দিস ম্যান। হি ইজ বেসিক্যালি ক্রুড। আমার হাত থেকে এক গেলাস জল নিলেন। আলগোছে খেয়ে গেলাসটাকে টেবিলের ওপর না রেখে ঘরের এককোণে রেখে, ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন। দেখছি, রাস্তার একপাশ দিয়ে হেঁটে চলেছেন আত্মস্থ হয়ে। যেন একটি জ্যোতির্বলয় চলে গেল।

ওপরে উঠে আসতেই কাকাবাবু বললেন, 'প্যারাসাইটস। কত টাকা দিলে প্রণামী ?'

'প্রণামী ?' অমৃতফলের প্রভাব কিনা জানি না, ভীষণ হাসি পেল। আমি হাহা করে হাসতে লাগলুম। নিজের হাসি দেখে নিজেই অবাক। এত জোরে আমি কখনো হাসিনি।

কাকাবাবু বললেন, 'অমন ইডিয়টের মতো হাসছে কেন ?'

এতেও আমার রাগ হল না। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, তামসিক একটা মানুষের অবয়ব খসে পড়েছে। ধসে পড়ছে অহঙ্কারের ইমারত। সেই স্তূপের ওপর কুচকুচে কালো

একটা ডিম।

কাকাবাবু বললেন, 'এইভাবে হাসাটা একটা মহা অসভ্যতা। হরিদার ছেলেকে এটা মানায় না। যাও চা করে আনো। আমাদের এইবার প্রস্তুত হতে হবে। খাওয়াটা তো মাটি করেই দিয়েছো, এইবার মনটাও খিঁচড়ে দিলে। চা-টা একটু কড়া করে কোরো। যেন সিস্টেমে অনেকক্ষণ থাকে।'

ঘরের একপাশে টুলের ওপর ছোট্ট একটা কুঁজো ছিল। গলাটা ধরে নিজের মুখে জল ঢালতে লাগলেন। এমন হিপোপটেমাসের মতো হাঁ আমি খুব কমই দেখেছি। মানুষ যে সমস্ত পশুর সমাহার, কথাটা মিথ্যা নয়।

সন্ধে নেমে গেছে। আকাশ এখন লাল-কালো। মাঠ পেরিয়ে আমরা চলেছি থানার দিকে। দিদি এইবার আসবেন।

২৪

Who can go out without using the door?
Why, then, does no one follow this way?

একটা খাট তো কিনতে হবে। কিছু ফুল। কয়েক প্যাকেট ধূপ। আবার কাঁধ দেবার জন্যেও তো কয়েক জনকে চাই। একা তো পারব না। ভীষণ অসহায় বোধ করছি। আশ্চর্য করে দিলেন মেনিদা। পাড়ার কেউ না, এগিয়ে এলেন তিনিই। সঙ্গে নিয়ে এসেছেন তাঁর তিন ছেলেকে।

মৃদু হেসে বললেন, 'অবাক হচ্ছ ? সন্দেহ হচ্ছে, তাই না ? ভাবছ আমার মতো একটা ইতর লোক আবার কি মতলবে এসেছে! কোনও মতলব নেই পিন্টুচন্দ্র। আমি নির্ভেজাল এক বাঙালি। জানো তো, বাঙালির কান বড় হয়। পরের কথা শুনতে ভালবাসে। বাঙালির জিভ চেরা হয়। সাপের মতো ছোবল মারতে পছন্দ করে। কিন্তু বাবা হৃদয়টা খুব নরম হয়। আর একটা কি গুণ বলতো, বিস্মৃতিপ্রবণ। ভুলে যায়। মনে রাখে না কিছু। তুমি আমাকে চড় মেরেছিলে। ভুলে গেছি। মনে রাখিনি। কেন এসেছি জানো ? তোমার পিতামহ ছিলেন আমার শিক্ষক। তাঁকে ভোলা যায় না। তাঁর নখের যোগ্য তোমরা হতে পারোনি। আর ওই যে দেখছো, আমার তিনটে দামড়া, ওদের আমি মানুষ করতে পারিনি, কিন্তু অমানুষ করতে পেরেছি। একালের মানুষের ডেফিনিসান কি জানো ? যে যার সে তার। কেউ কারোর নয়। মানুষ হলে, ওরা আমার কথায় ওঠ-বোস করত না। তোমার জন্যে ছুটেও আসত না। বক্তৃতাটা একটু লম্বা হয়ে গেল। এটাও বাঙালির লক্ষণ। কাজ কম, কথা বেশি। দাও, ওদের এখন টাকা, পয়সা বুঝিয়ে দাও। সব কিনে আনুক। তোমার ভয় নেই,পাইপয়সার হিসেব বুঝিয়ে দেবে। পকেটে নিয়ে বেরিয়েছো তো ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'বুদ্ধিমান ছেলে তুমি।'

কত লাগবে বলে মনে হয় ?'

'শ দুয়েক ছেড়ে দাও। অত লাগবে না। তবু কাছে থাক।'

ছেলে তিনটিকে এখন আর মোটেই খারাপ লাগছে না। অথচ এরাই একদিন মুকুকে লক্ষ করে অশ্লীল কথা বলেছিল। আমাকে একদিন রাস্তায় ধরে শাসিয়েছিল। বলেছিল, আমার খোল-নলচে আলাদা করে দেবে। দাঁতগুলো খুলে মালা করে আমার গলায় পরিয়ে দেবে। যা হবার তা হয়ে গেছে। এরা এখন সম্পূর্ণ অন্য চরিত্র। দুশো টাকা নিয়ে তারা

চলে গেল। মন এমনই এক জিনিস, বারেকের জন্য সন্দেহ খেলে গেল, কেটে পড়বে না তো !

অক্ষয় কাকাবাবু অফিসারের ঘরে গিয়ে বসেছেন। ছেচল্লিশের দাঙ্গার কথা হচ্ছে। সুরাবর্দী সরকারের কেচ্ছা চলেছে নতুন করে। থানার পাশেই চায়ের দোকান। মেনিদা আর আমি বসে আছি পাশাপাশি। জিজ্ঞেস করলুম, 'চা খাবেন' ?

'তুমি খাবে ?'

'তা একটু খেতে পারি।'

চায়ের অর্ডার দিলুম দু'গেলাস। মেনিদা হঠাৎ বললেন, 'মানুষ কেন এমন হয় বলতো ?'

'কি রকম বলুন তো ?'

'এই আমার মতো। জটিলে-কুটিলে টাইপ। সবাই ঘেন্না করে, সন্দেহ করে। দুর দুর করে। মানে অধমেরও অধম। অথচ দেখো লেখা-পড়া শিখেছি। সারা জীবন ভাল চাকরি করেছি। দেশ বিদেশ ঘুরেছি। কেন এমন হয় ? রক্তের দোষ। তাই না ?'

'কি করে বলি বলুন। আমার তো তেমন জ্ঞান নেই।'

'দেখো সংসার করেছি। এতগুলো ছেলেমেয়ে, তবু কিন্তু কাম গেল না। আড়ে আড়ে তাকাই। ছোঁক ছোঁক করি। অসভ্যতার চূড়ান্ত। যেন হেগো রুগি। আমার মতো জ্ঞানপাপীকে তুমি কি বলবে। যেখানে যখন গেছি সেইখানেই একটা কেলেঙ্কারি বাধিয়ে বসেছি। তোমার বউদি তো আমাকে সারা জীবন উঠতে ঝ্যাঁটা বসতে কোস্তা মেরে এলো। এখন তো ফিরেও তাকায় না। বলে, আমি নাকি তাকে ডাঁটার মতো সারা জীবন চিবিয়েছি।'

চা এসে গেল। মেনিদা এক চুমুখ খেয়ে, আঃ করে একটা প্রকাণ্ড শব্দ করলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'একে বলে পরিতৃপ্তির শব্দ। এক ধরনের অসভ্যতা। কি আর করা যাবে বলো, যার যেমন স্বভাব।'

— হঠাৎ আমার সন্দেহ হল, সাহস করে জিজ্ঞেস করলুম, 'আপনি কি কিছু খেয়েছেন আজ ?'

মেনিদা লাজুক লাজুক হেসে বললেন, 'এক ডেলা মোদক।'

'মোদক আবার কি ?'

'সে কি, এত বড় ছেলে তুমি, মোদক কাকে বলে জানো না ? ভেরি পাওয়ার ফুল অ্যাফ্রোডিসিয়াক। বুড়োরা খায়। খেলে শক্তি খুব বাড়ে। যৌবন শক্তি। বিজ্ঞাপন দেখোনি ? মদনানন্দ মোদক। কবিরাজি দাওয়াই। সিদ্দির অংশই বেশি। ভীষণ টেস্টফুল।'

'আপনি এই সব খান কেন ?'

'খাবো না ? যৌবন চলে যাবে, আর আমি বসে বসে দেখবো, হেল্পলেস হয়ে। আমার থিওরি,যত দিন দেহ, ততদিন ভোগ।'

'তাহলে সকালে হরি নাম করেন কেন ?'

'বাঃ, পাপীদের জন্যই তো মহানামের বিধান। রাতে পাপ করি,সকালে ইরেজার দিয়ে ইরেজ করি। পাপও হল না, পুণ্যও হল না। নিউট্রাল। মেনি মেনিই রইল। না হুলো, না পুষি।'

মোদকের নেশায় আত্মবিশ্লেষণ হচ্ছে। তার মানে এই নয় যে, মানুষটির চরিত্র

বদলাচ্ছে। কুকুরের বাঁকা লেজ কি সোজা হয়! গঙ্গায় স্নানে নামলে, পাপ দেহ ছেড়ে গাছের ডালে উঠে বসে থাকে। স্নান সেরে ওঠা মাত্রই ঝুপঝাপ লাফিয়ে পড়ে ঘাড়ে।

মেনিদার ফ্লো এসে গেছে, 'এই দেখো না, আমার কেমন রেপুটেশান! আমি খুব ভাল মনেই প্রতিবেশীর বউকে হয়তো জিজ্ঞেস করলুম, বউমা, ছেলে কেমন আছে গো? সে অমনি ফোঁস করে উঠবে, কেন বলুন তো? আপনার বুঝি ঘুম হচ্ছে না? তার পরেই রটিয়ে দেবে— আমি কোনো কু প্রস্তাব দিয়েছি। আচ্ছা জ্বালা বাবা!'

'যখন জানেনই, আপনার ওই আদিখ্যেতার কি দরকার?'

'বাঃ বেশ বললে যা হোক। প্রতিবেশী হয়ে প্রতিবেশীর খবর নোবো না! বেশ করবো নোবো। তাতে তোমার কি?'

'তাহলে বদনাম হোক।'

'হবেই তো। এর মধ্যে একটা দুটো কেস তো অন্যরকম আছে। কেউ না জানুক আমি তো জানি। আমার চরিত্র তো ধোয়া তুলসীপাতা নয়। জীবনভোর অনেক কেচ্ছাই তো করেছি।'

'আচ্ছা এই সব কথা আপনি আমাকে কেন শোনাচ্ছেন?'

'তুমি ভাল শ্রোতা বলে। তোমারও তো জানা উচিত মানুষের সংসারে কতরকম পাপ আছে। মানুষ কিভাবে তিলে তিলে নিজেকে দগ্ধ করে! চিরটা কাল নাবালক হয়ে থাকবে না কি! জীবনে অনুশোচনারও প্রয়োজন আছে। সাপ ছোবল মারে বলেই মানুষ সাপ থেকে সাবধান হয়। সাপ আর পাপ এক জিনিস। শোনো, জ্ঞানপাপীর নাম জানো?'

'সে আবার কে?'

'এই যে তোমার পাশে বসে আছে। নাম তার মেনি। অনেক আগে পড়েছিলুম, এখনো মনে আছে। কি সুন্দর কথা দেখো, In his errors a man is true to type. Observe the errors and you will know the man. আমাকে চিনতে তোমার কোনওদিন অসুবিধে হবে না, কারণ আমার অপকর্ম। কিন্তু ভায়া, তুমি নিজেকে কোনওদিন চিনতে পারবে না। এ এক মজার কল। আমারই আমি অথচ আমিই চিনি না। আচ্ছা গ্যাঁড়াকল শালা।'

মেনিদা মেয়েলি গলায় গান ধরলেন, 'কথা কয়রে/ দেখা দেয় না/ নড়ে চড়ে হাতের কাছে/ খুঁজলে জনম-ভোর মেলে না/ খুঁজি তারে আসমান-জমি/ আমারে চিনিনে আমি/ একি বিষম ভুলে ভ্রমি/ আমি কোন জন, সে কোন জনা।'

তাল মারতে গিয়ে গেলাস উল্টে গেল। ভাগ্য ভাল ভাঙেনি। মেনিদা বললেন, 'এক সময় আমি মনোহর সাঁই কীর্তন করতুম। সিল্কের পাঞ্জাবি। গলায় ফুলের মালা। পায়ের ওপর কোঁচা লুটোচ্ছে। এতখানি খানি চুল। কপালে, নাকে তিলক সেবা। সে এক ফাটাফাটি কাণ্ড। যাঃ শালা, যৌবনটাই চলে গেল। আবার জন্মাবো, আবার তবে যৌবন ফেরত পাব। সে এখনো বহুত দেরি। শোনো, যৌবনটাকে প্রপারলি ইউটিলাইজ করো। বড় ক্ষণস্থায়ী। অবশ্য তুমি ঠিকই করছ।'

'তার মানে?'

'আবার কেন প্রশ্ন করছো? বুঝতে তো পারছোই, অন্যায় তো কিছু নয়, এই তো বয়েস।'

'এতক্ষণ তো বেশ হচ্ছিল, আবার কেন উল্টোপাল্টা কথা বলছেন?'

'ওই তো, ওইটাই তো আমার রোগ। পেট-পাতলার মতো মন-পাতলা। চিন্তা লিক

করে যায়। ওই রোগেই তো ঘোড়া মরেছে। তবে হ্যাঁ, মেয়েটি একেবারে চোখা, সারের সার। আমার চোখ কেড়েছে। তাহলে বুঝতেই পারছো ?'

'এই কথাটা বলা কি সভ্যতা হল ! এখন একটা সত্য কথা বলুন তো, ওরা কি টাকাটা মেরে পালালো ?'

'তুমি কি ওদের ওতটাই অসভ্য ভাবো ?'

দু'হাঁটুর ওপর দুটো হাত টান টান করে রেখে মেনিদা বসে আছেন। মুখে সব সময় যে ভুবনমোহিনী হাসিটি লেগে থাকে সেই হাসি। আমার নিজের মন নিদাঘের প্রান্তরের মতো শূন্যাকার হয়ে আছে বলেই মানুষটিকে এতক্ষণ সহ্য করতে পারছি। সব সময়েই একটা ভয় খেলা করছে, যেন পরীক্ষার ফল বেরোবে। হঠাৎ যদি আইনের প্রভুরা বলে বসেন, না মশাই এটা হত্যা, আত্মহত্যা নয়। গলায় ফিঙ্গার প্রিন্ট পাওয়া গেছে। হয়ে গেল। কিছুতেই মনকে বোঝাতে পারছি না, তা কেন বলবে ! মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে, আমিই যেন খুনী। কেসটাকে সেইভাবে যদি সাজায়। মাঝে যে একটা লোভ ঢুকে আছে। একটা হার। গগনের অস্তিত্ব শুধু আমার মনে। সে যে এসেছিল, এমন কোনো প্রমাণ আমার কাছে নেই। আমার কথা ছাড়া। আমাকে ফাঁসিয়ে কার কি লাভ ! সে কি বলা যায় ! অক্ষয় কাকাবাবুরও লাভ হতে পারে। ওই বাড়িতে জাঁকিয়ে বসে গেলেন হয়তো। জরি-বুটির কারবার করেন। সেইটাই আরো ফলাও হবে। মুকুর ওপর রাগের অনেক কারণ থাকতে পারে। তার একটা হয়তো, মুকুকে তিনি নিজেই একটু নেড়েচেড়ে দেখতে চান। আকর্ষণটাই বিকর্ষণের কারণ। মানুষের মন দুর্গম অরণ্যের মতো। কত জন্তু জানোয়ার যে লুকিয়ে আছে ! এমন ঘৃণা দেহবাসনা থেকেই আসে।

মেনিদা বললেন, 'ভেবে মরছো কেন ? আরে আমি তো রয়েছি তোমার সঙ্গে। লোকটা জাত খচ্চর।সে আমি জানি। অনেক দিন পরে একটা গলায়-দড়ি কেস পেয়েছে। চেষ্টা করবে নেঙড়াবার। আমিও কাঠ পিঁপড়ে। সহজে ছাড়ছি না। লোকটা আমায় হাড়ে হাড়ে চেনে। এই বসেছি ডেডবডি নিয়ে উঠবো। আর এক দলা মোদক মেরে দিই। এক গেলাস চা বল তো। স্ট্রেংথ কমে আসছে।'

হাত চেপে ধরে বললুম, 'প্লিজ, আর মোদক খাবেন না। চা খান কোনো ক্ষতি নেই।'

'তুমি ভয় পাচ্ছ কেন। এ হোলো মহাদেবের নেশা। ভভম ভভম ববম ভাল/ ঘন বাজে শিঙ্গা ডমরু গাল/ রুদ্রতালে তাল দেয় বেতাল/ ভৃঙ্গী নাচে অঙ্গ ভঙ্গিয়া।—বুঝলে ? লিঙ্গেশ্বর জেগে ওঠেন।'

বিরক্ত হয়ে বললুম, 'কিছুক্ষণ চুপ করে বসুন না, কথা না বলে।'

'তা হলেই তোমার যে দুশ্চিন্তা বেড়ে যাবে ভায়া। আমি যে তোমার কারণেই বকরম বকরম করছি গো। এও দেখো মেনির বরাত। যার জন্য চুরি করি সে-ই বলে চোর।'

কালো রঙের বিশাল একটা গাড়ি ঝ্যাড়াং ঝ্যাড়াং শব্দ করতে করতে থানার সামনে এসে দাঁড়াল। মেনিদা সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন, 'যাক এসে গেছে।'

'কিন্তু খাট কোথায় ?'

'ওই তো, আসছে পেছন পেছন। তোমার দুটো দুশ্চিন্তাই দূর হল।'

একটু লজ্জাই পেলুম। একটু আগে চোর ভেবেছিলুম। মধ্যবিত্ত বাঙালি তো। সবেতেই সন্দেহ। সকলকেই সন্দেহ। অসম্ভব একটা ব্যস্ততার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেললুম। ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন কাকাবাবু। আমার ডাক পড়ল। দারোগামশাই বেশ আয়েস করে বসে আছেন। দুপুরে মাংস খেয়েছেন। দেশলাই কাঠি দিয়ে দাঁত

খুঁচছেন। আর ফুঃ ফুঃ করছেন। এঁর আগের অফিসারের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল। বড় সুন্দর মানুষ ছিলেন তিনি। আমার মামার গানের ভক্ত।

অফিসার বললেন,'যাও লাশ এসে গেছে। বেশি নাড়াচাড়া কোরো না, পেট খুলে মাল বেরিয়ে পড়বে। ওরা কোনোরকমে ট্যাঁক সেলাই দিয়ে ছেড়ে দেয়। যাও নিয়ে গিয়ে চপিয়ে দাও। কাগজপত্তর সব সই করো। পকেটে টাকা আছে ?'

ফস করে বেরিয়ে গেল, 'আবার টাকা ?'

হেসে বললেন, 'হ্যাঁ টাকা। অনবরত টাকা। যারা তোমার জন্যে সারাটা দিন এত করল, তাদের একটু মিষ্টি মুখ করাবে না ! তিনজন আছে, তিনশো হলেই চলবে।'

তিনশোটা টাকা তাঁর হাতে দিতে গেলুম, তিনি ভূত দেখার মতো আঁতকে উঠলেন, 'আমাকে না, আমাকে না। গাড়ির ড্রাইভারকে।'

সব ঝামেলা মেটাতে আধ ঘণ্টার মতো সময় লাগলো। দিদিকে নিয়ে এসেছে চট দিয়ে মুড়ে। পাতলা মুখ আরো পাতলা হয়ে গেছে। রঙটা কালচে। রক্ত জমে গেছে। দড়ি দিয়ে ঝোলার সময় ঘাড়টা ভেঙে গেছে, লটরপটর করছে। মৃত্যু যেন অদৃশ্য বাঘ। কখন যে ঝাঁপিয়ে পড়বে ঘাড়ে ! কেউ জানে না। জানতেও পারে না। চটের রঙ দেখে আমার ভীষণ ঘেন্না করছিল। রক্তের দাগ। ময়লা। আঁষটে একটা গন্ধ। এই মৃত্যুর মধ্যে কোনও শোভা নেই। পবিত্রতা নেই। জীবন থেকে বেরিয়ে যাবার দরজা দিদি খুঁজে পেয়েছিলেন, তবে সদর দরজা নয়, খিড়কির দোর।

মেনিদার ছেলেরা মেনিদার মতোই। কোনও ঘেন্নাপিত্তি নেই। দুদিক থেকে দুজন ধরে ঝপ করে তুলে ফেললো।

আমি বললুম, 'সাবধান পেট খুলে যাবে।'

একজন বললে, 'আবার প্যাক করে দোবো।'

কারোর কথাই আমার ভাল লাগছে না। কোথাও কোনও দুঃখ নেই, এক ফোঁটা চোখের জল নেই। একজন মানুষের চিরতরে চলে যাওয়াটা কি কিছুই নয় ! চারদিকে চড়া চড়া আলো জ্বলছে। টেলিফোনের কর্কশ বাদ্য। উচ্চ কণ্ঠের হ্যালো। জিপগাড়ির স্টার্ট নেওয়ার শব্দ। এ যেন এক ধাতব জান্তব পৃথিবী। হাতকড়ার ক্ল্যাং আওয়াজ। ইউনিফর্মের বিকট গন্ধ।

প্রায় একটা বোঝার মতো দিদিকে খাটিয়ায় ফেলা হল। কোনওরকমে চাপিয়ে দেওয়া হল কিছু ফুল, একটা মালা। সবই আমার হাতের বাইরে চলে গেছে। আমি এক দর্শক মাত্র। তিনজন তিন দিকে। আর একটা কাঁধের দরকার ছিল। সেই কাঁধ আমার । চাপা হরি ধ্বনি। দিদি চললেন। এখানে বাঁচতে এসে মরে গেলেন। জীবন খুঁজতে এসে পেয়ে গেলেন মৃত্যুকে। চির মুক্তি। মেনিদার পকেট থেকে বেরলো করতাল। তিনি আসছেন সবার পেছনে, নাম করতে করতে।

শ্মশানে গিয়ে এক নাটক হয়ে গেল। কাকাবাবু চাইলেন, কোনও রকমে চিতায় তুলে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিতে। অনুষ্ঠানাদির কোনও প্রয়োজন নেই। নিজের দোষে মারা গেছেন।পাপী।যেমন কর্ম তেমন ফল। যাবে তো নরকেই, তার আবার অত কি !

মেনিদা রুখে দাঁড়ালেন। মৃত্যু আর আগুন দুটোই মানুষকে পবিত্র করে। প্রথা যা তা পালন করতেই হবে। লেগে গেল দুজনের ঝটাপটি। কাকাবাবু রেগে এক পাশে সরে গেলেন। আমাকে একটু খোঁচা মেরে গেলেন, 'তোমার দেখছি আপন লোকের অভাব নেই। এখন মনে হচ্ছে আমি উড়ে এসে জুড়ে বসেছি।'

এসব এত বাইরের কথা, আমার আর কানে নিতে ইচ্ছে করল না। শ্মশানের পুরোহিত এগিয়ে এলেন। শুরু হল যাবতীয় অনুষ্ঠান আর মন্ত্রপাঠ। চিতা জ্বলে উঠল। কিছু দূরে বট তলায় এসে বসলুম। কাকাবাবু ওপাশে ধ্যানস্থ। আমাদের মুখদর্শন করবেন না তিনি। মনে হল কিছু একটা জপ করছেন। এক এক মানুষের এক এক রকম বিচার। আচরণ।

দিদির লম্বা লম্বা চুল বিদ্যুতের মতো লিকলিকে হয়ে জ্বলে কিছু সূক্ষ্ম ছাই আকাশের দিকে উড়িয়ে দিল। পশ্চিমে গঙ্গা।বাতাস আসছে হুহু করে। ঈশ্বরের কি অপূর্ব খেলা! সংসার ছাড়াবার আগে শ্মশানটা একবার দেখিয়ে দিলেন। মানুষের অনিবার্য পরিণতি দেখছি চোখের সামনে। পুড়ে ঝুল কালো হতে হতে দপ করে জ্বলে ওঠা। এক কিশোর মায়ের চিতাভস্ম গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে গলায় কাছা নিয়ে এগিয়ে আসছে টলতে টলতে। মেনিদার তিন ছেলে সিনেমার গল্প করছে। চিতা জ্বলছে দাউ দাউ করে। বিশাল চেহারার এক মানুষ খাটের বাঁশ খুলে নিবে আসা একটা চিতা দমাস দমাস করে পেটাচ্ছে। আগুনের ফুলকি উড়ছে।

মেনিদা বসে ছিলেন আমার পাশে। শান্ত-শিষ্ট হয়ে। হঠাৎ ফোঁস ফোঁস করে কেঁদে উঠলেন। মাথার ওপর বাতাস কাঁদছে বটের পাতায়। তলায় কাঁদছেন মেনিদা। আমি বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে প্রশ্ন করলুম, 'কাঁদছেন কেন?'

'কাঁদবো না? শ্মশানে কেউ হাসে! তোমার দিদিকে আমি ভালবেসে ফেলেছিলুম।'

'সে আবার কি? আপনি দেখলেন কবে?

'এই তো আজ সকালে। আমার নিজের দিদির কথা মনে পড়ে গেল। এমনি পাতলা পাতলা চেহারা ছিল। চোখা মুখের গড়ন। দেখেই চমকে উঠেছিলুম, এ কে? এই তো আমার দিদি।জানো তো আমার দিদি মাত্র আঠাশ বছর বয়সে টিবিতে মারা গিয়েছিলেন। আর আমার মহাবিষয়ী, কৃপণ বাবা বলেছিলেন, যাক বাবা বিয়ে দেবার খরচটা বেঁচে গেল। সেই বাপের ছেলে আমি। তুমি যে আমাকে চড় মেরেছিলে, বেশ করেছিলে।'

'কেন আমাকে বারে বারে লজ্জা দিচ্ছেন।'

'লজ্জা দেবার জন্যে বলিনি। আমার নিজের ওপরে নিজেরই বিশ্রী একটা ঘৃণা এসে গেছে। কবে যে এই স্টেশানে এসে টিকিট কাটবো।এ এমন এক স্টেশান যেখান থেকে ট্রেন শুধু ছেড়েই যায়, ফিরে আর আসে না। ওই গানটা আমি কান খাড়া করে শুনি, যেথায় গেলে হারায় সবাই ফেরার ঠিকানা গো, ডাক এসেছে আমার সে-দেশ থেকে, বিদায় নেব একটিবার শুধু তোমায় দেখে।' মেনিদার গলা ধরে এল আবার। মাথা নিচু করলেন। পিঠের দিকটা ফুলছে। হঠাৎ আমার হাত দুটো খামচে ধরে বললেন, 'জানো, পৃথিবীতে ভালবাসা ছাড়া কিছু নেই। ভালবাসা হীরের চেয়েও দামী। তুমি আমাকে কোহিনূর দিতে চাইলে, আমি বলবো, ভালবাসা দাও। এ লিটল লাভ। এবারের বাঁচাটা গেঁজিয়ে গেল। পরের বার আসছি একটু ভাল ঘরে। সাত্ত্বিক পিতামাতার সন্তান হয়ে। আমারও দিন আসবে টু ডে অর টু মরো।'

চিতাটা ভুস ভুস করে ধসে গেল। জোনাকির মতো চারপাশে উড়ে গেল এক রাশ ফুলকি।

মেনিদা বললেন, 'যাও, বাকি কাজটা করে এসো।'

অনেকক্ষণ একভাবে বসে থাকার ফলে, পায়ে ঝিনঝিন ধরে গেছে। দাঁড়ানো মাত্রই উল্টে পড়ে যাচ্ছিলুম। মেনিদা ধরে ফেললেন, 'সামলে ভাই সামলে'।

চিতায় জল ঢালা হল। ধোঁয়ায় সোঁদা সোঁদা গন্ধ। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি। এত

বছরের বেঁচে থাকা এক মুঠো ছাই মাত্র। নাভিটা খুঁজে খুঁজে বের করল মেনিদার ব ছেলে। একতাল গঙ্গামাটিতে পুরে বললে, 'চলো, গঙ্গায় ফেলতে হবে।'

মাঝ রাতের গঙ্গার কি শোভা! যেন তরল মৃত্যু। কুল কুল করে বয়ে চলেছে। কি অক্ষয় কাকাবাবু কোথায়!

২৫

Life is like an Onion. You peel away layer after layer and when You come to the end you have nothing.

কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না মানুষটিকে। আমরা সিক্ত বস্ত্রে, সিক্ত পদে শ্মশান ছেড়ে বাইরে চলে এলুম। পুব আকাশে জবাফুলের রঙ ধরেছে। মেনিদা বললেন, 'প্রমাণ করে দিলুম, রাজদ্বারে আর শ্মশানে যে সঙ্গী হয় সে-ই প্রকৃত বন্ধু। আমরা তোমার শাস্ত্র-সম্মত বন্ধু। তোমার সেই ঘটোৎকচ, দেখলে তো, কোন এক সময় কেটে পড়েছে খুস করে। দ্যাটস ভেরি ব্যাড, অফুলি ব্যাড।'

আমাদের অনুসরণ করে আসছে, আমাদেরই ভিজে কাপড়ের সপাৎ সপাৎ শব্দ, আর পায়ের ছাপ। মেনিদা আমার পাশে-পাশে আসছেন কথা কইতে কইতে। হঠাৎ বললেন, 'তোমার খুব একা লাগে না ? বাবা চলে গেলেন, তোমার সেই মেয়েটিও চলে গেল। যা-ও বা একটা দিদি এসেছিল, সে-ও সরে পড়ল। এইবার তুমি কি করবে ! একেবারে একা একা পৃথিবীতে বাঁচা যায় ?'.

আমার কথা বলতেই ইচ্ছে করছে না। কোনওরকমে বললুম 'হুঁ'।

মেনিদা বললেন, 'কোনও দিন অচলাকে দেখেছো ?'

'অচলা ? কে অচলা ?'

'অচলা আমার মেয়ে। নিশ্চয় দেখেছো। তাকে না দেখে উপায় নেই। তার যা রূপ যে কোনও ছেলেকে তাকাতেই হবে। উঠতি বয়সের ছেলে। আর তা না হলে বুঝতে হবে কোনও অসুখ আছে। আমি নিজেই অনেক সময় হাঁ করে তাকিয়ে থাকি। একটা পারফেক্ট ক্রিয়েশান। সিনেমাঅলারা পেলে একেবারে খামচাখামচি করবে। ওকে বেশি দিন আর এইভাবে ফেলে রাখাটা সেফ্ নয়। ধামায় করে প্রেমপত্তর ফেলতে হয়। তাই ভাবছি তোমাদের দু'জনকে গেঁথে দিয়ে চলে যাবো। তোমাকে কিছু করতে হবে না, শুধু একটু সাবধানে রাখবে ; যেন হাত ছাড়া হয়ে না যায় ! ঠিক এই সময় কথাটা কেন বলছি জানো ? ইংরেজি প্রোভার্ব, স্ট্রাইক দি আয়রন হোয়াইল ইট ইজ হট্। তোমার মনটা এখন সম্পূর্ণ ফাঁকা হয়ে আছে। ফাঁকা দেয়ালেই ছবি ঝোলাতে হয়। ঝুলিয়ে দিলুম, তুমি এইবার তাকিয়ে থাকো। রুমাল দিয়ে মোছো। ভাব আনো মনে। একটা অভাব-বোধ। এরই মাঝে টুক করে একদিন অচলাকে পাঠিয়ে দেবো। সে তোমার মন মেরামত করে দেবে।'

'কেমন করে বুঝলেন আমি বিয়ে করবো ?'

'তোমার হাবভাব, রকমসকম দেখে।'

'সে আবার কি ?'

'তুমি পায়রা দেখেছো ? পায়রার মেটিং !'

'আজ্ঞে না, সুযোগ হয়নি, ইচ্ছেও নেই।'

'নেচারকে অবজার্ভ করবে, স্টাডি করবে, দেখবে কত কি জানতে পারবে। পুরুষ পায়রা গাল-গলা ফুলিয়ে, পেখম ছেতরে, একবার এদিক যায়, একবার ওদিক যায়। কোঁক কোঁক শব্দ করতে থাকে। গায়ের রঙটঙ আরো উজ্জ্বল হয়ে যায়। স্ত্রী পায়রা তখন বুঝতে পারে। প্রকৃতির সে এক অদ্ভুত লীলা। তুমি সাপের মেটিং দেখেছো ?'

'আজ্ঞে না। আমি তো ন্যাচারালিস্ট নই। আর মেটিং দেখা উচিত না। অসভ্যতা।'

মেনিদা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'তোমার মাথা। মানুষ ছাড়া আর কিছু চতুষ্পদ ছাড়া, প্রাণীজগতের মেটিং স্বর্গীয় দৃশ্য। কি আর্ট ! কি বিউটি ! জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ঝকঝকে পীচের রাস্তা চলে গেছে। ফটফট করছে চাঁদের আলো। আমরা একটা গাড়ি করে যাচ্ছি। বসেছি সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে। সামনে চাঁদের আলোয় ধোয়া পথ। আহা ! হোয়াট এ ম্যাগনিফিসিয়ান্ট সাইট ! ড্রাইভার ঝপ্ করে ব্রেক কষে দিল। ঠিক হাত কুড়ি দূরে এক জোড়া শঙ্খচূড়। মেল সাপটা পেছনের লেজে ভর রেখে খাড়া দাঁড়িয়ে পড়েছে আর ফিমেলটা তার সারা শরীর পেঁচিয়ে ওপরে উঠেছে, দুটো মাথা হেলছে-দুলছে, যেন অদৃশ্য কোনও সংগীতের তালে তালে। এ একবার ছোবল মারে তো, ও একবার। দড়ির ফাঁসের মতো জড়িয়ে গেছে দুটো শরীর। একটা সার্কল করে দু'জনের শরীরের নিচের অংশ খেলে বেড়াচ্ছে। সাপ দুটোর শরীর যেন ফসফরাসের মতো জ্বলছে। আর একটা সুগন্ধ, যেন কেউ কোথাও কামিনীভোগ চালের পায়েস রাঁধছে। আর একটা ঝুন্‌ঝুন্ শব্দ। দু'জনের শরীরের কাঁটার মতো হাড়ের শব্দ। উঃ সে কি দৃশ্য ! গড, আই অ্যাম গ্রেটফুল টু ইউ। তোমার কৃপায় এই মেনি, হাড়হাবাতে এই মেনি তোমার সৃষ্টির এই লীলা দেখে ধন্য হয়েছে। কি বিরাট, স্বরাট, মহারাজ। একটা গাছকে জড়িয়ে ধরে আমার কাঁদতে ইচ্ছে করছে। কি বিশাল, বিচিত্র এই সৃষ্টি ! কোথায় তুমি বসে আছ মহারাজ ? কেন তোমাকে দেখতে পাই না ! তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি বিচিত্র ছলনাজালে, হে ছলনাময়ী।'

মেনিদা ঝরঝর করে কাঁদছেন। আশ্চর্য চরিত্র ! আমাদের বাঁপাশে গঙ্গা। বড় বড় অশ্বত্থ আর বট গাছ। আকাশের গা থেকে অন্ধকারের নির্মোক একটু একটু করে খুলে পড়ছে। দ্রুত ধাবমান ট্রেনের জানালায় যেমন একটি দুটি নিরীহ আত্মভোলা মুখ দেখতে পাওয়া যায়, সেই রকম একটি কি দুটি তারা আকাশের চাঁদোয়ায়। গাছের পাতায় বাতাসের ভিজে জাল টানার শব্দ। মেনিদা অবরুদ্ধ গলায় বলে চলেছেন,

'মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে
এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত
তার তরে রাখনি গোপন রাত্রি
তোমার জ্যোতিষ্ক তারে
যে পথ দেখায়
সে যে তার অন্তরের পথ
সে যে চিরস্বচ্ছ

সহজ বিশ্বাসে সে যে
করে তারে চিরসমুজ্জ্বল
বাহিরে কুটিল হোক অন্তরে সে ঋজু
এই নিয়ে তাহার গৌরব
লোকে তারে বলে বিড়ম্বিত
সত্যেরে সে পায়
আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে
কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিতে
শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে
আপন ভাণ্ডারে
অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার।'

মেনিদা একটা দম নিলেন বড় করে। চোখ মুছলেন জামার হাতায়। ভিজে ভিজে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'একসকিউজ মি। বিশ্রী একটা ভাব এসে গিয়েছিল। আসলে আমি তো খুব দুঃখী মানুষ। কেন মাঝে মাঝে বজ্জাতি করি জানো ? তুমি কি শেক্‌সপীয়ারের রিচার্ড দি থার্ড পড়েছ ?'

'আজ্ঞে না।'

'তোমরা কেন লেখাপড়া করো না বলো তো, ইয়াংম্যান। আরে, আমরা একজায়গায় দাঁড়িয়ে আছি সেই থেকে ? ছেলেরা কোথায় গেল ?'

'এগিয়ে গেছে।'

'চলো চলো, সর্বনাশ ! ভিজে কাপড়ে তোমার ঠাণ্ডা লেগে যাবে।'

'আমার প্রশ্নের উত্তর পাইনি আমি। কি করে বুঝলেন আমি বিয়ে করব ? আমারকোনও রকমসকম দেখে আপনার এই ধারণা হল !'

'ও তুমি এখনো ওইটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছ ? প্রথমত দেখো তোমার চুল। একেবারে এ-ক্লাস বাবরি। শিল্পী শিল্পী ভাব। দ্বিতীয়ত, তোমার সাজপোশাক। তুমি স্টিমলণ্ড্রীতে জামাকাপড় কাচাও। সবসময় ফিটফাট ধোপদুরস্ত। তৃতীয়ত, তুমি রোজ দাড়ি কামাও, মুখে স্নো-পাউডার মাখো। গায়ে সেন্ট মাখো। চতুর্থত, তুমি মেয়ে ছাড়া থাকতে পার না। আর পঞ্চম, নরাণাং মাতুলক্রমঃ, তোমার মামার ধারায় রয়েছে গান, সিনেমা, নায়িকাসঙ্গ। এইবার তুমিই বলো। নিজেকে নিজেই বিচার করো। তোমার ভেতরে প্রেম জাগছে।'

আমরা হনহন করে হাঁটছি। একজন দুজন স্নানার্থী গঙ্গার দিকে চলেছেন নিদ্রার আলস্য নিয়ে। হঠাৎ মেনিদা পাকা ওস্তাদের গলায় গান ধরলেন, 'ওগো ! কেমনে বলো না, ভালো না বেসে থাকিগো তোমায় !'

ভদ্রলোকের মাথায় একটা কিছু হয়েছে। কত রকমের ভাব খেলা করছে। মেনিদা কিছু দূর আমার সঙ্গে এলেন, তারপর বিদায় নিলেন। নিত্যকর্ম করবেন। পথে পথে নামগান গেয়ে বেড়াবেন। মেনিদার গুরু বলেছেন, মেনি নাম ছেড়ো না। নামেই মুক্তি।

বাইরের রকে অক্ষয়কাকাবাবু গুম মেরে বসে আছেন। সদরের চাবি আমার কাছে। ঢুকতে পারেননি। কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না, তবু প্রশ্ন করলুম, 'কখন চলে এলেন ?'

'জানো না ?'

'আজ্ঞে না। খেয়াল করিনি।'

'এতই যখন বেখেয়াল তখন আর জেনে কি হবে ?'

'আশ্চর্য কথা বলছেন আপনি ! নিজেই উদাস হয়ে বসে রইলেন দল ছাড়া হয়ে, আমাদের পেছন দিকে। এক ফাঁকে টুপ করে উঠে চলে এলেন। কেমন করে জানবো ? আপনার রাগের কারণটা কি ?'

'সে আর তোমার জেনে কাজ নেই। দয়া করে দরজাটা খোলো, আমার জিনিসপত্তর নিয়ে সরে পড়ি। খুব শিক্ষা হয়েছে আমার।'

'কাকাবাবু অত রাগ ভালো নয়। এই রাগের জন্যেই আপনি আজ সংসার ছাড়া।'

শুকনো ঘাসে আগুন পড়লে যেমন দপ্ করে জ্বলে ওঠে, কাকাবাবুও সেইরকম দপ্ করে জ্বলে উঠলেন, 'শোনো পিন্টু, বয়সকে সম্মান দিতে শেখো। জানি তোমার অনেক ইয়ারবক্সি জুটেছে। ইহকাল-পরকাল দুটোই চিবিয়ে শেষ করবে। তোমার অধঃপতনে আমি অবাক।'

বেশ কড়া একটা জবাব জিভে এসেছিল। হঠাৎ মনে পড়ল, সন্ন্যাসী আমাকে অমৃতফল খাইয়েছিলেন। সহজে বিচলিত হলে তো চলবে না। সঙ্গে সঙ্গে জিভে লাগাম চড়ে গেল। রাগরাগ ভাবে তালাটা খুলতে যাচ্ছিলুম। সংযত ভাব এল। ধীরে দরজা খুললুম। স্যাঁতস্যাঁতে একটা বাতাস ঝাপটা মেরে চলে গেল। পেছন থেকে কে খুব মিষ্টি গলায় ডাকলো, 'পিন্টুদা।'

টিপ আর টিপের মা। টিপের হাতে একটা নিমডাল। বউদির হাতে গঙ্গাজলের ঘটি। মিষ্টির বাক্স। হাঁ করে তাকিয়ে আছি। বউদি বললেন, 'কি দেখছো অমন করে ?'

'আপনারা ? আপনারা এলেন আমার জন্যে ?'

'হ্যাঁ এলুম। দেখো ঠিক সময়ে এসে গেছি। দাঁড়াও ঢোকার আগে নিমপাতা চিবোও।' কাকাবাবু বসেই আছেন। বউদি বললেন, 'চান করেননি আপনি ?'

'না, আমি আমার সময়ে চান করবো।'

'শ্মশানে যাননি ?'

'গিয়েছি।'

'তাহলে ?'

'শ্মশানেই আমার ঘরবাড়ি। আমার চানের দরকার হয় না।'

কাকাবাবু ভেতরে চলে গেলেন। টিপ বললেন, 'মনে হচ্ছে, কোনও কারণে বেশ রেগে আছেন।'

বউদি বললেন, 'কি হল ?'

'কিছু হতে হয় না। উনি দুর্বাসার বংশধর।'

'তোমার জীবনে দেখছি অশান্তির পর অশান্তি।'

'ঈশ্বরের পরীক্ষা।'

'তা যা বলেছ।'

কাকাবাবু তাঁর ঝোলা ব্যাগ নিয়ে আমাদের পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেলেন বীরের মতো। আমরা কেউ বাধা দিলুম না। টিপ আর বউদি দু'জনেই হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন। শুনেছি ভদ্রলোক এইভাবেই একদিন সামান্য কারণে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেছিলেন। আমার পিতার সামনে বিশেষ ট্যাঁ ফোঁ করতে পারতেন না। তাঁর ব্যক্তিত্বের সামনে কেঁচো হয়ে থাকতেন। পৃথিবীতে এই ধরনের মানুষের জন্যে প্রয়োজন ভাল রকমের চাবকানির।

কিন্তু হঠাৎ আমার কি হল ভেতরে। রাগ আর ঘৃণার বদলে একটা ভালবাসার ভাব এল। প্রচণ্ড একটা দুঃখের বোধ। আহা! মানুষটার কেউ নেই। এত বড় পৃথিবীতে একেবারে একা। চাকরি অবসর দিয়েছে। যৎসামান্য পেনসান। একেবারেই অনিকেত। কলকাতার এক পরিবারে একটু আশ্রয় পেয়েছেন। এই মেজাজ নিয়ে কতদিনই বা সেখানে থাকতে পারবেন! এই বৃদ্ধ বয়েস। বাউণ্ডুলে হয়ে ঘুরছেন।

তীরবেগে দৌড়লুম। যেমন একদিন দৌড়েছিলুম আমার পিতার পেছন পেছন। সে ছিল অদ্ভুত এক ঘটনা। নতুন এক কথা শেখার বিড়ম্বনা। সেইদিনই স্কুলে বাংলার শিক্ষকমহাশয় নতুন এক শব্দ শিখিয়েছিলেন, 'পরাকাষ্ঠা'। বেশ নতুন ধরনের কথা। নিজেকে খুব ঐশ্বর্যশালী মনে হচ্ছিল। সেইদিনই সন্ধেবেলা বাড়িতে পুরোহিতমশাই এলেন, পিতা বললেন, প্রণাম করো। সঙ্গে সঙ্গে পরাকাষ্ঠা শব্দটি লাগাবার সুযোগ পেয়ে গেলুম। প্রণাম করতে করতে বললুম, প্রণামটাই ভক্তির পরাকাষ্ঠা নয়। পিতা গুম্ মেরে গেলেন। পুরোহিতমশাই চলে গেলেন। হঠাৎ বামুনদি এসে বললেন, তুমি কি বলেছ, ছোটবাবু বেগে বেরিয়ে গেলেন। নির্বোধ কিশোরের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। পন্‌পন্ করে ছুটলুম বাজারের দিকে। রাতের অন্ধকার রাস্তা, গুচ্ছের সাইকেল, রিকশা। দৃকপাত নেই। তিনি ফিরে এলেন ; কিন্তু পুরো একটা মাস বাক্যালাপ বন্ধ রইল। কাকাবাবুকে ধরার জন্যে ছুটছি, আর সেই অতীত ঘটনা মনে পড়ে যাচ্ছে। সেই একই হাঁকপাঁক ভাব। বেশ কিছুটা যাবার পর, কাকাবাবুকে দেখতে পেলুম। খাড়া হেঁটে চলেছেন। এক মাথা এলোমেলো পাকা চুল। বাঁ দিকে দুলছে সাইড ব্যাগ। রাস্তার দু'পাশের লোক অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে আমার ছোটার দিকে।

মোটরবাইক আরোহী সার্জেন্ট যে-ভাবে আইনভঙ্গকারী গাড়ির পথ অবরোধ করেন, আমিও সেইভাবে কাকাবাবুর সামনে গিয়ে পড়লুম। হাপরের মতো হাঁপাচ্ছি। কথা বলতে পারছি না। তাঁর হাত দুটো ধরে আবেগে কেঁদে ফেললুম। কোনও রকমে বললুম, 'ক্ষমা করুন। ফিরে চলুন আপনি। আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে।'

রাস্তার একপাশে সরে এলুম আমরা। কাকাবাবু আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আমি ফুলছি, ক্রমশই। কাকাবাবু ফিসফিস করে বললেন, 'কে কাকে ক্ষমা করে! আমিও তো এক পাঁঠা। চলো চলো, বাড়ি চলো।'

সাতসকালেই রাজপথে এক নাটক। সকলেরই চোখে প্রশ্ন। উৎসুক মানুষের মধ্য দিয়ে আমরা দু'জনে ফিরে এলুম। বাড়িতে ঢুকেই কাকাবাবু বললেন, 'আমি তোমার ওপর কেন অমন রেগে গেলুম বলো তো, ছোটলোকের মতো।'

বউদি বললেন, 'থাক ওসব ফয়সালা। মুখ হাত ধুয়ে ফেলুন। সকালের চা-টা হয়ে যাক আগে।' কাকাবাবু দু'হাতে আমার কাঁধ দুটো ধরে, সোজাসুজি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমিই হরিশঙ্করদার ছেলে হবার উপযুক্ত। বোম্বাই আম গাছে বোম্বাই আমই হয়। আসল ব্যাপারটা কি জানো, তোমাকে আমি বোধহয় সর্বাধিক ভালবাসি। আমারও তো কিছু আশা ছিল। শান্ত সংসার, তোমার মতো একটি ছেলে, হরিশঙ্করদার মতো ভাই। সবই তো মরীচিকা হয়ে গেল। ভালবাসার কোনও ব্যাখ্যা হয় না পিণ্টু। ইট ফ্লোজ। যেমন করে ধমনীতে রক্তপ্রবাহিত হয়। তোমাকে এত ভালবাসি বলেই, তোমাকে অন্য কেউ অধিকার করলে আমার অভিমান হয়। হোয়াট ক্যান আই ডু? আই অ্যাম হেল্পলেস।'

এক প্রবীণ আর এক নবীন দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। সময় যেন

থমকে গেছে। আমরা কত অসহায়! ভেতরে শূন্যতার তেপান্তর। কারোরই কেউ নেই। সকলেই সকলকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছি। চাঁদের বাইরে মায়াবী আলো। সে আলোও আবার ধার করা আলো। চাঁদের পিঠে বীভৎস যত গর্ত। প্রাণহীন এক মহাশ্মশান। বউদি আর টিপ দু'জনেই রান্নাঘরে। হঠাৎ আমার একটা কথা মনে পড়ে গেল। মনে হওয়া মাত্রই রাতের শ্মশানের দৃশ্য আবার ভেসে উঠল। স্যার ওয়াল্টার র‍্যালের কথা, পৃথিবীটা কি? বিশাল এক কারাগার। প্রতিদিনই কিছু কিছু কয়েদীকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হয়। তারা আর ফেরে না।

কাকাবাবুকে বললুম, 'আপনি একটু হাসুন। তা না হলে আমার মন ঠিক হবে না।'

হা হা করে হেসে উঠলেন ভদ্রলোক। বউদি ছুটে এলেন, 'কি হোলো?'

কাকাবাবু বললেন, 'ভয়ের কিছু নয় বউমা। জীবন বেলাইন হয়ে গিয়েছিল, আবার তাকে লাইনে ভেড়ানো হোলো। সুর কেটে গিয়েছিল না!'

বারান্দার টিনের চালে এক ঝাঁক পায়রা এসে বসেছিল। কি কারণে সব কটা ফটফট করে উড়ে গেল। কিছু পরেই কারণটা বোঝা গেল। সেই বাঘা বেড়ালটা ছাত থেকে লাফ মেরে টিনের চালে নেমেছে। বড়ই আফসোস। একটাকেও যমের বাড়ি পাঠাতে পারল না।

দুপুর এল। মুকুর শাড়িটা বউদি তার থেকে তুলে পাট করে রেখে গেছেন। কোনও মেয়েলি ব্যাপার আর চোখে পড়ার উপায় নেই। বর্শার ফলার মতো রোদের রেখা নতুন টিনের চাল থেকে ঠিকরে চোখে এসে লাগছে। নারী-শূন্য বাড়িতে অনেকদিন পরে আমার শৈশবকে যেন ফিরে পেলুম। কেউ তখন ছিল না। আমি আর পিতা হরিশঙ্কর। আমাদের ঘিরে ছিল উচ্চ আদর্শ, ত্যাগ আর তিতিক্ষা। ছিল এস্রাজ, হারমোনিয়াম, তানপুরা, বাঁয়াতবলা। একটা আশ্রমিক পরিবেশ। পিতা যেন বাঘছাল পরা, ত্রিশূলধারী মহাদেব। তিনটে জিনিসকে শূলে বিঁধে হত্যা করা হয়েছিল—কাম, ক্রোধ আর লোভ।

আজ যেন সেই অতীত সাঁতার কেটে বর্তমানের পইঠায় উঠে পড়েছে। শুধু কাকাবাবুকে পিতা ভেবে নিলেই হল। ভদ্রলোক এই মুহূর্তে কঠিন এক অঙ্ক নিয়ে পড়েছেন। হরিশঙ্করের জন্মসময় আর সাল-তারিখ নিয়ে হিসেব চলেছে। কোথায়, কোনদিকে যেতে পারেন। সবার আগে দেখা দরকার বেঁচে আছেন কি না! ছক পড়ে গেছে। গ্রহ, নক্ষত্রের ডিগ্রি বেরিয়ে গেছে। দশা অন্তর্দশার হিসেব চলছে।

দূর থেকে মানুষটির তন্ময়তা দেখছি। কেটলিতে চায়ের জল ফোটার সিঁসিঁ শব্দ। একটু আগে কাজের মহিলা এসে জবাব দিয়ে গেছে। কাজ করতে পারবে না। আসলে ভূতের ভয়। গলায় দড়ি। সাংঘাতিক এক ব্যাপার। না আসে, না আসবে। সিদ্ধান্ত হয়েই গেছে, বাড়িতে কিছুদিন তালা পড়বে! সংসার গুটিয়ে রাখা হবে গালচের মতো। আমরা একটা পরিক্রমায় বেরবো। হরিশঙ্করকে যে-ভাবেই হোক উদ্ধার করে আনতে হবে। কাকাবাবু মুখ তুলে তাকালেন, 'শোনো, কি করছ ওখানে একা একা! ও চা বসিয়েছ! গুড বয়। আচ্ছা হরিদার কি হারপিস হয়েছিল? হারপিস জোস্টার? এনি ফর্ম অফ ভাইর‍্যাল ইনফেকসান?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, হারপিস জোস্টার।'

'বাঃ বাঃ, কি আনন্দ!' কাকাবাবু উল্লাসে আটখানা, 'সে ফাইভ ইয়ারস ব্যাক।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, ওইরকমই হবে।'

'মিলছে, মিলছে। আচ্ছা, এনি অ্যাকসিডেন্ট ?'

'অ্যাসিডে পুড়ে গিয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, দ্যাট আই ক্যান রিমেম্বার। তাহলে তো লং লাইফ ! তিনি আছেন। বেঁচে আছেন। আচ্ছা দেখি সন্ন্যাসযোগ আছে কি না ! নাউ হি ইজ পাসিং থ্রু স্যাটার্ন।'

কাকাবাবু আবার ঝুঁকে পড়লেন। বাইরে একটা গাড়ি থামার শব্দ হল।

২৬

অন্তরে লভেছি সত্য, ভ্রমণের ফলে,
ধরণী সুদূর নয় আকাশের তলে ॥

গাড়ি থামার শব্দে চমকে গেছি। এখন গাড়ি মানে পুলিসের গাড়ি। দুটো দুর্বল জায়গায় এখনো আঘাত আসার সম্ভাবনা আছে। দিদি কিসের ওপর দাঁড়িয়েছিলেন ? ঘরে উঁচু কোনও জিনিস পাওয়া যায়নি। এইটা একটা লুজ-এন্ড। দ্বিতীয় দুর্বল জায়গা হল, ওই হার। যাঁর কাছে অমন মূল্যবান একটা হার, তিনি কেন ভিক্ষা করতে বেরোবেন ! হারটা বিক্রি করলেই তো রাজার হালে থাকা যেত ! সদরের কড়া নড়ল। ভয়ে ভয়ে কাকাবাবুর দিকে তাকালুম। তিনি বললেন, 'দেখো, কে এলেন !'

'যদি পুলিশ আসে !'

'আসে আসবে। অত ভয়ের কি আছে।'

এই ভয়ই তো আমাকে মেরেছে। সব ব্যাপারেই ভয়। আমার পিতাকে ভয় করতে করতে ভয়টা জীবনের সর্বস্তরে ছড়িয়ে গেছে। সদর দরজা খুলেই চমকে উঠলুম। ইনি কোথা থেকে এসে হাজির হলেন ! আরো মোটা হয়েছেন। দুটো চোখের তলায় অতিরিক্ত মদ্যপানজনিত স্ফীত ভাব। খ্যাসখেসে গায়ের রঙ। এই সেই মেসোমশাই। সঙ্গে আর একজন ভদ্রলোক। দেখলেই মনে হয় অতিশয় চালিয়াত।

দরজার ভেতরে একটা পা, দরজার বাইরে একটা পা। মেসোমশাই থমকে আছেন, সেই ত্রিশঙ্কু অবস্থাতেই প্রশ্ন, 'মুকু কোথায় ?'

যেন আমি মুকুকে কিডন্যাপ করে এনেছি।

'মুকু মুকুর হস্টেলে।'

ধমকের সুরে মেসোমশাই বললেন, 'না, সেখানে নেই। এই বাড়িতেই আছে। হস্টেল ছেড়ে দিয়েছে।'

'আবার হস্টেলেই ফিরে গেছে।'

'না যায়নি। আমি জানতে চাই, কেন সে এখানে ? হোয়্যার ইজ হরিশঙ্করবাবু ?'

'তিনি নেই। বেশ কিছু দিন হল কলকাতার বাইরে।'

'অ্যাঁ, তার মানে, তোমরা দুজনে এই বাড়িতে সংসার পেতে ফেলেছো। টেরিব্‌ল।'

'আপনি ভেতরে আসুন না মেসোমশাই।'

'এখনো মেসোমশাই আছি না বাবা হয়ে গেছি ? টেরিব্‌ল, টেরিব্‌ল। সুধন্য হোয়াট ইউ

সে !' সঙ্গের সাথীটির নাম সুধন্য। কে জানে কে, কি সম্পর্ক !

গম্ভীর গলায় বললুম, 'মেসোমশাই ওপরে চলুন ?'

'সে তো যাবোই ; কিন্তু আমার দুটো মেয়েই কি বোকা, পারফেক্ট ফুল। আমার মেয়ে বলে মনেই হয় না। রোমান্টিক ফুল। ইডিয়টস, ইডিয়টস।'

সিঁড়ি দিয়ে প্রথমে উঠছেন মেসোমশাই, পেছনে সুধন্য কাপ্তেন, তার পেছনে আমি। মিষ্টি একটা মদের গন্ধ নাকে আসছে। অবেলাতেই এক রাউন্ড চড়ে গেছে। সুধন্যবাবু এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে বললেন, 'বনেদি বাড়ি ; কিন্তু শ্রীহীন। মেন্টিনেন্‌স ভাল নয়। তেমন নজর নেই। খিলানের কাজ দেখেছেন ? এসব কাজের মিস্ত্রী আর নেই।'

মেসোমশাই বললেন, 'এসব কাজের আর দরকারও নেই। মার্টিন বার্নকে দিয়ে তোমাদের লেটেস্ট যে বাড়িটা করিয়েছ, সেটা এর চেয়ে ফাংসানাল। মডার্ন ইজ মডার্ন।'

'তা হলেও এসব বাড়ির ইজ্জত আলাদা।'

'তর্ক কোরো না সুধন্য। তর্ক কোরো না।'

দু'জনেই ঘোঁৎ করে থেমে গেলেন। সামনেই পর্বতের মতো দাঁড়িয়ে আছেন কাকাবাবু। মেসোমশাই থতমত খেয়ে বললেন, 'ইনি কে ?'

কাকাবাবু বললেন, 'চিনতে পারছেন না ! এরই মধ্যে ভুলে গেলেন !'

'চেনা চেনা মনে হচ্ছে।'

কাকাবাবুর ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত। বিশাল বুক। ভাল্লুকের মতো লোম। একসময় গোবরবাবুর আখড়ায় কুস্তি করতেন। গোপালবাবুর বন্ধু। রায়াটের সময় দু'জনে কলকাতা দাপিয়ে বেড়িয়েছেন। চেহারা দেখে যে কোনও মানুষই থতমত খাবেন। সে একটা যুগ চলে গেছে এ-দেশবাসীর জীবনের ওপর দিয়ে। আমার পিতৃদেব ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটে নিত্য ব্যায়াম করতেন। মাতামহ ছিলেন মল্লবীর। পিতামহ যোগী। আমি নেংটি ইঁদুর। পরের প্রজন্মের আমরা একেবারে ওয়ার্থলেস। আমার মাতুল ফিনফিনে পলতোলা গেলাস। আমাদের কোনও আয়তনই নেই। ডিসপেপটিক ইন্টেলেকচ্যুয়াল। মেয়েছেলেরই পুং সংস্করণ। একালের নানা সাজসজ্জা দিয়ে রক-ক্লাইম্বিং শুরুর ঢের আগেই পিতা হরিশঙ্কর ক্লাইম্বিং শুরু করেন। মালকোচা মারা ধুতি। গায়ে টুইলের শার্ট। পায়ে কেড্‌স। ডাল-পালা, গাছের শেকড়, পাথরের খাঁজ ধরে ধরে খাড়া পাহাড়ে উঠছেন। আমি নিচে দাঁড়িয়ে দেখছি। ভয়ে দমবন্ধ। কেউ কোথাও নেই। বাতাসের সন্‌সন্‌ শব্দ। মজা নদীর বুকে বালি আর নুড়ি পাথর। গরুর কঙ্কাল। হয় তো বাঘেই মেরেছিল। নীরব প্রার্থনা, হে ভগবান ! ফেলে দিও না। এক সময় হারিয়ে গেলেন। আর দেখাই যাচ্ছে না। সময় যাচ্ছে। এক ঘণ্টা, দেড় ঘণ্টা। কিশোর কাঁদছে ভয়ে। এক সময় পাহাড় চূড়ায় মানুষটিকে দেখা গেল। বিন্দুর মতো। একটা সাদা রুমাল নাড়ছেন। পিন্টু ! এই ডাক ধ্বনি, প্রতিধ্বনি হয়ে সেই নিরালায় ভেসে বেড়াল। সূর্য অস্তে চলেছেন। নামছেন না কেন ! এখুনি তো অন্ধকার হবে। আমি কাঁদতে কাঁদতে চিৎকার করছি, বাবা, নেমে আসুন। বাবা ডাকটাই, বা, বা, বা, শব্দে সন্ধ্যার ঘরে ফেরা পাখির মতো ঝটপট, ঝটপট করে উড়তে লাগল। ছর্‌ছর্‌ শব্দে নেমে এল একটা পাথর। হঠাৎ এক সময় তিনি আমার পেছনে এসে দাঁড়ালেন। কোন দিক থেকে কি ভাবে নেমে এলেন কে জানে। হাতের পায়ের দু'একটা জায়গা ছিঁড়ে, ছেঁচে গেছে। সে ব্যাপারে কোনও মাথা ব্যাথাই নেই। মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত। রাজমহল পর্বতপালার অজানা এক শৃঙ্গে আরোহণের অপরিসীম আনন্দ। কোনও সংবাদ হবে না। গলায় মালা পরাবার জন্যে কেউ ছুটে আসবে না।

কিশোর পুত্রকে সাক্ষী রেখে দুঃসাহসী পিতার ভয়ঙ্কর অভিযান। মাতামহ যে-গানটি গাইতে গাইতে আত্মহারা হয়ে যেতেন, সেই গানের একটি কলি গেয়ে উঠলেন, পর্বত-সুমেরু ওহে হিমাচল গ্রীবা উন্নত করি কি দেখিছ বলো, দেখিছ কি সেই গুণাকর রূপ। কেউ কোথাও নেই। শুকনো নদী, উপত্যকার জঙ্গল, গরুর আস্ত কঙ্কাল, পোড়া ইটের মতো লাল আকাশ। চারপাশে পাহাড়ের দেয়াল। তাঁর সেই অক্ষত নেমে আসার আনন্দে একটি কিশোরের ক্রন্দন আরো প্রবল হত। বুঝে ফেলত, পৃথিবীতে পিতা ছাড়া কেউ নেই। তিনি এসে হাত না ধরলে সব মানুষই বড় অসহায়। মানব পিতাকে উপলক্ষ করে জগৎ-পিতার ধারণা মন স্পর্শ করে যেত। মাতামহের উদাত্ত সংগীত আরো অর্থবহ হত :

যিনি মহারাজা, বিশ্ব যাঁর প্রজা,জানোনা রে মন আমি পুত্র তাঁর।

সন্ধ্যার ছায়ান্ধকারে, সেই অরণ্যপ্রান্তরে পর্বতরাজী ক্রমশ আকাশের গায়ে ধোঁয়ার মতো মিলিয়ে যেত। পিতা হরিশঙ্করের বর্ণনা তবু থামত না। শিখরে বাতাস কেমন মসলিনের মতো, সুরার মতো, কেমন তার ফিনফিনে শব্দ, কতটা শীতল। ঊর্ধ্ব থেকে অধের দৃশ্য কেমন খেলাঘরের মতো। কত বর্ণের রেখা টানা মসৃণ পাথর। ফাটলে ফাটলে তুলোঘাস। যেন কোনও ঋষির শ্বেত শ্মশ্রুমণ্ডিত বিশাল এক সমাহিত মুখ আত্মপ্রকাশ করতে চাইছে। আবার না কি একটা কালো কুচকুচে সাপও দেখেছেন। সিল্কের কর্ডের মতো মসৃণ আর সরু। এত সব দেখার বৃত্তান্ত দিতে দিতেই নেমে আসত ঘোর অন্ধকার। দূর, দূর দেহাতিগ্রামে বলের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে উঠত লণ্ঠনের আলো। চুলার ধোঁয়া পাকিয়ে পাকিয়ে উঠত অশরীরী প্রেতের মতো। বনভূমির মাথার ওপর ভেসে উঠত হালকা কুয়াশার রেখা। নাকে এসে লাগত বোটকা একটা গন্ধ। পিতা হরিশঙ্কর হঠাৎ অতিশয় সচকিত হতেন। বলতেন, চলো চলো, মনে হয় বাঘ বেরিয়েছে কাছাকাছি কোথাও। তাড়াতাড়ি পা চলবে কি করে! তারার আলো ছাড়া তো আর কোনও আলো নেই। গাছগাছালির গন্ধ। ঝিল্লির রব। ভাসমান জোনাকির আলো। তিনি শক্ত করে আমার হাত ধরে বলতেন, কি ভয় করছে বুঝি! ভয় কিসের আমি তো আছি। সেই হাত, সেই ধরার হাত খুলে গেছে ; কিন্তু আমার সামনে উদার বুক মেলে দাঁড়িয়ে আছেন সেই একই ঘরানার আর এক মানুষ।

চটকা ভেঙে গেল। অতীত থেকে ফিরে এলুম বর্তমানে। কাকাবাবু বলছেন, 'আপনার কথা শুনে আমার একটা গল্প মনে পড়ছে। গল্পের নায়ক ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর জীবনের ঘটনা। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে এক ব্রাহ্মণ আসা-যাওয়া করত। বাইরে বেশ বিনয়ী ছিল। কিছুদিন পরে ঠাকুর কোন্নগরে গেছেন। সঙ্গে রয়েছেন ভাগনে হৃদয়। নৌকো থেকে নামছেন, দেখলেন গঙ্গার ঘাটে সেই ব্রাহ্মণ বসে আছেন। বোধহয় হাওয়া খাচ্ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখে ব্রাহ্মণ বলছেন, কি ঠাকুর! বলি, আছ কেমন? তার কথার স্বর, বলার ধরন দেখে ঠাকুর বললেন, ওরে হৃদে! এ লোকটার টাকা হয়েছে, তাই এইরকম কথা। তা মশাই, আপনার ধরণ-ধারণ দেখে আমারও তাই মনে হচ্ছে, আপনার টাকা হয়েছে। অবেলায় মদ চড়িয়েছেন। সেই অবস্থায় এসেছেন মেয়ের খোঁজ নিতে!'

ভদ্রলোক প্রথমটায় একটু ঘাবড়ে গেলেন। পর মুহূর্তেই সামলে নিয়ে বললেন, 'আমাদের সোসাইটিতে এটা কোনও ব্যাপার নয়। একে আমরা বলি, হেল্‌থ ড্রিংক। আমি জানতে চাই আমার মেয়ে, মুকু কোথায়?'

কাকাবাবু ঠিক অনুরূপ ভঙ্গিতে বললেন, 'আমি জানাতে চাই মুকু এখানে নেই। ছিল, কিন্তু চলে গেছে।'

'হোয়াট ডু ইউ মিন ! সে হস্টেলে নেই, সে এখানে নেই, তাহলে গেল কোথায় ? কে তাকে হস্টেল থেকে ফুসলে এখানে এনেছিল ! ফোসলানো একটা পেনাল অফেন্স। ভারতীয় দণ্ডবিধির কোন ধারায় পড়ে আপনি জানেন ?'

'ঘোড়ার ডিম ধারায়। মেয়ে নিজের ইচ্ছেয় এসেছিল, নিজের ইচ্ছেয় চলে গেছে। ধারাপাত আপনি পড়ুন। আমাদের আর পড়ার বয়েস নেই।'

'জেনে রাখুন, আপনাদেরও পড়তে হবে। আমি লোক্যাল থানায় গিয়ে একটা ডায়েরি করে আসি। তখন পড়বেন। কত ধানে কত চাল তখন বুঝবেন !'

'আপনার মেয়ের বয়েস কত ?'

'অ, আপনি ওই রাস্তায় যেতে চান ! অ্যাডাল্ট ! মাইনার নয়। তাকে যে ফ্রেশ মার্কেটে পাচার করা হয়নি কে বলতে পারে ! আপনার যে-রকম যমদূতের মতো চেহারা ! খুন করলেও অবাক হবার কিছু নেই।'

'আপনি যত তাড়াতাড়ি পারেন থানাতে যান। সেইখানেই আবার দেখা হবে। কথা হবে। এমনি তো হবে না। সাক্ষীসাবুদ চাই। কি বলেন ?'

আমার ভেতরে আবার একটা ভয় গুড়গুড় করে উঠল। মনে পড়ে গেল, ছেলেবেলায় আমাদের ক্লাবের ক্যাপ্টেন দীনবন্ধুদাকে পুলিশ কি রকম নারীঘটিত ব্যাপারে কোমরে দড়ি বেঁধে প্রকাশ্য দিবালোকে নিয়ে গিয়েছিল। আমারও সেই একই অবস্থা হবে।

ভয়ে ভয়ে বললুম, 'আপনি এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন ? আপনি তো আমাদের আত্মীয় !'

'সো হোয়াট ! আমার সঙ্গে তোমার যা সম্পর্ক, তাতে আমার মেয়েকে বিয়ে করা যায় !'

'বিয়ের কথা আসছে কেন ?'

'অ, তুমি বিয়ের নামে ফুর্তি করবে ! আই বিয়িং এ ফাদার সেটা রেলিশ করবো !'

হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'আপনি কি করছেন ?'

ভদ্রলোক স্তব্ধ হয়ে গেলেন। একেবারে ফিউজ। সঙ্গে সঙ্গে আমি আর এক ডোজ দিয়ে দিলুম, 'মুকু আপনাকে বাবা বলতে ঘৃণা করে। বড় মেয়েকে তো বিক্রি করতে চেয়েছিলেন। সে তো পালাল। আজ হঠাৎ বোতল টেনে এখানে এসে বাবাগিরি ফলাচ্ছেন ! মুকুকে সময় মতো টাকা পাঠান ? চিঠি লেখেন ! আপনি তো চরিত্রহীন। আমার কাকিমায়ের দিকে হাত বাড়িয়েছিলেন। হাত না বলে থাবা বলাই ভাল।'

কাকাবাবু এইবার একটা পাঞ্চ ঝাড়লেন, 'বাপ হয়ে কি করে বলতে পারলেন, মেয়েকে বেশ্যালয়ে বিক্রি করা হয়েছে ! রাবিশ। ভালগার। জেনে রাখুন, এই পিন্টুর আর মুকুর বিয়ে হবে। হরিদা ফিরে এলেই হবে। কারোর বাবার ক্ষমতা নেই আটকায় !'

মেসোমশাই একটু টাল খেলেন। চোখ দুটো কাত্‌লা-মাছের মতো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। এমন একজন মানুষকে শ্বশুরমশাই বলে মেনে নিতে হবে ভাবলেই মন বিদ্রোহ করে। এমন একজন মানুষের অমন সুন্দর দুটি মেয়ে হল কি করে ! মাসিমার রূপে। আমার জ্যাঠাইমার রূপ তো আমি দেখেছি। দুই ব্রাহ্মিকা। কোথায় লাগে একালেব আধুনিকা !

সুধন্যবাবু মেসোমশাইকে ধরে টাল সামলাতে সাহায্য করলেন। ভদ্রলোক বললেন, 'জামাইবাবু, আপনি পুরো ব্যাপারটাকে এমন ঘুরপাক খাইয়ে দিচ্ছেন কেন ? তিলকে তাল করছেন ?'

জামাইবাবু ! তার মানে শ্যালক। কোন শ্যালক ? দ্বিতীয়পক্ষের ভাই।

কাকাবাবু বললেন, 'আগেও দেখেছি, সমস্ত ব্যাপারটাকে উনি সব সময় একটা সংঘাতের দিকে নিয়ে যেতে চান। গ্রহ-বৈগুণ্য। মঙ্গলটা বেয়াড়া জায়গায় বসে আছে। মানুষের সব কথা বলতে আছে মৃত্যুর কথা বলতে নেই ; কিন্তু আজ আমি সেই নীতিবিরুদ্ধ কাজ করতে বাধ্য হচ্ছি, এই তেঁটিয়া ভদ্রলোকের অপঘাতে মৃত্যু হবে। আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।'

সুধন্যবাবু বললেন, 'আপনি অ্যাস্ট্রলজার ?'

'ফুটপাথের নই। এই নিয়ে আমি রীতিমত রিসার্চ করছি। আমার অবিশ্বাসকে আমি বিশ্বাসে নিয়ে আসছি। জীবনের কতভাগ ভাগ্যের দখলে আর কতভাগ পুরুষকারের দখলে, এই রেসিয়োটা আমি বার করতে চাই। রহস্যটা প্রায় ধরে ফেলেছি। মৃত্যু, অসুখ, এইটাই আমার রিসার্চের বিশেষ দিক।'

মেসোমশাই চোখ দুটো বড়বড় করে বললেন, 'আপনারা কি বলতে চাইছেন, আমার মেয়ে, আমার কোনও দুর্ভাবনা থাকবে না ! এত বড় একটা শহর, মেয়েটা কোথায় গেল আমি জানতে চাইব না ! আপনি তো আচ্ছা লোক মশাই, আমাকে অভিশাপ দিচ্ছেন, অপঘাতে মৃত্যু হবে। হয় হবে, সব মানুষকেই একদিন না একদিন মরতে হবে। আপনিও মরবেন আমিও মরবো। আপনার মেয়ে থাকলে বুঝতেন মেয়ের বাপের কি দুশ্চিন্তা ! এতটুকু একটা ছেলে আপনার সামনে আমাকে দুশ্চরিত্র বললে। আপনি শুনলেন, কিছু বললেন না !'

'ইকোয়াল জাস্টিস। আপনি প্রথমেই তাল ঠুকে বললেন, ফুসলে এনেছে, তারপরে বললেন ফ্লেশ-মার্কেটে বেচে দিয়েছে। কোনও ভদ্রলোক এমন কথা বলে ?'

'তার মানে আমি ছোটলোক ?'

'আপনি মেয়ে চান, না ঝগড়া চান ?'

হঠাৎ পিতা হরিশঙ্কর আমাকে ভর করলেন। কানের কাছে স্পষ্ট তাঁর কণ্ঠস্বর, 'ফিনিশ ইট, ফিনিশ ইট। ডোন্ট ওয়েস্ট ইওর টাইম, সান। ট্যাক্‌ল ইট।'

আমি সঙ্গে সঙ্গে হাত জোড় করে বললুম, 'আমাকে ক্ষমা করবেন। মুকুকে আমি খুঁজে বের করে দোবো। নিশ্চয় কোনও বন্ধুর বাড়িতে আছে। কাল ক্লাসে গিয়ে ধরবো। আপনার ঠিকানাটা আমাকে দিয়ে যান।'

মিষ্টি কথায় কাজ হল। ভদ্রলোক কাঁপা কাঁপা হাতে ঠিকানা লিখলেন। মদ স্নায়ুকে ধরেছে। মদ এইবার মানুষটিকে খেতে শুরু করেছে। কাগজটা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। ঢেলা ঢেলা চোখ দুটো জলে ভরে এসেছে। আবেগরুদ্ধ গলায় বললেন, 'দেখো বাবা, সিনসিয়ারলি একটু দেখো। সকলের ঘৃণা নিয়ে বেঁচে আছি। টাকা-পয়সায় কি হয় ! কেউ কেউ দু'বার বিয়ে করতে বাধ্য হয়, তাতে চরিত্র কেন খারাপ হবে। মায়ের আসনে আর একটা মাকে বসাতে পারল না ওরা, সে দোষ আমার ! কি ভাবে যে মেন্টাল-টর্চার করছে আমাকে ! আর তো সহ্য হচ্ছে না। আমার তো আর কোনও ছেলেমেয়ে হয়নি। কে দেখতো আমাকে ? তোমরা দেখতে ! সন্ধের অন্ধকারে পাহাড়ি ভাল্লুকের মতো দু'হাত বাড়িয়ে বার্ধক্য এগিয়ে আসছে। মি লর্ড, আই অ্যাম কাস্টিগেটেড। আই অ্যাম ওল্‌ড, এ হ্যাগার্ড হায়না, হাউলিং ইন দি ডাস্ক অফ মাই লাইফ। নো হোয়্যার, নো রেসপাইট। মি লর্ড আপ ইন ইওর ডোম, ইউ আর এ সাইলেন্ট অবজার্ভার। ইউথ ইজ এ ব্লান্ডার। ম্যানহুড এ স্ট্রাগল। ওল্‌ড এজ এ রিগ্রেট। আর আমি আসতে চাই না, ইন ইওর কিংডাম। মি লর্ড হ্যাং মি বাই দি নেক। আমি শুনেছি তার বাঁশি। বাঁশি বাজে দূর বনে। ভুল, ভুল।

লাইফ ইজ অ্যান ইনকিওরেব্‌ল ডিজিজ। উই অল লেবার অ্যাগেনস্ট আওয়ার ওন কিওর, ফর ডেথ ইজ দি কিওর অফ অল ডিজিজেস।'

'নেশা চড়ছে। এজলাসে যেন সওয়াল করছেন এক প্রবীণ আইন ব্যবসায়ী।

আবেগের জগৎ থেকে কঠোর, রুদ্র বাস্তবে ফিরিয়ে আনতে আমার প্রস্তাব, 'চা খাবেন!' পিতা হরিশঙ্করের এই সময়টাই ছিল টি টাইম। নিজের তৈরি ধবধবে সাদা একটা লুঙ্গি পরে, গায়ে অনুরূপ সাদা গেঞ্জি, পায়ে ভবীচরণ দাসের দোকানের চপ্পল, ফট্‌ফট্‌ আওয়াজ তুলে এই বারান্দায় পায়চারি করতেন আর মাঝে মাঝে ফিন্‌ফিনে পাতলা চায়ের কাপে চুমুক দিতেন। পেছন পেছন ফিরত দার্জিলিং চায়ের বিশিষ্ট গন্ধ। দেখে মনে হত দক্ষিণ ভারতীয় মহাসাধক, রমণমহর্ষি পায়চারি করছেন। সৎজীবনের সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে। আত্মীয়-স্বজন-বন্ধুবান্ধব মিলিয়ে পঞ্চাশটি মৃত্যুর চিতা জ্বলছে বুকে। বৃহৎ একটা আমগাছের মতো ছিল এই যৌথ পরিবার। ডালে ডালে প্রিয় আম ঝুলছে। দক্ষিণের বাতায়ন খুলে এমন একটা ঝড় এল। সব আম ঝরে পড়ে গেল। একটি ডালে দুটি মাত্র আম। পিতা আর পুত্র। কে যায় কে থাকে! ভবে কে বলে কদর্য শ্মশান! পরম পবিত্র মহাযোগের স্থান। হেথা এলে পরে যায় মায়া সব।

চা খেয়ে ভেঙে পড়া কপিধ্বজের মত মেসোমশাই চলে গেলেন শ্যালক সুধন্যর হাত ধরে। কাঠের কারবারী। আসামের বড় টিম্বারমার্চেন্ট। চলে যেতেই কাকাবাবু বসলেন আমাকে নিয়ে। বললেন, 'কেমন হল! তোমাকে আমি ওই কারণেই সাবধান করি। একেবারে অরক্ষিত। মেয়েদের থেকে শতহস্ত দূরে থাকাই উচিত। এই সেই বয়েস, ফিউম আর পারফিউম দুটোই তোমাকে আকর্ষণ করবে। একটা আদর্শ ধরে, দাঁতে দাঁত চেপে বয়েসটা পার করে দাও। সামনে হ্যাপি-ভ্যালি। হরিদার জীবন থেকে কি কোনও শিক্ষাই নিতে পারলে না। কামজয়ী মহামানব। যে-বয়সে তোমার মা মারা গেলেন, সেই বয়েসটা একবার ভাবো! আর দেখলে তো দ্বিতীয় পক্ষের অবস্থা! আর কোনও কথা নয়, এইবার কিছুদিনের জন্যে পালাও। অ্যাস্ট্রোলজিক্যালি এই সময়টা তোমার মোটেই ভাল নয়। ছটা বছর কোনও রকমে পার করে দাও। এইটাই হল যৌবনের টিথিং টাইম।'

'মুকুর কি হবে?'

'তুমি কি মুকুকে বিয়ে করে ফেলেছো?'

'তার মানে?'

'মানে, রেজিস্ট্রি।'

আজ্ঞে না। মুকু আমার মতো মেয়েছেলেকে বিয়ে করবে না। মুকু হল শক্তি, মুকু ভৈরবী। মুকুকে খুঁজে দেবার দায়িত্ব আমি নিয়েছি।'

'আর হরিদাকে খোঁজার দায়িত্ব কার ওপর দিয়েছো?'

স্তব্ধ হয়ে বসে রইলুম কিছুক্ষণ। সত্যই তো। কি করেছি তাঁর জন্যে! শুধুই জল্পনা।

কাকাবাবু বললেন, 'জেনে রাখো, ঠিক তিনদিনের মাথায় আবার একটা ঘোরতর সমস্যা আসছে।'

২৭

'The man that runs away
Lives to die another day'

সিঁড়ির শেষ ধাপে একটা পোস্টকার্ড উল্টে পড়েছিল। পিওন কখন দরজার ফাঁক দিয়ে খুস্ করে ঠেলে দিয়ে গেছে, কেউ খেয়াল করেনি। আমাদের নিচেটা অন্ধকার অন্ধকার, স্যাঁতস্যাঁতে। সদর থেকে পেছন পর্যন্ত টানা একটা রক। সারসার তালা বন্ধ ঘর। ডাচ আমলের কুঠি বাড়ি এইরকমই ছিল। ঘরগুলোয় সেই দূর অতীতে মুহুরিরা বসতেন। একটা ঘরের জানালার গরাদ থেকে লম্বা একটা চেন ঝুলছে। অতীতের স্মৃতি। এই পরিবারের পূর্ব পুরুষদের দুটি মজার শখ ছিল। এক, কুকুর পোষা, দুই, মানুষ পোষা। শেষ কুকুরটি ছিল বিশাল এক হাউন্ড। ধবধবে সাদা। নাম ছিল জিম। এই চেনটা দিয়ে জিমকে বাঁধা হত। চেনটাকে রোজ আমি পরিষ্কার করি আর একটি কুকুরের অস্তিত্ব অনুভব করি। আমার জ্যাঠামশাইয়ের মৃত্যুর পর কুকুরটি ইচ্ছামৃত্যু বরণ করে। মানুষ পারবে ?

চেনটার পাশে বসে পড়লুম। পেছনে জানালা। সাবেক কালের চল্লিশ ইঞ্চি পুরু দেয়াল। ভেতরে কটা আনারকলি আছে কে জানে! পোস্টকার্ডে চোখ রাখলুম ভয়ে ভয়ে। কার চিঠি ? পরিষ্কার হাতের লেখা। চিঠিটা পড়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলুম কিছুক্ষণ। আবার এক খেলা! দোতলায় এসে কাকাবাবুর সামনে চিঠিটা ফেলে দিলুম, 'এই নিন, পড়ুন। আর এক বিপদ আসছে। যা বলেছিলেন, সব অক্ষরে অক্ষরে মিলছে।'

কাকাবাবু পড়ে বললেন, 'এইবার কি করবে ?'

দোতলার বারান্দার মেঝেতে বসে পড়লুম। বেলা ঝুলে পড়েছে। আকাশের নীল শীতল হয়েছে। ছোট পিসিমার চিঠি। পিসেমশাই বেশ কিছু দিন গত হয়েছেন। তিনটি ছেলেমেয়ে। জেলা-শহরে জীবন প্রায় অচল হয়ে পড়েছে। পুঁজি নিঃশেষ। মাঝে মাঝে অনাহার চলছে। হয় মৃত্যু না হয় এইখানে আশ্রয়। ছেলেমেয়েরা নাবালক। আত্মীয়-স্বজনদের অত্যাচার ও ভীতিপ্রদর্শন। কেটে ফেলবো, মেরে ফেলবো। কারণ সামান্য কিছু ভূসম্পত্তি আছে, তার ভাগ শ্বশুরবাড়ির মহামানবরা দিতে প্রস্তুত নয়। আমার চিন্তা দেখে কাকাবাবু বললেন, 'হরিদা থাকলে হাসিমুখে বুক ফুলিয়ে বলতেন, চলে এসো। আমার এক মুঠো জুটলে তোমাদেরও জুটবে। হরিদা তো গৃহী সন্ন্যাসী, অবধূত। সাগরের মতো মন। সেই পিতার পুত্র তুমি। বিশাল এক পরিবার প্রতিপালনের জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারবে ? ভেবে দেখো। তোমার যা রোজগার তা ভাগ করে নিতে হবে।

দারিদ্র্য আসবে। অশান্তি আসবে। আয়েস ঘুচে যাবে। রোজগার বাড়াতে হবে। তিনটি ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার খরচ যোগাতে হবে। প্রয়োজন হলে প্রাইভেট টিউশানি করে আয় বাড়াবার ফিকির করতে হবে। এই আদুরে, সুখী জীবন আর থাকবে না তোমার। তোমাকে হরিদার মতো ফাইটার হতে হবে। পারবে তুমি ? আমার সন্দেহ আছে যথেষ্ট। তোমার মেটাল আমি চিনি। তুমি কল্পলোকবিহারী। তোমার চরিত্রে আছে বিরোধ। ত্যাগের কথা ভাবো, কাজে তুমি ভোগী। দ্বিতীয় পথই তোমার পথ। পত্রপাঠ জানাও, আসবেন না। এ বাড়িতে কেউ থাকছে না। তালা ঝোলাও, সরে পড়ো। অথবা, লেখো, যেখানে আছেন, সেইখানেই থাকুন, আমি মাসে মাসে কিছু টাকা পাঠাবো।'

'টাকা কি করে পাঠাবো কাকাবাবু ? আমি তো আশ্রমে যেতে চাই !'

'তাহলে তো হয়েই গেল। সেইটাই লিখে দাও। কে বাঁচলো, কে মরলো তোমার দেখার দরকার নেই। সংসার হল মায়া। তাই তো ? সন্ন্যাস মানেই তো বেদান্ত। ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ, নায়ং ভূত্বাইভবিতা বা ন ভূয়ঃ। আত্মা। জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই। চুকে গেল লেঠা। লোকে বলবে, নিষ্ঠুরতা, স্বার্থপরতা, নীচতা, পলায়নী মনোবৃত্তি। ওসবে তুমি কান দিয়ো না। দিন কতক অ্যাডভেঞ্চার করে এসো। তারপর গেরুয়া ফেলে গৃহী। কি বলো ? ভাবো। ভেবে দেখো।'

এটা কোনো পরামর্শ হল ! এ তো ব্যঙ্গ ! প্রতিটি কথা যেন দু'মুখো ছুরি ! এদিকেও কাটে, ওদিকেও কাটে। ভদ্রলোকটিকে বোঝা দায়। ক্ষণে, ক্ষণে রূপ পাল্টান। এই বন্ধু, তো পরমুহূর্তেই শত্রু। কাগজ-পত্র গুছিয়ে কাকাবাবু উঠে দাঁড়ালেন। গম্ভীরমুখে বললেন, 'আমাকে এইবার যেতে হচ্ছে। আমার নিজস্ব কিছু কাজ আছে। সামান্য কটা টাকার পেনসানে তো দিন চলবে না। যত দিন বাঁচবো তত দিন আমাকে খাটতে হবে। কে খাওয়াবে ! কেউ তো নেই আমার !'

'কেন আমি ?'

কাকাবাবু নাটকীয় ভঙ্গিতে তাকালেন আমার দিকে, 'দেখো পিন্টু, যে কথা বিশ্বাস করো না, সে-কথা বোলো না। কোনটা কথা আর কোনটা কথার কথা বুঝতে শেখো। এ-যুগে আপনই পর হয়ে যাচ্ছে, পর হবে আপন ? ডোন্ট বি সিলি।'

গোলার আঘাতে দুর্গ ভেঙে পড়ার মতো, আমিও ভেঙে পড়লুম। কথার কথাই বলেছি। ফাঁকা কথা। ধরা পড়ে গেছি। ঠোঁটকাটা মানুষ। অভিনয় করতে জানেন না বলেই এমন তীব্র ধাক্কা মারতে পারলেন। অন্য কেউ হলে, গলে গিয়ে বলতেন, 'ওরে আমার সোনা রে !'

নিজেকে সামলে নিয়ে বললুম, 'আমাকে ফেলে চলে যাবেন ?'

'সেইটাই পৃথিবীর নিয়ম। কেউ চিরকালের নয়। নিজের হাল নিজে ধরো। কারোর ওপর নির্ভর কোরো না। আর তোমাকেও তো যেতে হবে। সন্ন্যাসী হবে, বললে না ?'

আবার বাঁকা কথা। একটু খোঁচা। কথা না বাড়িয়ে, আবার নতুন কোনও খোঁচার ভয়ে আমিও উঠে পড়লুম। এরই নাম বোধহয় সংসারের শকথেরাপি।

কাকাবাবু যাবার আগে ইট ছোঁড়ার মতো বলে গেলেন, 'বি এ ম্যান।'

আমার বলতে ইচ্ছে করল, 'থ্যাঙ্ক ইউ ফর ইওর অ্যাডভাইস।'

দরজা বন্ধ করে অন্ধকার সিঁড়ির মুখে অনেকক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে রইলুম। একেবারে চিন্তাশূন্য ফ্যালফ্যালে অবস্থা। মনে হচ্ছে, পৃথিবী শেষ হয়ে গেছে। সৃষ্টি লোপাট। একা আমি দাঁড়িয়ে আছি পৃথিবীর কিনারায়। শেষ জীবিত ব্যক্তি। মনে হচ্ছে, এই বাড়ির

অসংখ্য ঘরের প্রতিটিতে একটা করে মমি শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে আছে। নিচের কোণের ঘরে যেন তবলা বাজছে। প্রফুল্লকাকাবাবু মৃত্যুর পার থেকে ফিরে এসে হাত সাধছেন। কাকিমা গা ধুয়ে কুয়োতলা থেকে আসছেন ভিজে শাড়ি পরে। মাতামহ দীর্ঘ শরীর নিয়ে তানপুরা হাতে দোতলা থেকে নেমে আসছেন। সম্রাটের মতো ভঙ্গিতে। বারান্দায় পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে কনক। শূন্য বাড়িতে, জীবিত-মৃত সবাই ফিরে আসছে একে একে। মহা কোলাহল, কলরোল। যেন এক উৎসব হচ্ছে। নিমন্ত্রিতরা আসছেন একে একে। দমাশ্ করে একটা আওয়াজ হল কোথায়। চমকে উঠলুম। বোধহয় ছিটকিনি দেওয়া ছিল না। জানলার পাল্লা পড়ল। ফাঁকা বাড়িতে শব্দটা বড় ভয়ঙ্কর।

বিশাল বড় একটা সিন্দুক খুলে যদি দেখা যায় ভেতরটা একদম ফাঁকা তাহলে মনের যে অবস্থা হয়, আমার মনের অবস্থাও ঠিক সেইরকম। শূন্যতাও হাসে। শূন্যতারও দাঁত আছে। ভাষাহীন ভাষা আছে, অবয়ব আছে। ফাঁপা একটা চেহারা। বিশাল এক ইঁদারার মতো। অতল।

লেজ তোলা একটা বেড়ালের মতো এ-ঘর, ও-ঘর, সে-ঘর ঘুরেঘুরে বেড়ালুম খানিক। সব ছেড়ে যেতে হবে আমাকে! বেঁচে থাকার একটা পর্ব এইখানে এইভাবেই শেষ হয়ে যাবে! অসমাপ্ত উপন্যাসের মতো। মানুষের মৃত্যু না হলেও আয়োজনের মৃত্যু।

অন্ধকার হল ; কিন্তু আলো জ্বালাতে ইচ্ছে করল না। পিতা হরিশঙ্করের খাটে বসে আছি। বালিশের পাশে পাটকরা একটা সাদা রুমাল। নিয়ে যাননি। পড়ে আছে। বসে বসে দেখছি, সব বাড়িতে আলো জ্বলে উঠেছে। হরিশঙ্কর ইমনে একটি সুন্দর গান গাইতেন, নিশি এল দেখে চোখেরি পলকে শূন্য কে সাজালো দীপমালায়/ ঘরে ঘরে আলো দেখে লাগে ভাল, আমার হৃদিগেহ অন্ধকারে কালো। তখন ছিল গান, এই মুহূর্তে আমার উপলব্ধি। চারপাশে কেমন সব সুখের সংসার, আমি বসে আছি শ্মশানে। হঠাৎ মনে হল, দিদি গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছেন। মনে হওয়া মাত্রই, শরীরে একটা কাঁপুনি খেলে গেল। অদ্ভুত একটা ভয়। এক মুহূর্ত আর এ-বাড়িতে থাকা যায় না। ভয়ঙ্কর। কিন্তু, যাই কোথায় ? কাকে গিয়ে বলি, আজকের রাতটা আমাকে থাকতে দেবেন আপনারা দয়া করে ? প্রথমেই মনে পড়ল টিপের কথা। পরমুহূর্তেই এমন ছোটলোক মন, ভাবতে বসল মেনিদার মেয়ে অচলার কথা। অচলাকে আমি দেখেছি। না দেখে কোনও উপায় নেই, এমনই তার আকর্ষণ!

অশরীরী আত্মার ভয়ে আলো জ্বাললুম। অন্ধকার ঘরে আলোটা লাফিয়ে পড়ার মুহূর্তে মনে হল খাটে কেউ বসেছিলেন। আলো পড়া মাত্রই অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ভয় যে কত শীতল সেই মুহূর্তে বুঝতে পারলুম। মাইনাস দশ, কুড়ি ডিগ্রিও হতে পারে। শরীরে একটা কাঁপুনি ধরে গেল। ওজন মনে হচ্ছে আড়াই মণ।

নীল একটা আলো ঝলসে উঠল। কি ব্যাপার ? পৃথিবীটা কি বিজ্ঞানের বাইরে চলে গেল! মেঘ ডাকার শব্দে বিজ্ঞান ফিরে এল। বিদ্যুৎ চমকেছে। খেয়াল করিনি, পশ্চিমের আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেছে। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। মনে হয় ঝড় আসছে। আবার একবার মেঘ ডাকল। দমকা হাওয়ায় টেবিলের ওপর থেকে ফড়ফড় করে কিছু কাগজ উড়ে গেল। আর কোনও উপায় নেই। রাতটা এই কফিনেই আটকে গেলুম।

যাই হোক, তবু একটা কিছু এসেছে। ঝড় এসেছে বৃষ্টি নিয়ে। তাড়াতাড়ি জানালা বন্ধ করলুম। সগর্জনে বৃষ্টি এসে গেল কেট্‌ল ড্রাম বাজিয়ে। হিটলারের প্যানজার বাহিনী মার্চ করছে। ঈশ্বরের কি খেলা! এমন এক ব্যবস্থা করেছেন, যদি কারোর আসার ইচ্ছাও থাকত

সে আর আসতে পারবে না, যেমন টিপ, বউদি, কি অন্য কেউ। খেলা জমে গেল। এরই নাম বেঁধে মারা। যেমন বৃষ্টি, তেমনি বাতাস। জানালা, দরজা কেঁপে কেঁপে উঠছে। ঘন ঘন বজ্রপাত। খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে বাতাস আসছে কেঁদে কেঁদে। যতই চেষ্টা করছি মনটাকে ঘোরাতে, মন ততই চলে যাচ্ছে ঝুলন্ত একটা মৃতদেহের দিকে। দুলছে। ঘুরছে। বিদ্যুতের আলোয় নীল হয়ে উঠছে।

খাটের তলায় কিছু একটা পাশ ফিরছে। চোর-টোর ঢুকে বসে আছে না কি ? শব্দ করে কি একটা গড়িয়ে গেল। আজ রাতে সব জড়-বস্তুই কি প্রাণ পাবে ! নৃত্য করতে থাকবে আমাকে ঘিরে। জড়-জগতে একটা চক্রান্ত শুরু হয়েছে। ভয়ে ভয়ে নিচু হয়ে দেখলুম, কি থাকতে পারে খাটের তলায় ! সাদা কাপড়ের একটা ব্যাগ। তলা দিয়ে বাতাস এসে ব্যাগটাকে কাত করে দিয়েছে। খালি একটা কৌটো গড়িয়ে গেছে।

দিদির ব্যাগ। মনে পড়ল সঙ্গে একটা ব্যাগও এনেছিলেন। ব্যাগটাকে টেনে বের করে আনলুম। বাইরে থেকে স্পর্শ করে মনে হচ্ছে, দু'একটা বই আছে। একটা চশমার খাপ। ছোট ছোট কয়েকটা পুঁটলি। একটাতে কিছু পয়সা আছে বলে মনে হচ্ছে। টিনের কৌটোটা অনেক চেষ্টা করেও খুলতে পারলুম না। ভেতরে একটা কিছু আছে। ঠকাস ঠকাস করে নড়ছে। ব্যাগটির সমস্ত জিনিস উল্টে দেখতে ইচ্ছে করছে। সঙ্কোচও হচ্ছে। জানালা দিয়ে জল ঢুকে মেঝের ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলেছে। এই বাড়ির এইটাই দোষ। জল আটকানো যায় না। পিতা হরিশঙ্করের বিজ্ঞানও হার মেনেছে।

হঠাৎ মনে হল সদরের কড়াটা কেউ নাড়ছে। তুমুল বাদলেও শব্দটা কানে আসছে। নিচেটা এই মুহূর্তে আমার কাছে ভীতিপ্রদ কবরখানা। অশরীরীদের মিলন-ভূমি। মনের জোর করে নামতে হল। বীর হরিশঙ্করের ছেলে আমি। বাইরে কেউ দাঁড়িয়ে আছেন। ছাতার ওপর অঝোরে জল-পড়ার শব্দ। দরজাটা খোলামাত্রই ছাতাটাতা সমেত মেনিদা ঢুকে পড়লেন। বাইরে নীল ইস্পাতের মতো রাস্তায় বৃষ্টি নাচছে। গাছের পাতা পড়ে আছে। পোস্টের আলোয় জলে খেলছে রুপোলি ফুলঝুরি। ছাতার জলে, বৃষ্টির ঝাপটায় বেশ খানিকটা ভিজে গেলুম।

মেনিদা বললেন, 'ধরো, ধরো। দুটো হাতই জোড়া। ছাতা বন্ধ করতে পারছি না।'

বাঁ হাতে একটা টিফিন ক্যারিয়ার। আমার হাতে দিয়ে ছাতা বন্ধ করে ধেইধেই করে খানিক নেচে নিলেন।

'কি করছেন ?'

'সিঙ্গিং ইন দি রেন তো পারবো না, তাই ড্যানসিং। সিনেমাটা দেখেছো ? বাইরের রাস্তাটা নাচার মতোই।'

'এই বৃষ্টিতে বেরোলেন কেন ?'

'বাঃ বেরবো না ! দেখলুম ঘটোৎকচ কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে হনহন করে চলে গেলেন। জিজ্ঞেস করলুম, কি মশাই চললেন ? তা কোনও উত্তরই দিলেন না। গরম কচুরি হল। শুকনো আলুর দম। তোমার জন্যে নিয়ে এলুম। আর জানি তো, তুমি একলা আছ। পিন্টু, পিতা শব্দটা বড় বিশাল। সকলের ভেতরেই আছে। আমরা খাবো, তুমি উপোস করে থাকবে ! আমার মনে হয় এইতেই তোমার আজকের রাতটা চলে যাবে। চলো চলো, ওপরে চলো।'

মেনিদা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বললেন, 'এই বাড়ি এত ফাঁকা ভাবাই যায় না। অতীতে কি সব দেখেছি আমরা ! সংস্কৃতির পীঠস্থান। গানবাজনা, লেখাপড়া। একটা

মানুষ যে একশোটা মানুষ হতে পারে, তোমার বাবাই ছিলেন তার প্রমাণ। কি হয়ে গেল। কি করে গেলেন! কত স্মৃতি ভেসে আসছে মনে!'

মেনিদা একটা চেয়ারে বিমর্ষ হয়ে বসলেন। কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবার শুরু করলেন, 'সব বিষয়ে এমন দখল আমি আর কারোর দেখিনি। অমন স্মৃতিশক্তি! অমন মেধা! একজন অতিমানব। আমরা চিনতে পারিনি। কথায় আছে, গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না! নিজেরও কোনও প্রচার ছিল না। তোমার সন্ধ্যাহ্নিক হয়ে গেছে তো!'

'ওসব তো আমি করি না।'

'সে কি ব্রাহ্মণের ছেলে! ত্রিসন্ধ্যা তো কর্তব্য! তিনবার না পারো, দু'বার তো করতেই হবে। অবশ্যই করবে। দেখবে মনের জোর বাড়ছে। ভয় কেটে যাচ্ছে। এটা ধর্ম নয়, ডিসিপ্লিন। সব সময় একটা কিছু জপ করবে মনে মনে। যেন মুখে একটা সুপুরি রেখেছো। একেই বলে অজপা। দেখবে অদ্ভুত একটা শক্তি পাবে। আমাদের অনেক কিছু সম্পদ আছে পিন্টু। চর্চার অভাবে মরচে ধরে যাচ্ছে। একালের ছেলেদের কেউ বলেও না। যাও, তুমি হাত ধুয়ে খানকয়েক গরম গরম খেয়ে নাও। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে আর ভাল লাগবে না। আমার সামনে খেতে লজ্জা করবে তোমার। পাশের ঘরে চলে যাও।'

মেনিদাকে যতই দেখছি, ততই অবাক হয়ে যাচ্ছি। ভুল করেছিলুম, না মানুষটি রাতারাতি বদলে গেলেন। মেনিদা আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। যেন বুঝতে পেরেছেন আমার মনের কথা। মেনিদা বললেন, 'টেক ইট ইজি, টেক ইট ইজি। সব সময় দুঃখু দুঃখু ভাব করে থেকো না। কৃত্রিম মনে হতে পারে। আমাকে হারমোনিয়ামটা বের করে দাও, ততক্ষণ হরিশঙ্করকে গান শোনাই।

হারমোনিয়ামটা বের করে দিলুম। মেনিদার গলা কি সুন্দর! মিছরির মতো। তিনি গান ধরলেন, 'ওরা চাহিতে জানে না দয়াময়/ চাহে ধন জন আয়ু আরোগ্য বিজয়/ করুণার সিন্ধুকূলে/ বসিয়া মনের ভুলে/ এক বিন্দু বারি তুলে মুখে নাহি লয়।' মাঝে মাঝে গান থামিয়ে প্রশ্ন করছেন, 'ঠিক হচ্ছে তো, হরিশঙ্কর!'

পাশের ঘরে চোরের মতো একপাশে বসে কচুরি খাচ্ছি, আর মনে মনে হাসছি। ঠিক হয়েছে ব্যাটা! কেউ কোথাও নেই। একেবারে একা Alone, alone, all all alone/ Alone on a wide, wide sea/ And never a Soul took pity on/ My Soul in agony. বেশ হয়েছে। কাঙালি ভোজনের বাঙালির মতো এক পাশে বসে খাচ্ছি। তফাৎ এই, খাদ্যটা খিচুড়ি নয়, ঘিয়ে ভাজা হিং-এর কচুরি। মেনিদা গাইছেন, 'তীরে করি ছুটাছুটি/ ধূলি বাঁধে মুঠিমুঠি/ পিয়াসে আকুল হিয়া আরো ক্লিষ্ট হয়/ ওরা চাহিতে জানে না দয়াময়।'

অঝোরে ঝরছে বৃষ্টি। লাল মেঝের ওপর বসে হনুমানের মতো একের পর এক কচুরি খেয়ে চলেছি। কচুরি, আলুরদম দুটোই সাঙ্ঘাতিক সুস্বাদু হয়েছে। এও মনে হয় ঈশ্বরেরই ইঙ্গিত। হিমালয়ে আশ্রমে চটিতে এইভাবেই তো আমাকে পঙ্গতে বসে খেতে হবে। আর তো কয়েক ঘণ্টা, তার পরেই তো আমি ট্রেনে। হিমালয়মুখো।

হারমোনিয়াম বন্ধ করে মেনিদা বললেন, 'তুমি কি ভাবছো আমি জানি। তোমাকে জামাই করার জন্যে আমি কচুরির টোপ ফেলছি। না, তা নয়। আজই জানতে পারলুম, অচলার বিয়ে হয়ে গেছে। একালের মেয়েরা নিজের ব্যবস্থা নিজেরাই করে নেয়। তাহলে কচুরিটা টোপের কচুরি নয়। মুখে তুলতে গিয়ে তোমার মুখ ভেসে উঠল চোখের সামনে। করুণ, অসহায় একটা মুখ। ছেলেটা কি খাবে! তারপরেই মনে হল, গলায় দড়ি। সারাটা রাত ভয়ে মরবে। বউকে বললুম, ভরো টিফিন কৌটো। ছেলেকে বললুম, ছাতাটা খুঁজে

দে। চলে এলুম। রাতটা তোমার সঙ্গে কাটিয়ে ভোরে চলে যাবো। কাল সারা রাত তুমি জেগেছো। আজ তোমার ঘুম দরকার সলিড ঘুম। বেশ বাদলার রাত আছে। আজ তুমি তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ো।'

মেনিদার চোখে-মুখে অদ্ভুত একটা স্নেহের ভাব। এমন স্নেহ বহুকাল আমি পাইনি। কি ভাবে কৃতজ্ঞতা জানাবো ভেবে পাচ্ছি না। প্রশ্নটা আর চেপে রাখতে পারলুম না, 'কোনটা আপনার আসল রূপ!'

মেনিদা হাহা করে হেসে বললেন, 'শোনো, আমার থিওরির সঙ্গে তোমারটা মিলবে না। বাইরেটাকে এমন করে রাখবে, যেন তোমাকে কেউ চিনতে না পারে। মহাপুরুষের ভেক ধরলে তাঁদের অপমান করা হয়। অভিনয় করা হয়। বাইরেটা ভাল, ভেতরটা নোংরা, সে বড় সাঙ্ঘাতিক জীব। ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক। উল্টে নাও। বাইরেটা ভয়ঙ্কর ; কিন্তু ভেতরটা সুন্দর। বিহারী নদী দেখেছো ? বাইরে বালি, একটু খোঁড়ো, স্বচ্ছ, টলটলে শীতল জল। তোমার বাবার কথাই ভাবো না। বাইরেটা রুক্ষ, কঠোর, তীব্র, ঝাঁঝালো, কর্কশ, ঘোরতর নাস্তিক। ভেতরে স্নেহের ফল্গুধারা। মেনি বাইরে খারাপ। সবাই ঘৃণা করে। কেউ কাছে ঘেঁষে না। আরে সেইটাই তো আমি চাই। তলে তলে এগিয়ে যাও। সাধু মরণে সাবধান! গল্পটা জানো ?'

'বলুন না শুনি।'

'বারাণসীতে এক সাধু ছিলেন। ভক্তদের মাঝখানে বসে আছেন। এক পাগলী কোথা থেকে এসে হাত পা নেড়ে রোজই এক কথা বলে যায়, ওরে সাধু মরণে হুঁশিয়ার! সাধুর অহঙ্কারে লাগে। তেড়ে ওঠেন, বেরো বেরো। পাগলী হাসতে হাসতে পালায় ; কিন্তু রোজই আসে, আর রোজই সেই এক কথা বলে যায়। অবশেষে সাধুর মরণকাল এসে গেল। নিজের আটচালায় চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন। প্রাণ যায়-যায়। এমন সময় সাধুর নজর হঠাৎ চলে গেল চালের বাতার দিকে। সেখানে গোঁজা রয়েছে একজোড়া নতুন পাদুকা। কোনও ভক্ত দিয়ে গিয়েছিল। সেটি আর ব্যবহার করা হয়নি। সেই আফসোস নিয়েই সাধুর মৃত্যু হল। তারপর! আবার সেই বারাণসী ; কিন্তু এর মাঝে বহু বছর পার হয়ে গেছে। দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে এক মুচি বসে বসে ঠুকঠুক করে জুতোয় পেরেক ঠুকছে। হঠাৎ এক সাধিকা সামনে এসে দাঁড়ালেন। মুচিকে বললেন, কি সাধু, মনে পড়ে, বলেছিলুম, মরণে হুঁশিয়ার! মনে পড়ে সেই কথা! মুচি চোখ তুলে তাকালেন। চোখে জল। মুহূর্তে মনে পড়ে গেল পূর্বজন্মের কথা। জুতোর আফসোস নিয়ে মরেছিলেন। এই জন্মে তাই কত জুতো! জুতোর দুনিয়াতেই জীবন কাটছে। সেই কারণেই খুব সাবধান পিন্টু। গল্প গল্পই। তবে নীতিটা হল, বাইরের ভেক কিছুই নয়, আসল হল ভেতর, যেটাকে কেউ দেখতে পায় না। ভেতরটাকে বেশ ভাল করে সাজাও। আরে তুমি কোন্ বাপের সন্তান! লড়ে যাও। হও কর্মেতে বীর, হও ধর্মেতে ধীর, হও উন্নত শির। দেখো, আমি তোমাকে এইসব বলছি, বাইরে যেন প্রচার না হয়ে যায়। আমার ইমেজ ভেঙে যাবে। ঘৃণা মানুষকে এক-ঘরে করে অচ্ছুত করে। নির্জনতা এনে দেয়। সংসার তাকে খারিজ করে। কি মজা! আচ্ছা, আমি একবার বাথরুমে যাই। হাত মুখ ধুয়ে, ইষ্ট নাম স্মরণ করে এবার ধুপুস করা যাক।'

দক্ষিণের একটা জানালা অল্প একটু ফাঁক করলুম। বৃষ্টির দাপট কমে গেছে। ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবির মতো বাতাস বইছে। অনেকটা নিচে রাংতার মতো ভিজে রাস্তা। আকাশ ঘোলাটে সাদা। হঠাৎ রবীন্দ্রনাথ এসে গেলেন। ইলেকট্রিকের তার থেকে জল পড়ছে

ফোঁটা ফোঁটা। সেইদিকে তাকিয়ে মনে পড়ে গেল, 'নবাঙ্কুর ইক্ষুবনে এখনো ঝরিছে বৃষ্টিধারা/ বিশ্রামবিহীন/ মেঘের অন্তরপথে অন্ধকার হতে অন্ধকারে/ চলে গেল দিন/ শান্ত ঝড়ে, ঝিল্লিরবে, ধরণীর স্নিগ্ধ গন্ধোচ্ছ্বাসে/ মুক্ত বাতায়নে/ বৎসরের শেষ গান সাঙ্গ করি দিনু অঞ্জলিয়া/ নিশীথগগনে।'

বৈষ্ণবরা যে-ভাবে বস্ত্র পরেন ধুতিটাকে সেইভাবে পরে মেনিদা ঘরে এলেন। গুনগুন করে কি একটা গাইছেন! আমি রাস্তার দিকেই তাকিয়ে আছি। হঠাৎ গাড়ির হেডলাইটের তীব্র একটা আলোয় রাস্তা ঝলসে উঠল। খুব মিহি বৃষ্টি এখনো পড়ছে। কালো একটা গাড়ি ঘ্যাঁস করে থেমে পড়ল বাড়ির সামনে।

আর আমি! 'এই রে পিসিমারা এসে পড়েছেন', বলে নিচু হয়ে, প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে খাটের তলায় ঢুকতে চাইছি। মেনিদা বলছেন, 'এ আবার কি? ছেলের এ কি ছিরি!'

২৮

Like a sword that cuts but cannot cut itself,
Like an eye that sees but cannot see itself.

দুধের মতো সাদা ধবধবে পাঞ্জাবি। হাঁসের পালকের মতো সাদা ধুতি। ব্যাকব্রাশ করা লম্বা লম্বা চুল। চাঁপাফুলের মতো গায়ের রঙ। কুচকুচে কালো মটোর গাড়ি। মাতুল নেমে এলেন। মাতুল জয়নারায়ণ। হাল্কা আতরের গন্ধ। নেমেই বললেন, 'অবাক হবার কিছু নেই রে ব্যাটা। ট্রেন দু'ঘণ্টা লেট। ঝড়বৃষ্টিতে তিন ঘণ্টা ডিটেন্‌ড। অ্যান্ড দি ক্লক স্ট্রাইকস টুয়েলভ। চাটুজ্যেমশাইয়ের এইটাই তো টি টাইম।'

পাঞ্জাবি চালক হাসতে হাসতে গাড়ির পেছন দিকের ডালাটা খুলছেন। তাঁর খুশির ভাব দেখে মনে হচ্ছে সারাটা পথ মামা মজার মজার কথা বলতে বলতে এসেছেন। মামার সঙ্গে একটানা এক মাস বসে থাকলেও কারোর বিরক্তি লাগবে না। কোথা দিয়ে যে সময় কেটে যাবে বোঝাই যাবে না। মজলিশী মানুষ। কত সত্য ঘটনা যে সঞ্চয়ে আছে।তেমনি রসবোধ।

গাড়ির পেছন থেকে একটা ঝুড়ি নেমে এল। তাইতে দশ-বারোটা ছোট ছোট ফুলগাছের টব। মাতুল বললেন, 'কি দেখছো! চাটুজ্যে মশাই আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে যাবেন। রাঁচীর সেরা নার্সারির সবচেয়ে সেরা গোলাপ। ফুল দিয়ে পৃথিবী সাজাবো বন্ধু। দুঃখ ম্লান হয়ে যাবে। প্রিয়জন ছেড়ে গেছে যাক। গোলাপ এসেছে ফিরে।'

ছোট একটা স্যুটকেস নেমেএলো।ভাড়া, বকসিস বুঝে নিলেন চালক। বললেন, এমন ইনসান খুব কমই দেখেছি। সদরে ঢুকে সুরেলা পঞ্চমে মামা হাঁকলেন, চাটুজ্যে মশাই?

আমি তখন বললুম, 'মামা, তিনি নেই।'

জয়নারায়ণও সেই সংবাদে থমকে গেলেন। প্রশ্ন করলেন, 'নেই মানে? ইয়ারকি করছিস আমার সঙ্গে! নেই মানে? কোথায় গেছেন?'

'জানি না। চলে গেছেন কোথায়, কারোকে কিছু না বলে।'

'বলিস কি? তা আমাকে একটা চিঠিতে জানাতে কি হয়েছিল?'

'আপনার ঠিকানা?'

'আমার ঠিকানা তোর কাছে নেই?'

'আপনি দিয়ে যাননি।'

'সে কি রে? এমনও হয়!'

গুম মেরে রইলেন কিছুক্ষণ। আপন মনেই বললেন, 'জানতুম। এইরকম একটা কিছু হবে। সংসারের ছোট্ট আঁধারে অত বড় একটা মানুষকে ধরে রাখা শক্ত।

মামা পা টিপে টিপে, অতি সন্তর্পণে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে লাগলেন।

আমি বললুম, 'ফুলের ঝাঁকাটা ?'

মামা বললেন, 'ফুল এনে ফুল বনে গেলুম। ফুলের মর্ম এ-বাড়িতে আর কে বুঝবে ? ভাগ্যিস কুকুর-বাচ্চাটা আনিনি ! বাড়ি তো শ্মশান !'

মেনিদা দাঁড়িয়ে আছেন সিঁড়ির মাথায়। সেই একই বৈষ্ণবের পোশাকে। দু'হাত বাড়িয়ে বললেন, 'এসো, জয় এসো। তুমি ঠিক সময় এসে গেছ।

মামা প্রথমে চিনতে পারেননি। পরে চিনতে পেরেই বললেন, 'আরে মাস্টারমশাই আপনি ? আপনি এখানে ?'

'অনেক কাণ্ড ঘটে গেছে বাবা। ছেলেটা যাতে ভয় না পায় তাই রাত-পাহারা দিতে এসেছি।'

'চাটুজ্যে মশাই তো নিরুদ্দেশ ? এ ছাড়া আর কি হয়েছে ?'

'পরে শুনো। আগে জামা-কাপড় ছাড়ো। খাওয়াদাওয়া করো।'

আমাকে একপাশে নিয়ে গিয়ে মেনিদা কানে কানে বললেন, 'কি খাওয়াবে ?'

'এখনো কচুরি আলুরদম আছে।'

'কচুরি-টচুরি খাবে তো ? শিল্পী মানুষ। এখুনি বলবে, গলা খারাপ হয়ে যাবে।'

'সে তো তিনটে জিনিসে হয়। চাটনি, দই আর আইসক্রিম।'

'তবু তুমি জিজ্ঞেস করো। সে-রকম হলে আমরা স্টোভ ধরিয়ে কিছু করে দোবো।'

মামা ততক্ষণে অন্য সমস্যায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। ধুতির কাছার দিকে একটু কাদা ছিটকে লেগেছে। আমাকে বললেন,

'খাওয়া দাওয়া নিয়ে অত ভাবছিস কেন ? চা আছে তো। আগে আমাকে একটা কাপড় কাচা সাবান দে।'

'এত রাতে কাপড় কাচতে বসবেন ? কাল সকালে হবেখন। তা না হলে আমাকে দিন, আমি ঠিক করে দিচ্ছি।'

'শোন, কাপড়ে কাদার দাগ, চরিত্রের কলঙ্ক প্রায় পার্মানেন্ট। সহজে তোলা যায় না ! আলাদা কায়দা। ধীরে ধীরে, ঘষে ঘষে, যেন ছড়িয়ে না যায় !'

'আমি জানি মামা। কায়দাটা আমার জানা আছে।'

'জানলেও আমি তোমাকে করতে দোবো না। আমার অস্বস্তির কারণ হবে।'

'কচুরি আর আলুরদম আছে। রাতটা চলে যাবে ?'

'খুব যাবে। তুই কি আমার জন্যে এখন রান্না করতে বসবি ? শোন, আমাকে মনে হচ্ছে সারারাত জাগতে হবে। কাল ভোরেই আমার রেডিও প্রোগ্রাম। বিলাসখানি টোড়িটা এক রাউন্ড ভেঁজে নিতে হবে তো !'

'নেবেন। অসুবিধের কি আছে ? হারমোনিয়াম বার করাই আছে !'

'তাহলে লেগে যাই কর্মযজ্ঞে !'

বহুকাল পরে সময় লজ্জা পেয়ে গেল। ভেবেছিল বেহুঁশ ঘুমে সবাই অচেতন হয়ে পড়বে। নিঃশব্দে একটি দিনের আয়ু হরণ করে চলে যাবে। তা আর হল না। সব আলো জ্বলে উঠল। অসম্ভব এক কর্মব্যস্ততা। যেন সবে দিন শেষ হয়ে সন্ধে নেমেছে। পিতা হরিশঙ্কর যখন ছিলেন তখন এইরকম সব উদ্ভট কাণ্ড প্রায়ই হত। সময়ের দাসত্ব মেনে

নিতে তিনি একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না। না সময়ের, না মানুষের, না অভ্যাসের, কোনও কিছুর তিনি দাস ছিলেন না। তিনিই ছিলেন প্রকৃত প্রভু। রাজার রাজা রাত বারোটার সময় চা-টা খেয়ে তিনি যখন বইপত্তর খুলে বসতেন, তখন মনে হত এই সবে শাঁখ বাজিয়ে সন্ধে হল। ছুটির দিন বেলা পাঁচটার সময় গঙ্গার স্নান করে উঠছেন। বৈকালিক ভ্রমণকারীরা ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করছেন, 'আর ইউ লেট অর টু আরলি ফর টোমরো'

একটা মোড়ার ওপর জয়নারায়ণ বসেছেন, কোলের ওপর তোয়ালে, তার ওপর কাপড়ের সেই অংশটা যেখানে লেগে আছে কাছার ছিটে। রুমালে সাবান মাখিয়ে সন্তর্পণে ঘষছেন আর বলছেন, এ ভেরি ডেলিকেট অপারেশান। ছড়িয়ে, ছেতরে না যায়!'

মেনিদা ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, জয় কি খাবে! এত রাতে ঘিয়ে ভাজা খেলে অম্বল হবে, কাল সকালে আর গাইতে পারবে না। এই মানুষটি সম্পর্কে এখন দেখছি, আমার কিছুই জানা হয়নি। এঁর অবশ্যই একটা গৌরবের অতীত আছে। যে-অতীতের আমি সাক্ষী নই।গৌরবের অতীতটাকে কি কায়দায় ভদ্রলোক ঘৃণার বর্তমান করে তুললেন, জানতে ইচ্ছে করে! মানুষ কি ভাবে পড়ে যায়! কে তাকে পেড়ে ফেলে? মামার মতো একজন সেরা ছাত্রের শিক্ষক ছিলেন। এখন ভোরবেলা ফুলুরি ভিক্ষে করেন! এর-তার ব্যাপারে নাক গলান। অসভ্য, অসভ্য কথা বলেন। গৌরব কোথাও একটা মস্ত বড় খোঁচা মেরেছে।

মামা তন্ময় হয়ে কাদার দাগ তুলছেন আর জয়জয়ন্তী ভাঁজছেন—এই সো না বোলো লাগরি রাধা। গলায় যেন মিছরির চাক। বাদ্য-বাজনা ছাড়াই যে কি কাণ্ড করছেন! চেহারা আগের চেয়ে অনেক ভাল হয়েছে। মুখে জ্বল জ্বল করছে একটা জ্যোতি! যে-ঝড় বইছিল জীবনের ওপর দিয়ে, সে-ঝড় কিছুটা কেটেছে। আমার তাই বিশ্বাস!

মেনিদা খুব চিন্তিত মুখে বললেন, 'জয়, এত রাতে কচুরি নাই বা খেলে!'

মামা এক মুখ হেসে বললেন 'আপনি আমার জন্যে এত ভাবছেন কেন? ঘড়ির দিকে তাকান, আর কিছু খাওয়ার প্রয়োজন হবে না। এখুনি পাখির ডাক শুনতে পাবেন। আসুন আমরা সবাই মিলে চা খাই!'

মামা আমাকে বললেন, স্যুটকেস খুলে একটা পাজামা আর গেঞ্জি বের করে আনতে। পাশের ঘরেই সেই স্যুটকেস। শৌখিন মানুষের শৌখিন স্যুটকেস। চাপ দিতেই খুট্‌স করে খুলে গেল। ডালা ওঠাতেই ভুরভুরে সুগন্ধ। সিল্কের পাঞ্জাবি, ধুতি, পাট করা রুমাল, আন্ডারওয়্যার। দাড়ি কামাবার সেট। গানের খাতা। কিট্‌সের কবিতার বই। একেবারে তলায় পাজামা আর গেঞ্জি। সবই পরিচ্ছন্ন, যেন একেবারে নতুন! হঠাৎ নজরে পড়ে গেল জিনিসটা। রুমালে জড়ানো ছিল। একটা পাশ খুলে গেছে।সেই খোলা অংশ দিয়ে উঁকি মারছে, একটা চশমার খাপ। শরীর অবশ হয়ে গেল। এই তো সেই চশমার খাপ। এরই মধ্যে থাকত পিতা হরিশঙ্করের গোল্ড ফ্রেমের চশমা। এ-দিক ও-দিক তাকিয়ে খাপটা খুললুম। বুকটা ধড়াস করে উঠল। ভেতরে সেই চশমা। নিভৃতে শুয়ে আছে। ফ্রেমের একটা ডাঁটি ভেঙে গেছে। তাহলে? মালিক কোথায়? মামা এতক্ষণ অভিনয় করছিলেন আমার সঙ্গে। সব জানেন তিনি! মহা অপরাধীর মতো খাপটাকে কাপড়-চোপড়ের অন্তরালে রেখে ফিরে গেলুম। সম্পূর্ণ অন্য এক মানুষ। সন্দেহ, অভিমান, চাপা একটা রাগ উতলে উঠছে ভেতরে। ধরতে পারছি না, ষড়যন্ত্রটা কি? কিসের জন্যে এই লুকোচুরি!

পাজামা আর গেঞ্জি পরে মামা হারমোনিয়ামের সামনে বসেছেন। হাতে চায়ের কাপ ধোঁয়া ছাড়ছে। ঘড়িতে ঠিক দুটো। মেনিদা অদূরে দেয়ালে ঠেসান দিয়ে ধ্যানস্থ। মামাকে

বেশ তৃপ্ত দেখাচ্ছে। মুখে একটা হাসির ভাব। অর্থাৎ সব জেনেও না জানার অভিনয়। মেনিদার দিকে তাকালুম, মনে হল ঢুলছেন।

খালি কাপটা একপাশে রেখে মামা বললেন, 'কি রে ! অমন গুম মেরে গেলি কেন ?'

মামার দিকে আরো কিছুটা সরে গিয়ে ফিশফিশ করে বললুম 'আপনি সব জানেন, তাই না ?'

'কি জানি বল তো ?' অকৃত্রিম অভিনয়।

'তিনি কোথায় আছেন।'

'আমি কেমন করে জানবো ? আর জানলে তোকে বলব না !'

'মামা, জীবনে একটা সত্যি কথা বলুন। আমার মনের অবস্থাটা একবার চিন্তা করুন। পরপর যা ঘটে গেল আপনাকে বলা হয়নি। আরো যা ঘটবে তার আভাস আছে। শুনলে স্তম্ভিত হয়ে যাবেন।'

মেনিদা তন্দ্রা জড়ানো গলায় বললেন, 'জানলে বলে দাও। বড় কষ্টে আছে। হাতে-পায়ে ধরে ফিরিয়ে আনুক সম্রাটকে। নয় তো ধ্বংস অনিবার্য।'

মামা আশ্চর্য হবার ভান করে বললেন, 'জানলে বলবো না ? তা কখনো হয় ! তাহলে অত কষ্ট করে বয়ে বয়ে গোলাপ আনলুম কার জন্যে !'

মামা হারমোনিয়ামে সাপাট একটা তান বাজালেন। লম্বা, ফর্সা আঙুল বিজলীর মতো খেলে গেল। অনামিকার আঙটির পাথর ঝলসে উঠল।

আমি হাতটা খপ্ করে চেপে ধরে বললুম 'একটা সত্যি কথা বলুন না, আমার এই দুর্দিনে।'

সঙ্গীতে বাধা পড়ায় আমার রাগী মামা যেন এটু বিরক্তই হলেন, 'তোর এই ধারণার কারণটা কি ?'

'আপনার সুটকেসে ওটা কার চশমার খাপ ?'

'চশমার খাপ ?' মামা অবাক হবার ভান করলেন। আমার সন্দেহ আরো ঘোরতর হল।

'হ্যাঁ, চশমার খাপ, রুমালে জড়ানো।' আমার গলা আর স্বাভাবিক নেই। মেনিদা সোজা হয়ে বসলেন উত্তেজনার গন্ধ পেয়ে। আমার কান দুটো গরম আগুন। দু'জনে ষড়যন্ত্র করেছেন, জামাইবাবু আর শ্যালকে। একটা অশুভ আঁতাত তৈরি হয়েছে, আমাকে শিক্ষা দেবার জন্যে। এই শ্যালক সম্পর্কেই একদিন আমাকে কত সাবধান করেছিলেন, বি কেয়ারফুল, মামার মতো ফুলবাবুটি হয়ো না। ওর অনেক গুণ, মানাবে। ইউনিভার্সিটি ব্লু, শিল্পী। তুমি মিডিয়কার, ট্যালেন্টলেস। ভাল-মন্দ খেয়ে পেট খারাপের সান্ত্বনা আছে। কুমড়োর ঘ্যাঁট খেয়ে কাত হলে অতিশয় দুঃখের। তোমার একমাত্র সম্বল, চরিত্র, আদর্শ, সততা।

হারমোনিয়ামটা ভ্যাঁক করে বন্ধ করে মামা বললেন, 'অ, ওটা নজরে পড়ে গেছে !'

'হ্যাঁ পড়েছে। না পড়ে উপায় ছিল না। রুমালের পাশ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। ভেতরে সেই চশমা।'

'ওটা আমার শ্বশুরমশাইয়ের চশমা।'

'কেন আমাকে ভোলাবার চেষ্টা করছেন ? বাবার চশমা আমি চিনবো না ! কানের কাছে, নাকের ব্রিজে মাদার অফ পার্লস দিয়ে মোড়া। গোল ফ্রেম।'

'তোর ধারণা পৃথিবীতে ফ্রেম যখন তৈরি হয়, এক পিসই হয় ? আমার সঙ্গে বউবাজারে চল। দেখবি একই ফ্রেম একশোটা, পাশাপাশি রয়েছে।'

আমি অসহায়ের মতো মেনিদার দিকে তাকালুম।

তিনি মামাকেই সমর্থন করলেন, 'তা অবশ্য হতে পারে। জয়ের চোখে যে-চশমাটা রয়েছে আমি আরো অনেকের চোখে এমন চশমা দেখেছি।'

মামা সমর্থন পেয়ে বললেন, 'তবে! শুনলে তো!'

আমার লড়াই থামল না, 'এটা তো প্রাচীন ফ্রেম।'

মামা বললেন, 'চাটুজ্যেমশাই আর আমার শ্বশুরমশাই দু'জনেই তো প্রাচীন। প্রায় সমবয়সী।'

আমি ঝট্ করে উঠে গিয়ে চশমার খাপটা নিয়ে এলুম। আমি তো পিতা হরিশঙ্করের শুধু সন্তানই ছিলুম না, বিশ্বস্ত কুকুরও ছিলুম। প্রভুর সমস্ত সামগ্রীর বর্ণ, গন্ধ, স্পর্শ আমার জানা। এতটা ভুল তো আমার হবার কথা নয়। খাপটা বহু ব্যবহারে ছাল ওঠা ওঠা হয়ে গেছে। মাঝখানে একটু টাক। আমি তো চিনি। কতবার আমি ওই চশমা টেবিল থেকে তুলে খাপে ভরেছি। নরম সিল্কের কাপড় দিয়ে সোনালী অংশ আর কাচ পালিশ করেছি। আমার কখনো ভুল হতে পারে! কাচের দিকে তাকিয়েই হরিশঙ্করের বড় বড় দার্শনিক চোখ আমি দেখতে পেয়েছি। যে-চোখে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাব খেলা করত। কখনো অ্যাডমিরাল। জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে অনন্ত নীল সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছেন যেন। কখনো কবি। প্রকৃতির সবুজ শোভায় বিভোর। কখনো রুদ্র ভৈরব। কখনো রসিক। কখনো ধারালো ব্যঙ্গ। আকাশের মতো রূপ পালটাতো ক্ষণে ক্ষণে।

চশমাটা হারমোনিয়ামের ওপর রেখে বললুম, 'এই চশমাটা বাবার নয়? এই খাপটা বাবার নয়? আমার চিনতে এত ভুল হবে?'

মধ্যরাতে আলোর ভোল্টেজ বাড়ে। সেই চড়া আলোয় মামার ফর্সা মুখ ফসফরাসের মতো জ্বলছে। খাঁড়ার মতো অহঙ্কারী নাক। তিনি যেন একটু বিরক্ত হয়েই বললেন, 'আচ্ছা মুশকিল তো! তুই বুঝছিস না কেন, চশমা আর খাপ একই হবে। যে-চশমার যে-খাপ। বউবাজারের একই বড় দোকান থেকে হয় তো একই সময়ে দু'জনে চশমা করিয়েছিলেন। আমি কি করতে পারি বল!'

চশমাটা ভাল করে পরীক্ষা করলুম। একটা ডাঁটি খুলে গেছে।

প্রশ্ন করলুম, 'চশমাটা এনেছেন কেন?'

'এটা একটা আন-ইনটেলিজেন্ট প্রশ্ন হল। দেখতেই পাচ্ছিস ভেঙে গেছে। মেরামত করতে হবে।'

'আপনার শ্বশুরমশাই তো দক্ষিণ কলকাতায় থাকেন। রাঁচী গেলেন কেন?'

'তুই তো দেখছি পুলিশের জেরা শুরু করলি। রাঁচীতে গেছেন বায়ু-পরিবর্তনে। মেয়ের কাছে কিছুদিন থাকবেন বলে। হয়েছে!'

হঠাৎ আমার মাথায় খেলে গেল, পিতা নিজেই একজন বড় মেকানিক। এই সামান্য মেরামতির জন্যে দোকানের শরণাপন্ন হবেন কেন? পরমুহূর্তেই মনে হল, স্ক্রুটা হারিয়ে গেছে বলেই হয় তো নিজে কেরামতি করতে পারেননি।

মামা আমার দিকে বড় বড় চোখে তাকিয়ে বললেন, 'কি, জেরায় সন্তুষ্ট তো!'

মেনিদা বললেন, 'এর পর আর কি প্রশ্ন থাকতে পারে? আর কেনই বা তুমি মিথ্যে কথা বলবে?' চশমার খাপটা স্যুটকেসে ঢোকাতে ঢোকাতে পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসের কাহিনী মনে পড়ে গেল। এ যেন অনেকটা সেই রকমেরই ঘটনা। মামা একজন মস্ত বড় অভিনেতা। তাঁর পক্ষে ছোট-বড় যে কোনও মিথ্যাকে সত্য বলে চালানো কোনও ব্যাপারই নয়। এর বহু

নজির আছে। সত্য আর মিথ্যার সীমারেখা ভেঙে চুরমার করে জীবনকে দাঁড় করিয়েছেন। চশমাটাকে একান্তে আরো ভাল করে পরীক্ষা করলুম। বড়ই চেনা। পিতা হরিশঙ্কর বলতেন আমার হল 'হক নোজ'। আর একজনের এই রকম নাক ছিল, তার নাম চেঙ্গিজ খান। সেই নাকের ওপর এই চশমাটাই কি ঝুলতো না! চশমা, তুমিই বলো। নিজের সত্য নিজেই উদ্‌ঘাটন করো।

মামা আলাপ শুরু করে দিয়েছেন। যেন সুরের মিছরি ভাঙছে গলায়। সেই বিখ্যাত গান, আঁখিয়া ভর আয়ি। দরশ তুঁহে লাগি। বিলম্বিত একতালে সুরের রাজহাঁস হেলেদুলে চলেছে। আমার চোখও জলে ভরে এলো। বড় সময়ের গান। আমিও তো তাঁর দর্শন চাইছি। দরশ তুঁহে লাগি। আঁখিয়া ভর আয়ি। Who rides so late through the night and storm? It is the father with his child. ও-ঘরে ভোর যেন ধীর পায়ে ঢুকছে রাতের অবগুণ্ঠন মোচন করে।

মামা সুরের সমুদ্রে তলিয়ে গেলেন। চোখ-মুখের চেহারা একেবারে অন্যরকম। এমন মানুষ মিথ্যে কথা বলেন কি করে! মেনিদার রাত-জাগা মুখে একটা গর্বের ভাব। দেখো দেখো, এই ছেলেটা একসময় আমার ছাত্র ছিল। আমি পতিত ও উত্থিত।

ঘরের অন্ধকার হামাগুড়ি দিয়ে কোণে কোণে পালাচ্ছে। অনেক আগেই আলো নেবানো হয়ে গিয়েছিল। জানালায় পর্দার মতো ঝিলঝিল করছে সদ্যোস্ফুট নতুন একটি দিন। গান শেষ হল। মামা স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। মেনিদা ঠিং করে খঞ্জনিতে একটা শব্দ তুলে বললেন, 'বেরিয়ে পড়ি এইবার। আমি এক দিনের ফেরিঅলা।'

মামা শুয়ে পড়লেন খাটে। সামান্য একটু নিদ্রা তো চাই! আমি জানি, এই সময় তাঁর একটু চায়ের প্রয়োজন হবে। চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন বেদী থেকে নামানো গ্রীকদেবতার মতো। অনেকটা কীটসের মতোই রূপ। ঘুমিয়ে পড়েছেন। মসলিনের মতো ফিনফিনে নিশ্বাস পড়ছে। বহুক্ষণ তাকিয়ে রইলুম সেই নিদ্রিত নিভাঁজ শান্ত মুখের দিকে। গুণের আধার। ভেতরে সুরের সমুদ্র। ওই মুখে কি আমার মায়ের মুখের আদল ভাসছে!

চায়ের কাপটা টেবিলে রেখে, পায়ে হাত ঠেকালুম। এই ভাবেই নাকি নিদ্রিত মানুষকে জাগাতে হয়। পাতলা ঘুম। সঙ্গে সঙ্গে চোখ মেলে তাকালেন। কিছুক্ষণ সময় লাগল পরিবেশটা বুঝে নিতে। চায়ের কাপ তুলে ধরলুম। মৃদু হেসে বললেন, 'তোর কি ভালোবাসা রে!'

চা শেষ করে মামা উঠে পড়লেন। আড়মোড়া ভেঙে বললেন, 'বেশ ফ্রেশ লাগছে। জাস্ট এ লিট্‌ল স্লিপ।' ঠিক ছ'টার সময় মামা বেরিয়ে গেলেন গার্স্টিন-প্লেসের রেডিও অফিসে। যাবার সময় বলে গেলেন, 'প্রোগ্রামটা শুনিস।' যতক্ষণ দেখা যায় তাকিয়ে রইলুম তাঁর চলে যাওয়ার দিকে। সেই নিদ্রিত মানুষ নয়। আত্মসচেতন, কিঞ্চিৎ অহঙ্কারী এক শিল্পী। জিজ্ঞেস করা হল না, কখন ফিরবেন! যতই অহঙ্কার করুন, এ-ও এক নিঃসঙ্গ মানুষের ছবি।

গোলাপের ছোট ছোট টব। একে একে সব ছাতে তুললুম। প্রত্যেকটায় একটা দুটো করে কুঁড়ি লেগে আছে। জীবন্ত, সতেজ গাছ। সারা রাত বাইরে থাকায় তাজা লকলকে। এ-বাড়ি আর পাশের বাড়ি গায়ে গায়ে। লাগোয়া পাঁচিলটা বেশ উঁচু। পাঁচিলের ও-পাশে হঠাৎ একটা মাথা জেগে উঠল।

'কি করছ তুমি একাএকা?'

জবা! সেই ভয়ঙ্করী। ডাকাবুকো মেয়েটা। যে ওই পাঁচিল বেয়ে এই ছাদে লাফিয়ে

পড়ে বাড়ি থেকে পালিয়েছিল। বিয়ে হয়েছে। ছেলেপুলে হয়েছে। সে যৌবন আর নেই। এখন শান্ত এক মা। আগে লাল শাড়ি আর লাল ব্লাইজ পরা জবার দিকে তাকালেই শরীর খারাপ হত! জবা কত ছেলেকেই যে গোল্লায় পাঠিয়েছিল! প্রশ্ন করলুম, 'কবে এলে?'

'কাল। সব পাট চুকিয়ে এলুম। জানো তো, ওরা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। কি মজা! এরাও বলছে তাড়িয়ে দেবে। এইবার বেশ ঝি-গিরি করে বাঁচবো। তোমাদের বাড়িতে আমাকে রাখবে? খাওয়া-পরা।' জবা হাসছে। ঝকঝকে দাঁত। বিশাল খোঁপা। জবা কান্নার শব্দে হাসছে।

২৯

Still nursing the unconquerable hope
Still clutching the inviolable shade.

মেয়েদের এই এক সমস্যা। যৌবনটাকে সহজেই নয়-ছয় করে ফেলে। জবার সেই পাগলামি, আবেগের বাঁধ ভাঙা নদী। সুখেনকে নিয়ে তো বেশ সুখেই ছিল। কি হল, কে জানে! কত রকমের বিভ্রাট যে নেমে আসে জীবনে! ভগবান করুন, আবার যেন সংসার ফিরে পায়! জবাকে বেশ দেখতে হয়েছে! আমার এই সব ভাবা উচিত নয়। শুধু ভয় করে, কোন জীবন যে কোথায় চলে যাবে! কি পরিণতি পাবে! একজন বলেছিলেন, জীবন একটা পিয়ানো। সেই পিয়ানোর রিডগুলো সব কাঁটা দিয়ে মোড়া। বাজাবে। সুর ঝরে পড়বে। কিন্তু আঙুলগুলো সব ক্ষত-বিক্ষত হবে।

আমার পিতার একটা সুন্দর নোটবই আমি খুঁজে পেয়েছি। অপূর্ব হস্তাক্ষরে উপাদেয় সব দার্শনিক তত্ত্ব লেখা আছে। উপন্যাসের চেয়েও সুখপাঠ্য। জগৎ জীবন ভুল হয়ে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই তুলে নিয়ে যায় অন্য লোকে।

হরিশঙ্কর লিখছেন, একদিন স্বপ্ন দেখছি, আমি একটা সুন্দর রঙিন প্রজাপতি হয়ে গেছি। ফুরফুর করে উড়ছি। ফুল থেকে ফুলে। কখনো ভেসে যাচ্ছি এক টুকরো কাগজের মতো। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। ছিঁড়ে গেল স্বপ্ন। ভাবতে বসলুম, কোনটা ঠিক। আমি স্বপ্ন দেখছিলুম, আমি একটা প্রজাপতি। না কি, আমি একটা প্রজাপতি, স্বপ্ন দেখছিলুম আমি হরিশঙ্কর। বড় কঠিন ধাঁধা। আমার অঙ্কের জ্ঞান হার মেনে যাবে। কোনটা ঠিক! প্রজাপতির স্বপ্নে হরিশঙ্কর, না হরিশঙ্করের স্বপ্নে প্রজাপতি!

এরপরেই লিখছেন, একদিন গঙ্গা পার হচ্ছি নৌকায়। যাবো বেলুড়ে। আমাদের বিখ্যাত পতিতপাবন মাঝি নৌকা বাইছে। হাল-ধরায় তার অসাধারণ দক্ষতা প্রবাদের মতো। বর্ষার অশান্ত নদী। বড় বড় ঢেউ। নৌকা হেলছে-দুলছে, সামনে-পেছনে দোল খাচ্ছে। পতিতপাবনের ভ্রূক্ষেপ নেই। আমি বসেছিলুম তার পায়ের কাছে। কি মনে হলবললুম, 'নৌকা চালানো কি শেখা যায়?' পতিত বললে, 'কেন যাবে না। খুব যায়। তবে কি জানেন, যারা ভাসতে জানে, ভাসাতে জানে, তারা ডোবাতেও জানে। এই যে আমার নৌকায় এত যাত্রী, আমার হাতে ডুবেও যেতে পারে। ইচ্ছে করে ডোবাবো না। ভুল করে। জল আর ডাঙ্গার তফাত তো আমি বুঝি না বাবু। জলে ভেসে ভেসে জলের ভয় আমার কেটে গেছে। আর সেইটাই হল সবচেয়ে ভয়ের। তার চেয়ে আমি কি বলি বাবু, নিজে

ভাসতে শিখুন, নিজে সাঁতার কাটতে শিখুন, ডুব সাঁতার শিখুন, ডাঙ্গা যে ডাঙ্গা আর জল যে জল সব সময় সেইটা মনে রাখুন।' যাকে আমরা সাধারণ সামান্য মানুষ জ্ঞান করি, সেও কত জ্ঞানী ! কেমন সহজে আমাকে বুঝিয়ে দিলে, অন্যের সাহায্য নিয়ে ভেসে থাকায় ভয় আছে। পাকা মাঝির নৌকার তলা ফেঁসে যেতে পারে। সংসার নদীতে ভেসে থাকো নিজের আয়ত্ত করা কৌশলে।'

এরপর পিতা হরিশঙ্কর লিখছেন, একটি সুন্দর কাহিনী পড়লুম—এক দারুশিল্পী সুন্দর একটা কাঠের স্ট্যান্ড তৈরি করে উপহার দিলেন রাজাকে। রাজা সেই স্ট্যান্ডে বাদ্য-যন্ত্র রাখবেন। সকলেরই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, এমন স্বর্গীয় শিল্পকর্ম সহসা দেখা যায় না। রাজা তখন শিল্পীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এমন সুন্দর কাজ আপনি করেন কি করে ! কি আছে আপনার হাতে ? রহস্যটা কি ?'

শিল্পী বললেন, 'কোনও রহস্যই নেই মহারাজ। তবে হ্যাঁ কিছু একটা আছে। সেটা কি, তাহলে বলি শুনুন। এই ধরনের কাজ ধরার আগে প্রথমেই নিজেকে সুরক্ষিত করি, প্রাণশক্তি যেন কমে না যায়। তারপরে মনটাকে স্থির করতে করতে একেবারে শান্ত করে ফেলি। তিন দিন নিজেকে এই অবস্থায় ফেলে রাখি। প্রাপ্তি, পুরস্কারের সব চিন্তা চলে যায় মাথা থেকে। পাঁচ দিনের দিন ভুলে যাই যশ-খ্যাতির চিন্তা। সাত দিনের দিন আমার দুটো হাত, দুটো পা ও শরীর-বোধ চলে যায়। অবশেষে কার কাজ করছি, কোন রাজার, কোন মহারাজার, সে-চিন্তাও আর মাথায় থাকে না। তখনই আমার দক্ষতা দানা বাঁধে। তখন আর আমি মানুষ থাকি না, পরিপূর্ণ একজন শিল্পী। বাইরের কোনও গোলমাল তখন আর আমাকে কাবু করতে পারে না। তারপর আমি এক পর্বত অরণ্যে প্রবেশ করে, উপযুক্ত একটা গাছের অনুসন্ধান করি। যে আকার দিতে চাই গাছটায় যেন মোটামুটি সেই আকার থাকে, পরে সেইটাকেই আমি ফুটিয়ে তুলবো। এরপর আমি দেখতে পাই। আমি যা করতে চাই সেইটা ভেসে ওঠে চোখের সামনে। আমি তখন সেই রূপকর্মকে অনুসরণ করি। প্রকৃতির গঠন ভঙ্গিমা আর আমার তন্ময়তা দুইয়ে মিলে তৈরি হয় শিল্প, যাকে আপনারা বলছেন অলৌকিক।' এরপর হরিশঙ্কর লিখছেন, এই আমার জীবনের তত্ত্ব। অসীম তন্ময়তা।

মেঝেতে বসে, দেয়ালে পিঠ রেখে খাতাটা পড়ছিলুম। অজস্র লেখা। হঠাৎ অদ্ভুত একটা জিনিসের দিকে চোখ চলে গেল। একটা পালক। পায়রার পালক। মুখের দিকে পাখার মতো অল্প একটু লেগে আছে। বাকিটা ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। এইরকম কায়দার পালক দিয়ে হরিশঙ্কর কান চুলকোতেন। আর এই পালক থাকতো চশমার খাপে। তার মানে ? মানে খুব সহজ—কাল রাতে চশমার খাপটা খোলার সময় পালকটা পড়ে গেছে। আমি নিঃসন্দেহ, ওই চশমা পিতা হরিশঙ্করের। মামা সত্য গোপন করছেন।

ভীষণ একটা শক্তি, ভয়ঙ্কর এক উৎসাহ, ভীষণ এক উদ্দীপনা নড়ে চড়ে উঠল ভেতরে। আমি পেয়ে গেছি। আমার বৃক্ষের সন্ধান আমি পেয়ে গেছি। তিনি রাঁচীতেই আছেন। আমি যাবো। মামা মনে হয় কালই যাবেন। খাতা রেখে উঠে পড়লুম। উত্তেজনায় গোটা বাড়িটা একবার ঘুরে এলুম। তাঁকে নিয়ে আসবো। আবার জমে উঠবে এই গৃহ-সংসার। মাঝরাতে এস্রাজের ছড়ে টান পড়বে। কেঁদে উঠবে রাগিণী। বাগ্রেশী, কেদারা কি জয়জয়ন্তীতে। ছাদ ভরে যাবে ফুলে। অন্ধকার ঘরে বোতলের পর বোতল ফিল্টার হবে কালি। পিতা হরিশঙ্কর শেকসপীয়ার আওড়াতে আওড়াতে কাজ করবেন। আমার বর্ণোজ্জ্বল অতীত ফিরে আসবে। মনে হচ্ছে লটারি পেয়ে গেছি। কয়েক লাখ

টাকার ফার্স্ট প্রাইজ।

আনন্দে হঠাৎ ছায়া নামল। কত রকমের উৎপাত যে আছে! জবা আর জবার মা একসঙ্গে এসে হাজির। জবার মায়ের স্বাস্থ্য ইদানীং বেশ ফিরেছে। স্বামীর কারবার বেশ ফুলে ফেঁপে উঠেছে। জবার আকর্ষণও কিছু মাত্র কমেনি।

জবার মা বললেন, 'তোমার বাবা পালিয়ে গেছেন, খবর পেয়েছি। আসি আসি করে আর আসা হয়নি।' পালিয়ে গেছেন, শব্দটা শুনে সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল। জবা আর জবার মা দু'জনেই বাবার খাটের ধারে পা ঝুলিয়ে বসেছেন। শয্যায় নারীর স্পর্শ। চক্ষুলজ্জায় বলতে পারছি না কিছু। জবার আবার পা দোলানোর অভ্যাস। কাকাবাবু থাকলে বলতেন, শনি নীচস্থ। জবার চিরদিনই লজ্জা-শরম কম। আরো যেন একটু কমেছে। ইচ্ছে করছে, উঠে গিয়ে শাড়ির আঁচলটা গোছগাছ করে দিয়ে আসি।

জবার মা বললেন, 'খবর পেলে কিছু? বেঁচে আছেন তো! না গোবিন্দর বাবার মতো আত্মহত্যা করলেন!' এইবার আমার ফেটে পড়তে ইচ্ছে করছে। জবার জন্যে পারছি না। মনের খুব গভীর গোপনে একটা ইচ্ছের নড়াচড়া টের পাচ্ছি। শয়তান এখনো মরেনি। ঘাপটি মেরে বসে আছে। জবা অসহায়। জবার বন্ধুর প্রয়োজন। শয়তান আবার ইংরেজিতে বার্তা প্রেরণ করে, জবা ইজ নাও অ্যাভেলেব্‌ল। জবা ভয়ঙ্করী। জবার কোনও সংস্কার নেই। কোনও নৈতিক বাঁধন নেই। বিদেশী মনের মেয়ে।

ধুর ঘোড়ার ডিম জবা! কম শক্তির অবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ-তরঙ্গে শরীর যেন ঝিমঝিম করছে।

জবা বললে, 'কাকাবাবু আত্মহত্যা করার মানুষ নন। পিন্টুদাকে দেখে কিছুই বুঝতে পারবে না মা। কাকাবাবুর কিছুই পায়নি। মেয়েছেলেরও অধম। কোনও সাহস নেই। সুখেনের যত প্রেমপত্র ওই লিখে দিত। তবু নিজের একটা লেখার সাহস হয়নি। বাবা বকবে! বাবার আঁচল-ধরা। সেই বাবাই এখন ছেলেকে ফেলে পালিয়েছে। কচি খোকা! এইবার কেঁদে মরো, কোথায় পিতা, কোথায় পিতা, জ্বলছে বুকে স্মৃতির চিতা।'

'তুই থাম।' জবার মা মেয়েকে ধমক দিলেন।

জবা খিলখিল করে হেসে পেছন দিকে উল্টে পড়ল। দুটো পা টেনে তুলে নিল খাটে। এই সেই জবা। নিটোল পায়ের গোছে, গোড়ালির ওপর দুটো পাঁয়জোর। উল্টোদিকে আমি বসে আছি। দুটো পা তুলে ওইভাবে শুয়ে থাকলে কি কি প্রকাশিত হতে পারে, সেই বোধটাই জবার নেই। জবার মায়েরও নেই। চিৎ হয়ে শুয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ জবা উপুড় হয়ে গেল। দুটো পা হাঁটুর কাছ থেকে ভাঁজ হয়ে ওপরে উঠে আছে। এপাশে ওপাশে দুলছে। মলের সঙ্গে যুক্ত ছোট ছোট ঝুমকোয় চুনুর চুনুর শব্দ। হাতের ভরে চিবুক। ঘাড়ের কাছে আধ ভাঙা বাসী খোঁপা। একটা কাঁটা একটু আলগা হয়ে আছে। জবা তাকিয়ে আছে জানলার বাইরে।

অসুস্থ অভুক্ত মানুষ দেখেছি। গাল ভাঙা। কোটরগত চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ঢেলা ঢেলা। ঠোঁট দুটো সামান্য ফাঁক। শ্বাসকষ্ট। সেইরকম এক মানুষের অস্তিত্ব অনুভব করলুম ভেতরে। ভীষণ খারাপ লাগছে। ভীষণ ভালও লাগছে। চোখ বলছে বাহবা। দৃশ্যটা স্থায়ী হোক। মন বলছে ছিছি। দেখো না। হতে পারে কবিতা; কিন্তু নিষিদ্ধ কবিতা। জবা মনে হয় পরিবেশ পরিস্থিতি সবই ভুলে গেছে। জবার মা যথারীতি বেহুঁশ। জবার আগুনে কত নির্বোধ যে বেপরোয়া পতঙ্গের মতো পুড়ে মরেছে! আমাকে আরো বিপদে ফেলেছেন জবার মা। মেয়ের একেবারে পাশটিতে তার কোমরের তলায় হাত

ফেলে বসে আছেন। তাঁর দিকে তাকাতে গেলেই জবার শারীরিক বিপর্যয়ের দিকে চোখ চলে যাচ্ছে। বেড়ে যাচ্ছে আমার অস্বস্তি।

জবার মা হঠাৎ বললেন, 'তোমার জন্যেই আমার মেয়েটার এই সর্বনাশ হল।'

জবা ঘুরে চিৎ হয়ে বলল, 'ওর জন্যে কেন হবে মা! হয়েছে আমার বরাতে। সংসার যে আমার ভাল লাগে না!'

'তা কেন লাগবে!' জবার মা গলা বিকৃত করলেন, 'ফুলে ফুলে মধু খেতে ভাল লাগে! যত দিন না বুড়ি হচ্ছে, ততদিন আমাকে জ্বালাবে। শোয়ার ছিরি দেখো। ঠিক করে শো। সামনে একটা পুরুষ মানুষ বসে আছে, সে হুঁশ নেই। উঠে বোসো না। যেখানেই যাচ্ছে সেখানেই ঢ্যাস ঢ্যাস লটকে পড়ছে। তোর কিছু হয়েছে না কি?' মেয়ের দিকে সন্দেহের চোখে তাকালেন মা। পরিবেশটা হঠাৎ কেমন দূষিত হয়ে গেল! পিতার খাতা পড়ে ও তাঁকে পাবার সম্ভাবনায় মনে যে স্বর্গীয় ভাবের উদয় হয়েছিল তা ঘুচে গেল! ফুলের বাগান থেকে মাছের বাজারে।

জবার মা বললেন, 'তোমারও কিছুটা দায়িত্ব আছে। তুমি দু'জনকেই সাহায্য করেছিলে। তোমাদের বাড়িতেই দু'জনের দেখা হত। চিঠি চালাচালি হত।'

হঠাৎ মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, 'আপনি তখন কি করতেন!'

জবা কুঁক কুঁক করে হাসতে হাসতে বললে, 'মা তখন রাজ কাপুরের সঙ্গে প্রেম করত। সিনেমার নেশা।'

আমি আর এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বললুম, 'নিজের মেয়েকে নিজে সামলাতে পারেননি!'

জবার মা সুর পাল্টে বললেন, 'আমি এখন কি করব বাবা! মেয়ে কোলে মেয়ে তো শ্বশুর বাড়ির পাট চুকিয়ে চলে এলো। এখন কি হবে!'

'কি আবার হবে? দু'দিন পরেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ও অমন ঝগড়াঝাঁটি হয়, আবার মিটে যায়। সুখেন খুব সাদাসিধে, ভালো ছেলে।'

জবা বললে, 'সে ছেলে আর নেই। তার এখন অনেক গুণ। মদ খেতে শিখেছে। খারাপ জায়গায় যেতে শিখেছে। রোজ রাতে বউকে না পিটিয়ে বিছানা নেয় না। খারাপ অসুখও বাধিয়েছে।'

সুখেনের এত গুণ হয়েছে। দুটো পয়সার মুখ দেখেছে বুঝি! আমি বললুম 'তাহলে তো হয়েই গেল। এরপর তো আর কিছু করার নেই। জবা যে-অসুখের ইঙ্গিত করছে, সেই অসুখে মানুষের পরিবার জীবন নষ্ট হয়।

জবার মা তবু ছাড়লেন না। বললেন, 'ব্যাটাছেলেদের অমন বেচাল একটু-আধটু হতেই পারে। সব অসুখই চিকিৎসায় সারে। সুখেন তোমার বন্ধু, তুমি একটু খোঁজ নাও বাবা। বড় ছেলেটার তাহলে বিয়ে আটকে যাবে।'

জবা উঠে পড়ল। সেই রাগী রাগী, বেপরোয়া ভাব, 'তোমার ছেলের বিয়ে ঠিকই হবে মা, জবার জন্যে আটকাবে না। জবার ব্যবস্থা জবা নিজেই করে নেবে। জবার জন্য তোমাকে জনে জনে গিয়ে নাকে কাঁদতে হবে না।'

জবার মা যেন ঘুরে ছোবল মারলেন, 'ওই স্বভাবের জন্যে তুমি মরেছো। এখন গতর আছে, অনেককে খেলাচ্ছ, এরপর দোরে দোরে ভিক্ষে।'

'জেনে রাখো, তোমার দোরে ভিক্ষে করতে আসবো না। তোমার জামাইয়ের দশ হাজার টাকা শোধ করেছিলে?'

'সেটা সুখেনের সঙ্গে আমার ব্যাপার।'

'তার জন্যে আমাকে রোজ ধোলাই খেতে হয়েছে কেন?'

'টাকাটা আমি ফুর্তি করবো বলে নিইনি। তোর বাপের ব্যবসায় ঢুকেছে। যখন দেবে তখন ঠিকই দিয়ে দেওয়া হবে।'

'সেই যখনটা কখন মা। কত দিন হল!'

ইচ্ছে করলে এরা সারাদিন চালাতে পারবে। এদের সঙ্গ আর এক মুহূর্তও ভাল লাগছে না। বেশ একটু ভারী গলায় বললুম, 'মাসীমা, আমাকে বেরোতে হবে।'

'তা বেরোবে। ব্যাটাছেলের কি ঘরে বসে থাকা সাজে! তুমি বাবা সুখেনের সঙ্গে যে-ভাবেই হোক একটু যোগাযোগ কোরো; তা না হলে এই মেয়ের জন্যে আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে। ওই তোমার জাড়তুতো দিদির মতো। তুমি দেখেছিলে, আমি এসেছিলুম।'

'লক্ষ করিনি।'

'ও মা, সে কি? আমি বললুম, পিন্টু বিপদে বুদ্ধি হারিয়ো না। শুনতে পাওনি?'

'না, তখন আমি কুইনিন খেয়েছিলুম।'

'তোমার ম্যালেরিয়া হয়েছে বুঝি! সাবধানে থেকো। ইহসংসারে তো কেউই নেই তোমার। আমরা আর কতটুকুই বা করতে পারবো। নিজেদের জ্বালায় জ্বলছি সব।'

জবার মা দরজার দিকে এগোতে এগোতে বললেন, 'চল জবা চল। সৃষ্টি কাজ পড়ে আছে।'

জবা বললে, 'তুমি যাও না। কত দিন পরে এলুম। আমি একটু পরে আসছি। পিন্টুদার সঙ্গে আমার প্রাইভেট কথা আছে।'

'ওকে আর বিরক্তি করিসনি। দেরি হয়ে যাচ্ছে। ও বেরোবে।'

জবা বললে, 'তুমি যাও তো, আমাদের ব্যাপারে নাক গলিও না।'

'নাক না গলিয়ে গলিয়েই তো আজ তোমার এই অবস্থা হয়েছে।'

জবার মা চলে গেলেন। জবা আমার খুব কাছে সরে এসে বললে, 'কেমন আছো? তোমাকে তো আগের চেয়ে বেশ ভালই দেখতে হয়েছে, প্রেমিক প্রেমিক। মনে হচ্ছে বেশ ভালোই আছো?'

জবা আমার এত কাছে যে অস্বস্তি হচ্ছে। জবার স্বভাব বরাবরই একটু আলগা ধরনের। ভীষণ সরল। বুঝতেই পারে না, কি করছে, তার ফলে কি হচ্ছে! টেবিলের কোণে পেছন ঠেকিয়ে জবা আয়েস করে দাঁড়িয়েছে। একটা পা তুলে দিয়েছে আমার চেয়ারের তলার কাঠে। হাঁটুটা ঠেকে আছে আমার উরুতে। ভীষণ একটা বিরক্তির ভাব আসছিল, সেটা কেটে গেল হঠাৎ। বেশ ভাল ভাবেই বললুম, 'জবা, তুমি আমাকে এই কথা বলার জন্যে আটকালে?'

জবা মাথার পেছন দিকে হাত ঘুরিয়ে খোঁপাটা খুলে, বিনুনিটা বুকের সামনে টেনে এনে খুলতে শুরু করল। আমার দিকে তাকিয়ে আছে; কিন্তু আমাকে দেখছে না। হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'তুমি আমার একটা উপকার করবে? কেলে মানিককে বলবে, আইনত আমাকে যাতে ছেড়ে দেয়।'

'তার মানে তুমি বিবাহ বিচ্ছেদ চাইছ?'

'হ্যাঁ। আমি একজনকে ভালবেসে ফেলেছি। ছেলেটা ভীষণ ভাল। ভীষণ দুঃখী। তার কেউ নেই। সে-ও আমাকে ভীষণ ভালবাসে। সুখেন যদি আমাকে ছেড়ে দেয় আমি তাকে

বিয়ে করব।'

'সুখেনকেও তো তুমি ভালবেসেই বিয়ে করেছিলে!'

'আমি তো বাসিনি, সুখেনই আমার পেছনে লেগেছিল ফেউয়ের মতো। তখন মনে হল, যাক যা হয় হবে, বিয়েটা করেই ফেলি। তুমি তো আমাকে জানো দুমদাম কিছু করে ফেলতে আমার ভীষণ ভাল লাগে।'

'বয়েস তো হচ্ছে। এইবার একটু নিজেকে বোঝাও না!'

'বুঝিয়েছি তো! সুখেনের সঙ্গে আমি পারব না। ও নিজে একটা শরীর, বোঝেও শরীর। আর এই ছেলেটা হল শুধুই মন। একদিন সারারাত আমার পাশে শুয়েছিল, আমাকে ছোঁয়নি।'

'তার মানে মানুষ নয়!'

'ঠিক বলেছো দেবতা।'

আর পারলুম না। উঠে পড়লুম, 'ঠিক আছে, পরে তোমার সঙ্গে কথা বলব।' তারপর সামান্য একটু কৌতূহল হল, জিজ্ঞেস করলুম, 'ছেলেটা কে? তোমাদের ওখানেই থাকে?'

জবা একটু হাসল। হেসে বললে, 'না না, খুব কাছেই থাকে।'

'কোথায়? এইখানে?'

'হ্যাঁ, একেবারে সামনেই, এক হাত দূরে। সেই ছেলেটা হলে তুমি।' জবা আমার দু'কাঁধে বন্ধুর মতো হাত রাখল। মুখে হাসি, কিন্তু চোখে জল, 'প্রথম থেকে তোমাকেই আমি ভালবাসতুম।'

স্বাস্থ্যবান, জীবন্ত একটা মেয়ে ভালবাসার কথা বলছে সরাসরি। কেমন যেন অভিভূত হয়ে গেলুম। একটা মন জয় করা, বিশাল এক রাজ্য জয় করারও অধিক। জবার মতো দেহবাদী, পিচ্ছিল এক মেয়ে বলছে, আমি তোমাকেই ভালবাসতুম। আদর্শ, চরিত্র, ঈশ্বর, প্রখর নদীর স্রোতে এক টুকরো কুটোর মতো ভেসে গেল। জবার কপালে সোনালি টিপ। চিবুকে ছোট্ট একটা তিল। বুকের ওপর দুলছে বিনুনি।

জবা বললে, 'পারবে না, আমার জন্যে সব কিছু ছাড়তে! নদীর ধারে ছোট্ট একটা বাড়িতে আমরা থাকবো। একেবারে নতুন একটা জায়গায়, সেখানে কেউ আমাদের চিনবে না। ছোট্ট একটা ফুলের বাগান। একটু কিছু রোজগার। অনেক রাত পর্যন্ত আমরা জেগে থাকবো। মেলায় গিয়ে নাগরদোলা চাপবো। মাটির হাঁড়িতে, কাঠের জ্বালে ভাত রাঁধবো। তুমি নদী থেকে স্নান করে আসবে সাধুর মতো। কম্বলের আসনে পুজোয় বসবে। সামনে এক থালা সাদা ফুল, তার ওপর সাদা একটা জবা, পাশেই একটা লাল পঞ্চমুখী, গোটা কতক টকটকে গেরুয়া কলকে ফুল। চওড়া লাল পাড় শাড়ি পরবো আমি। হাট থেকে তোমার জন্যে কাঁচা শালপাতায় মুড়ে সাদা মাখম নিয়ে আসবো, কোলে করে আনবো লাল তরমুজ। গাছের ডালে ঝোলাবো একটা দোলনা। লটলটে কান এক জোড়া ছাগল ছানা খেলে বেড়াবে। আমাদের জানলা দিয়ে পুবের আকাশে নীল একটা পাহাড় দেখা যাবে। আমাদের বাড়ির ঢোকার মুখে দুটো বেতগাছের ঝোপ থাকবে। আমরা আমাদের নাম পাল্টে নোবো। নতুন শাড়ির পাট খোলার মতো নতুন জীবনের ভাঁজ খুলবো।' জবার মাথা নেমে এল আমার বুকে। কান্নায় ফুলছে। ধরা ধরা গলায় বললে, 'হয় না এসব? হওয়ানো যায় না? এ কি একেবারেই অসম্ভব!'

৩০

what a great happiness not to be me!

জবা গলা-বড় একটা ব্লাউজ পরেছে। গলা আর বুকের ওপরের অনেকটা উন্মুক্ত। সুঠাম, ঢলঢলে শরীর। বুকের ওপর দুলছে সোনার লকেট। জবা সাধারণ মেয়ের চেয়ে বেশ লম্বা। সুখেনটা একটা রিয়েল গাধা। এমন একটা বউ পেয়েও সুখী হতে পারল না ইডিয়েট। মানুষের জীবনে সুন্দর একটা মেয়ে যে কি ফুল ফোটাতে পারে অনেক মোটা মাথাই তা বোঝে না।

জবা আঁচলে চোখ মুছে বলল, 'আমি যাই। পরে আবার আসব। পিন্টুদা তুমি কখনো প্রেম করে বিয়ে কোরো না। প্রেম বলে কিছু নেই। সংসারে ঢুকলেই প্রেম জ্বলে যায়। দেহটাই সব। মনটা কিছু নয়। ওই নরকের কীট আমাকে কি ভাবে যে ভোগ করেছে, তুমি কল্পনা করতে পারবে না। ওটা মানুষ নয় ষাঁড়।'

জবা নিচে নামছে। অসহায় একটা মেয়ে। ঈশ্বর আমাকে যদি সেই সাহস দিতেন, আমি জবাকে নিয়ে কোথাও একটা গুছিয়ে বসতুম। মেয়েটা ভীষণ সরল আর ইমোশানাল বলেই ঠকে গেছে। এইবার নোংরা আর লোভী সমাজ ওকে গ্রাস করবে। দশ বছর পরে জবার কি হবে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। বারে বারে ঠকার জন্যেই ও পৃথিবীতে এসেছে। সিঁড়ির বাঁকে গিয়ে জবা আমার দিকে তাকাল। চোখ দুটো বর্ষার আকাশের মতো। মুখে অদ্ভুত একটা হাসি। জবা বললে, 'আমার জন্যে ভেবো না। কিছু আশা, আশাই থেকে যায়।'

জবা নেমে গেল। খুব ইচ্ছে করছে জবাকে ডেকে ফেরাই। মানুষ যে-ভাবে জলে কি আগুনে ঝাঁপায়, সেই ভাবে ঝাঁপ মারি। সবাই তো হিসেব-নিকেশ করে ভাল হতে চায়, আমি না হয় খারাপই হয়ে গেলুম। লোকে বাহবা, বাহবা না করে, না হয় ছিছি-ই করল। মন্দিরের প্রদীপ না হয়ে, একটি মেয়ের অন্ধকার মনেরই না হয় প্রদীপ হলাম। চতুর্দিকে রাষ্ট্র হয়ে যাক হরিশঙ্করের ছেলে নষ্ট হয়ে গেছে। আমি তো তাদের কাছে হাত পাততে যাবো না। আমার শিক্ষা, জ্ঞান, উপার্জন সবই ঠিক থাকবে। হরিশঙ্করই যখন নেই, তখন আর আমার ভয় কিসের! আজই এই মুহূর্তে আমাদের একটা গোপন সিদ্ধান্ত হয়ে যেতে পারে। পৃথিবী যেমন চলছে সেই রকমই চলবে। কারোর কোনও ক্ষতি হবে না। শুধু একটা ছেলে আর একটা মেয়ে সুখের একটা কোণ খুঁজে পাবে। দেরাদুনে আমার চাকরিতে ফিরে গেলে জবাকে ওই পরিবেশে ভয়ঙ্কর মানাবে। জবা মুকু নয়। অনবরত শাসনে

আমাকে আড়ষ্ট করে দেবে না। জীবনের ভাল দিক, খারাপ দিক দুটোই জানে। একটা মানুষ সব সময় ভালো থাকতে পারে না। কখনো ভোগী, কখনো যোগী। মন্দিরে যেতে পারে আবার সেই সব জায়গায় ফুর্তি করতেও যেতে পারে। মনের অবস্থা যখন যেমন। একটু আগে জবা শুয়েছিল। শরীর ছেড়ে দিয়ে, অলস ভঙ্গিতে, নায়িকার মতো। তার দেহ থেকে নানা তরঙ্গ ছড়াচ্ছিল। আমার মন দুলছিল, হেলছিল। কাবু হচ্ছিল। মজে আসছিল। নেশা ধরছিল। এখন এই বাড়ি নির্জন। কাক ডাকছে। গরম নিশ্বাসের মতো ফিকে বাতাসে খাতার পাতা অল্প অল্প কাঁপছে। রসের মতো অল্প ঘাম। টনটনে শরীর। জবাকে ডাকতে পারি। মনের সব সংস্কার ফেলে দিতে পারি। বর্তমানই সব। আমার অতীত নেই, ভবিষ্যতও নেই। বর্তমান চলে গেলে যা আসবে, যেভাবে আসবে সেইটাই আমার ভবিষ্যৎ। তারপর ? গান থেমে যাবার পর সুরের রেশ। সুন্দর একটা ঘুম ভাঙার আবেশ। একটা আশীর্বাদ। চওড়া মসৃণ একটা পিঠে দিশাহারা ছোট্ট একটি পিঁপড়ে। নিরালায়, নিঃশব্দে খসে পড়া একটি ফুল। গাছের পাতায় বহুক্ষণ থেমে যাওয়া বৃষ্টির নোলকের মতো এক ফোঁটা জল। কি ? এবার ওঠো। বাড়ি যাবে না ? আমার ঘুম পেয়েছে। দুটো হাত এগিয়ে আসছে। আমি আবার তলিয়ে যাবো পাহাড়-নদী-উপত্যকায়, একটা দিনের মতো, একটা রাতের মতো। ভাবতে ভাবতেই জবা চলে গেল। এ-জীবনটা আমি শুধু ভেবেই যাই। আর সময় আমার ওপর দিয়ে চলে যাক সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো।

হঠাৎ মনে হল, পিতা হরিশঙ্করের জন্যে উতলা হয়ে কি হবে ! বেশ তো লায়েক হয়েছি। সুযোগ যখন পেয়েছি তখন বেশ মাংস কষার মতো, পেঁয়াজ, রসুন, মশলা দিয়ে জীবনটাকে কষি। একটু ভোগ করি বিলিতি কায়দায়। মুকু গেছে ভাল হয়েছে। সে ছিল আমার বিবেকের চোখ। প্রতি মুহূর্তে সে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিত, সাবধান ! মনে রেখো, তুমি কার ছেলে ! কোনও বেচাল চলবে না। সরে বোসো। আলাদা শোও। ধর্মের পানে, কর্মের সুপুরি দিয়ে খিলি তৈরি করো। ভক্তির জর্দা মেশাও। মুকুর মতো স্ত্রী স্বামীকে ধোলাইও দিতে পারে। ঈশ্বর যখন পাঁচিলের ওপাশে জবাকে এনে ফেলেছেন, তখন আর সুযোগের অবহেলা করা কেন ! জবা তো এক সময় আমাকে উন্মাদই করেছিল। নেমে পড়ি আসরে। এখনই অথবা কখনোই নয়। ভয়ঙ্কর একটা রোমাঞ্চ আছে এই অবৈধ ব্যাপারটার ভেতর।

এই পাপ চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে দাড়ি কামাচ্ছিলুম। প্রস্তুত হয়ে থাকি। মামা যদি আজই রাঁচীর ট্রেন ধরেন, আমি পিছু ছাড়ছি না। না, আজ কি করে যাবেন ! গভীর রাতেও তো প্রোগ্রাম আছে ! রাত সাড়ে দশটার সময় বেতারের ঘোষক বলবেন, এখন জয়জয়ন্তী রাগে খেয়াল শোনাবেন। ঠোঁটের ওপর ব্লেডটা একবার হোঁচট খেল। চিন্ করে উঠল জায়গাটা। সঙ্গে সঙ্গে সাবান ফুঁড়ে ফুটে উঠল এক বিন্দু রক্ত। নিচের ঠোঁটে গড়িয়ে এল রক্তের ধারা। এ আবার কি হল ! কি ছিল ওখানে ?

ঠোঁটটা ধুয়ে ফেললুম। সঙ্গে সঙ্গে আবার রক্ত। বোধহয় একটা ব্রণ হয়েছিল। আমার খেয়াল ছিল না। কি করি এখন ? রক্ত তো বন্ধ হচ্ছে না। অসম্ভব জ্বালা। মনে হল চুনই ওষুধ। চুন টিপে দিলে রক্ত বন্ধ হতে পারে।

সামনের পান-বিড়ির দোকানে চুন চাইতে গেছি, মালিক কেষ্টদা ভয় ধরিয়ে দিলেন, 'করলে কি ? ওষ্ঠ ব্রণ ভয়ঙ্কর জিনিস। ব্লেড মেরে দিলে !'

দোকানের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুন চেপে ধরলুম। রক্ত বন্ধ হল। কিন্তু স্বস্তি পেলুম না। দেখতে দেখতে ওপরের ঠোঁটটা ফুলে উঠল। আড়ষ্ট ব্যথা। স্নান করার সময় গায়ে

জল ঢালা মাত্রই শীত করে উঠল। জল একেবারেই ভাল লাগছে না। চোখ জ্বালা করছে। মাথা ঝিম মেরে আসছে। কোনও রকমে স্নান শেষ করে আয়নার সামনে দাঁড়ালুম। ঠোঁটটা আরো ফুলে বনমানুষ কি ওরাং ওটাং-এর মতো হয়ে গেছে। চেহারা দেখে নিজেরই ভয় করছে। কপালে হাত রেখে মনে হল, বেশ জ্বর এসে গেছে। তাই এত শীত করছে। অক্ষয়কাকাবাবুর ভবিষ্যৎবাণী তাহলে ফলে গেল। আজই সেই তৃতীয় দিন। একটা বিপদ আসছে। এই তো সেই বিপদ। এখন আমার কি করা উচিত! বেশ ভালই লাগছে। একেবারে অসহায়। পরামর্শ দেবার মতো কেউ নেই। মামাকে আমি চিনি। বড়লোক ঘেঁষা মানুষ। কোথায় গিয়ে বসে আছেন কে জানে! আজ আর ফিরবেন বলে মনে হচ্ছে না। বেলা একটা বাজল। উনুন জ্বেলে রান্না করার প্রশ্নই ওঠে না। খেতেও পারব না। কোনওরকমে ঘরে এসে পিতা হরিশঙ্করের খাটে ধপাস করে উল্টে পড়লুম। চাদরটা পাল্টাবো ভেবেছিলুম, জবা শুয়ে গেছে। সেই ভাবনাটা চলে গেছে। এখন বেশ ভালই লাগছে। বোধহয় জবার দিকে মনটা ঝুঁকেছে বলেই। ভালবাসা, কে বলতে পারে! কখন টলটল করে উঠবে ভেতরে তালশাঁসের জলের মতো! আর আমার কোনও ক্ষমতাও নেই, যে তুলবো, ঝাড়বো, নতুন একটা পাতবো! জবার ওপরেই শুয়ে পড়ি। আশ্চর্য জবার শরীরের কথা চিন্তা করলে যন্ত্রণার কথা আর মনে থাকছে না। জবা ঈশ্বরের চেয়ে শক্তিশালী। সাধ্যসাধনাতেও তিনি আসেন না। ঈশ্বরের আর একটা প্রবলেম হল, এত রূপ, কোন্ রূপে আমি চিন্তা করব! চলচ্চিত্রের মতো একের পর আর এক এসে, জড়ভট্টি হয়ে তালগোল পাকিয়ে, শেষে যেন মনের কুস্তি! কোনও প্যাঁচেই পেড়ে ফেলা যায় না। ধোঁয়া ধরার কসরত। সেই তুলনায় জবা কত স্থির। যে-জায়গাটা স্মরণ করছি, সেইটাই সামনে এসে স্থির হচ্ছে। শুধু স্থির নয়, আনন্দ আর আকাঙ্ক্ষা জাগাচ্ছে। সেই গানের মতো, যতই না পাবে, তত পেতে চাবে, ততই বাড়িবে পিপাসা তাহার। এই জায়গাটায় জবার মাথা ছিল। এইখানে শরীরের মধ্যভাগ। এই জায়গায় হাঁটু দুটো। উত্তেজিত পদযুগল। সাদা ক্রমশ দুধ সাদা হয়ে রহস্য হয়ে গেছে নীল অন্তর্বাসে।

জ্বর আরো বেড়ে গেল। যেখানে হাত রাখছি সেই জায়গাটা গরম হয়ে উঠছে। বেশ জমে গেল তাহলে! ওষ্ঠ ব্রণ সেপ্টিক্, মানে মৃত্যু অবধারিত। ভালোই হবে। আর একবার ভালো করে জন্মাবো। অক্ষয়বাবুর মতো বিশাল এক শরীর চেয়ে নোবো, আর তার ভেতর ফিট করে দোবো পিতার চরিত্র ও মেধা। মামার সঙ্গীত-প্রতিভাও নিতে পারি। স্বর্গে গিয়ে প্রথমেই দিদিকে খুঁজে বের করে ক্ষমা চেয়ে নোবো। মাকে বলবো, তাঁর চলে আসার পর আমার বেঁচে থাকার বৃত্তান্ত। নন্দনকাননে কিছু দিন রেস্ট নেবার পর পৃথিবীতে ফিরে আসবো।

গোটা মুখ থমথম করছে। এ-পাশ, ও-পাশ করলে যেন মল বাজছে ঝমঝম। চোখের মণি নিচের দিকে নামালে নিজের গাল, ঠোঁট পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি আয়না ছাড়াই। ফুলে উঠে চোখের কোলে চলে এসেছে। কি মজা! এ-ও জীবনের এক অভিজ্ঞতা। ঈশ্বরকে ডেকে লাভ নেই। মন দেবী থেকে সরে গেছে মানবীতে। কেউ কি আসবে না, আমার এই অসহ্য যন্ত্রণার মুহূর্তে! চ্যাঁ চ্যাঁ করে ডাকছে শালিক। মাঝে মাঝে ইলেকট্রিক-শক-এর মতো যন্ত্রণার তীব্র একটা খোঁচা মাথার দিকে উঠে যাচ্ছে।

বহুক্ষণ ধরে টেলিপ্যাথিতে জবাকে ডাকছি। আসছে না কেন। তিনটে বেজে গেছে। রোদ মরে আসছে। কত তাড়াতাড়ি জায়গাটা বিষিয়ে উঠল! ধুপ করে ছাতে একটা শব্দ হল। বেশ ভারী একটা কিছু পতনের শব্দ। বোধহয় জবা পাঁচিল টপকালো। অনেক

দিনের পুরনো অভ্যাস, আবার ঝালিয়ে নিচ্ছে। ছাতের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। মলের ঝুমকোর চুনুর চুনুর শব্দ। পরক্ষণেই জবা ঘরে এল। হলদে শাড়ি, আটপৌরে সাদা ব্লাউজ। শাড়িটা গ্রামের মেয়েদের মতো উঁচু করে পরা। গাছ কোমর আঁচল। চুলের খোঁপা বেদেনীর মতো। ঝুরঝুরে কিছু কপালে এলোমেলো।

জবা আমার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বললে, 'এ কে ?'

এই একই প্রশ্ন তো আমারও। এ কে ? সন্ন্যাসী, গৃহী, লম্পট, ভণ্ড, শয়তান ? কোনটা ?

জবা বললে, 'এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কি করে ফেললে ? মারামারি করে এলে না কি ?'

জবা সাবধানে আমার মাথার পাশে খাটের ধারে বসল। মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললে, 'কি সাংঘাতিক অবস্থা ! কি করে করলে এমন ?'

জবার মুখটা ভীষণ সুন্দর। কিছু পাপ, কিছু পুণ্য মিশে বড় আকর্ষণীয়। বিদেশী চলচ্চিত্রের নায়িকার মতো। কুমারী নয় বলেই অন্য এক ধরনের চটক এসেছে। এই যন্ত্রণার মধ্যেও আমার সৌন্দর্য-বোধ ঠিক আছে দেখে মনে হল, মৃত্যু আসন্ন হলেও সমাসন্ন নয়। একদিন, দুদিন লড়ে যেতে পারবো। বিপরীত স্টেশন থেকে ট্রেন ছেড়েছে, এখন আসতে যত দিন লাগে। শুনেছি মরণকালে মানুষের মাংসে রুচি চলে যায়। বুকে মৃদঙ্গ বাজে। মনে মহাদেব নৃত্য করেন। আমার ওইসব কিছুই হচ্ছে না। বরং জবার নিটোল পশ্চাদ্দেশ আমার ডান কান ছুঁয়ে আছে বলে শরীরে অন্য আর এক ধরনের যন্ত্রণা টের পাচ্ছি। চলেই যখন যাবো, তখন জবার আপত্তি না থাকলে জীবনের শেষ নারীসঙ্গ করে যাবো কি ! আর হয় তো মনুষ্যজীবন পাবো না। প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা, সৌন্দর্য দেখার চোখ, কবিতার মতো শরীর, নৃত্য, গীত, নিষিদ্ধ সম্পর্ক, ছোটখাটো পাপ, একটু পদস্খলন, অপরাধী বিবেক, আসক্তি, নিরাসক্তি এই মানব জীবনের যত মশলা, সবই হয় তো একবার। জবার হাতটা নিজের হাতে টেনে নিলুম। কোমল, অনভিজ্ঞ, কুমারী হাত নয়, ঝানু হাত। নখের মাথা সামান্য সামান্য ক্ষয়ে গেছে। সংসারের কাজে কর্মে খসখসে। হাত মানুষের জীবনযাপনের সাক্ষী। কর্মীর হাত, বিলাসীর হাত, দুঃখীর হাত, খুনীর হাত, তবলিয়ার হাত, সেতারীর হাত। নিজেকেই নিজে ধমক মারলুম। জ্বরের ঘোরে, ব্যথার তাড়সে মন ভুল বকছে।

জবা আমার হাতে চাপে দিয়ে বড় স্নেহের গলায় বললে, 'বললে না তো কি হয়েছে ? মুখ থুবড়ে পড়ে গেছো ?'

মনে মনে হাসলুম, অনুমানটা তোমার নেহাত মিথ্যে নয়। এমন পড়া পড়েছি, আর উঠতে পারবো কি না জানি না। মুখে বললুম যা হয়েছে।

জবা বললে, 'তাহলে আমি ডাক্তার ডেকে আনি।'

কাঁচের শার্সির গায়ে লেবড়ে থাকা ডাঁস মাছি যেমন বুজুর বুজুর শব্দ করে, সেইরকম একটা শব্দ বেরলো আমার মুখ দিয়ে, 'এখন ডাক্তার কোথায় পাচ্ছ জবা ! সন্ধের পর পাবে। এখন তাঁরা বিশ্রাম নিচ্ছেন।'

জবা বললে, 'আমি সব পারি। ডক্টর মিত্রের বাড়ি আমি চিনি। ঠিক ধরে আনবো।'

'তুমি আমার কাছে থাকো। আমার ভীষণ ভয় করছে। আমাকে ছেড়ে চলে যেয়ো না।'

অদ্ভুত একটা আকর্ষণ বোধ করছি। অদ্ভুত একটা শান্তি। দুটো জীবন প্রায় এক ধাঁচের। দুজনেরই এক হাল। সমান অসহায়। দু'জনেই পরিত্যক্ত। একজন স্বামী। আর একজন পিতা। বার্ডস অফ দি সেম ফেদার ফ্লক টোগেদার।

জবা বললে, 'কিসের ভয় ! তোমার নিশ্চয় খাওয়াও হয়নি !'

'আর খাওয়া, আমি ঠোঁট ফাঁক করতেই পারছি না।'

জবা কিছুক্ষণ কি ভাবল। আমার আঙুলগুলো নিজের আঙুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করল। শেষে একটা যেন কিছু খুঁজে পেল। আমার বুকের ওপর হেলে পড়ে বললে, 'একটা কাজ করি। সরু একটা পেঁপের ডাল কেটে আনি। এক বাটি দুধ গরম করি। তুমি সেই ডালটা দিয়ে চোঁচোঁ করে খেয়ে নাও।'

জবার লকেটটা আমার বুকের কাছে দুলছে। শীত করছিল বলে পাখা বন্ধ। জবার টিকলো নাকের ডগায় তিলফুলের মতো ঘাম। বুকের খোলা অংশটা ভিজে ভিজে। মন কেমন করানো অতি কোমল, অতি নিভৃততম আরো কিছু। আমি লকেটটায় হাত দিলুম। বড় সুখ। জবাকে আমি একদিন আদর করতে চেয়েছিলুম। পৃথিবীকে যখন বিদায় জানাতে হবেই, তখন আর দেরি কেন ! মানুষ যখন মরে তখন তো তার সবই বেরিয়ে যায় প্রাণবায়ুর সঙ্গে। দেহেব সঙ্গেই পুড়ে ছাই হয়ে যায় তার নাম, আদর্শ, চরিত্র। তবে ! এই আমার শেষ ইচ্ছে। জবাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলুম। ভরাট এক অনুভূতি। এর বেশি কিছু সম্ভব নয় ! শরীরে কুলোবে না।

জবা বললে, 'অমন কোরো না। তোমার লেগে যাবে। জ্বরে তোমার গা পুড়ে যাচ্ছে !'

জবার আঁচল খুলে লুটিয়ে পড়েছে আমার বুকে। জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে। এর অর্থ আমি বুঝি। জবা উঠে দাঁড়াল। নিজেকেই প্রশ্ন করল, 'এই জ্বরে দুধ দেওয়া কি ঠিক হবে ?' বলতে বলতে বেরিয়ে গেল। বাইরের রাস্তায় ছেলেরা সোরগোল তুলে চলেছে। স্কুলের ছুটি হয়েছে। ওই জীবনটা ছেড়ে এসেছি আমি। লোভনীয় জীবন। আবার ফিরে পেতে হলে মরে যেতে হবে। জীবন হল নদীর মতো। উৎসের দিকে আর ফিরতে পারে না। সাগরের টানে এগিয়েই চলে। ক্রমশ আচ্ছন্ন হয়ে আসছে আমার চেতনা। রঙীন কাঁচের মধ্যে দিয়ে পশ্চিমের রোদ এসেছে। এটা তার নিত্য আসা। ধর্মশালার অতিথির মতো। সারাদিনের তীর্থভ্রমণ শেষ করে, বোঝা নামিয়ে বসা। বড় কষ্ট হচ্ছে। খুবই যন্ত্রণার মৃত্যু হবে। পিতা হরিশঙ্কর বলতেন, যন্ত্রণা সহ্য করবে বীরের মতো। উঁ হাঁ করবে না। পরাজিত হবে না। হাসবে। গান গাইবে। মনটা তুলে নেবে। অন্য চিন্তা করবে। তবু আমার মুখ দিয়ে মাঝে মধ্যে উ হা বেরিয়ে পড়ছে। কতটা সময় চলে গেল হিসেব নেই। মাথাটা ছিঁড়ে যাচ্ছে। হঠাৎ জবা ঘরে এল ডক্টর মিত্রকে নিয়ে। ঠিক ধরে এনেছে।

বিছানার পাশে একটা চেয়ারে বসলেন ডক্টর মিত্র। তিনি আমাদের পারিবারিক চিকিৎসক নন। আমাদের ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান ডক্টর সেন। সেই কারণেই একটু অস্বস্তি বোধ করছেন। যেন পরস্ত্রীর গায়ে হাত দিচ্ছেন। জবা মনে হয় সবই বলেছে। ঠোঁটটা ভাল করে দেখে, চারপাশ আঙুল দিয়ে আলতো আলতো করে টিপে বললেন, 'ভয়ঙ্কর কাণ্ড। ওয়ান পার্সেন্ট কেস।'

জবা বললে, 'তার মানে কি ডাক্তারবাবু ?'

'মানে হল, একশোতে একজন বাঁচে। এ বড় সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার—ইরিসিপ্লাস। সোজা ব্রেনে গিয়ে ধাক্কা মারবে। ইশ্ বিশ্রী কাণ্ড করে বসে আছে। দেখি কি হয় ! তেড়ে সালফার ড্রাগস চালাই। একটা পাউডার দোবো, ঠোঁটের ওপর সাবধানে ছড়িয়ে দিয়ো। হরিশঙ্করবাবু কোথায় ?'

জবা বুদ্ধি করে বললে, 'কয়েক দিনের জন্যে বাইরে গেছেন।'

'তবে যে শুনলুম, তিনি জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছেন।'

জবা বললে, 'যাব্বাবা, এ আবার কে রটালে ! একখানা পাড়া বটে !'

ডাক্তার বললেন, 'তাহলে যা বলেছ ! এক কাজ করো, তাঁকে টেলিগ্রাম করে আসতে বলো। কেস কোন্ দিকে যাবে বলতে পারছি না।'

আবার দুজনেই বেরিয়ে গেল। জবা সদর পর্যন্ত গিয়েছিল ডাক্তারবাবুকে এগিয়ে দিতে। ফিরে এসে বললে, 'হ্যাঁ গো, তোমার কাছে কিছু টাকা-পয়সা আছে ?'

হ্যাঁ গো, শব্দটা ভীষণ ভাল লাগল। এই ভাবে স্ত্রীরা স্বামীকে সম্বোধন করে। ভীষণ একটা আন্তরিকতা। দুটো মহাদেশের মাঝখানে অর্থহীন দুটো শব্দের সেতু। জবাকে ইশারায় কাছে ডাকলুম। লকেটটা বাঁ হাতে একটু তুলে আঁচল দিয়ে বুক আর গলা মুছলো।

পাশে এসে বললে, 'কি বলো ?'

'ও ঘরে গিয়ে আলমারিটা খোলো। গোল একটা বাক্স দেখবে। সেই বাক্সটার দুটো তলা। একেবারে নিচের তলায় টাকা আছে। চাবি আলমারিতেই ঝুলছে।'

যতক্ষণ কথা বললুম জবা চোখ বড় বড় করে ওপর নিচে ঘাড় দোলালো, যেন ছাত্রী। মাস্টারমশাই কিছু বোঝাচ্ছেন। জবা চলে গেল পাশের ঘরে।

পৃথিবীতে এমন কেন হয় না ! মানুষ মানুষের খুবই ছোটখাটো সুখের বাধা হবে না। কিছু দিতে হবে না, শুধু বাধা দোবো না। সুখেন বলবে, ঠিক আছে জবা তোমাকে আমি ছেড়ে দিলুম। পিতা হরিশঙ্কর হাসি মুখে বললেন, ঠিক আছে পিণ্টু, সংসার তুমি করবে। তোমার যদি মনে হয় জবার মতো সংসারে ইতিমধ্যেই পোড় খাওয়া, অভিজ্ঞ এক মহিলা তোমাকে সুখী করতে পারবে, তাহলে আমার আর আপত্তি কিসের ! পাড়ার লোকজন বলবে, ঠিকই তো, ঠিকই তো। বিলেতে এইরকম অনবরতই হচ্ছে। তারাও মানুষ, আমরাও মানুষ। মানুষের সুখটাই আমাদের কাছে বড়। যে যেখানে আছো সুখী হও। আমরা তো অন্যভাবে সাহায্য করতে পারবো না, আমরা বাধা না দিয়ে, ছিছি না করে তোমাদের সাহায্য করব। আর জবা বলবে, এতদিন আমি যা খুঁজছিলুম তাই পেয়ে গেছি। আর আমার কিছু চাইবার নেই। জীবন-জাহাজ এইবার বন্দর খুঁজে পেয়েছে। তখন আমি বাগান ঘেরা ছোট একটা বাড়ি করব। স্মৃতিভারাতুর এই অভিশপ্ত প্রাচীন কেল্লাটি আমরা পরিত্যাগ করবো। স্মৃতির কঙ্কালরা এখানে দোল খাক। মাঝরাতে হা হা করে হাসুক অট্টহাসি। সেই নতুন বাংলো বাড়ির সবচেয়ে ভাল ঘরটিতে থাকবেন পিতা হরিশঙ্কর। মামার আনা গোলাপ গাছগুলো দিয়ে জানালার বাইরে ছোট্ট একটা বাগান সাজাবো। যাতে তিনি জানালায় বসে দেখতে পান ফুলের বাহার। জবা কোমরে আঁচল জড়িয়ে, শাড়িটাকে একটু উঁচু করে পরে, ঝারি নিয়ে জল দেবে। ছোট্ট রুমালের মতো একটা লন থাকবে। শেষবেলায় জবা আর হরিশঙ্কর সেখানে বসবেন, ভিজে মাটি, ঘাস, রোদ, ফুলের গন্ধ। হরিশঙ্কর রাতের আকাশ থেকে তারা খুঁজে খুঁজে জবাকে কনস্টিলেশান চেনাবেন। গাছের ডালে চেন বাঁধা দোলা বাতাসে মৃদু মৃদু দুলবে। তারই অস্ফুট শব্দ। কাঠের মেঝেআলা একটা ঘর থাকবে। জবা সেখানে নাচ শিখবে। স্কুলে ভাল নাচত। হরিশঙ্কর নাচ বোঝেন, তাল বোঝেন, ছন্দ বোঝেন। ছেলেবেলায় আমাকে নাচ শেখাতেন। জবা হবে তাঁরই ছাত্রী। কাঠের পাটাতনে পায়ে তাল ঠোকার শব্দ। ঘুঙুরের বোল। তবলায় হরিশঙ্করের ছটফটে আঙুল। মামার হারমোনিয়াম আর গলা। জবার লাল ব্লাউজ ঘামে ভিজে আরও লাল। এরপর রাত যখন গভীর হয়ে যাবে। কালো আকাশের ছায়াপথ ধরে তারারা প্রদীপ হাতে নিয়ে যখন বেরোবে তীর্থযাত্রায়, তখন হরিশঙ্করের টেবিলে জ্বলবে একটি মাত্র আলো, সামনে খোলা কঠিন গণিতশাস্ত্রের বই। পাশে খাতা। সমাধান খুঁজে ফিরবেন, যে-সব

সমস্যার আজো সমাধান হয়নি। জবা একসময় এসে আলোটা নিবিয়ে দেবে। হাত ধরে বলবে, আজ আর নয় এইবার শুতে হবে। ফিনফিনে নীল মশারির মধ্যে তিনি ধ্যানস্থ হবেন। ঝকঝকে গেলাসে জল এগিয়ে দেবে জবা। গুড নাইট।

আমার জ্বরের বিকারে মহাজীবন অরণ্যে একটা মায়ামৃগের পেছনে সুপ্ত ইচ্ছার ধনুর্বাণ নিয়ে ছুটতে লাগলুম। কত কি দেখছি জীবনের শেষ পাতায় এসে। জবা কালো চুলে ঘষে ঘষে তেল মাখছে। দু'হাতের বাড়তি তেল মুখে মাখতে মাখতে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। গায়ে জামা নেই। শাড়ির আঁচল। মেয়েরা তেল মাখলে ভীষণ ভাল দেখায়। তেলের মিষ্টি লেবুলেবু গন্ধ। জবা আমাকে বলছে, 'উনুনে ডাল চাপানো আছে। আমি ঝট করে চানটা করে আসি। তুমি একটু নজর রেখো। এসে বাবাকে চা করে দিচ্ছি।' রান্নাঘরটা হবে বাইরে বাগানের একপাশে। বাথরুমে জল পড়ার শব্দ। বাঁধানো নর্দমা দিয়ে ভেসে ভেসে যাবে সাবানের ফেনা। জবার মসৃণ বুক-পিঠ, তলপেট বেয়ে ফুলের মতো নেমে এসেছে গোলাপ, চামেলী। সব যেন ধন্য ধন্য রবে ছুটে চলেছে। ভীষণ একটা সুখের দৃশ্য। স্বাস্থ্য নিয়ে বেঁচে থাকার সুস্থ দৃশ্য।

দিনের শেষ আলোটুকু সরে গেল। কেউ নেই। জবা গেছে প্রেসক্রিপশন নিয়ে ওষুধ আনতে। কোনও রকমে উঠলুম। আলোটা জ্বালতে হবে। এক একবার পা ফেলছি, গোটা মুখ ঝনঝন করে উঠছে, জল ভর্তি হটব্যাগের মতো। আয়নার সামনে দাঁড়াবার সাহস হল না। হয়তো নিজের বদলে ঘটোৎকচ ভেসে উঠবে। ভালো দেখতেও পাচ্ছি না। চোখ ঢেকে গেছে। আবার এসে শুয়ে পড়লাম। একটা মাথার চুলের কাঁটা পড়ে আছে। ভঙ্গিটা দু'পা ছড়ানো মৃত সৈনিকের মতো। জবার চুল থেকে খুলে পড়েছে। আলোটাকে মনে হচ্ছে থলথলে মাছের পিত্ত।

কখন কি হল! ঘর ভরে গেছে। অনেকে এসেছেন। টিপ, টিপের মা, জবা। বিষ্টুদার গলাও পেলুম একবার। ঠোঁটটা সাবধানে ফাঁক করিয়ে জবা কিছু পাউডার ঢেলে দিল মুখে। কোথা থেকে একটা ফিডিং কাপ এনেছে। ফলের রসের মতো কি একটা চলে গেল ভেতরে। কপালে কার নিশ্বাস পড়ল। টিপের। আমাকে ঘিরে মহা কাণ্ড চলেছে। সকলেই এসেছেন আমাকে বিদায় জানাতে। জাহাজ কখন বন্দর ছাড়ে!

একে একে পায়ের শব্দ নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে। ঘরে আবার বাতাস খেললো। শুধু জবা, ফুলের মতো ঝুঁকে আছে আমার দিকে। মনে হল চোখ দুটো ছলছল করছে। অতি কষ্টে বললুম, 'তুমি এইবার বাড়ি যাও।'

'আর তুমি?' টস্‌টস্‌ করে কয়েক ফোঁটা জল পড়ল আমার বুকে।

৩১

Nothing at all but three things,
Birth and copulation and death.
I've been born and once is enough.

ঘরে একটা মৃদু আলো জ্বলছে। মধ্যরাত। মামা আজ আর ফিরলেন না। কলকাতায় তাঁর কত বন্ধু। শ্বশুরবাড়ি। সুন্দরী শ্যালিকা। মামা আনন্দ করছেন। জবা আমার পাশে কাত হয়ে শুয়ে আছে। তার ডান হাতটা আমার বুকে। মোটা শাঁখা। লোহার একটা বালা। কয়েক গাছা চুড়ি। মানুষ কত যন্ত্রণাই সহ্য করতে পারে! আমার গোটা মুখটা হুহু করে জ্বলছে।

হঠাৎ মনে হল, হরিদ্বারের সন্ন্যাসী আমাকে একটা ফল খাইয়েছিলেন। বলেছিলেন, অমৃত ফল। সেই ফল খেয়ে আমার কি লাভ হল! দেহ-যন্ত্রণা, দেহ-বাসনা সবই তো রয়েছে। কোনওটাই তো গেল না। জবাকে মনে হচ্ছে আমার কত কালের বিয়ে করা বউ। সব বাজে সব মিথ্যে। সবই মানুষের ইচ্ছাপূরণ কল্পনা। মানুষ ভাবে, এই হল এই হবে। কিছুই হয় না। যা হবার তাই হয়। যদি আমি সেরে উঠি ঘোরতর নাস্তিক হয়ে যাবো। যা মন চাইবে তাই করব।

ভাবামাত্রই ভেতরে একটা শব্দ হল মড়মড় করে; যেন হাড়গোড় সব ভেঙে গেল। একটা কাঠামো ধসে পড়ল যেন। মরেছে, এই ভাবেই বোধ হয় মৃত্যু আসে। মরার অভিজ্ঞতা তো নেই আমার। জবার হাতে চাপ দিলুম। বোধহয় তন্দ্রা এসেছিল। একটু চমকে উঠল, 'কি হল?'

'তুমি কোনো শব্দ শুনতে পেলে?' অতি কষ্টে জড়িয়ে জড়িয়ে বললুম।

'কই না তো? কিসের শব্দ?'

আমি কি বোকা! জবা কেমন করে শুনতে পাবে আমার অন্তরের অলৌকিক শব্দ! এ তো আমার সংস্কার ভেঙে পড়ার শব্দ। এও আমার মনের ভুল। সংস্কার একটা মনের ভাব, বস্তু নয়, তার আবার ভেঙে পড়া কি!

জবা আমার কপালে হাত রেখে বললে, 'বেশ জ্বর। তোমাদের বাড়িতে সব আছে, একটা থার্মোমিটার নেই। তোমার আর একবার ওষুধ খাবার সময় হল। টেবলেটটা গুড়ো করি।' জবা উঠে পড়ল। বাড়ি-ঘর ছেড়ে আমার জন্যে মেয়েটার কি শাস্তি? এ ঋণ আমি কেমন করে শোধ করব? একটা ভাল শাড়ি! একটা হার! হবে না। উপহার দিয়ে সব ঋণ শোধ করা যায় না। বোতলের পেছন দিয়ে জবা ট্যাবলেট গুঁড়ো করছে। ঠুকঠুক শব্দ।

নিস্তব্ধ রাত। ঘড়ির টুকটুক পদশব্দ। দূরে কুকুরের ডাক। আমি চলে যাচ্ছি এই সুন্দর প্রেম-প্রীতির পৃথিবী ছেড়ে। জবা মেঝেতে বসে আছে। তাকাচ্ছি, ভাল দেখতে পাচ্ছি না। চোখে পর্দা পড়েছে। রাত ভোর হবার আগেই হয় তো থেমে যাবে আমার যন্ত্র! মৃতজনদের দেখতে পাচ্ছি। আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছেন। সকলেই হাসছেন। আর দেরি কেন? মায়ার খাঁচা খুলে বেরিয়ে এস। আকাশ কত নীল!

অনেক কসরত করে জবা আমাকে ওষুধটা খাওয়াতে পারল। সে এক পর্ব। লজ্জা করছে, হাসিও পাচ্ছে। অসুস্থ দেহ, টগবগে মন, পাশেই ভোগ, কিছুই করার উপায় নেই। তখনই যেন অমৃত ফলের রহস্য পরিষ্কার হল। সন্ন্যাসী জানতেন, আগুন আর ঘৃত পাশাপাশি আসবে, এমন একটা অবস্থা করে দাও যাতে মাথা তুলতে না পারে। তারপর নারীতে মাতৃদর্শন হোক। একটু একটু করে দুধ খাওয়াচ্ছে, ওষুধ খাওয়াচ্ছে, বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। প্রবল যন্ত্রণার মধ্যে মায়ের দর্শন।

জবা একটা কাঁচা টাকা আমার কপালে ঠেকিয়ে ঠাকুরের ছবির কাছে রেখে এল। মায়েরা ছেলের আরোগ্য কামনায় এইরকমই করে। সেরে উঠলে পুজো দেওয়া হবে। আমি ধীরে ধীরে আবার একটা ঘোরের মধ্যে চলে যাচ্ছি; আর ঠিক সেই মুহূর্তে সামনে এসে দাঁড়ালেন মিশনারিদের মতো সাদা পোশাক পরা এক মূর্তি। প্রথমে চিনতে পারিনি। অন্ধকারে এক ছায়ার মতো। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি। সাদা পোশাকে একটি অন্ধকার মুখ। চোখদুটো আলপিনের মতো জ্বলছে। হঠাৎ একটা সোনালি আলো ফুটে উঠল। ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল মূর্তির শরীরে। জল যেমন কাগজে শুষে যায়, সেইভাবে আলোটা ভেতর থেকে ফুটে উঠছে। ক্রমশই উজ্জ্বল হচ্ছে। আলোয় ভেজা এমন এক সুঠাম মানবকে চোখের সামনে দেখে চেতনা স্তম্ভিত। এই কি দেবদূত! মৃত্যুর প্রাক্ মুহূর্তে যাঁর আগমন হয়। তলার দিক থেকে আলো পড়ল মুখে। চমকে উঠলুম। স্বয়ং হরিশঙ্কর এসেছেন দুয়ার খুলে দিতে। একটা ভয় ছড়িয়ে পড়ল, পাশেই জবা। জবাকে দেখে যদি তিরস্কার করেন,'এখনো গেল না আঁধার, এখনো রহিল বাধা/ এখনো মরণব্রত জীবনে হল না সাধা॥' হরিশঙ্করের মুখ পাথরের মতো। সেই বজ্রকঠিন মুখ। যে-মুখে তিনি সংসার-সমস্যার মুখোমুখি হতেন। যে মুখের সামনে কারোর ক্ষমতা হত না মুখ তুলে দাঁড়াবার। হরিশঙ্কর দুটো হাত নিজের চোখের সামনে তুলে ধরলেন। হাতে একটা ইনজেকসানের সিরিঞ্জ। ভেতরে টলটল করছে সাদা তরল পদার্থ। সিরিঞ্জের গায়ের কালো কালো রেখা সুস্পষ্ট। হরিশঙ্কর সামনে ঝুঁকে আমার হাতে প্রিক করে ছুঁচটা ফুটিয়ে দিলেন। সারা শরীরে ছড়িয়ে গেল পিপারমেন্টের অনুভূতি। ভীষণ একটা আরামে আঃ করে উঠলুম। সাদা আলখাল্লা পরা হরিশঙ্কর সেজ নেবার মতো ধীরে ধীরে নিবে গেলেন। কানে এল জবার গলা, 'কি হল? খুব কষ্ট হচ্ছে তোমার?' জবার মুখ হেঁট হয়ে আছে আমার মুখের ওপর। কানের দুল টুলটুল করে দুলছে। সোনার চেনে বাঁধা পাথর বসানো লকেট আমার বুকে নেমে এসেছে। কথা বলার ক্ষমতা নেই আমার। ডান হাতে তার ওপর বাহুটা চেপে ধরলুম। নরম তুলতুলে। জবার নরম বুক চেপে আছে আমার বুকের একপাশে। স্পঞ্জের মতো ওঠানামা করছে।

হঠাৎ জবা চমকে উঠল। 'ওটা কি?'

জবা আড়ষ্ট কাঠ। কি দেখেছে! জবা অতি সন্তর্পণে আমার মাথা ও পাছার তলা দিয়ে তার হাতদুটো চালিয়ে দিয়ে খুব সাবধানে বিছানা থেকে তুলে নিল। প্রায় পাঁচ ফুট ন'ইঞ্চির মতো দীর্ঘ, সুঠাম শরীর। জবার কোনও অসুবিধেই হল না। আমাকে তুলে নিয়ে একপাক

ঘুরে যেতেই ভোরের মৃদু আলোয় চোখে পড়ল, মাথার বালিশ আর খাটের সীমানা ঘেঁষে, বিছানার খাঁজ ধরে গলগল করে চলেছে মেটে লাল রঙের একটা সাপ। ঠোঁটের সমস্ত যন্ত্রণা ভুলে আমি আর্তনাদ করে উঠলুম, 'সাপ, সাপ।'

জবা আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে আমাকে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে মুকু যে তক্তাপোষে শুতো তার ওপর ধীরে ধীরে শুইয়ে দিল। সাপ কোথা থেকে এলো! অত বড় সাপ! পুরনো বাড়ি, সাপের অভাব নেই। একতলায় হামেশাই দেখেছি দোতলায় এই প্রথম। আগে পিছনের সিঁড়িতে সন্ধের দিকে প্রায়ই কামিনীভোগ চালের পায়েসের গন্ধ পেতুম। হরিশঙ্কর একদিন রহস্যটা বলেছিলেন, বাস্তু সাপ বেরোলে অমন গন্ধ বেরোয়। পরে একদিন দেখিয়েও ছিলেন। বেঁটে, চওড়া, শ্যাওলার মতো গাত্রবর্ণ। বয়েসের কোনও ঠিকঠিকানা নেই। হরিশঙ্কর সাপ মারা একদম পছন্দ করতেন না। বলতেন, সাপ তো মানুষ নয় যে অকারণে মানুষের ক্ষতি করবে! সাপ পোষার এই ফল।

জবা বললে, 'তোমার একটু কষ্ট হল, এ ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। তুমি শুয়ে থাকো, আমি দেখে আসি চলে গেল কি না?'

জবা চলে যাচ্ছিল, আঁচলটা চেপে ধরে বললুম, 'আমার ডান হাতের এই জায়গাটা দেখো তো।'

জবা ঝুঁকে পড়ল স্বপ্নে যে জায়গাটায় হরিশঙ্কর ছুঁচ ফুটিয়েছিলেন সেই জায়গাটা দেখতে বললুম। জবা দেখে বললে, 'কি ব্যাপার বলো তো। একটা কিছু ফুটেছিল'

একটা মৃদু হাসি খেলে গেল ভেতরে, সাবাশ! অক্ষয়কাকাবাবু। অভ্রান্ত আপনার গণনা। ডবল আক্রমণ। ওই দাগটা আর কিছুই নয়, সাপের ছোবল। হরিশঙ্করের ছুঁচ নয়। তিন দিনের মধ্যে বিপদ আসছে। সেই বিপদের চেহারা যে এইরকম হবে কে জানত।

জবা প্রশ্ন করলে, 'কি ফুটলো বলো তো? আমার কিছু? হাতের নোয়া? সেফটিপিন?'

মনটা আমার বিশাল সমুদ্রে ভেসে চলা ছোট্ট নৌকোর মতো হয়ে গেছে। যেতেই হবে, যেতেই হবে। কোনওরকমে বললুম, 'জবা হয়ে গেছে। ফিনিশ। ওটা সাপের ছোবল। একটু আগে মনে হল একটা ছুঁচ ফুটলো। তখনই আমি তোমাকে ডেকেছিলুম।'

জবার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল, 'সে কি? সর্বনাশ। তাহলে তো ওর ওপরে একটা বাঁধন দিতে হবে। দাঁড়াও।'

'বাঁধনে কি হবে জবা? যেখানে কামড়েছে সেটা মাথার খুব কাছে।'

আর আমার সামান্যতম শক্তি নেই। ঠোঁটের যন্ত্রণাও আর অনুভব করতে পারছি না। শরীর একেবারেই এলিয়ে গেল। সাপের বিষে এইরকমই হয়তো ঘোর লাগে। তারই মধ্যে দেখলুম জবা শাড়িটা খুলে ফেলল। তারই মধ্যে এক ঝলক ভেবে নিলুম, আহা! জবার শরীরটা কি সুন্দর! ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি নারী। একই নারীর কত রূপ! জবা সায়ার দড়ি খুলছে। একটানে ফস করে দড়িটা খুলে কোমরের একটু নিচে সায়াটাকে কোনও রকমে গাঁট দিয়ে সামলে রাখল। গভীর নাভির দিকে আমার আচ্ছন্ন চোখ চলে গেল। মৃত্যুটা আমার খুবই সুখের হতে চলেছে নানা রকম বিভীষিকা দেখে মরতে হচ্ছে না। জবা আমার হাতে দড়ির ফাঁস পরাতে লাগল। জবার দেহের উত্তাপে দড়িটা গরম। মনের কল্পনাও হতে পারে ব্লাউজে দুটো সেফটিপিন। সাপটা কি চলে গেছে! এ ঘরে আসবে না তো! এক ঝটকায় কে যেন আমাকে অচেতনায় তলিয়ে দিল।

কটা দিন চলে গেছে, কে জানে ? আমার মরা হল না। চোখ মেলে তাকালুম। স্বপ্ন দেখছি না তো ? সামনেই হরিশঙ্করের মুখ। সেই সোনার চশমা। তীক্ষ্ণ, উজ্জ্বল চোখ। মুখে অদ্ভুত একটা জ্যোতি খেলছে। পাশেই মাতুল জয়নারায়ণ। তার পাশেই জবা। জবার পাশে মুকু, মুকুর পাশে টিপ। টিপের পাশে সুরঞ্জনা। সুরঞ্জনার পাশে টিপের মা। তার পাশে কাকিমা। কাকিমার পাশে অক্ষয় কাকাবাবু। ভাবছি পুনর্জন্ম হল কি না !

হরিশঙ্কর তাঁর সেই পরিচিত ভঙ্গিতে একটা আঙুল তুলে বললেন, 'ক্রাইসিস ইজ ওভার।'

আমি হাত জোড় করে নমস্কার করলুম। তিনিও হাত জোড় করে নমস্কার করলেন। এই হলেন আমার পিতা। এটিকেট, ম্যানারস, ফর্মালিটি। অতুলনীয়। শুয়ে আছি বড় ঘরে। পিতারই খাটে। খাটের পাশে একটা স্ট্যাণ্ড। দুটো বোতল ঝুলছে। তার মানে আমাকে ড্রিপ দেওয়া হচ্ছিল। নিজের মুখটা খুব দেখার ইচ্ছে হচ্ছিল। খুব হালকা মনে হচ্ছে। কোনও জ্বালাযন্ত্রণাও নেই।

জয়নারায়ণ বললেন, 'মিরাকলস। যমে মানুষে টানাটানি অ্যাণ্ড যম মিজারেবলি ফেলড্।'

'এই মেয়েটার কাছে যম হার মেনেছে।' হরিশঙ্কর জবার পিঠে হাত রাখলেন। 'এ সব জানে। বাঁধন দিয়েছে। ইনসিসান করে সাক্ করেছে। হোয়াট এভার ইট মে বি, দ্যাট ওয়ার্কড।'

মাথার কাছে কেউ একজন বসে আছেন, তাঁর গলা, 'এটা হল ডিভাইন গ্রেস। যে-টুকু ভেনাম রয়ে গেল দ্যাট ফট আউট ইরিসিপ্লাস। ইরিসিপ্লাসে কেউ সারভাইভ করেছে, দিস ইজ ভেরি রেয়ার।' ডক্টর সেনের গলা। কতদিন, কতক্ষণ আমার মাথার কাছে বসে আছেন জানি না। কাকিমা আমার কাছে এগিয়ে এলেন, 'চিনতে পারছো ?'

আমি একটু হাসলুম। চেহারা বেশ ভাল হয়েছে। গাল দুটো লাল। কুচকুচে কালো ছবির মেয়েদের মতো চুল। অনুমান করার চেষ্টা করলুম, কি ঘটে গেছে এই ক'দিনে ? মামা এসেছেন। ফিরে গেছেন। হরিশঙ্কর কোথায় তিনি জানতেন। তাঁকে নিয়ে এসেছেন। মুকু আর সুরঞ্জনা কেমন করে এলো !

অক্ষয়বাবু বললেন, 'একে আমরা পুনর্জন্ম বলতে পারি হরিদা।'

'ওটা তোমার মেয়েলী সাবজেক্ট অক্ষয়। আই বিলিভ ইন সায়েন্স। একে বলে চান্স সারভাইভাল। হয়ে গেছে। বেঁচে গেছে। অ্যান্ড দেয়ার ইজ সায়েন্স ইন ইট। তবে হ্যাঁ, সাপের ছোবলটা না খেলে কি হত ? বা শুধুই যদি সাপের ছোবল হত। উইদাউট ইরিসিপ্লাস। এ ম্যাটার অফ ইনভেস্টিগেশন ? লাক্ শব্দটা যখন বেঁচে থাকার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে, লেট আস অ্যাকসেপ্ট ইট। তবে, উই হ্যাভ এ ফাইন টিম হেয়ার। এ পারফেক্ট সেবাদল। ডাক্তার সেন আপনার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, জাস্ট ওয়ান ক্ল্যারিফিকেসান। স্নেকবাইটের রোগীকে কখনো ঘুমোতেদিতে নেই ; বাট হি ওয়াজ ইন এ কোমা। হাউ ক্যান ইউ এক্সপ্লেন ইট ?'

ডক্টর সেন হেসে বললেন, 'আই ডিডন্ট অ্যালাউ হিজ সিসটেম টু স্লিপ। কেপ্ট হিম অ্যাওয়েক ইনসাইড।'

হরিশঙ্কর হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'গেট আপ। গেট আপ। অনেক দিন শুয়ে আছো। অনেক সময় নষ্ট করেছো। অনেকের সময় নষ্ট করেছো। উঠে পড়ো। মনের জোর করো।'

কাকিমা বললেন, 'এখনো বড় দুর্বল। মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। ও উঠবে। ঠিক উঠবে। একটু খাওয়া দাওয়া করুক।'

জবার সঙ্গে চোখাচোখি হল। জবা কোনও কথা বলেনি। সাহস পায়নি বলার। রাত জাগার ছাপ মুখে। মনে মনে জবাকে নমস্কার করলুম। আমার জন্যে তুমি যা করলে, তার তুলনা নেই। এর কোনও প্রতিদান হয় না। সুরঞ্জনা বললে, 'আমরা তো সব আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। মেসোমশাই আপনার নার্ভ হল স্টিলের নার্ভ। আমরা এমন দেখিনি।'

হরিশঙ্কর বললেন, 'ডোন্ট ফোমেন্ট মাই ইগো। তোমার বাবার নার্ভও কিছু কম যায় না। কলকাতার দাঙ্গার সময় আমরা দেখেছি। আচ্ছা এইবার কাজের কথা। নাও উই হ্যাভ আর্নড এ গুড কাপ অফ টি। তোমরা বোসো, আমি করে আনি।'

জবা পাশ থেকে সামনে এসে বললে, 'আমি করছি, আপনারা বসুন।'

হরিশঙ্কর বললেন, 'এই একটা মেয়ে। নেভার গেটস টায়ার্ড। কেউ তোমাকে সাহায্য করুক তাহলে।'

সুরঞ্জনা বললে, 'আই ভলানটিয়ার।'

সুরঞ্জনা আর জবা একেবারে মাথায় মাথায়। দু'জন বেরিয়ে গেল। ডক্টর সেন উঠে দাঁড়ালেন, 'যাবার আগে একটা কথা বলে যাই, যদি ব্ল্যাক স্টুল হয়, ডোণ্ট গেট নার্ভাস।'

হরিশঙ্কর বললেন, 'জানি। আপনি চা খাবেন না ?'

'একসকিউজ মি। আমার একটু তাড়া আছে।'

হঠাৎ মনে হল, একজনকে দেখছি না কেন ? মেনিদা ? কাকেই বা জিজ্ঞেস করি ! সাহস হচ্ছে না। অক্ষয় কাকাবাবু বললেন, 'আমি তা হলে বড় করে একটা বাজার করে আনি।'

হরিশঙ্কর বললেন, 'অফ কোর্স। আজ আমরা খাবো।'

জয়নারায়ণ বললেন, 'নিশ্চয় শাক্তমতে ?'

'তুমি যখন আছ শাক্ত না হয়ে উপায় কি !'

মাথাটা তরল হয়ে গেছে, যেন টলটলে জলের মতো। গালে হাত দিলুম। দাড়ি। মুখটা চুপসে গেছে। টিপ একটু ফাঁক পেয়ে এগিয়ে এলো। প্রশ্ন করার আগেই বললুম, 'বেশ ভালই মনে হচ্ছে। জানো ? আর কোনও কষ্ট নেই।'

টিপ বললে, 'উঃ কি সাংঘাতিক কাণ্ড ! তুমি কিছু জানো, এই ক'দিন কি হল ?'

'বাইরে কি হয়েছে জানি না, ভেতরে যা হয়েছে তোমাকে একদিন বলব।'

মুকু কিন্তু কাছে ঘেঁষছে না। দূরেই দাঁড়িয়ে আছে। দেয়ালে পিঠ রেখে। গলায় তেমন জোর পাচ্ছি না। ওরই মধ্যে যতটা সম্ভব গলা চড়িয়ে বললুম, 'তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছে ?'

মুকু গম্ভীর গলায় বললে, 'ও সব কথা এখন থাক।'

তবে থাক। আমার চোখ বুজে আসছে আবার। ভীষণ দুর্বল। খালি বাড়ি আবার ভরে উঠেছে। বহু চরিত্রে সরগরম। কথা, শব্দ। কেউ যদি আমাকে এক কাপ চা দিত। চা যেন সুখ আর জীবনের প্রতীক। আমার জীবনের যত নারী সবাই আজ এক পরিচ্ছেদে সমবেত হয়েছে। পুরাকালে স্বয়ম্বর সভায় রাজকুমাররা আসতেন। রাজকন্যারা বেছে নিতেন যে-কোনও একজনকে। এই সভায় রাজকন্যারা এসেছেন। হরিশঙ্কর-কুমারকে বেছে নিতে হবে যে কোনও একজনকে। নিজেকেই নিজে তারিফ করলুম, ক্ষমতা রাখিস পিণ্টু ! শুয়ে শুয়ে কি খেলই দেখালি ! সেই সঙ্গীত :

চিড়েতন হর্তন ইস্কাবন
অতি সনাতন ছন্দে করতেছে নর্তন
কেউ বা উঠে কেউ পড়ে,
কেউ বা একটু নাহি নড়ে,
কেউ শুয়ে শুয়ে ভুঁয়ে করে কালকর্তন ॥

তাসের দেশের রাজা চেত্তা খেয়ে পড়ে আছে। তাও তার কত রোয়াব। কাকিমা খাটের তলা থেকে কি একটা বের করে বললেন, 'আজ কি তোমার বেডপ্যান লাগবে ? না বাথরুমে যেতে পারবে ?'

লজ্জায় কুঁকড়ে গেলুম। ছিছি। এ ক'দিন তাহলে শুয়েশুয়ে ভুঁয়ে বীরত্ব প্রদর্শন করেছি। লজ্জা ! ছিছি লজ্জা !

'আজ আমি মরে গেলেও বাথরুমে যাবো।'

'ঠাকুরপোকে জিজ্ঞেস করি, ভাল করে গরম জলে চান করো। তোমার জন্যে জবা যা করেছে কেউ কারোর জন্যে অমন করে না। আমরা তো স্রেফ দর্শকের মতো দেখেই গেলুম। এমন সেবা দেখা যায় না। ও না থাকলে তোমার কি হত ?'

'বাবা কি রাঁচিতে আপনাদের কাছেই ছিলেন !'

'না, কারোর আশ্রয়ে থাকার মানুষ উনি নন। সে তো তুমি জানোই।'

'তা হলে ?'

'কাছাকাছিই ছিলেন। পুরুলিয়ায়।'

'কার কাছে খবর পেলেন ?'

'পরে শুনো। তাঁর কাছেই শুনো। আমার বলা বারণ।'

সবাই যখন চলে গেলেন, মুকু এসে বসল আমার মাথার কাছে, 'খুব কাহিল হয়ে গেছো। আমার চলে যাওয়াটাই ভুল হয়েছিল। আমি থাকলে এই বিপদ তোমার ধারে কাছে ঘেঁষতে পারত না। আমি তোমার মাদুলি।'

'তুমি কোথায় ছিলে ?'

'সুরঞ্জনাদের বাড়িতে।"

'সুরঞ্জনা ? সুরঞ্জনার দাদা ফিরেছেন ?'

৩২

You stand upon the threshold of your Century.
Here is the Cradle in which you wept.
There lie the worlds that await you!

আবার জেগে উঠেছে প্রেতপুরী। ভেতর থেকে ভেসে আসছে মেয়েদের কলকাকলি। প্রবল শব্দে কে কাপড় থুপছে ? আমি চিৎ হয়ে পড়ে আছি বিছানায়। রান্নার সুবাস আসছে নাকে। দুর্বল শরীর স্বপ্ন দেখছে। অতীত যেন ফিরে আসছে। একঘরে জ্যাঠামশাই আর একঘরে বাবা। মা আর জ্যাঠাইমা হাসতে হাসতে গল্প করতে করতে কুটনো কুটছেন। রাঁধুনী বামুন তেলে ফোড়ন ছেড়েছেন। সুখী বেড়ালটা একপাশে থুপ্পি মেরে বসে আছে আধবোজা চোখে। কি সদ্ভাব, কি ভরভরন্ত চেহারা সংসারের। একটা হাবাগবা ইজের পরা ছেলে ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। লাল চকচকে মেঝে। চুনকাম করা সাদা দেয়াল। জ্যাঠামশাই নিঃসন্তান। সংসারের একটি মাত্র ছেলে ; তার কত আদর ! সুখ হল শিশিরের মতো। ভোরের নরম আলো যতক্ষণ, ততক্ষণই তার আয়ু। কাল এক নিষ্ঠুর ধুনুরি। সুখের তুলো সব পিঁজে দেয় তার যন্ত্র চালিয়ে। সবাই গেছে চলে, একটি মাধবী শুধু ···।

হরিশঙ্কর ঘরে এসে একটা চেয়ার টেনে খাটের পাশে বসলেন। স্থির চোখে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। অস্বস্তিতে চোখ নামিয়ে নিলুম। মানুষকে ভেদ করার ক্ষমতা আছে ওই চোখে। হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, 'কি বুঝলে ?'

প্রশ্নটারই অর্থ খুঁজে পেলুম না। বললুম 'আজ্ঞে।'

ফিসফিস করে বাতাসের শব্দে বললেন, 'ডানার জোর না থাকলে পাখি উড়তে পারে না। তোমার ডানায় এখনো সেই জোর আসেনি।'

একেই দুর্বল আমি, প্রখর সেই ব্যক্তিত্বের সামনে নিজেকে কীটের মতো মনে হতে লাগল। ভেতরে যেন ছেঁড়া ন্যাকড়া ঠাসা। যারা কাগজ কুড়োয় তাদের কাঁধের বস্তার মতো। সৎ, সাত্ত্বিক কোনও চিন্তা নেই। কেবল ঘিন ঘিনে দেহবাসনা।

'ডানা দুটো কি বলো তো ? ভেবেছ কোনওদিন ? ভাবার অবসর হয়নি আদর্শ ও চরিত্র। আদর্শ কাকে বলে ? সমস্ত জীবনের স্বাভাবিক পরিণতির দিকে নজর রেখে সফল জীবনের ছক তৈরি করা। চরিত্র হল, অভ্যাসের দাসত্ব না করা। নৌকোর দাঁড় দেখেছ ? দুপাশে দুটো। একই সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে চলে, জলে ওঠাপড়া করে। মন আর আদর্শ এই দুটো হল দাঁড় আর সংযম হল দাঁড় বাইবার তাল, ছন্দ। কোনওটাই তোমার আয়ত্তে আসেনি। নিজেকে দর্শন করার ক্ষমতাটাও জাগাতে পারোনি। তোমার এখনো চোখ

ফোটেনি। কুকুরের ছানা দেখেছো ? সবে জন্মেছে। চোখ ফোটেনি। মায়ের কোলের কাছে সব কটা একসঙ্গে তালগোল পাকাচ্ছে। একটাই প্রবৃত্তি, দুধ খাবে, কিন্তু অন্ধ। গুঁতো গুঁতি। হঠাৎ ঠোঁটে এসে গেল তো গেল।চোখ নেই, লক্ষ্য নেই, পরিকল্পনা নেই—আছে প্রবৃত্তি। তুমি সেই দৃষ্টিহীন কুকুরশাবক। প্রবৃত্তিমার্গে অন্ধের মতো তালগোল পাকাচ্ছ। শুনতে তোমার খারাপ লাগছে। তোমার ফ্যাকাসে মুখ আরো ফ্যাকাসে হয়ে উঠছে, কান্ট হেল্প। তোমাকে সুযোগ দিয়েছিলুম, নিজের মতো চলার। ইউ হ্যাভ ফেল্‌ড মিজারেবলি। কানা মাছির মতো ঘুরপাক খেয়েছো। সাধনা করবে, সাধক হবে। সাধনা কাকে বলে ? হোয়াট ইজ দ্যাট ? কোনও ধারণা আছে ? এনি আইডিয়া ? প্রবেবলি নট। টেল মি, সাধু কাকে বলে ?'

হাঁ করে তাকিয়ে রইলুম তাঁর মুখের দিকে। এতদিনের জমে থাকা সব তিরস্কার একসঙ্গে নেমে আসছে। সাধু কাকে বলে ? কোনও সংজ্ঞা খুঁজে পাচ্ছি না। গেরুয়া ? সংসার ত্যাগ ? কোনটা ? আশ্রম ? ধ্যানধারণা ? নিরামিষ আহার ? মাথায় আসছে না।মিউ মিউ করে বললুম, 'কাকে বলে ?'

হরিশঙ্করের ঠোঁটের কোণে সামান্য একটু হাসি খেলে গেল, 'খুব সহজ আবার খুবই কঠিন সাধনার পথ। স্মৃতি কাকে বলে জানো ?'

আমি যেন ইন্টারভিউ দিতে বসেছি। কোনওরকমে বললুম, 'মনে রাখাটাই স্মৃতি।'

হরিশঙ্কর মৃদু হেসে বললেন, 'প্রায় হয়েছিল। শুধু একটা একারের জন্যে হল না। মনে রাখা নয় মন রাখা। কোথায় রাখবে ? রাখবে নিজের কর্ম, নিজের প্রবৃত্তির ওপর। মনের তিন অবস্থা, সঙ্কল্পক মন, অস্মিতা বা অহঙ্কার মন আর বুদ্ধিতত্ত্ব বা মহত্তত্ত্ব মন।এই তিনটে আলাদা আলাদা নয়। এক জায়গায় জড়াজড়ি হয়ে বসে আছে। কেমিস্ট্রির ছাত্র তুমি। তোমার সহজেই বোঝা উচিত। একে বলে, কম্পাউন্ড বা যৌগ। সাধকের কাজ হল বিশ্লেষণ। তিনটেকে আলাদা করে বোঝার স্থির চেষ্টা। সঙ্কল্প যেখানে ওঠে তাকে বলা হয় মন। এর ঠিক ওপরের যে 'আমি'-বোধ তাকেই বলা হবে অস্মিতা বা অহঙ্কারতত্ত্ব। সেইটাই আমাদের প্রথম আমিত্ববোধ। এই আমির নিয়ন্ত্রণে আমাদের সমস্ত কাজ। এক মহাসাধকের সুন্দর একটি উদাহরণ শোনো। এক গৃহকর্তার পাঁচজন ভৃত্য। কর্তা সবার ওপরে থেকে সকলকে খাটান। সকলের কাজকে সুসমঞ্জস করেন। একজন মালী হয়ত গাছ লাগালে, আর একজন তাতে জল দিলে, একজন চারপাশের আগাছা উঠিয়ে ফেললে। এমন কখনই হবে না, একজন যখন গাছ লাগাল, অপরজন এসে তা উপড়ে দিল। এই যে সকলে মিলেমিশে কাজ করে, তার একটাই কারণ, ওপরে একজন কর্তা, একটা আদর্শ, একটা নির্দেশ আছে। মনের ওপরের স্তর থেকে নিচের স্তরের দিকে লক্ষ রাখাটাই হল সাধনা। ধরো আমার মনে রাগ আসছে। সাধারণ মানুষ রেগে সব তছনছ করবে। সাময়িক উন্মাদ হয়ে যাবে।সাধকের কি হবে ? সঙ্গে সঙ্গে ওপরের মন টের পাবে, আমি রাগতে চলেছি। রাগ আমার ক্ষতি করবে। আমি রাগব না। আমার ভোগবাসনা আসছে, আমি ভোগ করব না। আমার আলস্য আসছে, আলস্যে গা ঢেলে দেবো না। সঙ্কল্প করা আর সঙ্কল্প রক্ষা করাই হল, নিচের মনের ওপর ওপরের মনের নিয়ন্ত্রণ। একেই বলে স্মৃতি সাধনা। তুমি মানুষ, তোমার নিচের স্তরে অস্থিরতা থাকবে। তা থাকুক, ক্ষতি নেই, কিন্তু ওপরের স্তর থেকে যেন লক্ষ থাকে। স্বস্থ মানে আত্মস্থ, আত্মস্থ মানে আমি কি করছি তা লক্ষ রাখা। রাগে আত্মভাব হারিয়ে ফেলছি। ভাঙছি, চুরছি, গালাগাল দিচ্ছি। কাজটাই সেখানে বড় হয়ে উঠছে আর যে কাজ করে সেই আমি হয়ে যাচ্ছে তার ভৃত্য। সাধু কে ?

না যিনি তাঁর নীচ প্রবৃত্তির ভৃত্য নন। বৌদ্ধদের নিধ্যান আর সম্প্রজন্য সাধনও এইরকম। নিধ্যান মানে ভেতরে ভেতরে স্মরণ করা। অভীষ্ট স্থির করো। অভীষ্ট চিন্তা করো। অভীষ্ট কি তা বলা হল না। সেটা তোমাকেই বেছে নিতে হবে। সবকিছু থেকে নিজেকে আলাদা করে দেখতে থাকাটাই হল স্মৃতিসাধন। তোমার পক্ষে কি স্বস্থ থাকা সম্ভব ? ঈশ্বর তোমার ভেতরেই আছেন। সদা বসন্তং হৃদয়ারবিন্দে। স্বস্থ না হলে দর্শন তো পাবে না বাপু। তুমি তো অস্থির ! তুমি তো তোমার দেহের ভৃত্য। তোমার প্রবৃত্তি তো তোমাকে বাঁদর নাচ নাচাচ্ছে। কি ? শুনতে খুব খারাপ লাগছে তাই না ?'

'আপনি কোনও দিনই আমার মধ্যে ভাল কিছু দেখতে পাননি।'

'তা বটে। তোমাকে তো আমি সুযোগ দিয়েছিলুম, তুমি তোমার আশ্রমে গেলে না কেন ? কেন এই বাড়িতে নববৃন্দাবন খুলে বসলে ? তোমার জন্যে এই বাড়িতে একটা আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে গেল। এই কেন-র কোনও সন্তোষজনক উত্তর কি তুমি দিতে পারবে ?'

'আমি আপনার অপেক্ষায় ছিলুম।'

'তাহলে আমি যখন তোমার হাত ধরেছিলুম, তখন তুমি সেই হাত ছাড়িয়ে নিয়েছিলে কেন ?'

'ভেবেছিলুম আমি লায়েক হয়ে গেছি, তারপর দেখলুম আমি একেবারে অসহায়। আমি কোনও ডিসিসান নিতে পারি না, ভীতু। অতীত আর স্মৃতির মধ্যে বসে প্যান প্যান করে কাঁদি। আপনি যতদিন ছিলেন না,প্রতি মুহূর্তেই বলেছি, ও ফাদার ! টেক মাই হ্যান্ড। আপনি ছাড়া আমার জীবন অচল।'

হরিশঙ্কর আমার কপালে হাত রাখলেন। তাঁর চোখ দুটো এইবার ছলছল করছে। আমার শরীরে অদ্ভুত এক অনুভূতি খেলছে। শক্তির এক তরঙ্গ। প্রবল এক ইচ্ছার স্রোত। হাত যেন নীরব ভাষায় বলছে, উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ॥ জীবনের একেবারে নিচের তলায় ইন্দ্রিয় সুখভোগের লালসায় পড়ে আছ। ওঠো। উচ্চজ্ঞান, উন্নত জীবনলাভের চেষ্টা করো। আত্মজ্ঞানে জ্ঞানী হও। নিজের চেষ্টায় হয়ত পারবে না। টেক মাই হ্যান্ড। আমার হাত ধরো। পথ যতই দুর্গম হোক আমি তোমাকে নিয়ে যাবো।

আমার হাত রাখলুম কপালের সেই হাতে। মনে মনে অনুভব করলুম এই সেই হাত, যে হাত কখনো কোনও অপবিত্র কাজ করেনি। কারোর কাছে নতি স্বীকার করেনি। আত্মবিশ্বাসে ইস্পাত কঠিন। প্রবল একটা শক্তির ধারায় আমি স্নাত হলুম। সমিধের অভাবে যে যজ্ঞাগ্নি নির্বাপিত হয়ে এসেছিল, সেই আগুন আবার লকলকিয়ে উঠল। হরিশঙ্কর যেন উপনিষদের উদ্যত বজ্র পুরুষ ! কি আশ্চর্য ! একটা সদ্ভাবের প্লাবন বয়ে চলেছে ভেতরে। কে যেন ভেতরে বসে বেদগান করছেন। প্রাণাগ্নয় এবৈতস্মিন পুরে জাগ্রতি। স্পর্শে প্রাণ অগ্নি জ্বলে উঠল। আঙুলে আঙুল জড়িয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ।

জামা শুকোতে দেবার গোটাকতক হ্যাঙ্গার নিয়ে জয়নারায়ণ ঘরে ঢুকে বললেন, 'রেকনসিলিয়েসান হচ্ছে। বাঃ জাহ্নবী ও যমুনার মিলন ! ঠিক এই মুহূর্তে পাখোয়াজের সঙ্গে ধ্রুপদ গাইতে ইচ্ছে করছে।'

'করলে কি হবে ? তুমি তো বাজে কাজে ব্যস্ত হয়ে আছ।'

জয়নারায়ণ শিশুর মতো মুখ করে বললেন, 'না না, আমি তো মেয়েদের দলে ঢুকে গজালি করছি না। একগাদা জামা কাপড় কাচলুম ; আর তারই ফাঁকে ফাঁকে একটু কথা

বলছিলুম।'

'জামাকাপড় মেয়েরা কেচে দিতে পারছে না ?'

'বলেছিল। অফার দিয়েছিল। আমি পারি না। নিজের জামাকাপড় অন্যে কেচে দেবে ভাবলেও কেমন লাগে।'

'দ্যাটস গুড। চরিত্রটা তাহলে ঠিক রাখতে পেরেছ এখনো। ক্লীব হয়ে যাওনি !'

জয়নারায়ণ লাজুক হেসে বললেন, 'এতদিনে আপনার কাছ থেকে একটা গুড ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট পেলুম। না, গান না গেয়ে আর থাকা যাচ্ছে না। দিস ইজ হাই টাইম লাইক হাই টাইড।'

'তাহলে বসে পড়ো, আমি তোমার সঙ্গে তবলায় বসছি।' হরিশঙ্কর উঠে পড়লেন। জয়নারায়ণ হ্যাঙ্গার কটা বিছানার একপাশে রেখে মেঝেতে মাদুর বিছলেন। হারমোনিয়াম এসে গেল। জয়নারায়ণ ধ্যানস্থ হলেন। হরিশঙ্কর তবলায় হাতুড়ির ঠুকঠাক শুরু করলেন। জয়নারায়ণ হারমোনিয়ামে হাত রাখলেন। এক ঝলক সুর খেলে গেল ছররার মতো। প্রথমেই নেমে এল সংস্কৃত স্তোত্র। যেমন গলা তেমন সুর,

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোহয়মগ্নিঃ।

তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥

কঠোপনিষৎ-এর এই শ্লোকটি স্বামীজির অতি প্রিয় ছিল। সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, জ্যোতিষ্মান যত কিছু সবই ব্রহ্মের কাছে নিষ্প্রভ। ব্রহ্মের আলোয় সবকিছু আলোকিত। ব্রহ্মের জ্যোতিতেই জগৎ আলোকিত। মাতুল জয়নারায়ণ নিমেষে তৈরি করে ফেললেন তপোবন। হরিশঙ্কর স্তব্ধ। জয়নারায়ণ আড়া ঠেকায় গান ধরলেন। স্বামীজীর সেই বিখ্যাত রচনা,

নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর,

ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব-চরাচর।

বিছানায় উঠে বসলুম। মেয়েরা কাজ ফেলে ছুটে এসেছে। অক্ষয়কাকাবাবু রাঁধছিলেন মনে হয়, কোমরে গামছা জড়ানো, হাতে খুন্তি। পথ দিয়ে যেতে যেতে এক সমঝদার, আহা আহা করে উঠলেন। আমার ভেতরে অন্যলোকের দরজা খুলে গেল। আরো দুজন ঘরে এসে ঢুকলেন, যাঁদের এই সময় আসার কথাই নয়। আশ্চর্য ব্যাপার। একজন হরিদ্বারের সেই সন্ন্যাসী। অন্যজন মেনিদা। তবলা বাজাতে বাজাতে হরিশঙ্কর মাথা নত করে নমস্কার জানালেন। কাকিমা একটা আসন পেতে দিলেন সন্ন্যাসীকে। মেনিদা মেঝেতেই বসে পড়লেন।

মাতুল এক গান থেকে আর এক গানে চলে গেলেন। এইবার একতালা বাউল, 'আর কেন মন এ সংসারে, যাই চল সেই নগরে/যেথা দিবানিশি পূর্ণশশী আনন্দে বিরাজ করে ॥' সঙ্গে সঙ্গে মেনিদার পকেট থেকে খঞ্জনি বেরিয়ে এল। সে কি গান ! সকলেরই মাতোয়ারা অবস্থা। আনন্দের বন্যা বইছে। দক্ষিণের খোলা জানালা দিয়ে মাঝে মাঝে গরম বাতাসের ঝলক খেলে যাচ্ছে। এমনই তালের খেলা আমার পা দুটো নাচতে চাইছে। একসময় শেষ হল গান। সবাই সন্ন্যাসীকে প্রণাম করছেন। আমি প্রণাম করতেই মৃদু হেসে বললেন, 'বেটা বাঁচ গিয়া।'

অবাক হবারই কথা। জানলেন কেমন করে ! দেখা গেল সবই তিনি জানেন, যা যা ঘটেছে। ছবির মতো বলে গেলেন সব। এমনকি সাপের ছোবল। শেষে বললেন, 'বেটা তোমার মৃত্যু হত। তাই আমি তোমাকে অমৃত ফল খাইয়ে গিয়েছিলুম। তা হলে শোনো

অদ্ভুত এক ঘটনার কথা।' স্বপ্নে নয়, সন্ন্যাসীর আশ্রমে দিব্য শরীরে আমার মাতামহ দর্শন দিয়ে বলেছিলেন, নাতিটার একটা বিপদ আসছে, আপনি একটা কিছু করুন। আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি, বাকিটা প্রভুর কৃপা।

হরিশঙ্কর জানতে চাইলেন, 'অমৃত ফলটা কি ? আপনার কাছে আর একটা আছে ? তা হলে অ্যানালিসিস করে দেখতুম, অ্যাকটিভ ইনগ্রিডিয়েন্টস কি আছে ? বিজ্ঞানের উপকার হত।'

সন্ন্যাসী বললেন, 'হিমালয়ের ফল হিমালয়েই থাক। সাধুসন্ন্যাসীদের সহায়। ও জেনে কোনও লাভ নেই। দুর্গমের ফল দুর্গমেই থাক। আমাদের কাজ হয়ে গেছে আবার কি। আর তো আমাদের প্রয়োজন নেই। সোমরস ছিল। ফর্মুলা ইজ লস্ট। সমুদ্রমন্থনে অমৃত উঠেছিল। সেই অমৃতের ফর্মুলা কি ? জেনে লাভটা কি হবে ? আমরা তো ব্যবসা করব না। তবে আপনি সায়েন্টিস্ট, আপনার কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক।'

'অলৌকিককে আমি লৌকিকে আনতে চাই, যাতে জড়বাদীরা ধাপ্পা বলে উড়িয়ে দিতে না পারে।'

'দরকার নেই। অবিশ্বাসীরা অবিশ্বাসীই থাকুক। দ্যাট ইজ গড্‌স ডিজায়ার।'

জয়নারায়ণ বললেন, 'মহারাজ আপনি আমার বাবাকে দেখলেন ? কেমন আছেন তিনি ? কোথায় আছেন ?'

মামা এমন আকুল হয়ে প্রশ্ন করলেন, যেন সাধুজী ঠিকানাটা বললেই তিনি এখনি ছুটে যাবেন দেখা করতে। কিন্তু সে এমন একটা জায়গা যেখানে দেহ নিয়ে যাওয়া যায় না। দেহ ফেলে যেতে হয়। সেই লোকের অধিবাসীরা মায়াদেহ ধারণ করে হয়তো আসতে পারেন।

সন্ন্যাসী বললেন, 'তিনি কোন লোকে আছেন বলা সম্ভব নয়। জীবনের পরপারে অনন্ত লোক। কেই বা জানে তার কথা, সবই কল্পনা, সবই অনুমান। মৃত্যু আর পুনর্জন্ম এই বৃত্তাকার পথে আত্মার ভ্রমণকে চীন ও তিব্বতী ধর্মশাস্ত্রে বলে বার্দো জার্নি। ভারী সুন্দর ধারণা। মৃত্যুর পর দেহমুক্ত আত্মা পরলোকের পথ ধরে ভ্রমণে বেরোয়। একটা পাক মেরে ফিরে আসে মাতৃজঠরে। এই স্বাধীন ভ্রমণে তাঁরা আমাদের কাছে আসতে পারেন, আমরা যেতে পারি না, কারণ আমরা দেহে আবদ্ধ, পৃথিবীর নিয়ম মেনে আমাদের চলতে হয়।'

জয়নারায়ণ জিজ্ঞেস করলেন, 'তিনি কি আবার জন্মগ্রহণ করবেন ?'

'সেটা তাঁর ইচ্ছে। যদি করেনও আমরা জানতে পারব না। তিব্বতী সাধকদেরই সেই ক্ষমতা আছে। আমাদের নেই। কি আর করা যাবে। বৌদ্ধরা বেশ মজা করেছেন। তাঁরা ফর্ম, মানে জীবাকারকে বলছেন 'সে', আর শূন্যকারকে বলছেন 'কুং', এইবার দুটি অবস্থাকে একটি সূত্রে গেঁথেছেন। সেই সূত্রের নাম হৃদয়সূত্র। সেই সূত্রে সব একাকার, That which is form is just that which is emptiness. আমরা আছি, আকার, আকৃতি, দেহ, জীব, বস্তু, আছি শূন্যতাকে ঘিরে। একটা বুদবুদ। ভেতরটা ফাঁকা, and that which is emptiness is just that which is form. বেটা, হোয়াট ইজ এ উইন্ডো, হোয়াট ইজ এ ডোর ? একটা ফাঁকা জায়গা। এ প্যাচ অফ এম্পটিনেস, কিন্তু প্রয়োজনীয়। দরজা আর জানলা ছাড়া ঘর হয় না, অ্যান্ড ইউ মেক ইট। প্ল্যান করে তৈরি করা হয়। একটা ফর্ম কিন্তু শূন্য। নাথিং ইজ দেয়ার। আকার নিরাকার, নিরাকার আকার, দুটোই সত্য দুটোই মিথ্যা অ্যান্ড ভেরি ইন্টারেস্টিং। বেটা, আমি এখন যাই। দেখা করে গেলুম। আবার কবে আসবো জানি না।'

হরিশঙ্কর বললেন, 'আজ আপনাকে কিছু গ্রহণ করতে হবে।'

'করেছি। সঙ্গীত। আর কিছুর প্রয়োজন নেই। ওটা বাহুল্য। ভাল থাকুন। বি হ্যাপি।' সন্ন্যাসী চোখ বুজিয়ে স্থির হয়ে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। কেউ পেলেন কি না জানি না, আমার নাকে একটা সুগন্ধের ঝাপটা এল।

সন্ন্যাসী আঙুল দিয়ে মেঝেতে একটা ত্রিভুজ এঁকে আসন ছেড়ে উঠে পড়লেন। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকার পর বললেন, 'নিজেকে জানতে চান ? দি স্টাফ, হুইচ ইউ আর মেড অফ !'

সবার আগে মাতুল উৎসাহী হলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই জানতে চাই।'

হরিশঙ্কর বললেন, 'কি ভাবে জানা যাবে ?'

সন্ন্যাসী হেসে বললেন, 'জাস্ট পুট ইওর ফার্স্ট ফিঙ্গার অন দি সেন্টার অফ দি ইম্যাজিনারি ট্রাংগল।' মাতুল আঙুল দিতে গিয়েও থমকে গেলেন। সন্ন্যাসী বললেন, 'টাচ ইট।'

জয়নারায়ণ আঙুল ছোঁয়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে মুখের চেহারা করুণ হয়ে উঠল। কতদিনের বেদনা ফুটে উঠল মুখে। জলে ভরে এল চোখ। অসীম বিষণ্ণতায় নিমজ্জিত হলেন।

সন্ন্যাসী বললেন, 'ইউ আর মেড অফ সরো। দুঃখ দিয়ে তৈরি। দুঃখের পথেই রিয়েলাইজেশান।'

একে একে সবাই এগিয়ে এলেন। আঙুল রাখলেন অক্ষয়কাকাবাবু। ছটফট করে উঠলেন। সন্ন্যাসীর দিকে তাকালেন। তিনি বললেন, 'এনারজি'। মুকু হাত ছোঁয়ালো। পাথরের অহল্যার মতো বসে রইল কিছুক্ষণ। সন্ন্যাসী বললেন, 'তুমি রিজিডিটি। অনমনীয়তা দিয়ে তৈরি।' সুরঞ্জনার পালা এল। আঙুল ছুঁইয়েই সে টানটান খাড়া। কে যেন তাকে ওপর দিকে টানছে। ধারালো মুখ আরো ধারালো। সন্ন্যাসী বললেন, 'ইউ আর অল অ্যাম্বিশন। তুমি বড়, আরো বড় হতে চাও।' আমার পালা এল। ভয়ে ভয়ে আঙুল রাখলুম। সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরটা কুঁকড়ে ছোট হয়ে এল। জমির সঙ্গে মিশে যেতে চাইছে। সন্ন্যাসী বললেন, 'ইউ আর মেড অফ ফিয়ার। তোমার উপাদান হল ভয়।' এইবার হরিশঙ্কর। আমরা তাকিয়ে আছি। অসীম কৌতূহল। এমন একজন বজ্র পুরুষের সত্তাটা কি ? কি দিয়ে তৈরি। হঠাৎ মেনিদা বললেন, 'আমি আগে সেরেনি।' হরিশঙ্কর বললেন, 'অল রাইট। সব শেষে আমি।' মেনিদা আঙুল রাখলেন। পাগলের মতো হাসতে লাগলেন। সন্ন্যাসী বললেন, 'হি ইজ এম্পটি। এ ম্যান উইদাউট সোল।' এইবার হরিশঙ্কর। তাঁর প্রথম আঙুল ধীরে ধীরে এগোচ্ছে ত্রিভুজের দিকে।

৩৩

যেন রে তোর হৃদয় জানে হৃদয়ে তোর আছেন রাজা
একতারাতে একটি যে তার আপন-মনে সেইটি বাজা

উৎকণ্ঠা তো বটেই। হরিশঙ্কর আঙুল রাখবেন ত্রিভুজে। কি প্রকাশ পাবে তাঁর স্বভাবে ! নিষ্ঠুরতা, দয়া, মায়া, জ্ঞান ! চরিত্রের কোন দিকটা প্রবল হবে ! সন্ন্যাসী কি দেখবেন তাঁর ভেতরে ! হরিশঙ্করের স্থির, অকম্পিত আঙুল কাঙ্ক্ষিত স্থান স্পর্শ করল। তাঁর ঋজু শরীর আরও ঋজু হল। মুখে একটা জ্যোতি। যেন একটা বিদ্যুৎ-তরঙ্গ খেলছে শরীরে। মনের বা চোখের ভুল কি না জানি না, আঙুল ভূমি স্পর্শ করামাত্রই একটা স্পার্ক খেলে গেল। এমনও হয় নাকি ! চোখের দেখা আর মনের বিশ্বাসকে এক করতে পারছি না। তবে আমার নিজের অভিজ্ঞতা, হরিশঙ্কর স্থির দৃষ্টিতে কারোর দিকে তাকালে তার আর নড়বার চড়বার ক্ষমতা থাকে না। আমার মনে আছে, একবার একটা মরচে-ধরা টিনের কৌটোর ঢাকনা কিছুতেই খোলা যাচ্ছিল না, অথচ তার মধ্যে একটা কেমিক্যালস ছিল, যেটা খুবই জরুরি প্রয়োজনের। আমরা সবাই ব্যর্থ হলুম। হরিশঙ্করও প্রথমটায় পারলেন না। সকলেই রায় দিলেন, ঢাকনা এমন আঁটা এঁটেছে ও আর খোলা যাবে না। হরিশঙ্করের চোখে একটা স্পার্ক খেলে গেল। মুখের চেহারা পাল্টে গেল। কৌটোটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলেন স্থির হয়ে, তারপর মারলেন এক টান। ঢাকনা খুলে গেল। একবার একটা ড্রয়ারের তালা খুলছিল না। সবাই পরাজিত। হরিশঙ্কর চাবি ঢোকালেন, ঘোরানো মাত্রই খুলে গেল। সবাই জিজ্ঞেস করলেন, কি করে হল ? হরিশঙ্কর অদ্ভুত উত্তর দিয়েছিলেন, তোমরা খুলবে না ভেবে চাবি ঘোরাচ্ছিলে, আর আমি ঘুরিয়েছিলুম খুলবে ভেবে। এই সামান্য তফাত। বলেছিলেন, দেশলাই কাঠি জ্বালাবার আগেই যদি ভাবো নিবে যাবে, তাহলে নিববেই ; আর সেটা যদি একেবারেই ভুলে যাও কাঠি কখনোই নিববে না। একে বলে অ্যাপ্রোচ। একে বলে উইল। দুটো কথা আছে, আই ক্যান আর আই ক্যান নট। আমি পারি আর আমি পারি না। একটা শক্তি আর একটা দুর্বলতা। হরিশঙ্কর একটা উদাহরণ দিয়েছিলেন, কাউন্ট মেরালের উদাহরণ। ইতালির এক মাননীয় মানুষ। হাত অথবা চিরুনি ছাড়াই তিনি চুল আঁচড়াতে পারতেন যেমন খুশি। যেদিকে খুশি টেরি বাগাতে পারতেন। ইচ্ছাশক্তির উদাহরণ। আর একটা গল্প বলেছিলেন জন কাউপারের। নিউ ইয়র্কে ওয়েস্ট ফিফটি সেভ্‌নথ স্ট্রিটে কাউপারের এক অন্তরঙ্গ বন্ধু থাকতেন। তাঁর নাম ছিল ড্রেইসার। কাউপার রোজ বিকেলের দিকে

তাঁর বাড়িতে আসতেন। কাউপার তখন হাডসান নদীর ধারে ছোট একটা গ্রামে থাকতেন। প্রায় তিরিশ মাইলের দূরত্ব। বেলাবেলি বন্ধুর বাড়িতে ডিনার শেষ করে ট্রেন ধরে তিনি ফিরে যেতেন গ্রামে। একদিন ডিনার শেষ হয়ে যাবার পর দুই বন্ধুতে খুব গল্প হচ্ছে। কাউপার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন, কথায় কথায় সময়ের খেয়াল ছিল না। তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন। আর বসলে ফেরার ট্রেন পাবেন না। বন্ধু একটু হতাশ হলেন। গল্প বেশ জমেছিল। কাউপারকে ছাড়তে ইচ্ছে করছিল না। কাউপার বিদায় নেওয়ার আগে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, মনখারাপ করো না, আমি আজই আবার আসছি তোমার কাছে। বন্ধু বললেন, চলে গেলে আবার আসবে কি করে, সেই তিরিশ মাইল দূর থেকে ? কাউপার বললেন, তা জানি না, তবে আমি আসবো। তোমার সামনে এসে দাঁড়াবো আমি ।ড্রেইসার বন্ধুর কথা কিছুই বুঝলেন না। কাউপার চলে যাওয়ার পর বই নিয়ে বসলেন। ঘণ্টা দুই কেটে গেছে। হঠাৎ কি খেয়াল হল দরজার দিকে তাকালেন। অবাক কাণ্ড। দরজা আর ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় কাউপার দাঁড়িয়ে আছেন। স্পষ্ট। কোনও-ভুল নেই। ড্রেইসার তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে বন্ধুর দিকে এগিয়ে গেলেন। জন, তুমি তোমার কথা রেখেছো ।এসো, এসো। বন্ধুর হাত ধরার জন্যে নিজের হাত বাড়িয়ে দিলেন। কাউপার কোনও কথা বলছেন না। ড্রেইসার যখন আরো কাছে গেলেন, দূরত্ব মাত্র তিন ফুট। কাউপার হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ড্রেইসার প্রথমটায় ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। পরে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বন্ধুকে টেলিফোন করলেন। কাউপারের গলা ভেসে এল। ড্রেইসার এই গলার সঙ্গে পরিচিত। কাউপার বললেন, আমি তোমাকে বলেছিলুম যাবো। তুমি তার প্রমাণ পেয়েছ। এর বেশি আর আমাকে কিছু জিজ্ঞেস কোরো না। গল্প শেষ করে হরিশঙ্কর বলেছিলেন, প্রবল ইচ্ছাশক্তিতে মানুষের পক্ষে অ্যাস্ট্রাল প্রোজেকসানও সম্ভব। হরিশঙ্কর নিজেও তা পারেন, যেমন পারতেন যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী মশাই। অস্বীকার করেন, কিন্তু আমার কাছে অজস্র প্রমাণ আছে। হালফিল তার প্রমাণ পেয়েছি। আমার রোগশয্যায় মাথার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। স্বপ্ন নাও হতে পারে।

হরিশঙ্করের উজ্জ্বল মূর্তির দিকে তাকিয়ে সন্ন্যাসী বললেন, 'ইউ আর অল পাওয়ার ভাইব্রেটিং ইন এ ডিভাইন প্লেন। সাবাশ বেটা। সাইলেন্টলি চালিয়ে যাও তোমার সাধনা। জল একটু বেশি খাবে। চিৎ হয়ে শোবে, অ্যান্ড ইউস এ ব্ল্যাঙ্কেট। হোয়াইট ছাড়া কিছু পরবে না। তোমার ইস্ট হলেন লর্ড ভিষ্ণু।'

সন্ন্যাসী হাত দিয়ে সেই অদৃশ্য ত্রিভুজ মুছে দিলেন। তারপর হাত জোড় করে সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই আমাদের শেষ দেখা, আপনারা সবাই ভাল থাকুন। ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করুন।' সন্ন্যাসী সিঁড়ির দিকে এগোলেন। মেনিদা বললেন, 'আমি একটু এগিয়ে দিয়ে আসি। আর তো দেখা হবে না।'

জয়নারায়ণের গবেষণা শুরু হল, ব্যাপারটা কি ? এমনও হয় নাকি ! জাদু ? হিপনোটিজম ? হরিশঙ্কর বললেন, 'প্লেন অ্যান্ড সিম্পল সাইকোলজি। চালপড়া বলে একটা জিনিস আছে জানো ? চালপড়া খাইয়ে চোর ধরা। যে চোর তার মুখে চাল ভিজবে না। শুকনোই থেকে যাবে। ভয়ে থুতু বেরোবে না। মুখ শুকনো কাঠ। মনস্তাত্ত্বিক কারণে। এও সেইরকম। আমরা সবাই আত্মসচেতন হয়ে উঠেছিলুম। নিজের ভেতরটাকে দেখার চেষ্টা করছিলুম, যেটা সব সময় আমাদের বাইরের তুচ্ছতায়

চাপাই পড়ে থাকে, খড়ের গাদায় ছুঁচের মতো। ধরো মানুষ একটা মটোর গাড়ি, তার দু'জন চালক। একজন বসে আছেন সূক্ষ্মে, অন্য জন স্থূলে। স্থূলে যিনি আছেন তাঁর ভূমিকা হল মেন্টিনেন্স ইঞ্জিনিয়ারের। তাঁর নিয়ন্ত্রণে, আমাদের নিদ্রা, আমাদের স্মৃতি, পরিপাকযন্ত্র ও পরিবর্জন ব্যবস্থা। সূক্ষ্ম মনের উপস্থিতি আমরা ভুলেই যাই। স্থূলের কাজকর্মের দিকেই আমাদের নজর। সরষের ভেতর তেল আছে। বোঝার উপায় নেই। পিষতে হবে। ঘোলে মাখন আছে, মন্থন করতে হবে, মেহেদিতে রঙ আছে বাটতে হবে। একটা মোহর পড়ে আছে এক বালতি ঘোলা জলে। দেখার উপায় নেই। ফটকিরি ফেলে জল পরিষ্কার করে নাও সব দেখতে পাবে। শান্ত হয়ে বোসো। স্থূলের ক্রিয়া থেকে চিন্তা তুলে নাও। স্থির হও আর তখনই দেখতে পাবে সূক্ষ্মকে। সেই সূক্ষ্মেই আছে আমাদের স্বভাব। সন্ন্যাসী অলৌকিক কিছুই করলেন না, কায়দা করে আমাদের স্বরূপ দর্শন করালেন। একসঙ্গে এতজনকে দীক্ষা দিয়ে গেলেন। ভাবে বলে গেলেন, অখণ্ডং সচ্চিদানন্দমবাঙ্ মনসগোচরম। আত্মানম্ অখিলাধারম্ অভীষ্টসিদ্ধয়ে আশ্রয়ে। চিত্তের অনন্তবৃত্তি। স্টপ ইট। আত্মাতে যুক্ত হও। সিট স্টিল অ্যান্ড মেডিটেট। আমরা যা করলুম তা এক ধরনের ধ্যান। করেছি এক মহাশক্তির উপস্থিতিতে। নিজেরা করলে অত সহজে হত না। ওইটাই হল সন্ন্যাসীর সম্মোহন। সাপকে ঝাঁপিতে এক কথায় ঢোকাতে পারেন বেদে। সন্ন্যাসী সেই বেদে। আমি বোধ হয় একনাগাড়ে বহুক্ষণ বকবক করছি! আমার স্বভাববিরুদ্ধ কাজ। ছি ছি তোমরা কি মনে করছ। আই বেগ টু বি একস্‌কিউজড ফর মাই অসভ্যতা। এজ হ্যাজ মেড মি এ ফুল। তা না হলে কেনই বা ভুলে যাবো, নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। একমাত্র প্রবল ইচ্ছাশক্তিতে মানুষ নিজের শক্তিকে খুঁজে পেতে পারে!'

হরিশঙ্কর উঠে পড়লেন। শ্যালক জয়নারায়ণ বললেন, 'অপূর্ব পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। আরও কিছুক্ষণ চললে বেশ হত। আর কতকাল নিজেকে লুকিয়ে রাখবেন। আসুন আমরাও এইবার শুরু করি। এই পানসে সংসার থেকে বেরিয়ে যাই। শ্যামা সুধা তরঙ্গিণীতে ভেসে যাই।'

হরিশঙ্কর বললেন, ' "নাক তেরে কেটে তাক" বোল মুখে বলা সহজ, হাতে ফোটানোই মুশকিল। এই তো তবলা, অক্ষয় একবার চেষ্টা করো না!'

অক্ষয় কাকাবাবু বললেন, 'এমনি হবে? সাধতে হবে।'

হরিশঙ্কর বললেন, 'তারও আগে একটা কথা আছে, কেন সাধবে? মোটিভেশান? বেশ তো আছি? রোগে-ভোগে। বউ ঝ্যাঁটা মেরেছে? ভাই মামলা ঠুকেছে। চাকরি চলে গেছে? শেয়ার মার্কেটে দেউলে হয়ে গেছি! সংসারের একদল ঝড়তি-পড়তি মানুষ, গাল ভাঙা, কোলকুঁজো, চোখে ছানি-কাটা-চশমা। বুকে ব্রঙ্কাইটিশ, কাতরাতে কাতরাতে চলেছে, প্রভু প্রভু করতে করতে, খিচুড়ি আর মালসাভোগ দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ছে, হৃষ্টপুষ্ট মহিলা দেখলেই অক্ষম দেহ হায় হায় করে উঠছে। পেট-চুক্তি হরিনাম। ছ' ঘন্টা নাগাড় করতে পারলেই একপাতা খিচুড়ি। হরে কৃষ্ণ হরে রাম-এর বদলে ক্রমান্বয়ে বলে চলেছে, হচে কিষ্ণ হচে রাম। মূল গায়েনের কোনও মাথা ব্যথা নেই সংশোধন করে দেবার। লক্ষ্য তো রাম নয়, কৃষ্ণও নয়। লক্ষ্য উদর ও উদরের নিম্নভাগ। এই মিছিল ঈশ্বরের দিকে যত এগোতে থাকে, ঈশ্বর ততই পেছোতে থাকেন। শবযাত্রীর দল আসছে গামছা কাঁধে। স্বর্গের দেউরি বন্ধ করো। পূর্ণ প্রাণে চাবার যাহা রিক্ত হাতে চাস নে

তারে, সিক্ত চোখে যাস নে দ্বারে। তোমায় আমায় মিলন হবে বলে, যুগে যুগে বিশ্বভুবনতলে পরান আমার বধূর বেশে চলে চিরস্বয়ম্বরা। রাজার ছেলে রামচন্দ্র, রাজার ছেলে বুদ্ধ, জনকরাজা, মহাপণ্ডিত, কন্দর্পকান্তি শ্রীচৈতন্য, সেই পথের পথিকের এই হল চেহারা। রাজসমারোহে এসো। কার অভিসারে তুমি চলেছ! রাজসভায় ভোজ খেতে চলেছ তুমি। তুমিও যাও রাজার মতো। টু মিট এ কিং, বি এ কিং, নট এ বেগার। ভিখিরি রাজার দর্শন পায় না। ও হো, ধরো গান, জয় সুর লাগাও',

'একমনে তোর একতারাতে একটি যে তার সেইটি বাজা—
ফুলবনে তোর একটি কুসুম, তাই নিয়ে তোর ডালি সাজা ॥
যেখানে তোর সীমা সেথায় আনন্দে তুই থামিস এসে,
যে কড়ি তোর প্রভুর দেওয়া সেই কড়ি তুই নিসরে হেসে।
লোকের কথা নিসনে কানে, ফিরিস নে আর হাজার টানে,
যেন রে তোর হৃদয় জানে হৃদয়ে তোর আছেন রাজা—
একতারাতে একটি যে তার আপন-মনে সেইটি বাজা ॥'

জমজমাট ব্যাপার, সেই কালী-কীর্তনের মতো, হতেছে পাগলের মেলা খেপাতে খেপীতে মিলে/আনন্দেতে সদানন্দে আনন্দময়ী/পড়ছে ঢলে ॥ বড় ধুম লেগেছে হৃদকমলে। হুঁ করে বেজে উঠল চটকলের বাঁশি। দক্ষিণেশ্বরে বসে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই বাঁশি শুনে গেছেন। শ্রীশ্রীমা এই বাঁশিকে বলতেন শ্যামার বাঁশি। ঠাকুরের আহারাদির পর এই বাঁশি শুনে তিনি সেবায় বসতেন। এই বাঁশি শুনতে শুনতে আমার মাতামহ উত্তরের বারান্দায় পায়চারি করতে করতে তেল মাখতেন। সব সময় তাঁর বিভোর অবস্থা। দেহ একখানে মন আর একখানে। হরিদ্বার, হৃষীকেশ, লছমনঝুলা, কেদারনাথ। আজ এই আসরে তিনি থাকলে কি মাতনই না হত। যখন তানপুরা কাঁধে নিয়ে গান ধরতেন, 'যদি দান দিলে আমায় এ বিপুলধরণী। / তবে কেন প্রাণ দিলে না, দিলে না ॥ / আঁখি যদি দিলে মা গো এ বিশ্বমাঝারে। / তবে আঁখিজল কেন দিলে না, দিলে না ॥'

ভেঙে গেল আসর। শেষ হল আহারাদি। বাগানের রোদ পলাতক বালকের মতো পাঁচিল টপকে সারগাছের মাথায় গিয়ে চড়ল। ডালে ডালে বিষণ্ণ পাখি। উজ্জ্বল একটি দিনের মৃত্যুতে শোকার্ত। হঠাৎ হরিশঙ্কর ঘোষণা করলেন, কালই তিনি চলে যাবেন। জানলার কাছে বসে আছি আমি। বিভোর আমার স্বপ্নে। সব হারিয়ে আবার সব ফিরে পাওয়ার স্বপ্ন। সওদাগরের জাহাজ ডুবে গিয়েছিল মালক্ষ্মীর কৃপায় আবার ভেসে উঠেছে। হঠাৎ এ কি সিদ্ধান্ত। ঘরে যেন বজ্রপাত হল। কোথায় যাবেন? কেনই বা যাবেন! প্রশ্ন করলুম,'কোথায় যাবেন?'

'প্রশ্নটা একটু বোকার মতো হল। তোমার কি ধারণা? আমার কোনও যাওয়ার জায়গা নেই? তোমার কি ধারণা, এতকাল আমি ছেঁড়া কম্বল কাঁধে ধর্মশালায় ধর্মশালায় ঘুরছিলাম, লাইক ওয়ান অফ দি সো মেনি আইড্‌লারস!'

'আমি তা মনে করিনি। ভেবেছিলুম সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন। কারণ আপনি কিছুই নিয়ে যাননি। একবস্ত্রে গৃহত্যাগ করেছিলেন।'

'ইয়েস মাই সান, হরিশঙ্কর কনভেনসানাল সন্ন্যাসে বিশ্বাসী নয়। হরিশঙ্কর গুরুবাদে বিশ্বাসী নয়। হরিশঙ্কর কনভেনসানাল ধর্ম বিশ্বাস করে না। মন্দির, মসজিদ, গির্জা সব তার কাছে সমান। সন্ন্যাসী হবার জন্যে কোথাও যাবার দরকার হয় না। অন্তরের

কয়েকটা ময়লা জিনিস বাইরে ফেলে দিতে পারলেই একজন সন্ন্যাসী। যে-কোনও জায়গায়, যে-কোনও অবস্থায়। এম্পটি ইওর ডার্টি বাস্কেট অ্যান্ড ইউ আর এ সেজ। দেয়ার আর থ্রি ক্যাটস, কাম, ক্রোধ, লোভ, তিনটেকে বিদায় করো, তুমি সন্ন্যাসী। আর এক বস্ত্র ? যখন এসেছিলুম সঙ্গে কটা বস্ত্র এনেছিলুম ? ওইটাই হরিশঙ্করের আত্মবিশ্বাস। যেচে, সেধে চ্যালেঞ্জ নেওয়া। অলওয়েজ এক্সপ্লোর নিউ হরাইজন। নতুন দিগন্ত। এ নিউ স্ক্র্যাচ, অ্যান্ড বিগিন। নতুন একটা আঁচড় থেকে তৈরি করো নতুন ভবিষ্যৎ। ফ্রম নাথিং টু সামথিং। জগতের হাটে হরিশঙ্কর নিজেকে বাজাতে জানে। অ্যাডভেঞ্চার ইজ লাইফ। তুমি ভীরু, তুমি ঘরকুনো, তোমার পক্ষে জীবনের বিশালতা বোঝা সম্ভব নয়। ইউ আর এ পেটিকোট ম্যান।'

ভয়ঙ্কর আক্রমণে স্তব্ধ হয়ে যেতে হল। এই কারণেই আমার যত অভিমান, যত হতাশা। বয়সটা কাঁদার নয়। মুখ গোঁজ করে থাকার। আমি পেটিকোট ম্যান ! বারনার্ড শ-র কথা থেকে শব্দটা নিলেন ; শ বলেছিলেন, A woman is really only a man in petticoats, or, if you like that a man is a woman without petticoats. আমি সামান্য প্রতিবাদ জানাতে চাইলুম, 'আপনি এখনো আমার ওপর রেগে আছেন।'

'তুমি এটাকে রাগ ভাবছ ? একটু তলিয়ে দেখলে বুঝতে পারতে, এ রাগ নয়, এ তোমার শক থেরাপি। মিনমিনে, ঘিনঘিনে জীবন থেকে তোমাকে বের করে আনার চেষ্টা। এই বয়সে আমি যা পারি, তুমি তা পারো না ? মুখে পাউডার লেপে, ফিনফিনে কথা বলে মেয়েদের প্রিয় হতে চাও। ওমর খৈয়াম, গালিব পড়ো। কেন মিলটন, হোমার, ভার্জিল পড়তে পারো না ? গোলাপী কাগজে প্রেমপত্র লেখ। লাইফ ইজ নট দ্যাট রোজি পিন্টু। জীবন অবশ্যই একটা কবিতা, তবে বীররসের কবিতা। লাইফ ইজ এ হিরোয়িক পোয়েম, রাইমড্ আর আনরাইমড্। তোমাকে আমি তোমার মুখ দেখাতে চাই। মনে আছে সেই গল্প ! সিংহশাবক ভেড়ার পালে বড় হতে হতে ভেড়াই হয়ে যাচ্ছিল। একদিন এক সিংহ এসে তাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল জলার ধারে। জলে পাশাপাশি দু'জনের প্রতিবিম্ব। দেখ, তোর আর আমার দু'জনের মুখই একরকম দেখতে। তুইও সিংহ আমিও সিংহ। এই নে চেখে দেখ এক টুকরো মাংস। তুমি আমার ছেলে হয়ে, আমার উপহাস হয়ে জীবন নষ্ট করছ ? তোমার লজ্জা করে না। আমি এক ধরনের জীবন শেষ করে আর এক ধরনের জীবন শুরু করেছি। অবসরভোগী বৃদ্ধ হয়ে ছেলের রোজগারে অলস জীবন আমি কাটাতে চাই না।'

'ছেলের সেবাও আপনি নেবেন না ?'

'সেবা খুব কঠিন জিনিস পিন্টু। বলা সহজ করা শক্ত। বিরক্ত না হয়ে সেবা ক'জন করতে পারে ? আর শক্তি থাকতে সেবা নোবো কেন ?'

'আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে, আপনি এখন কি করছেন ? যদি আমাকে একেবারেই পর না ভাবেন তা হলে বলবেন, আর যদি ভাবেন আমি আপনার কেউ নই তা হলে বলবেন না। আমি আমার পথ আপনারই আশীর্বাদে ঠিক খুঁজে নিতে পারবো। ছোট মুখে বড় কথা মার্জনা করবেন, একটা উদাহরণ মনে আসছে, পাখির মা পাখিকে যখন উড়তে শেখায় তখন কিন্তু ঠোকরায় না। পাহারা দেয় ডালে বসে। অন্য পাখির ঠোকরের হাত থেকে বাঁচায়।'

হরিশঙ্কর অসন্তুষ্ট হলেন না, বরং খুশিই হলেন, 'বাঃ, ওয়েল সেভ। সুন্দর উপমা। ভেরি পোয়েটিক। বাট মাই সান, ইফ ইট ইজ নট এ বার্ড। যদি পাখি না হয়ে একজন

প্যারালিটিক মানুষ হয়। এ ক্রিপ্‌ল। তাকে বকে, ধমকে, তিরস্কার করে, যন্ত্রণা দিয়ে হাঁটাতে হয়। দয়া করলে, অনুকম্পা দেখালে তার ক্ষতি হয়। জীবনের দীর্ঘপথ পড়ে আছে তোমার সামনে, যে-পথে তোমার সঙ্গী হবে না কেউ, সেই পথে হাঁটার শক্তি তোমাকে অর্জন করতে হবে। প্রেমের কাছে, সহানুভূতির কাছে, সাহায্যের কাছে, মানুষের করুণার কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিয়ো না। এই তো আসল কুরুক্ষেত্র পিণ্টু। কেউ কারোর নয়। না ঘর মেরা, না ঘর তেরা। নিজের এই অসুস্থতার সময় অবশ্যই বুঝে গেছ নির্ভর করার মতো একজনই আছেন, তিনি কে ? তুমিও জানো না, আমিও জানি না। কেউই জানে না। জাস্ট এ ওয়াইল্ড গেস। একটা অনুমান মাত্র। ডপ্‌পেলগ্যাঙ্গার বলে একটা শব্দ কখনো শুনেছ ?'

'আজ্ঞে না।'

'শব্দটা জার্মান। ইংরেজি মানে হল, তোমার সাইকিক ডবল। তোমার দ্বিতীয় সত্তা। চুয়াল্লিশ সালের ঘটনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, তখন এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। ফরাসী রণাঙ্গনে এক আমেরিকান ইনফ্যান্ট্রি সার্জেন্ট। তাঁর নাম গ্রিফিথ। গ্রীষ্মের শেষবেলায় তাঁর বাহিনী নিয়ে বেরিয়েছেন টহলে। জায়গাটার নাম রেনে। চারপাশ শান্ত। সরু একটা পথ। ধুলোয় ঢাকা। দলের আগে আগে চলেছেন গ্রিফিথ। হঠাৎ গ্রিফিথের সামনে মাত্র কয়েক গজ দূরে এক মূর্তির আবির্ভাব হল। গ্রিফিথ চমকে গেলেন। সামনে পথ আগলে যে দাঁড়িয়ে সেও গ্রিফিথ। একই আকৃতি, একই পোশাক, এমন কি দাড়ির ক্ষতে যে স্টিকিং প্লাস্টার লাগান, দ্বিতীয় গ্রিফিথের দাড়ির ঠিক সেই জায়গাতেও প্লাস্টার। দ্বিতীয় গ্রিফিথ হাত নেড়ে ইশারা করছে, ফিরে যাও। গ্রিফিথ ভয় পেয়ে গেলেন। শুনলেন সেই নির্দেশ। ফিরে চললেন তাঁর বাহিনী নিয়ে। তিনি ফিরছেন এমন সময় সৈন্য বোঝাই একটা জিপ তাঁর পাশ দিয়ে তিনি যে-দিকে যাচ্ছিলেন সেই দিকেই গেল। পরক্ষণেই তাঁর কানে এল স্পাণ্ডাউ মেশিনগানের শব্দ। জিপগাড়িটার উল্টে যাওয়ার শব্দ। ওই জায়গায় জার্মান সৈন্যরা একটা গোপন ঘাঁটি গেড়েছিল। গ্রিফিথের মূর্তি যদি গ্রিফিথকে সাবধান না করত তাঁর বাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। বিজ্ঞানে এর কোনও ব্যাখ্যা পাবে না। একবার নয় গ্রিফিথের জীবনে এই ঘটনা দ্বিতীয়বার ঘটল কুড়ি বছর পরে। গ্রিফিথ তখন বিয়ে করেছেন। দুটি ছেলে। ঘটনাস্থল কানাডা। সপরিবারে বেড়াতে বেরিয়েছেন। দু'সার প্রাচীন গাছের মধ্যে দিয়ে পথ চলে গেছে। আবহাওয়া সুন্দর, তবে দমকা বাতাস বইছে। তাঁরা একটা ফাঁকা জায়গায় এসে সবে দাঁড়িয়েছেন, হঠাৎ সামনে আবির্ভূত হলেন সেই দ্বিতীয় গ্রিফিথ। যুদ্ধের পোশাক, চিবুকে প্লাস্টার। ইশারায় বলছে, পালাও, গো ব্যাক। গ্রিফিথ এক মুহূর্ত দেরি না করে পেছন ফিরে সপরিবারে ছুটতে লাগলেন। দমকা বাতাস তখন ঝড়ের চেহারা নিয়েছে। গ্রিফিথ যে জায়গায় দাঁড়িয়েছিলেন, সেইখানে হুড়মুড় করে বিশাল একটা গাছ ভেঙে পড়ল। সরে না এলে সপরিবারে মারা পড়তেন। এই ডপপেলগ্যাঙ্গারের অভিজ্ঞতা পৃথিবীতে আরো অনেক ভাগ্যবানের জীবনে ঘটেছে। বার্লিনের ঘটনা। থিওলজির অধ্যাপক বাড়ি ফিরছেন সন্ধেবেলা। উল্টো ফুটপাথে আর একজন। দেখেই চমকে গেলেন। আর একজন তিনি নিজেই। অধ্যাপক দ্রুত পা চালালেন। তাঁর দ্বিতীয় মূর্তির চলার গতিও বাড়ল। অধ্যাপক পাশের রাস্তায় ঢুকলেন। এড়াতে পারলেন না। বাড়ির দরজার কাছে মূর্তি তাঁকে অতিক্রম করে গিয়ে নিজেই বেল টিপল। অধ্যাপক স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন উল্টো ফুটপাথে। দর্শক হয়ে। পরিচারিকা বাতি হাতে দরজা খুলল। দু'জনে দোতলায় উঠছেন। দোতলার ঘরে আলো

দেখা গেল। পরমুহূর্তেই পুরো ছাতটা ভেঙে পড়ল সশব্দে। এর কি ব্যাখ্যা হবে পিন্টু ? তুমিই তোমার ভগবান। কারোর দর্শন হয়, কারোর হয় না।'

হরিশঙ্কর নিঃশব্দে উঠে গেলেন বারান্দায়। কেন আমি ওঁর জ্ঞানকে স্পর্শ করতে পারি না ! কেন পারি না ওঁর মতো একটা মনের উত্তরাধিকারী হতে ! নিজের মর্তসীমা চূর্ণ করে কেন মিশে যেতে পারি না বিশালের বিশালে। অনেকদিন পরে আদেশ এল, 'এস্রাজটা নামাও।' বারান্দায় দাঁড়িয়ে বলছেন।

এস্রাজ নামালুম। ঘরে এসে বললেন, 'আমাদের সেই মসলন্দটা বিছাও। ঠিক আছে না ইঁদুরে কুটি কুটি করেছে ?'

'আজ্ঞে না ঠিকই আছে।'

'বহুত আচ্ছা ! তাহলে পেতে ফেল। হারমোনিয়ামটা সাবধানে বের করে আনো।' এস্রাজের সিল্কের তৈরি ঢাকা খুললেন। ঝকঝকে শরীরে মিহি ধুলো। নরম কাপড় দিয়ে সযত্নে মোছা হল। ছড়িতে রজন ঘষলেন। রজন ঘষার সরঞ্জাম তাঁর এক অসাধারণ কারিগরী। ছোট্ট একখণ্ড কাঠ। বাটালি দিয়ে কুঁদে নৌকোর মতো আকৃতিতে এনেছেন। মসৃণ। ওভ্যাল। ভেতরের খোলে রজন গলিয়ে ঢেলে দিয়েছেন। তৈরি হয়েছে রজনের খোপ। বস্তুটা অপূর্ব এক কারুকর্ম। নাম—রজন-কাঠ। ছড়ির ছড় বার কয়েক ঘষলেই তারে স্বচ্ছন্দ্য গতি।

এস্রাজ বাঁধা হল। আমাকে বললেন, 'ওই গানটা গাইবার চেষ্টা করো। তাঁহারে আরতি করে... ।' এস্রাজে ছড় টানলেন। মিঠে, মোলায়েম সুর ডানা মেলে উড়ে গেল।

তাঁহারে আরতি করে চন্দ্রতপন, দেব মানব বন্দে চরণ—
আসীন সেই বিশ্বশরণ তাঁর জগতমন্দিরে ॥

রমেশবাবু যে-ভাবে গান, সেইভাবে গাইবার চেষ্টা করছি। হচ্ছে না। তবু চেষ্টা আপ্রাণ।

অনাদিকাল অনন্তগগন সেই অসীম-মহিমা-মগন
তাহে তরঙ্গ উঠে সঘন আনন্দ-নন্দ-নন্দ-রে ॥

৩৪

The people that walked in darkness have seen a great light.

ভগবান কে, এই প্রশ্নের সমাধান কোনও কালেই হবে না। আমিও ভগবান হতে পারি। পিতা হরিশঙ্কর হয়ত একটু পরেই বলবেন, ওয়ার্ক ইজ গড। আবার হয়ত পরমুহূর্তেই বলবেন, ম্যাথেমেটিকস ইজ গড। আমার কাছে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় প্রয়োজনীয়, হরিশঙ্করকে যেভাবেই হোক আটকানো। বালিশের তলা থেকে পিসিমার চিঠিটা বার করে তাঁর হাতে দিলুম।

নিতে নিতে বললেন, 'কার চিঠি ?'

উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে পড়তে শুরু করলেন। মুখের চেহারা পাল্টাচ্ছে। পড়া শেষ করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার কি সিদ্ধান্ত ?'

'ভয়ঙ্কর সমস্যা।'

হরিশঙ্কর বাজ পড়ার মতো চমকে উঠলেন, 'সমস্যা বলছ কেন ?'

'এত বড় একটা পরিবার ঘাড়ে এসে পড়বে।'

নোঙরা একটা বাথরুমে ঢুকলে মানুষের মুখের চেহারা যেমন হয়, হরিশঙ্করের মুখের চেহারা সেইরকম হল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'এমন একটা কথা তুমি বলতে পারলে ? ঘাড়ে এসে পড়বে। অসহায় একটা পরিবার অনাহারে, নির্যাতনে দিন কাটাচ্ছে, তাদের বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব তোমার নেই ?'

'আপনি চলে গেলে আমি একা কি করে সামলাবো ?'

'আমি যদি মরে যেতুম, তুমি তোমার পিসিমাকে সাহায্য করতে না ? না আমার বোন বলে দায়িত্বটা একা আমারই ? কি তোমার মনোভাব ? কি শিক্ষা পেলে তুমি ? মঠ-মিশনে গিয়ে কি পেলে তুমি ? কি হল তোমার ? এখনো গেল না আঁধার !'

শরীর খারাপের জন্যেই বোধ হয়, মেজাজ হঠাৎ বিগড়ে গেল। বলেই ফেললুম, 'আমার একার রোজগারে অত বড় একটা ফ্যামিলি সামলানো সম্ভব ? কারোর পক্ষেই কি সম্ভব ?'

হরিশঙ্কর হাঁটুতে চাপড় মেরে বললেন, 'আলবাৎ সম্ভব। পৃথিবীতে অসম্ভব বলে কিছু নেই, যদি মানুষের ইচ্ছে থাকে। কম রোজগারে এর চেয়ে কত বড় পরিবার প্রতিপালিত হচ্ছে। তুমি দেখতে চাও ? এক সময় আমাদের যৌথ পরিবার কত বড় ছিল, আমার বাবার সামান্য রোজগার। আমরা কি মরে গেছি ? ভেসে গেছি ? ধরো তোমার যদি আরো

কয়েকটি ভাইবোন থাকত, আর আমি যদি মরে যেতুম, তাহলে তুমি কি করতে ? বাবার বউ, বাবার ছেলে-মেয়ে বলে সব ফেলে রেখে পালাতে ?'

'সেটা অন্য কেস।'

'অন্য কেস নয়। দুটো কেসই সমান। কেবল মনটা অন্য। নিজের ভাবতে পারলে দুটোই সমান। তোমার স্বার্থ জেগেছে। তুমি এখন নিজের সংসারের স্বপ্ন দেখছ। নিজের সুখের স্বপ্ন, নিজের ভোগের স্বপ্ন। এই বাড়িটা খুব পুরনো হয়ে গেছে, তোমার একটা নতুন বাড়ি চাই। সেখানে তোমার সুন্দরী স্ত্রী। একটি দুটি ছেলেমেয়ে। সম্ভব হলে ছোট একটা গাড়ি। সুখী পরিবার ভোগ আর স্বার্থের বেড়া দিয়ে ঘেরা। ত্যাগ কাকে বলে তোমার ধারণা নেই। ছেলেবেলা থেকে একা মানুষ হয়েছো, একাই থাকতে চাও।'

আমার মাথা ঝাঁঝাঁ করছে। কান দুটো গরম আগুন। আমি দেখতে পাচ্ছি আমার ক্ষুদ্র আমি রাগে তিড়বিড় করছে। চিৎকার করতে ইচ্ছে করছে, তীব্র ভাষা ব্যবহার করতে ইচ্ছে করছে। ক্ষণকাল আগের আধ্যাত্মিক শিক্ষা অকেজো মনে হচ্ছে। নৌকো যেমন মাঝ নদীতে ঝড়ের ঢেউ-এ টলমল করে, আমাতেও সেই ক্রোধের দুলুনি। কণ্ঠস্বর অতি কষ্টে স্বাভাবিক রেখে বললুম, 'এ আমার স্বার্থপরতা নয়, ভয়। আমার ভয় করছে।'

হরিশঙ্করের ঠোঁটে সেই বাঁকা হাসি, 'ভয় থেকেই স্বার্থপরতা আসে। সহোদর ভাই। হারাবার ভয়েই মানুষ স্বার্থপর হয়। নাথিং টু লুজ অ্যান্ড নাথিং টু ফিয়ার। তোমার ভয়টা কিসের ? কমফার্ট হারাবে, হারাবে যা খুশি তাই করার স্বাধীনতা। জীবন বাঁধা পড়ে যাবে। জীবনের এতটা পথ ফাইট করতে করতে আসার পর আমি ভেবেছিলুম, এইবার একটু মুক্তি অর্জনের অধিকার সংসার আমাকে দেবে। তা আর হল না। আবার আমাকে কোমর বেঁধে জলে নামতে হবে। আবার শুরু করতে হবে গোড়া থেকে। এই বুড়ো বয়সে আবার আমি চাকরির সন্ধানে বেরবো, দশটা-পাঁচটা। আবার ঠেলবো সংসারের চাকা।'

সাহস করে বললুম, 'আমরা যদি না থাকতুম।'

'থেকে কি করে ভাবা যায় আমি নেই। আমি আমার জন্যেই আছি আর কারোর জন্যে নেই, এ ভাবনা তো আমার পক্ষে অসম্ভব। অল রাইট, তুমি তোমার ভাবনা ভাবো, আমি আমার ভাবনা। যে বোন আমার কোলে-পিঠে মানুষ হয়েছে, তাকে আমি ফেলতে পারবো না। বরং ফেলে দোবো আমার গবেষণা।'

গবেষণা ? অবাক হয়ে গেলুম। হরিশঙ্কর গবেষণা করতে গিয়েছিলেন। জানতে ইচ্ছে করছে, কি গবেষণা ? কোথায় সেই গবেষণাগার ? এখনি সেই প্রশ্ন করলে কোনও উত্তর দেবেন না। তার আগে নিজের দুর্বল চরিত্রের পুনরুদ্ধার প্রয়োজন। হরিশঙ্করের চোখে নিজের উজ্জ্বল মূর্তি তুলে ধরতে হবে। তিনি ধরেছেন ঠিক , নিজের সুখ বিসর্জন দিতে হবে এই ভয়েই আমি কাতর। আমার ফুরফুরে জীবন নষ্ট হয়ে যাবে। সেই গান মনে পড়ছে—এক হাতে মোর পূজার থালা আর এক হাতে মালা। এক হাতে আমার ত্যাগের বড়াই, আর এক হাতে নারী দেহের স্পর্শ। এমন একটা ভণ্ড শয়তান কি করে হরিশঙ্করের পুত্র হল। দেবতা সৃষ্টি করলেন অপদেবতা। মধ্যপ্রাচ্যের আমীর হবার কিংবা মোগল বাঁদশা হবার সব গুণ আমার মধ্যে বর্তমান। হারেম, ঝরোখা, গোলাপবাগিচা, ঝুলা, কোয়েলিয়া, বাঈনাচ, রাঙ্গা পানীয়ের গেলাস। মনে একেবারে মথুরা। ধরেছেন ঠিক। হরিশঙ্কর ধরবেন, না তো কে ধরবেন ! অন্তর্দর্শী।

একটু নড়েচড়ে বসতে হল। এখনি ঠিক করে ফেলতে হবে জীবন আমার কোন পথে চলবে। বিদ্রোহী হওয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে। একটা ব্যক্তিত্বকে অনুসরণ করতেই হবে।

এছাড়া আমার অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। বেশ জোর গলায় বললুম, 'আমি আপনার সঙ্গেই আছি। বলুন আমাকে কি করতে হবে।'

হরিশঙ্কর স্থির চোখে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'আমিও তোমার সঙ্গে আছি। আমাদের দুজনকেই আবার সংসারে ঢুকতে হবে। অন্যের সংসারে। আমি পুরুলিয়ার ঝালদায় গালা নিয়ে একটা রিসার্চ শুরু করেছিলুম। ফল সংরক্ষণে গালার ব্যবহার। গালার সঙ্গে রঙ মিশিয়ে ল্যাক পেন্ট, যা দিয়ে শিল্পীরা ছবিও আঁকতে পারবেন ? আর চেয়েছিলুম চাঁচগালা তৈরি করতে গিয়ে যেসব কর্মীর দুহাতের আঙুল ক্ষয়ে গিয়ে পঙ্গু হয়ে গেছেন তাঁদের পুনর্বাসন। মিশনারীরাই আমাকে সাহায্য করছিলেন, আমার সেই কাজটা বন্ধ হয়ে যাবে। এখানেই আমাকে একটা কিছু করতে হবে। কোনও ব্যবসা কি ছেলে পড়ানো। এ জীবনে বড় কিছু আর করা গেল না। স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেল।'

'না তা হবে না। আপনি যা শুরু করেছেন শেষ করুন। আমি একাই টানবো।'

'কি করে ? তোমাকে তো দেরাদুনে যেতে হবে।'

'বলে কয়ে কলকাতাতেই থাকবো। প্রোমোশানের দরকার নেই।'

'তা হয় না। আমি জীবন শেষ করতে চলেছি, তুমি চলেছ শুরু করতে।'

'আচ্ছা এমন হয় না, আমরা সবাই পুরুলিয়ায় সেটল করলুম। আপনার কাজে আমিও সাহায্য করলুম। আমাকে ওঁরা মাইনে দেবেন না ?'

'পিন্টু এ-ও এক ধরনের কর্মসন্ন্যাস। এটা ঠিক চাকরি নয়। সেবা।'

'তাহলে আসুন আমরা দুজনে মিলে এখানেই একটা কেমিকেল ইন্ডাস্ট্রি করি। আপনার বহু দিনের স্বপ্ন। ছেলেবেলায় আমাকে বলতেন, কারোর দাসত্ব যাতে করতে না হয় সেই চেষ্টা কোরো। আমি পারিনি। তোমার মধ্যে আমি আমার স্বপ্নের রূপায়ণ দেখতে চাই। আসুন না, আমরা একটা পরিকল্পনা তৈরি করি। কত কি-ই তো করা যায়। অনেকেই তো অনেক কিছু করছেন।'

'এইরকম একটা ইচ্ছে আমারও হচ্ছে। সাত্ত্বিক থেকে রাজসিক।'

'আপনি চেষ্টা করলে অসম্ভবও সম্ভব হবে। আপনি অসাধ্য সাধন করতে পারেন। আমার অনেক কল্পনা আপনাকে ঘিরে। আপনি একজন বড় ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হয়েছেন। কত মানুষ কাজ করছেন আপনার প্রতিষ্ঠানে। সাদা অ্যাপ্রন পরে নিজের ল্যাবরেটরিতে নিজের কাজ করছেন আপনি। চোখে সোনার চশমা। এই বাড়িটা ভেঙে নতুন একটা বাড়ি হয়েছে। চারপাশে সুন্দর বাগান। গ্যারেজে সাদা রঙের ঝকঝকে একটা গাড়ি। মাঝে মাঝেই আপনি বিলেতে যাচ্ছেন। বিদেশীরা আসছেন আপনার প্রতিষ্ঠানে। সুন্দর একটা অফিস। টাইপরাইটারের খট খট শব্দ। কেমিকেলসের গন্ধ।'

উত্তেজনায় আমি ঘরে পায়চারি শুরু করলুম। একটা কিছু করতে হবে। নিজেদের জন্যে, অন্যের জন্যে। এপাশ থেকে ওপাশ, ওপাশ থেকে এপাশ। মনে হচ্ছে আমিই হরিশঙ্কর। যত পাক মারছি ততই মনে হচ্ছে আমি বড়লোক হয়ে যাচ্ছি, লাখোপতি, কোটিপতি। হাল্কা লাগছে শরীর। সব বিষণ্ণতা কেটে যাচ্ছে। ঘরের আলোর পাওয়ার বাড়ছে। তখন আমি ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি রাখব। ড্রেসিংগাউন পরে বাথরুম থেকে বেরবো। স্লিপিং স্যুট পরে নেটের মশারিতে শোবো।

হরিশঙ্কর বললেন, 'এইবার তুমি একটু স্থির হয়ে বসতে পারো। প্রায় মাইলখানেক পায়চারি হল। ইন্ডাস্ট্রি ইজ নট ওয়াকিং। লোকে হজমের জন্যে বেড়ায়।'

'আমার ভেতরে একটা শক্তি আসছে। ডু আই মাস্ট।'

'ইংরেজি ভাষার একটা শক্তি আছে ; কিন্তু আমাদের কিছু করতে হলে করতে হবে বাংলায়। তুমি বোসো। দেখো ডক্টর রায় এখন চিফ মিনিস্টার ! আমাকে একটু পছন্দও করেন। কংক্রিট একটা স্কিম তাঁর সামনে ফেলতে পারলে টাকার অভাব হবে না।'

আমার আর তর সইছে না, বললুম, 'কালই তাহলে চলুন।'

দরজার কাছ থেকে জয়নারায়ণ বললেন, 'না না কাল কি করে যাবেন, এখনো দিন সাতেক আমাকে কলকাতায় থাকতেই হবে। রেকর্ডিং আছে, রিহার্শাল আছে। ট্রেনের টিকিট কেটে রিজার্ভেশান করতে হবে।'

জয়নারায়ণ ঘরে ঢুকতে ঢুকতে আমার কথার শেষটা শুনেছেন। প্রথম দিকটা শুনতে পাননি। ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি, কাঁচি ধুতি। হরিশঙ্কর বললেন, 'চললে কোথায় ? বরযাত্রী ?'

জয়নারায়ণ বললেন, 'ড্রেস দেখে বলছেন ? বেশি মিহি হয়ে গেছে তাই না ?'

'ভেতরের গেঞ্জি দেখা যাচ্ছে। একটু অবসিন হয়ে গেছে। তোমার মতো একজন কালচারড মানুষের এটা নজরে পড়ল না। আরে ছি ছি।'

জয়নারায়ণ লজ্জায় কাঁচুমাঁচু হয়ে গেলেন। নিজের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এটা তাহলে পাল্টানো দরকার ?'

'অফকোর্স ! এই পোশাকে লোক চরিত্রহীন হয়ে যায়।'

জয়নারায়ণ বললেন, 'আসল কালপ্রিট তাহলে এই পাঞ্জাবিটা ?'

'হ্যাঁ তোমার শাঁস দেখা যাচ্ছে।'

'এ তো তাহলে আর কোনও দিনই পরা যাবে না। তাহলে কি করবো এটাকে ?

'ভাল করে কাচিয়ে মেয়েমহলে চালান করে দাও, চা ছাঁকার কাজে লেগে যাবে। এটা আসলে ফিল্টার ক্লথ। তোমাকে ভুল করে পাঞ্জাবির কাপড় বলে গছিয়ে দিয়েছে।'

পাঞ্জাবিটা চা ছাঁকার কাজে ব্যবহার করা যাবে জেনে মাতুল জয়নারায়ণ ভয়ঙ্কর খুশি হলেন, 'যাক একটা ভাল কাজে লাগবে। কোনও চায়ের পাতাই আর লিক করবে না। গুঁড়ো চাও ব্যবহার করা যাবে। গুঁড়ো চায়ে বেশ আয় দেয়। সংসারের সেভিংস হবে।'

'তা হবে। তবে ছাঁকনিটা একটু কস্টলি হয়ে গেল।'

'না খুব একটা কস্টলি হবে না। সাড়ে তিন গজ কাপড় আছে, অনেক গুলো পিস বেরোবে।' জয়নারায়ণ বেশ খুশি হয়ে ভেতরে চলে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এসে হরিশঙ্করের সামনে দাঁড়ালেন। যেন পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে, এখন অভিভাবক কি বলেন। হরিশঙ্কর বললেন, 'হ্যাঁ এইবার ঠিক হয়েছে। ট্র্যানসপেরেন্ট থেকে ওপেক। তা তুমি যে বড় বাধ্য ছেলের মতো আমার কথা শুনলে ?'

'শুনবো না ? আপনার হাই টেস্ট। তা কালই যাবেন ঠিক করছেন ?'

'না না, আমরা একটা ব্যবসা করার পরিকল্পনা করছি। ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি।'

জয়নারায়ণ লাফিয়ে উঠলেন, 'উঃ, সেই কারণেই বলে গ্রেট মেন থিঙ্ক অ্যালাইক। আমিও সেই কথাই ভাবছি বেশ কয়েক মাস ধরে। আসুন তাহলে লেগে পড়ি। মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট। হারমোনিয়াম তৈরি হবে। স্কেলচেঞ্জ, কাপলার। টিউনিংটা আমি ভালই পারবো। কোম্পানির নাম হবে চ্যাটার্জি ফ্লুট। রিডে মাদার অফ পার্লস। বেলোয় রুপোর পাতের ডেকরেশান। এক একটা হারমোনিয়াম বেরোবে যেন ওয়ার্ক অফ আর্ট। সুর ঝরবে ঝরনাধারার মতো।'

'মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টস পারবে না জয়। ওর জন্যে একটা ট্র্যাডিসান গড়ে তুলতে

হয়। একটা হাউস। তোমাদের গানের ঘরানার মতো বাদ্যযন্ত্রেরও ঘরানা আছে। সেই ট্র্যাডিসান গড়ে উঠতে উঠতেই আমরা ভবসাগরের পারে চলে যাবো।'

'তাহলে আর কি করা যাবে ?' জয়নারায়ণের উৎসাহ ভেঙে পড়ল।

হরিশঙ্কর বললেন, 'আমার মাথায় একটা এসেছে। সেটা আমার লাইন। পারফিউমস।'

'মানে সেন্ট।' জয়নারায়ণ নড়েচড়ে বসলেন, 'তাহলে আমি হব পাবলিসিটি অফিসার। যেসব আসরে যাবো গায়ে মেখে যাবো। একেবারে মাত হয়ে যাবে। সবাই জিজ্ঞেস করবেন, কি মেখেছেন ? কোথায় পাওয়া যায় ? ওয়াইড পাবলিসিটি। নাম রাখা হবে সমীরণ। নাঃ বাংলা নাম চলবে না। ইংরিজী নাম রাখতে হবে। প্রাইভেট অ্যাফেয়ারস, সিক্রেট টাচ, অ্যাফেক্সান, কিস, এইসব।'

হরিশঙ্কর মৃদু হাসছেন, বললেন, 'এ পারফিউম, সে পারফিউম নয় স্যার। এ হবে স্পেস্যাল ব্লেন্ড। বড় বড় সাবান কোম্পানি, পাউডার, স্নো কোম্পানি, এমন কি ওষুধ কোম্পানিও এই ব্লেন্ড কিনবে। তারাই ব্যবহার করবে। এর বেশির ভাগটাই এখনো বিদেশ থেকে আসে। বম্বেতে একটা মাত্র প্রতিষ্ঠান হয়েছে। এই ব্লেন্ডিং একটা মস্ত বড় আর্ট। জানো তো পারফিউমকে ফিকস করতে হয়।'

'মানে ? সুগন্ধী কি ফার্নিচার যে ফিকস করতে হবে ?'

'ভাল পারফিউম মানে শুধু ভাল গন্ধ নয়, লাগাবার পর অনেকক্ষণ যেন গন্ধটা থাকে। লাগালুম আর সঙ্গে সঙ্গে উড়ে গেল, তা যেন না হয়। এর জন্যে প্রয়োজন হয় ফিকসেটিভের। বেড়ালের নাড়ি ভুঁড়ি থেকে তৈরি হয় সিভেট। সিভেট, স্যান্ডাল এইসব হল ফিকসেটিভ। যাক এই সব আলোচনা অর্থহীন। আমরা ভাবছিলুম ডক্টর রায়ের কাছে একবার যাবো, আমাদের এই পরিকল্পনা নিয়ে। তোমার কি মত ?'

'খুব ভাল হবে। ওয়ান্ডারফুল।'

'তুমি এখন চললে কোথায় সেজেগুজে ?'

'সুরঞ্জনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। বাড়ি যাবে বলছে।'

'এই যে বললে আজ থাকবে, রাতে আমার কাছে বসবে অঙ্ক নিয়ে।'

'মেয়েদের মত তো মিনিটে মিনিটে বদলায়।'

'ওকে ডেকে আনো।'

সুরঞ্জনা এল। কোনও সাজগোজই নেই। এলোমেলো হয়ে আছে। মাতুল জয়নারায়ণের মতোই লম্বা। চেহারার ধার কি ? তরোয়ালের মতোই। সুরঞ্জনাকে দেখলে আমার লজ্জা আসে নিজের ওপর। যেমন স্মার্ট, তেমনি বুদ্ধিদীপ্ত। আমি এক ম্যাদামারা। বাসী লুচি। ভিজে দেশলাই। শরীরে একটু শক্তি এলেই নিজের সংস্কারে লেগে যাবো। সাদা ফিনফিনে শাড়ি, হাল্কা হলুদ রঙের ব্লাউজ।

হরিশঙ্কর বললেন, 'তুমি চলে যাচ্ছ ?'

'কই না তো। কোথায় যাবো, বাড়িতে তো কেউ নেই। এই জমজমাট বাড়ি ছেড়ে কেউ যেতে পারে। আনন্দের হাটবাজার।'

জয়নারায়ণ বললেন, 'কি বলেছিলুম আপনাকে ? মিলিয়ে নিন।'

হরিশঙ্কর সুরঞ্জনাকে বললেন, 'যাও। এই প্রশ্ন করার জন্যেই ডেকেছিলুম। তোমরা কি করছ ?'

'আমরা কাকিমার গল্প শুনছি। কিছু বলবেন ? কিছু করতে হবে ?'

জয়নারায়ণ বললেন, 'করতে হবে না ? চা না খেয়ে কতক্ষণ থাকা যায়। এক রাউন্ড

হয়ে যাক।'

সুরঞ্জনা বললে, 'আর কিছু ? চায়ের সঙ্গে কোনও টা ?

'নো টা। সিম্পল চা।'

সুরঞ্জনা আড়-চোখে আমার দিকে তাকিয়ে চলে গেল। এই মেয়েটির প্রতি হরিশঙ্করের একটা মমতা জন্মেছে বেশ বোঝাই যাচ্ছে। বোধহয় বিজ্ঞানের ছাত্রী বলে। কিংবা বন্ধুকন্যা বলে। মুকুর ওপর এই স্নেহটা কিন্তু আসেনি। মুকুর দুর্ভাগ্য।

আমরা তিন জনেই থম মেরে বসে আছি। হঠাৎ খোলা জানলা দিয়ে হুস করে একটা চামচিকি ঢুকে ঘরের মধ্যে পাক মারতে লাগল। বোমারু বিমানের মতো। জয়নারায়ণ সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার থেকে খসে পড়লেন মেঝেতে। পারলে খাটের তলায় ঢুকে যান। হরিশঙ্করের দৃষ্টি জয়নারায়ণের দিকে। গভীর আগ্রহে দেখছেন আরো কি করতে পারে। কত দূর যেতে পারে। চামচিকির যা স্বভাব। উন্মাদের মতো ঘরময় লাট খাচ্ছে। জয়নারায়ণের ঘাড় নিচু। মাথার ওপর দুহাতের আড়াল।

হরিশঙ্কর বললেন, 'যতটা নিরাপদ ভাবছ নিজেকে ততটা নিরাপদ জায়গা ওটা নয়। মাঝে মাঝে ডাইভ মারছে। তুমি বুকে হেঁটে খাটের তলায় গেলে ভাল করতে। তার আগে অবশ্য ভেবে নাও, কোনটা তোমার ভাল লাগবে চামচিকির লাথি না আরশোলার খোঁচা।'

জয়নারায়ণ করুণ কণ্ঠে বললেন, 'আমার এই বিপদের মুহূর্তে আপনারা কোনও সাহায্যেই আসছেন না। চামচিকির ব্যালে দেখছেন।'

হরিশঙ্কর বললেন, 'আর দেখাচ্ছে কোথায় ? সবচেয়ে সমঝদার দর্শক যাকে ভেবেছিল তার এই দশা দেখে লজ্জায় ঘরের আকাশ ছেড়ে বাইরের আকাশে ফিরে গেছে। তুমি এইবার ভূমিতল ছেড়ে চেয়ার তলে ফিরে আসতে পারো। তোমার অমন সাদা ধবধবে ধুতি ময়লা হয়ে গেল।'

জয়নারায়ণ ঘাড় তুলে সাবধানে চারপাশ দেখতে দেখতে বললেন, 'আত্মরক্ষার সময় জামাকাপড় তুচ্ছ হয়ে যায় চাটুয্যেমশাই। চামচিকির লাথি খেলে কি হয় জানেন ? অষ্টিওম্যালাইটিস। হাড়ে চুন জমে সব গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে পড়ে যায়।'

'কোথায় পড়বে ? বাইরে ?'

'না না দেহের থলের মধ্যেই।

'বাবা এটা তো জানা ছিল না। কোন ডাক্তারি শাস্ত্রে লেখা আছে জয় ?'

'সব কি আর শাস্ত্রে থাকে চাটুয্যেমশাই ? কিছু থাকে মানুষের বিশ্বাসে। চামচিকি হল ইল-ওমেন। অশুভকারী।'

হরিশঙ্কর বললেন, 'চামচিকি হল আত্মা। সে-কথা জানো কি ? হয়তো কোনও ভাল সোল এসেছিল। তুমি তাকে উপেক্ষা করলে।'

জয়নারায়ণ শিশুর মতো মুখের ভাব নিয়ে তাকিয়ে রইলেন হরিশঙ্করের দিকে।

৩৫

জীব আজ সমরে, রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে ।
ভক্তিরথে চড়ি, লয়ে জ্ঞানতূণ, রসনাধনুকে দিয়ে প্রেমগুণ,
ব্রহ্মময়ীর নাম ব্রহ্ম-অস্ত্র তাহে সন্ধান করে ॥

সিল্ক টুইলের সাদা ধবধবে সার্ট । গলার একেবারে ওপরের বোতামটা পর্যন্ত টাইট করে লাগান । এক মুখ পান । বেঁটেখাটো হৃষ্টপুষ্ট চেহারা । সামনে সিঁথি । বসে আছেন হরিশঙ্করের ছোট মামা । অকৃতদার । তন্ত্রসাধক । বেশির ভাগ সময় তারাপীঠেই থাকেন । শবসাধনা করেছেন । অলৌকিক শক্তির অধিকারী । বাইরে থেকে দেখলে কিছুই বোঝা যাবে না । যাঁরা অন্তরঙ্গ তাঁরা ভয় আর ভক্তি দুটোই করেন । একটু খোঁচাখুঁচি যিনিই করেছেন তিনিই মরেছেন । প্রত্যেক মানুষের জীবনেরই একটা গোপন দিক থাকে । সর্বসমক্ষে তাঁর গোপনীয়তা উন্মোচিত হলে লজ্জার একশেষ । এই সাধক তাঁর অহঙ্কার চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেন, তখন আর তিনি পালাবার পথ পান না । এঁর অর্ন্তদৃষ্টির সামনে সবাই কাঁচের মানুষ । আমার সামনেই কতবার এমন ঘটনা ঘটেছে ।

একবার এক বড় ডাক্তার এসেছেন খোঁচাখুঁচি করতে । সন্দেহবাদী। অলৌকিকে বিশ্বাস নেই । বিলিতি ডিগ্রিধারী । বিশাল পসার । এসেছেন শক্তি পরীক্ষা করতে । খুব দগদগে কথা বলছেন, শবসাধনা ? কি আছে মশাই শবে ! জাস্ট এ ডেড বডি । বরং একটা কঙ্কালের প্রয়োজনীয়তা আছে । অ্যানাটমির ছাত্রের কাজে লাগে । অমন ডেড বডি আমরা বহুবার ডিসেক্ট করেছি । তাহলে তো আমরাও অলৌকিক শক্তির অধিকারী, কি বলেন মিস্টার ব্যানার্জি ?

ছোট দাদু মুচকি হাসছেন ।

ডাক্তার বলছেন, আমাদের ধর্ম থেকে এই বুজরুকিটা না গেলে শিক্ষিত লোক কোনও দিনই ভিড়বে না । বোকা আর অশিক্ষিত মানুষরাই এই ফাঁদে পা দেবে । গুরুদের এই ব্যবসাদারী ক্রিমিনাল অফেনস ।

ছোট দাদুর মুখে পান ছিল । ছিবড়েটা ফেলে মুখ খালি করলেন । ভাঁজ করা সাদা রুমালে পাতলা ঠোঁট দুটো সাবধানে মুছলেন । প্রস্তুত হচ্ছেন । আমরা যারা জানি, বসে আছি থম মেরে । পরিচিত যে-ভদ্রলোক ডাক্তারবাবুকে এনেছেন তিনি মহা বিব্রত ।

ছোটদাদু বললেন, কেন এসেছেন ?

ডাক্তার বললেন, খুব প্রচার আপনার, মুখ দেখে মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ বলে দেন !

ছোট দাদু বললেন, তিনটেই জানতে চান, না চারটে ? ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান এই নিয়ে

ইহকাল, তারপর একটা আছে পরকাল।

ডাক্তার বললেন, পরকাল তো একটা আজগুবি গল্প, যা বলবেন তাই মানতে হবে। ইহকালটাই হোক। তবে তাই হোক, বলে ছোট দাদু অদ্ভুত হাসলেন। এক টিপ নস্যি নিলেন। এইবার জামার পকেট থেকে একটা রুমাল বেরলো। খাড়া খড়্গের মতো নাক। নাক মুছলেন, তারপর বললেন, অফিসের ক্যাশ ভেঙে জেলে যেতে হচ্ছিল, আত্মহত্যা করলেন, তারপর মামার বাড়িতেই মানুষ। মামাদের প্রতি আপনার কৃতজ্ঞতা জানালেন মামাতো বোনটিকে নষ্ট করে। ভালই করেছেন। কিন্তু আপনার এমন স্বাস্থ্য পারেন না কেন? ইমপোটেন্ট হয়ে পড়েছেন। স্ত্রী তো অন্য ভাবে অন্য লোকের সঙ্গে জীবন কাটাচ্ছে। ডিসগ্রেসফুল। রোজগার তো কম নয়, জীবনের শান্তি কোথায় ডাক্তার? আমাকে পরীক্ষা না করে নিজেকে পরীক্ষা করান। ফিজিসিয়ান হিল দাইসেলফ। নিজের স্ত্রীকে অন্যের সঙ্গে দেখতে ভাল লাগে ডাক্তার? ডিসগ্রেসফুল। মাত্রাতিরিক্ত সেল্‌ফ অ্যাবিউজের ফল। বউ এখন ব্ল্যাকমেল করছে। সো স্যাড। আপনারই পয়সা অন্যের জন্যে দুহাতে ওড়াচ্ছে। ছেলেটা যে আপনার নয় সে আপনি ভালই জানেন। বাবা, বলে যখন ডাকে লজ্জা পান, তাই না ডাক্তার!

ডাক্তার স্তম্ভিত। মুখ কালো। মাথা হেঁট। শেষে কাঁদো কাঁদো অবস্থা।

ছোটদাদু বলেই চলেছেন, আপনার বাড়ির উত্তর দিকের হলদে বাড়ির ফর্সা মতো ছেলেটা এখন আপনার স্ত্রীর ইজারা নিয়েছে। অতীত আর বর্তমানের একটুখানি হল, এইবার ভবিষ্যৎ। পাঁচ বছরের মধ্যেই আপনার স্ত্রী পাগল হয়ে যাবে। আর যে আপনার ছেলে বলে পরিচিত, সে আপনাকে বাড়ি ছাড়া করবে। ভবিষ্যতের দিকে আর একটু এগোই? আপনার পার্কিনসন্‌স ডিজিজ হবে। সেটা কি নিশ্চয় জানেন। ভেবে দেখ, শেষের সে-দিন কি ভয়ঙ্কর! কেন এমন হবে? প্রারব্ধ। কেন এমন হবে? তামসিক অহঙ্কার হল আপনার ঘোড়ার জকি। সে যেমন চালাচ্ছে, তেমনি চলছেন আপনি। টাকার গরম, পসারের গরম, মোসায়েবদের মালিশ আর আলগা চরিত্রের কিছু মহিলা, দিলে সর্বনাশ করে। এরপর ময়লা বিছানায় শুয়ে থর থর করে কাঁপবেন। কাপড়ে-চোপড়ে মাখামাখি। পাশে থাকবে একজন, সে আপনার বিধবা বোন, যাকে আপনি এখন বাড়ি ঢুকতে দেন না। আর কিছু জানতে চান ডাক্তার? সামথিং কংক্রিট। অ্যাণ্ড হিয়ার ইট ইজ। আপনার কাছে এখন তিন হাজার সাতশো কুড়ি টাকা বারো আনা আছে। দুটো মরফিনের অ্যাম্পুলস আছে, সন্ধেবেলা আপনার নিজেরই লাগবে। গাড়িতে এক বোতল বিলিতি হুইস্কি আছে। নোংরা ছবির বই আছে একটা। আরো গভীরে যাবো? আপনার প্রাইভেট পার্টসে সম্প্রতি একটা ঘা হয়েছে। ওপাশে ক'দিন হল পাইলস খুব ভোগাচ্ছে। ফিস্‌চুলার দিকে যাচ্ছে। আরো চাই ডাক্তার? এনিথিং মোর ইউ ওয়ান্ট!

ডাক্তার কেঁদে ফেললেন। একটা তালগোল পাকানো মাংসপিণ্ডের মতো হয়ে গেলেন। অতিকষ্টে বললেন, আমাকে বাঁচান।

ছোট দাদু বললেন, বাঁচানো যায় না, তবে সহ্যশক্তিটা বাড়িয়ে দেওয়া যায়, টলারেন্‌স। ফুটবাথের মতো। ভীষণ গরম জল। ধীরে ধীরে সহ্য করার শক্তি বেড়ে গেলে আর পা ডুবিয়ে বসে থাকতে অসুবিধে হয় না। সহজ ব্যাপার। এর জন্যে কি করতে হবে? স্লেটের সব লেখা সাত্ত্বিক ন্যাকড়া দিয়ে মুছে ফেলতে হবে। ত্যাগ আর তিতিক্ষার পেনসিল দিয়ে ফোটাতে হবে নতুন বর্ণমালা।

সেই ডাক্তার এখন দাদুর প্রধান শিষ্যদের একজন। বেশির ভাগ সময় আশ্রমেই থাকেন। শান্ত, সমাহিত এক নতুন মানুষ। এইরকম অজস্র ঘটনা আছে দাদুর জীবনে। একবার একদল গুণ্ডা কালীপুজোর রাতে দাদুকে মারতে এসেছিল। সামনে গিয়ে দু'হাত তুলে দাঁড়ালেন। সব স্থাণু। কেউ আর নড়েও না চড়েও না। শেষে ছোটদাদু বললেন, আচ্ছা! তাহলে তোমরা এইবার যাও। একটা মৌন মিছিল ধীরে ধীরে চলে গেল। সব যেন নেশায় বুঁদ।

হরিশঙ্কর মুখে না বললেও এই ছোটদাদুকেই গুরু বলে মেনে নিয়েছেন। হরিশঙ্কর অলৌকিক কিছু বিশ্বাস করেন না। বিশ্বাস করেন বিজ্ঞান, কর্ম, সাধনা আর পবিত্র জীবন। বিয়ে করে কেউ সংসারে ঢুকলে আক্ষেপ করে বলেন, যাঃ হয়ে গেল। জীবনের ডানা ভেঙে গেল। ছোট মামা বিয়ে করেননি, সেটা একটা পয়েন্ট। বিয়ে তো করেননি, অনেকে বিয়ে না করেও নারীসঙ্গের জন্যে ছোঁক ছোঁক করেন, ছোট মামা তা করেন না। কামজয়ী সাধক। পয়েন্ট দুই। তিন নম্বর, প্রবল সাধনভজন করেন। চার নম্বর, পবিত্র জীবনযাপন, কদাচারী তান্ত্রিক নন। পরমাশক্তির উপাসক। ছোট দাদুকে আমি শ্রদ্ধা করি, কারণ তিনি আমাকে ভয়ঙ্কর ভালবাসেন। আমার চোখের সামনে তুলে ধরেন আমার ভবিষ্যৎ মহৎ জীবনের ছবি। কেবল বলেন, তুমি কি হবে তুমি নিজেই জান না। আমার সব হতাশা, সব দুর্বলতা ঝরে যায়, একটা আকাঙ্ক্ষা জাগে। শ্রদ্ধার দ্বিতীয় কারণ, আমি তাঁর মধ্যে অলৌকিক শক্তির বিকাশ দেখেছি। সেটা কি, তার মধ্যে বিজ্ঞান আছে, না তন্ত্র আছে, না ম্যাজিক আছে আমার জেনে দরকার নেই। ছোটদাদুকে প্রশ্ন করেছি। তিনি হেসে বলেছেন, সাধনাই সব। সেইটাই দেখবে। বিভূতির দিকে নজর দেবে না। অমন হয়। সাধনভজন করলে সকলেরই হবে।

সেই ছোটদাদু বসে আছেন দক্ষিণের জানলার দিকে পেছন ফিরে, হাতলঅলা চেয়ারে। সামনে একটা গোল কাঠের টেবিল। মুখোমুখি বসে আছেন হরিশঙ্কর। আমি ঘুরঘুর করছি। হঠাৎ হরিশঙ্কর টেবিলে একটা আঙুল ঠুকে বললেন, 'হোয়াই? ক্যান ইউ টেল মি হোয়াই? কেন এমন হবে? আমরা মানবই বা কেন?'

দু'জনেই সমবয়সী। একই সঙ্গে লেখাপড়া করেছেন, তাই তুই-তোকারির সম্পর্ক।

ছোটদাদুও হরিশঙ্করের প্রশ্নের প্রতিধ্বনি করলেন, 'হোয়াই। কেন মানবো আমরা! আমাদের অধিকার কেন ছাড়বো? হোয়াই।'

হরিশঙ্কর আর একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'দ্যাটস রাইট। একজন মহিলা যেই বিধবা হবে, অমনি পুত্র-কন্যা সমেত তাকে শ্বশুরবাড়ি থেকে দূর করে দেওয়া হবে কেন? বাঙালির এ কি অসভ্যতা! প্রতিবাদ করা হয় না বলে, বেড়েই চলেছে, বেড়েই চলেছে। আমরা তা হলে কি করতে আছি! উই মাস্ট ফাইট। জীবনটা বড় শান্ত হয়ে আসছে। বহুকাল বড় ধরনের কোনও মারামারি হয়নি। এখনো দশ-বিশটা লোকের মহড়া নিতে পারি।' ছোটদাদু খুব শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'লাস্ট কবে মারামারি করেছিস?'

'তা বছর দশেক হল। কলকাতার ময়দানে গোটা পাঁচেক বাঁদরকে দিন কতকের জন্যে শুয়ে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলুম।'

'তোর টেকনিকটা কি?'

'বেধড়ক ঘুসি আর যুযুৎসুর প্যাঁচ, রদ্দা।'

'আমি আবার কুস্তির লাইনটা প্রেফার করি। একবারে মাথার ওপর তুলে বারকতক ঘুরিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দি। মহাভারতের স্টাইলটাই আমার হাতে খোলে ভাল। দুটো পা

ধরে ফেঁড়ে ফেললুম, কি মুণ্ডুটা ঘুরিয়ে দিলুম। ঝামেলা অনেক কম। সময়ও অনেক কম লাগে।'

'তুই লাস্ট কবে করেছিস ?'

'পরশু দিন। তারাপীঠের শ্মশানে। খুব মাস্তানি করছিল। সব কটাকে ল্যাংটা করে রামপুরহাটে পাঠিয়ে দিলুম।'

'বেশ করেছিস। দু'একটাকে নিরামিষ করে দিতে পেরেছিস ?'

'হ্যাঁ, পালের গোদাটার মনে হল সবকটা দাঁতই ঝরে গেছে।'

'মানুষের মধ্যে পশুও আছে দেবতাও আছে। সবএক ট্রিটমেন্ট হলে তো হবে না। পশুদের শায়েস্তা করার জন্যে প্রয়োজন পশুবলের। ধর্মের কথা, জ্ঞানের কথা, সদুপদেশ, কিছুই কিছু হবে না। মায়ের নাম করো, মায়ের নাম, তারা শালা বলে তেড়ে আসবে। যেমন রোগ তার তেমন দাওয়াই হওয়া উচিত। ভূত ছাড়াতে ওঝার ঝ্যাঁটা। গ্রীক মাইথোলজিতে আছে সেন্টর-এর কল্পনা, যার আধখানা পশু আর আধখানা মানুষ। মানব-দানব কম্বাইনড্। তিনি আবার শিক্ষক। রাজপুত্রদের গুরু। ভবিষ্যৎ রাজা কি শিখতেন? দানবদলনে দানব হবে, মানবপালনে দেবতা হবে। আমাদের নৃসিংহ-অবতার! সেই একই কল্পনা। আমাদের দশ মহাবিদ্যা। ত্বং কালী তারিণী দুর্গা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী/ ধূমাবতী ত্বং বগলা ভৈরবী ছিন্নমস্তকা॥ ত্বমন্নপূর্ণা বাগ্‌দেবী ত্বং দেবী কমলালয়া/ সর্বশক্তি-স্বরূপা ত্বং সর্বদেবময়ী তনুঃ॥ আমাদের দশাবতার—মীন, কূর্ম, শূকর, নরহরি, বামন, ভৃগুপতি, ক্ষত্রিয়-রুধিরময়ে, রঘুপতি, হলধর, বুদ্ধ, কল্কি। কি কনসেপসান! জগৎ যেমন, শাসনও ঠিক তেমন। কি তুই আমার সঙ্গে একমত তো ?'

'অবশ্যই। কালই চলো বেরিয়ে পড়ি অসুর নিধনে।'

'একটা ব্যাপারে আমাদের সাবধান থাকতে হবে, সেটা হল সংযম। এমন কিছু করব না, যাতে থানা পুলিস হয়। অ্যাবসলিউট সংযম।'

'অ্যাবসলিউট। প্রথমে আমরা ভয় দেখাবো। তাতে না হলে লোভ দেখাবো। লোভ দেখিয়ে বের করে আনবো, তারপর আমাদের এলাকায় এনে দাঁড়া, হুল, সব ছেঁটে দেবো।'

'তোর অলৌকিক কিছু করবি না কি ?'

'এই অলৌকিক শব্দটা সম্পর্কে আমার সামান্য আপত্তি আছে। তোর কাছে যা অলৌকিক আমার কাছে তা ভীষণ স্বাভাবিক। তুই অবিশ্বাসী,তোকে বোঝাতে হলে বিজ্ঞানের রাস্তায় যেতে হবে। যেমন ধর, একটা দেশলাই কাঠি! দেখলে বোঝা যায় আগুন আছে ? যায় না। এইবার বারুদের গায়ে ঘষো, ফ্যাঁস! এটা কি অলৌকিক! কিছু শক্তি ধারণ করা যায় বৎস! একটু সাধনা করলেই হয়। তুই যে এস্রাজ বাজাস, ওটা কি অলৌকিক ? কেউ দশ সেকেন্ড দম বন্ধ করে থাকতে পারে না, আমি দশ মিনিট পারি। আমি অভ্যাস করেছি। আমি প্রাণায়াম করে আসন ছেড়ে ভেসে উঠতে পারি। আমি পারি। কেন পারি, কি ভাবে পারি, তা আমি কি করে বলব! প্রবল ইচ্ছাশক্তিতেই পারি হয়তো। ত্রৈলঙ্গস্বামী সারাটা দিন কাশীর গঙ্গায় পদ্মফুলের মতো ভেসে বেড়াতেন। হাস জলে ভাসে, পাখি আকাশে ওড়ে,এর মধ্যে অলৌকিক তো কিছু নেই। সেই আর্ট আমার আয়ত্তে এসেছে গুরুর কৃপায়। আমি কি করতে পারি! এখনই দেখবে, বিনা চেষ্টায় আমার ভেতর থেকে কেমন অনাহত শব্দ বেরোবে! ঠোঁট ফাঁক হবে না, নড়বে না, বুক পেটে কোনও রকম আন্দোলন হবে না। সেই শব্দে ঘরের সমস্ত জিনিস কাঁপবে।

তোমাদের শরীর সিরসির করবে। শুনতে চাও ?'

হরিশঙ্কর কিছু বলার আগে আমিই লাফিয়ে উঠলুম ! 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

হরিশঙ্কর বললেন, 'অকাল্টের দিকে এর খুব ঝোঁক।'

ছোটদাদু চেয়ার ছেড়ে মেঝেতে নেমে বসলেন পদ্মাসনে। দেহ স্থির। চোখ নিমিলিত। প্রথমে আকাশের অনেক উঁচু দিয়ে এক ঝাঁক প্লেন উড়ে গেলে যে-রকম শব্দ হয়, সেই রকম শব্দ শুরু হল। তারপরেই উঠল সেই ভয়ঙ্কর শব্দ, একটানা। কোনও ছেদ নেই। টানেলের ভেতর দিয়ে রেলগাড়ি যাচ্ছে। গোমুখে গঙ্গার অবতরণ হচ্ছে। একটা দড়িতে ছোট একটা লোহার পাত বেঁধে কেউ বন্‌বন্ করে ঘোরাচ্ছে। একাক্ষর শব্দ, ওঁ। হচ্ছে তো হচ্ছেই। কি তার রেজোনেন্‌স। ঘরের সমস্ত জিনিস চিন্‌চিন্ করে কাঁপছে। আমাদের শরীরের প্রতিটি কোষে ঝঙ্কার হচ্ছে। মনে হচ্ছে পাউডার হয়ে যাবো।

হরিশঙ্কর বললেন, 'স্টপ ইট। স্টপ ইট।'

ধীরে ধীরে শব্দ স্তব্ধ হল। ছোটদাদু আবার চেয়ারে ফিরে এলেন।

হরিশঙ্কর বললেন, 'এ হল সাউন্ড স্প্যাজম। নাদ-সাধনায় এটা হয়।'

ছোট দাদু বললেন, 'আমি এটা সাধনায় পেয়েছি, বাঘ পেয়েছে জন্মসূত্রে। যে কোনও বাঘই এটা পারে। শব্দটা একটু অন্যরকম হবে। বাঘের ভাষায় হবে ; কিন্তু সাউন্ড-কোয়ালিটি এক। এটা কি অলৌকিক ?'

'না। এটা টেকনোলজি।'

'এখন দেখো, এই শব্দের পিচ যদি আমি আরো বাড়াই, এই ঘরের সব কিছু ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। বিশ্বাস করো ?'

'করি। অনেক সময় প্লেনের শব্দে আলমারির কাঁচ ভেঙে যায়।'

'আমি এইরকম কিছু ভেল্কি দেখাতে চাই ওখানে। অলৌকিক নয় তবে হাইলি টেকনিক্যাল। তোর আপত্তি আছে ?'

'না। সে তুই করতে পারিস। সাউন্ডকেই অনেক ভাবে ব্যবহার করা যায়, যেমন ভেন্‌ট্রিলোকুইজম।'

'সে-বিদ্যাটাও আমার আয়ত্তে আছে।'

সঙ্গে সঙ্গে চেপে ধরলুম, 'ছোটদাদু একবার। কখনো শুনিনি।'

বলামাত্রই শুনলুম, নিচের রাস্তা থেকে কে আমার নাম ধরে ডাকছে। বোকার মতো রাস্তার দিকের জানালায় ছুটছিলুম। ছোটদাদু হেসে ফেললেন। ওপাশে রান্নাঘরের দিক থেকে কে বললেন, 'ওদিকে নয় এদিকে এসো।'

হরিশঙ্কর বললেন, 'বাঃ, বেশ ভালই আয়ত্ত করেছিস। দিস ইজ অ্যান আর্ট'।

ছোটদাদু বললেন, 'তোর কন্ট্রোলে এইরকম কিছু আছে ?'

'নাঃ, আমার কন্ট্রোলে আছে শক্তি। আমি মেঘের মতো হাসতে পারি। বিদ্যুতের মতো ঝলসে উঠতে পারি। হাতির মতো সব কিছু ভেঙে চুরমার করে দিতে পারি। আবার একটু একটু করে সব গড়েও তুলতে পারি। আমি কখনো শ্মশানের চিতা, কখনো উনুনের আগুন। জীবন আর মৃত্যুর সীমানায় মহাকালের দোলকের মতো দোল খাচ্ছি।'

ছোটদাদু বললেন, 'তোমার একটা জিনিস হয়, রঙের পরিবর্তন। কখনো ছাইয়ের মতো ধূসর, কখনো লোহার মতো কালো, কখনো রক্তের মতো লাল, কখনো মঠের মতো সাদা।'

'শুনেছি বটে, তবে কোনওদিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখিনি। মনের

ভাবের সঙ্গে রঙের পরিবর্তন হয়। আমার ভিতরে মনে হয় বহুরূপীর মশলা আছে। স্কিনের পিগমেন্টেশান পাল্টে যায়। বলে না ! রেগে লাল। আমি হয় তো সত্যিসত্যিই লাল হয়ে যাই। মনের ভাব অনুসারে আমার দেহের উত্তাপ বাড়ে কমে। পঁচানব্বই থেকে একশো এক চলাফেরা করে। এর কোনওটাই বিভূতি নয়। কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, ভাই ! অষ্টসিদ্ধির একটা সিদ্ধি থাকলে আমায় আর পাবে না। তোমার একটু শক্তি হতে পারে, এই মাত্র ! গুটিকা সিদ্ধি, ঝাড়ানো, ফোঁকানো, দাওয়াই। তবে লোকের একটু উপকার হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, সিদ্ধাইয়ের জন্যে লোক পঞ্চ-মকার তন্ত্রমতে সাধন করে। কিন্তু কি হীনবুদ্ধি ! সিদ্ধাই থাকলে মায়া যায় না, মায়া থেকে আবার অহঙ্কার। কি হীনবুদ্ধি ! ঘৃণার স্থান থেকে তিন টোসা কারণ বারি খেয়ে লাভ কি হল ? না মোকদ্দমা জেতা ! তুই তো এইসব করেছিস ?'

ছোটদাদু বললেন, 'যে সাধনের যা-নিয়ম তা তো আমায় করতেই হয়েছে গুরুর নির্দেশে। সিদ্ধাই এসেই পড়ে, যেমন বৃষ্টিতে দাঁড়ালে মানুষ ভেজে। আটটা সিদ্ধিও আমার এসেছে—অনিমালঘিমা ব্যাপ্তি প্রাকাম্য মহিমা ঈশিত্ব বশিত্ব কামাবসায়িতা, এই হল অষ্টসিদ্ধি ; কিন্তু আমি প্রকাশ করি না। সবই আমার আছে, প্রকাশ করলে সাধারণ মানুষ ভয় পেয়ে যাবে ; যেমন ধর অনিমা, আমি নিজেকে ছোট করতে করতে একেবারে অদৃশ্য করে ফেলতে পারি গুরুর কৃপায়। ব্যাপ্তি, সেটাও এসেছে। বিশালও করে ফেলতে পারি নিজেকে। নিজেকে ভারী করে ফেলতে পারি পর্বতের মতো।'

আমি আবার লাফিয়ে উঠলুম, 'ছোটদাদু অনিমাটা একবার দেখাবেন ?'

হরিশঙ্কর ধমকে উঠলেন,'কি ভেবেছ তুমি ? এটা কি যোগের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস? যাও, তোমার কাজে যাও।'

ছোটদাদু বললেন, 'তোমার যখন আকাঙ্ক্ষা এত প্রবল, সাধনভজনে চলে এসো না ?'

হরিশঙ্কর বললেন, 'ঈশ্বর কে চায়, সবাই চায় ম্যাজিক। ও-প্রসঙ্গ বাদ দে, এখন প্রস্তুত হ বাঁকুড়ায় যাওয়ার জন্যে। সেখানেই দেখা যাবে তোর অনিমা-লঘিমাদি অষ্টসিদ্ধি। আজই গেলে কেমন হয় !'

'না আজ নয়। আজ আমাদের দিন ভাল নয়। কাল হল উৎকৃষ্ট দিন।'

৩৬

জন্ম-জরার ঝরাধানে ফোটে নয়ন-চারা
কেউ জানে না রসে বশে খেলা কেমন ধারা ॥

বহুকাল পরে একটা অজ গাঁ দেখার সুযোগ পাওয়া গেল। হাঁটছি তো হাঁটছিই। সামনে বিশাল দামোদর। এখন তেমন জল নেই। ধু ধু বালি। সামান্য জল চিকচিক করছে কোথাও কোথাও। বালির নদী দেখলে বুকটা কেমন করে ওঠে। আতঙ্ক হয়। আবার নদীর নাম যদি হয় দামোদর, তাহলে তো কথাই নেই। দামোদর নদী নয় নদ। দুঃখ-নদ। নদীতে নামার আগে তিন জনেই থমকে দাঁড়ালুম।

পরম সাহসী হরিশঙ্কর বললেন, 'একটাই ভয়, চোরাবালি। চোরা বালিতে পড়লে আর রক্ষে নেই।'

ছোটদাদু বললেন, 'স্থানীয় মানুষ যাঁরা পার হচ্ছেন তাঁদের অনুসরণ করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।'

হরিশঙ্কর বললেন, 'তাহলে চলো কপাল ঠুকে নেমে পড়ি। এখানে তোর অলৌকিক বিদ্যা কাজে লাগবে না। লৌকিক বিদ্যাই ভরসা। সে-বিদ্যার নাম অনুসরণ। ওই যে তিন জন যেখান দিয়ে যে-ভাবে নামছে, আমরাও সেই ভাবে নেমে পড়ি।'

ঢালু গড়ানে পাড় বেয়ে ছোট ছোট আগাছা মাড়িয়ে আমরা নেমে এলুম নিচে। সঙ্গে সঙ্গে আকাশ উঠে গেল অনেকটা উঁচুতে। সাদা বালি প্রখর রোদে ঝলসাচ্ছে। চোখে ধাঁধা লেগে যাচ্ছে। মাথা ঝিম ঝিম করছে। সামনে, পেছনে, ডাইনে, বামে, শুধু বালি আর বালি। নিজেকে মনে হচ্ছে ছোট্ট একটা পুতুল। হাতের দিকে তাকালুম, মনে হল পোড়া কাঠ। এত কালো দেখাচ্ছে। সামনের তিনজন পরপর যেমন চলেছেন, আমরাও ঠিক সেই কায়দায় চলেছি। পাশাপাশি নয়। একের পেছনে আর এক। রোদে মাথার চাঁদি ফেটে যাচ্ছে। নেশার মতো লাগছে। বালির নেশা। সবার আগে হরিশঙ্কর, তারপর আমি, আমার পেছনে ছোটদাদু। ভয় এক মাত্র আমারই করছে ; কারণ আমি ভীতু। হরেক রকমের আশঙ্কায় কণ্ঠতালু শুকিয়ে গেছে। হঠাৎ যদি বান আসে, সেই বিখ্যাত দামোদরের বান, তাহলে কি হবে। কি ভাবে প্রাণে বাঁচবো। ফসফসে, থসথসে বালিতে তো দৌড়াতে পারবো না। এই প্রথম অনুভব করলুম, পথ না থাকলে পথ চলা কত অস্বস্তিকর। পথহারা পথিক আমরা। কোনও ধরাবাঁধা নেই। কেউ পথ পেতে না রাখলে চলার সুখ কি ভাবে হারিয়ে যায়! বাঁ পাশে পড়ে আছে বিশাল এক গরুর কঙ্কাল। হাড়ের খাঁচায় বাতাস বইছে

ঝুমঝুম শব্দে। মৃত্যু যেন ঘুঙুর পায়ে নাচছে।

আমরা যখন মাঝামাঝি এসে গেছি, সামনের তিনজনের মধ্যে একজন বললেন, 'আজ বোধহয় ড্যাম থেকে জল ছাড়বে।'

হরিশঙ্কর বললেন, 'শুনছিস ?'

ছোটদাদু বললেন, 'আর শুনে কি হবে, আমরা এখন মাঝ নদীতে। এপারও যত দূরে ওপারও তত দূরে। জল ছাড়লে ডুবে মরতে হবে।'

কথা শুনে, মরার আগেই আমি মরে গেলুম। পায়ের জোর কমে এল। বালির নদী এঁকে বেঁকে ডাইনে-বামে নিজেকে খেলিয়ে দিয়েছে। মহাতঙ্কের মহাসংকীর্তন যেন নেচে নেচে চলেছে। বুগ্ বুগ্ একটা শব্দ কানে এল। কে যেন আলগোছে জল খাচ্ছে। দেখি, সামনেই বালির মধ্যে একটা গর্ত, সেখানে জল ফুটছে। উঠছে, ঢুকছে, ঢুকছে, উঠছে।

হরিশঙ্কর থেমে পড়লেন। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। মুখে চোখে অসীম কৌতূহল। ছোটদাদু স্মরণ করিয়ে দিলেন, 'ওরা তিন জন কিন্তু অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আজ জল ছাড়তে পারে।'

হরিশঙ্কর সে-কথায় কান না দিয়ে বললেন, 'সায়েনসটা কি ? ব্যাপারটা কি হচ্ছে ! ও বুঝেছি, ক্যাপটিভ ওয়াটার। বালির তলায় জল আটকে আছে। রোদ আর বালির গরমে ফুটতে শুরু করেছে। এ-দেশে কেন যে সোলার এনার্জিকে কাজে লাগায় না ! জলের টেম্পারেচারটা হাত দিয়ে দেখবো ?'

ছোটদাদু বললেন, 'কি দরকার তোর ? ওখানে চোরাবালিও থাকতে পারে।'

'চোরা বালি নেই। তলায় একটা হার্ড সারফেস আছে। তা না হলে জল জমত না।'

'তুই এখন দয়া করে এগিয়ে চল।'

'তোরও ভয় করছে ?'

'আমি ঠাণ্ডা বাতাসের গন্ধ পাচ্ছি, তার মানে জল আসছে। ওই দেখ সেই তিনজন মানুষ দূরে বিন্দুর মতো হয়ে গেছে। আমাদের পেছনে আর কেউ নেই।'

হরিশঙ্কর এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলেন, দেখে বললেন, 'ভয় আর বিপদ নিয়ে খেলা করতে আমি ভীষণ ভালবাসি।ও দুটো আমার প্রিয় খেলনা। যারা ভয় পায় তাদের আরও ভয় দেখাতে ভীষণ মজা লাগে, আজ সেই সুযোগ এসেছে। আহা ! প্রকৃতির কি ভয়ঙ্কর রূপ ! মাথার ওপর অসীম, অনন্ত ফিকে নীল আকাশ। বালির বিশাল নদী খেলে খেলে চলে গেছে এপাশ থেকে ওপাশে। প্লাবনের আতঙ্কে ভরা পরিমণ্ডল। এমন পরিবেশ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ না করে চলে যাবো !'

ছোটদাদু বললেন, 'ক্যালকুলেটেড রিস্ক নেওয়া চলে, ডেয়ারডেভিল হওয়া ঠিক নয়। অকারণে নিজেকে বিপদে ফেলে বোকারা। এগিয়ে চল। বেলা বেড়ে যাচ্ছে।'

'তোরা না থাকলে আজ আমি এই নদীগর্ভেই দিন কাটাতুম। জল এলে আমার কি হত, ভেসে চলে যেতুম। মৃত্যুকে ভয় পেলে জীবনকে উপভোগ করা যায় না।'

'মৃত্যুকে ভয় না পেলেও জেনেশুনে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যাওয়া বোকামি। আত্মরক্ষার পথ খোলা রেখে বিপদের মুখোমুখি হতে হয়। জল এসে গেলে এই অবস্থায় আমাদের পালাবার কোনও রাস্তা নেই। ওরা যখন বলে গেল তখন আমাদের সাবধান হওয়াই উচিত। সাধ করে মরে লাভ কি ! সে তো আত্মহত্যার সামিল।'

হরিশঙ্কর বললেন, 'মৃত্যু থাকলে মৃত্যু হবে। তা বলে এমন একটা দৃশ্য ছেড়ে ভয়ে পালাবো ! ওরা কি জানে ?'

'ওরা স্থানীয় লোক। আমাদের চেয়ে বেশিই জানবে।'

ক্ষুণ্ণ হরিশঙ্কর হাঁটা শুরু করলেন। ছোটদাদু বললেন, 'তোর কাণ্ড দেখে আমার একটা গল্প মনে পড়ছে। শ্রীরামকৃষ্ণের গল্প। একটা হাতি আসছে। হাতির পিঠে মাহুত। সামনে একটি লোক পড়েছে। হাতির পিঠ থেকে মাহুত চিৎকার করছে, সাবধান! সাবধান! লোকটি শুনেছিল, সমস্ত জীবই নারায়ণ। হাতিও নারায়ণ। নারায়ণ তার ক্ষতি করবে কেন? লোকটি মাহুতের কথায় কান দিল না। হাতি এল। শুঁড় দিয়ে তুলে এক আছাড়। প্রায় মরো মরো। একজন এসে বললেন, 'বাবা, সবাই নারায়ণ, এই জ্ঞানই যদি তোমার হয়েছে, তাহলে মাহুত নারায়ণের কথা কেন শুনলে না। তোকেও বলি, ওয়ার্নিং শুনতে হয়। এখন গোঁগোঁ করে বাকি পথটুকু হেঁটে চলো। এখানে দ্রুত পলায়ন ছাড়া আর কোনও বিজ্ঞান আপাতত নেই।'

হরিশঙ্করের এই পলায়নটা তেমন পছন্দ হল না। তাঁর মুখ দেখেই বোঝা গেল। হঠাৎ বললেন, 'চাঁদের আলোর রাতে এই ধুধু বালির বিস্তারে আসন পেতে বসতে হয়। সামনে জ্বলবে ধুনি। আর সেই গান, শ্মশান ভালবাসিস বলে শ্মশান করেছি হৃদি।'

ছোটদাদু বললেন, 'ওই গান তো তোমার ভাল লাগার কথা নয়। নেগেটিভ গান। মৃত্যুর ইঙ্গিত আছে।'

হরিশঙ্কর বললেন, 'মৃত্যুর মতো মহান কিছু আছে! এমন একটা চলে যাওয়া, যা একেবারে একশো ভাগ সত্য। একশোভাগ নিশ্চিত। কোনওভাবেই আর ফেরা যাবে না। থাকা আর না-থাকার মধ্যে সময়ের ব্যবধান বাড়তেই থাকবে, ক্রমশই অনন্তে গিয়ে ঠেকবে। জার্নি টু ইনফিনিটি। এই একটা কারণেই মৃত্যু আমার কাছে ভীষণ আকর্ষণীয়। সব চলার শেষ আছে, এ-চলার শেষ নেই। জীবনই এই পথে পৌঁছে দেয় বলে জীবনের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।'

'তাহলে তুই আমার সঙ্গে চল, দ্বারকা নদীতে আমরা বসব আসন করে। অমাবস্যার রাতে। প্রহরে প্রহরে শেয়াল ডাকবে। মড়ার মাথায় বাতাস হাহা করবে। সে এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। অচেনা দিগন্তে ভ্রমণের মতো।'

দু'জনে কথা বলছেন। আমি কিন্তু ভয়ে ভয়ে ডাইনে-বামে তাকাচ্ছি। কোন্ বাঁক থেকে জল ছুটে আসবে তা তো জানি না। হঠাৎ দেখি ডান দিকে বহু দূরে সাদা একটা ঠেউয়ের মতো কি ফুলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আমি চিৎকার করে উঠলুম, 'জল আসছে।'

দু'জনেই সচকিত হয়ে তাকালেন। হরিশঙ্কর হাহা করে হেসে উঠলেন, 'আরে ওটা একটা কাপড়। দু'জনে দু' পাশ থেকে একটা কাপড় ধরে হাঁটতে হাঁটতে চলেছে। কাপড় শুকুতে শুকুতে চলেছে। এটা জলের নদী, দুধের নদী নয়। জল অত সাদা হয় না।'

অবশেষে আমরা নদীর গর্ভ ছেড়ে পাড়ে উঠে এলুম। দোকানপাট, মানুষজনের হইচই। ধড়ে প্রাণ ফিরে এল। শরীর আর চলছে না। মনে হচ্ছে ধড়াস করে শুয়ে পড়ি। যেমন তৃষ্ণা, সেইরকম খিদে। ছোটদাদু মনে হয় আমার মনের তরঙ্গ ধরতে পারলেন। বললেন, 'এইখানে একটা ভাল দোকান দেখে দুপুরের খাওয়াটা সেরে নেওয়া যাক। একটু বিশ্রামেরও দরকার। বেশ পরিশ্রম হয়েছে।'

হরিশঙ্কর বললেন, 'ভাত খাওয়া চলবে না। হোটেলের ভাত আমি অ্যালাউ করব না।'

'ভাত কে খেতে চাইছে শুকনোশাকনা।'

কোনও দোকানই মনে ধরে না। পরিচ্ছন্নতার অভাব। হঠাৎ হরিশঙ্কর বললেন, 'হোয়াট এ ফুল! বাড়ির বাইরে এসে বাড়ির সুখ খুঁজছি, মূর্খ আমরা। যে কোনও দোকানে ঢুকে যা

খুশি তাই খাবো আমরা। কোনও বাছবিচার করব না। একটা জিনিস ভেবে দেখেছিস, যেখানে যাচ্ছি আমরা, সেখানে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে হলে কোনও পাকা ব্যবস্থা নেই!'

ছোটদাদু বললেন, 'খুব জানি। প্রকৃতির কাজ প্রকৃতিতেই সারতে হবে। মাঠ আর পুকুর। আর লজ্জা! নিজের চোখ দুটো বন্ধ করে রাখো। আমাকে দেখো, আমি তো দেখছি না।'

হরিশঙ্কর সদর্পে একটা আটচালায় ঢুকে পড়লেন। সবই আছে সেখানে। অদ্ভুত চেহারার মিষ্টি। গুড়ের রসে পাক করা কালচে রঙের বেসনের লাড্ডু। ঠাণ্ডা জিলিপি। টক দই। প্রচুর মুড়ি। চিঁড়ে। ভেলি গুড়। মনমরা তেলেভাজা। এক ঝাঁক মাছি ছাড়া কারোকেই তেমন আনন্দিত, উৎফুল্ল মনে হল না।

দোকানের মালিক পরিচ্ছন্ন খদ্দের পেয়ে বেশ উৎসাহিত হলেন। প্রমাণ মাপের একটা গামছা পরে বসেছিলেন। নিজেকে একটু গোছগাছ করে বললেন, 'সব রকমের ব্যবস্থাই আছে। চিঁড়ের ফলার করতে পারেন মণ্ডা দিয়ে। এক ছড়া কলা আনিয়ে দিচ্ছি।'

তেড়াবাঁকা কালোকালো লাড্ডুগুলোর নাম মণ্ডা। এই অঞ্চলের লোকপ্রিয় মিষ্টান্ন, মণ্ডামেঠাই।

হরিশঙ্কর বললেন, 'আজ আমরা একাদশী করতে চাই।'

'আজ্ঞে বাবু আজ যে চতুর্দশী, পূর্ণিমা।'

'তাতে কি হয়েছে, একাদশী মানে আটাদশী। গরম লুচি, কুমড়োর ছক্কা, হতে পারে?'

'হবে না কেন, অর্ডার দিলেই হবে। মোহনের অসাধ্য কিছু নেই।' একটা হুঙ্কার ছাড়লেন, 'বিমলা!'

এমন একজন মহিলাকে এখানে দেখা যাবে আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। একেবারে সাধিকার চেহারা। ভাব থমকানো মুখে ভাসা ভাসা দুটো চোখ। উদাস যেন কোন্ আকাশে লগ্ন। মধ্যবয়সী। পরিষ্কার লাল পাড় শাড়ি। কপালে গোল সিঁদুরের টিপ। দু'হাতে মোটা দুটো শাঁখা। আলগা খোঁপা। আমরা তিনজনেই অবাক। এমন পবিত্র আবির্ভাব আমরা আশা করিনি। দোকানের মালিক এক গাল হেসে বললেন, 'আমার বোন। খুব ভালো ঘরে বিয়ে হয়ছিল। তা সংসার আর করা হল না।'

ছোটদাদু সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'সংসার করবেন কি করে! ইনি তো সংসারের নন। শক্তি, সাক্ষাৎ জগজ্জননী। এঁর স্থান তো আশ্রমে, মন্দিরে হবে। সাধিকা।'

বিমলা হাত জোড় করে বললেন, 'ওই সব বলবেন না বাবা। তবে আপনাকে আমি চিনি।'

ছোটদাদু অবাক হয়ে বললেন, 'আমাকে?'

'হ্যাঁ বাবা আপনাকে আমি তারাপীঠে দেখেছি। আজ আপনি এসেছেন আমাকে কৃপা করতে। আপনি যে কত বড় সাধক আমি নিজে দেখেছি। আপনি আমাকে একটা বজ্রনাভি রুদ্রাক্ষ দিয়েছিলেন। এই দেখুন আমার গলায়। এইটা ধারণ করার পর আমার অনেক বিপদ কেটে গেছে বাবা। এখন আর আমার কাছে আসার সাহস হয় না কারো।'

বিমলা এগিয়ে এসে ছোটদাদুকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন। হরিশঙ্কর নিজের মনেই বললেন, 'যেখানেই যাই সেইখানেই, সাধন, সাধনা, রুদ্রাক্ষ, তন্ত্র, তাগা, তাবিজ। সাধারণ মানুষের পৃথিবীটা হারিয়ে গেল নাকি!'

বিমলা হরিশঙ্করকে প্রণাম করার জন্যে এগিয়ে এলেন। হরিশঙ্কর তিন লাফে পেছিয়ে গেলেন, 'আমাকে নয়, আমাকে নয়। আমি কেউ নই। আমি সাধনভজন করি না।'

বিমলা হরিশঙ্করকে ধরে ফেললেন। প্রণাম করতে করতে বললেন, 'সে তো আমি বুঝি।' উঠে দাঁড়িয়ে হরিশঙ্করের দিকে তাকিয়ে এমন সুন্দর হাসলেন হরিশঙ্করও থমকে গেলেন। এত সব কাণ্ড দেখে দোকানের মালিক মোহন আর চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না। উঁচু জায়গা ছেড়ে নেমে এলেন। বোনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই মহাপুরুষের কথাই তুই আমাকে বলেছিলিস ? যিনি দু' হাত ঘষে আগুন জ্বালাতে পারেন।'

বিমলা ঘাড় নাড়ল। মোহন ছোটদাদুর দিকে তাকিয়ে আছেন অবাক হয়ে। ভাবের মানুষ। চোখে জল এসে গেছে। ছোটদাদুকে দেখছে আর কাঁদছে নিঃশব্দে। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। বহুকাল পরে সন্তান যেন তার হারিয়ে যাওয়া পিতাকে খুঁজে পেয়েছে। এত দিনের দুঃখ-বেদনা সব ধুয়ে সাফ হয়ে যাচ্ছে চোখের জলে। মোহন নিচু হয়ে ছোটদাদুকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল। এখন এই মুহূর্তে তাঁকে কোনওভাবেই ভাবা যাচ্ছে না, সামান্য একজন অশিক্ষিত মিঠাইঅলা। শান্ত, সংযত, ভাবগম্ভীর। থমথমে গলায় বললেন, 'আজ আমাদের পরম সৌভাগ্যের দিন। কিছু চাই না। যদি কিছু দেবার থাকে আমাদের দিয়ে যাবেন, অন্ধকারের লণ্ঠন, বৃদ্ধের লাঠি, বর্ষার ছাতা, শীতের কাঁথা।'

মোহন শুদ্ধ সাহিত্যের ভাষায় কথা বলছেন। এঁর জীবনের অন্য একটা দিক আছে অবশ্যই। ছোটদাদুর পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন না তাগা-তাবিজ, মন্ত্র-তন্ত্রের জন্যে। শুধুই কৃপাপ্রার্থী। ভাগ্য-ভবিষ্যৎ কিছুই জানতে চান না।

বিমলা বললেন, 'দাদা, এঁদের আমি বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছি। সেইখানেই সেবা হবে।'

মোহন বললেন, 'তাই তো করবি ! এঁরা কৃপা করে এসেছেন শুধু আমাদেরই জন্যে।'

হরিশঙ্করের হয়তো আপত্তি ছিল। মুখ দেখে তাই মনে হচ্ছিল আমার। কারো সংসারে সহসা ঢুকতে চান না। ব্যবসায়িক লেনদেনই পছন্দ করেন। একটা চুক্তির মধ্যে এসো। প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা, যাবতীয় সেন্টিমেন্ট বড়ই জটিল, অযথা সময় নষ্ট। ঘোর সংসারে অঘোর বিষয়ের কোনও দাম নেই। ফেলো কড়ি মাখো তেল। ইংরেজিতেই ভাল শোনায়, ফিনিশ ইট। পৃথিবী মানেই থকথকে, দগদগে স্বার্থ। স্বার্থে আসার আগে যাবতীয় গৌরচন্দ্রিকা। আগে দেখেছি, বাড়িতে এসে কেউ খুব ভণিতা করছেন, কেমন আছ ? তোমার সেই গোড়ালির ব্যথা ? আমি ডেড সিওর, কোনও পাথরে পা পড়ে গিয়েছিল। গুপো হয়ে গেছে। ভয়ঙ্কর ভোগায়।

হরিশঙ্কর শুনে যাচ্ছেন। ব্যাডমিন্টন খেলার মতো। বল আসছে, বল ফিরে যাচ্ছে। চলছে খেলা। হঠাৎ এক চাপ্‌স। বিপক্ষ বসে পড়বে।

হরিশঙ্কর হয় তো একটু মজা করবেন। বিব্রত করার জন্যে বলবেন, গোড়ালিতে তো আমার কস্মিন কালেও কিছু হয়নি।

ভদ্রলোক অমনি বলবেন, আমি গুলিয়েফেলেছি। নগেনের সঙ্গে তোমাকে গুলিয়ে ফেলেছি। তোমার যেন কোথায় ব্যথা হয়েছিল ? গলায় ?

হরিশঙ্কর আরো একটু খেলবেন, হাঁচি- কাশি- সর্দি- জ্বর- ব্যথা, মাথাধরা, আমার জীবনে হয়নি, হবেও না।

ভদ্রলোক হাল ছাড়বেন না। বলবেন, যদি কখনো তোমার গুপো হয়, তুমি যেরকম গোড়ালি ঠুকে ঠুকে গোরাদের মতো হাঁটো, হলেই হল। তখন কি করবে ? একটা টোটকা শিখিয়ে দি। মেয়েরা উনুনের আগুন ফেলে দেবার পর, উনুনের ঝিকের পাশে জয় মা বলে গোড়ালিটা চেপে ধরবে। বার কয়েক। ব্যথা-ফ্যথা সব হাওয়া। আর যদি গলায় ব্যথা হয় তাহলে···।

হরিশঙ্কর এইবার মারবেন চাপস, তাহলে গলাটা স্রেফ উড়িয়ে দোবো। অনেকটা সময় আমার নিয়েছেন, এইবার কাজের কথায় আসুন, কি চাই বলুন তো ?

ভদ্রলোক আমতা আমতা করে বলবেন, বেশি না, গোটা কুড়ি টাকা হলেই হয়ে যাবে। কামিং মান্থের বাই দা টেন্‌থ আমি দিয়ে যাবো। ভীষণ হার্ড আপ হয়ে পড়েছি হরিশঙ্কর। বৃদ্ধ মানুষ। আগের মতো আর খাটতে পারি না। ফার্মটা উঠে চলে গেল বিলেতে। ইন্ডিয়ান বিজনেস ক্লোজড। সবই শেষ হয়ে গেল। একসময় দোল-দুর্গোৎসব হত বাড়িতে। বাঙালির পতনের কাল।

হরিশঙ্করের ভেতর থেকে সেই মুহূর্তে একজন বড় মাপের মানুষ বেরিয়ে আসবে। মুখের চেহারাটা হয়ে যাবে শ্রীচৈতন্যের মতো করুণাময়। একটা বেদনা, যেন মানুষটির জীবনে নিজে ঢুকে পড়েছেন। ভদ্রলোক চেয়েছিলেন কুড়ি, একশো টাকার একটা নোট হাতে গুঁজে দিয়ে বলবেন, এটা আর আপনাকে শোধ দিতে হবে না। আমার ছেলেকে দিয়ে মাঝে মাঝে আপনার খবর নেওয়াবো। আমি বাঁচলে আপনারও বাঁচার অধিকার আছে।

ভদ্রলোক হতভম্ব হয়ে চলে যাবেন। হরিশঙ্করের দিকে অবাক হয়ে তাকাবেন। যেন বিস্ময়কর কোনও বস্তু দেখছেন। হতাশ মুখে একঝলক আশা। বেঁচে থাকার মন্ত্র শুনেছেন কানে।

এক নয়, ছড়িয়ে আছে শত শত উদাহরণ। কত পরিবার নীরবে, নিভৃতে স্মরণ করে হরিশঙ্করকে। হরিশঙ্করের দান সেইরকম, বাঁ হাতও জানতে পারে না, ডান হাত কি করছে। কেউ প্রশংসা করলে, স্তাবকতা করলে হয় নিজে স্থানত্যাগ করেন, নয় তাকেই দূর করে দেন।

সেই হরিশঙ্কর নিতান্ত বাধ্য হয়েই চলেছেন বিমলার ভিটেতে। ছোটদাদুর কথা অমান্য করতে পারেন না। দোকান থেকে বেরনো মাত্রই একটা কলরব। একটা শব্দ। সবাই ছুটছে নদীর দিকে। জল ছেড়েছে। জল ছেড়েছে।

কোনও কথা নয়, হরিশঙ্করও ছুটলেন। আমরাও পিছু নিলাম।

অপূর্ব দৃশ্য ! হু হু শব্দে, দিগ্বিদিক ভাসিয়ে ছুটে আসছে জল। ভক্ত নরনারীর মতো প্রণাম করতে করতে আসছে শত শত ঢেউ। একের ঘাড়ে আর এক। প্রেম সুধারসে মাতোয়ারা কীর্তনিয়ার দল। বাজছে লক্ষ মৃদঙ্গ।

৩৭

Is man one of God's blunders
Or is God one of man's blunders?

ঝোপ ঝাড়, গাছপালা সব মিলিয়ে বাগানের মতো একটা জায়গা। তারই মাঝে কয়েকটা কুঁড়েঘর। দুপুরে পাখির ডাকে একটা ক্লান্তির ভাব। গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে দামোদরের জল চিকচিক করছে। নদীটা পেছন দিক দিয়ে ঘুরে চলে গেছে তার সমুদ্রযাত্রায়। এই হল বিমলার ভিটে।

ঝোপঝাড়ের মধ্যে বাচ্চা একটা ছেলে ছপটি হাতে ঘুরছে। বড় বড় চোখ। আদুর গা, একমাথা ফুরফুরে চুল। নিজের মনেই বকবক করছে আর হাতের ছপটিটাকে ঘোরাচ্ছে মাঝে মাঝে। অচেনা আমাকে দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নাম কি ?'

কোথায় আমি নাম জিজ্ঞেস করব ! না, সে-ই আমার নাম জিজ্ঞেস করে বসল।

'আমার নাম পিন্টু। তোমার নাম ?'

'আমার নামও পিন্টু।'

ছেলেটি বললে, 'তুমি কি আমার মামা ?'

'হ্যাঁ, আমি তোমার মামা।'

'তুমি মাছ ধরতে পারো ?'

পারি না বললে ছেলেটির কাছে হেরে যেতে হয়। মামা মাছ ধরতে পারে না, সে আবার কেমন মামা ! বেশ একটা বীরত্ব এসে গেল ভেতরে। বুক চিতিয়ে বললুম, 'নিশ্চয় পারি।'

ছেলেটি আমার কাছে এগিয়ে এসে নিচু গলায় বললে, 'তুমি মাছি ধরতে পারো ?'

মহা দুষ্টু ছেলে। চোখে-মুখে বুদ্ধি খেলা করছে। পরিষ্কার হাফপ্যান্ট। ফর্সা রঙ। গ্রামের ছেলে বলে মনেই হয় না। হঠাৎ কোথা থেকে একটা ভোমরা উড়ে এল। মাথার চারপাশে ভোঁ ভোঁ উড়ছে। আমাকে ভয়ে আড়ষ্ট দেখে ছেলেটি বললে, 'দূর বোকা, নিজের নামটা বলে দাও না, তাহলেই তো চলে যাবে।'

'আমি বললুম, 'পিন্টু'। ভোমরাটা সত্যিই উড়ে চলে গেল আর এক দিকে।'

ছেলেটি বললে, 'দেখলে ? ওরা নাম জিজ্ঞেস করতে আসে।'

'কেন, নাম জিজ্ঞেস করতে আসে কেন ?'

'তাও জান না ?' ছেলেটি হাসল আমার অজ্ঞতায় 'ওরা হল কোটাল। রাজপুত্রের কাছ

থেকে আসে। তোমাকে তোমার মা বলেনি ?'

'না তো ?'

'তোমার মা জানে না। আমার মা সব জানে।'

'তোমার মা কে ?'

'আমার মা বিমলা।' ছেলেটি হঠাৎ ধেই ধেই করে খানিক নেচে নিল, 'বিমলি মা কলমি খায়। বাঘের সঙ্গে কথা কয়। তুমি আমার বিমলিমাকে চেনো না ? তুমি কোত্থেকে এলে গো ? বৃন্দাবন থেকে ?'

'না তো, কলকাতা থেকে।'

'ও তাহলে তুমি আর এক মামা। বৃন্দাবনে আমার আর এক মামা আছে। আসে না, কেবল চিঠি লেখে। বিমলি মা কেবল বলবে ঝুলনে আসবে, ঝুলনে আসবে। আসেই না। মিথ্যে কথা।'

'তুমি ওই ছড়াটা কোথায় শিখলে ?'

'আমার মোহনমামা শিখিয়েছে। মোহনমামা আমাকে কত শেখায় ? তোমার মামা আছে ?'

'হ্যাঁ আছে।'

'কিছু শেখায় ?'

'হ্যাঁ গান শেখান।'

ঠোঁট উল্টে বললে, 'আমার মোহনমামাও আমাকে গান শেখায়। দেখি তুমি একটা গান ধরো তো। কেমন শিখেছ দেখি।'

'তুমি একটা গাও আগে।'

'তোমার লজ্জা করছে ? আমি না হয় চোখ বুজোচ্ছি। নাও, নাও তাড়াতাড়ি ধরো।'

সত্যিই আমার যেন একটু লজ্জা লজ্জা করছে। এমন একজন শ্রোতা। যেন গানের পরীক্ষা দিচ্ছি। এক পিন্টু চোখ বুজিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর এক পিন্টু গান ধরেছে 'মন রে কৃষি কাজ জান না। এমন মানবজীবন রইল পতিত, আবাদ করলে ফলত সোনা।'

গান যতক্ষণ চলল ছেলেটা একভাবে চোখ বুজিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। গান শেষ হতেই চোখ খুলে বললে, 'ভালই শিখিয়েছে। তা তুমি আর একটু চড়াতে পারলে না ? তাহলে শোনো।'

পিন্টু ওই গানটাই ধরল। ধরা মাত্রই অবাক হয়ে গেলুম। যেমন সুরে গলা, তেমনি উচ্চারণ আর ভাব। এ ছেলে নির্ঘাৎ বড় গাইয়ে হবে। মন রে বলে যখন সুর টানছে তীরের মতো বুকে এসে লাগছে। পাতার ফাঁক দিয়ে এক চিলতে রোদ এসে পড়েছে মুখে। মুখটা লাল। হঠাৎ গান থামিয়ে বললে, 'ঠিক হচ্ছে তো ? দে মা আমায় তবিলদারিটা জানো ?'

'না গো।'

'ইস ! তাহলে শিখে নাও, আমি গাইছি।'

পিন্টু গাইতে লাগল, 'আমায় দে মা তবিলদারি। আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী।' প্রথম লাইনটা গেয়েই বললে, 'নাও ধরে ফেল। চুপ করে থাকলে শিখবে কি করে !'

ডি-শার্পে ধরেছে। আমি পারবো কেন। তবু হেরে যাওয়ার ভয়ে ধরতে হল। জয়-পরাজয়ের প্রশ্ন এসে গেছে। ধরে ফেললুম, আমায় দে মা তবিলদারি। অন্তরায় গিয়ে আর রাখতে পারলুম না। গলা ফেল করল। প্রসাদী গানের যত কেরামতি তো চড়ায়। পিন্টু আর গ্রাহ্যই করল না আমাকে। তার ভাব এসে গেছে। সে গেয়েই চলল প্রাণ খুলে।

এত ভাল গাইল, রেকর্ড কোম্পানি শুনলে রেকর্ড করে নিত। গান শেষ করে আবার সে প্রতিযোগিতায় ফিরে এল, 'তুমি আর কি জানো ? গাছে উঠতে পারো ?'

'না গো, গাছে চড়তে ভয় করে।'

পিন্টু কিছুক্ষণ ভেবে বললে, 'ও ভয় করে ! তাহলে তো তুমি কোনওদিন পেয়ারা, জামরুল খেতে পারবে না। তুমি ক'দিন থাকবে ? ওটাও তোমাকে শেখাতে পারি। খুব সহজ। হাত আর পা দিয়ে গাছটাকে জড়িয়ে ধরবে। প্রথমে কিন্তু নম করে নেবে। গাছ তো দেবতা। মনে মনে বলবে, গাছ, তুমি আমাকে ফেলে দিও না। তারপর তো একটু উঠলেই ডাল পেয়ে যাবে। ওগুলো হল গাছের হাত। ডাল ধরে ধরে তুমি কত ওপরে উঠে যাবে। একটুও ভয় পাবে না কিন্তু। এখনই শিখবে না কি ?'

ভয়ে ভয়ে বললুম, 'এখন থাক। কাল সকালে শিখবো।'

'সাঁতার জানো না কি ?'

'সে একটু একটু।'

'তাহলে তো ভালই। কাল পুকুরে দু'জনে সাঁতার কাটব।'

সাঁই সাঁই করে গাছের ভাঙা ডালটাকে এদিকে ওদিকে বার কতক দুলিয়ে দিয়ে বললে, 'কেন এইরকম করলুম কোনও তো ?' এক গাল হেসে বললে,'করতে হয়। তা না হলে রাগ হয়।'

'কার রাগ হয় ?'

'ছপটির রাগ হয়। মাঝে মাঝে এটা দিয়ে মারতে হয়।'

'কাকে ?'

'যাকে হোক। তা না হলে এর মন খারাপ হয়।'

'তুমি কত কি জানো !'

'বড় হলে আরো কত কি জানব ! তুমি লেখাপড়া করো না ?'

'করি তো। তুমি ?'

'আমিও করি। তুমি ফার্স্ট হও ?'

'তুমি ?'

'আমি ফার্স্ট ছাড়া হতেই পারি না। কি যে আমার হবে ?'

'তুমি কোন ক্লাসে পড় ?'

'ফোর। জানো তো আজ আমি একটু পরে পায়েস খাব।'

'কেন ?'

'পায়েস কেন খায় ?'

'তোমার জন্মদিন।'

'ঠিক বলেছ। আজ আমার জন্মদিন। তোমার জন্মদিন কবে ?'

'আমার জন্মদিন পুজোর সময়, আশ্বিন মাসে।'

'তোমাকে কেউ পায়েস করে দেয় ?'

'আমার যে মা নেই।'

'তাহলে তুমিও আজ আমার সঙ্গে পায়েস খাবে। এখন চলো আমরা বাড়িতে যাই। এখুনি বিমলি মা খুঁজতে আসবে এখানে।'

বাগানটাকে আমরা দুজনে মিলে একবার পাক মারলুম। গাছের জটলা। একপাশে একটা পরিত্যক্ত ভিটে। বিশাল বিশাল গাছ। আম, জাম, কাঁঠাল। কিছু ফুলগাছ,

আগাছা। হঠাৎ ঝোপের আড়াল থেকে টুসটুসে এক বৃদ্ধা বেরিয়ে এলেন, শিশুটির সামনে দাঁড়িয়ে একটু নিচু হয়ে বললেন, 'এই যে গোপাল আমার। আজ একবারও আসা হল না কেন মানিক।'

পিন্টু বললে, 'আজ আমাদের বাড়ি অনেক লোক এসেছে। দেখছ না, এই যে আমার মামা। আমার পিন্টু মামা।'

'গোপালের প্রসাদটা তাহলে আমি কি করব ?'

'নিজেই খেয়ে নেবে কুপুর কুপুর। তুমি তো পেটুক।'

বৃদ্ধা হাহা করে হেসে উঠলেন, 'কাল রাতে আমার খুব জ্বর হয়েছিল গো কত্তা।'

'যাও না, পুকুরে খুব করে চান করোগে না। তোমার তো খুব গরম।'

'একটু ওষুধ দিবি না।'

'তোমার ওষুধ আমার এই ছপটি। পিঠটা পাত।'

'আমি এমন ডাক্তার চাই না।'

'তাহলে যাও বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়।

বৃদ্ধা কিছু দূর গেছেন, পিন্টু ছুটে গিয়ে পেছন দিক থেকে জড়িয়ে ধরল, 'দিদা, আমার চাল ভাজা রেখো কিন্তু বিকেলে আসবো।' বৃদ্ধা আদর করতে করতে বললেন, 'লুডোটা আনবি। অনেকদিন আমাদের খেলা হয়নি। বেলাবেলি আসবি কিন্তু।' বৃদ্ধা সুঁড়িপথ ধরে গুটগুট করে চলে গেলেন। কাঁধের পাশে একটা ঝোলা।

পিন্টু বললে, 'তুমি চালভাজা খেয়েছ কোনওদিন, কুসুমবিচি ভাজা দিয়ে ?'

'শুধু চালভাজা খেয়েছি।' পিন্টুকে এখন সমবয়সী বন্ধু মনে হচ্ছে।

'তাহলে বিকেলবেলা আমার সঙ্গে যাবে। লুডো খেলতে জানো ?'

'হ্যাঁ তা জানি।'

'তাহলে ঠিক আছে, আমরা তিনজনে খেলবো। তুমি আর কি খেলা জানো ? ডাণ্ডাগুলি ?'

'সে তোমার মতো যখন ছোট ছিলুম।'

'আচ্ছা পিন্টুমামা, তুমি আমাকে একটা কথা বলতে পারো, বড় হতে ক'দিন লাগে ?'

বেশ শক্ত প্রশ্ন। উত্তরের বদলে প্রশ্ন করলুম, 'কেন বল তো ! বড় হয়ে কি হবে, ছোট থাকাই ভাল।' পিন্টু দীর্ঘশ্বাস ফেলল। চোখ কুঁচকে একবার আকাশের দিকে তাকাল। একটা ব্রাহ্মণ চিল উড়ছে। সাদা চিল সহসা দেখা যায় না। আমি তাকিয়ে রইলুম হাঁ করে। পিন্টু বললে, 'আমাকে খুব তাড়াতাড়ি বড় হতে হবে।'

'কেন বলো তো।'

'তুমি জানো কি, কানপুর বলে একটা দেশ আছে ?'

'হ্যাঁ, জানি তো।'

'সেই কানপুরে আমার বাবা আছে। বাবার সঙ্গে আমার বিমলি মায়ের আড়ি। ধরো, আমি যদি তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যাই, তাহলে একদিন ট্রেনে চেপে কানপুরে চলে যাব। গিয়ে বাবাকে ধরে আনব। বলব, চলো, এক্ষুনি চলো। তুমিই বলো, সব্বাইয়ের বাবা আছে, আমার বাবা নেই। ভাল লাগে ! আমার কেবল মামা। সবাই আমার মামা। তুমি আবার কোথা থেকে চলে এলে এক মামা। আমার মা কেবল সব সময় পুজো করে আর কাঁদে। কি করে তাড়াতাড়ি বড় হওয়া যায় বলো তো ! গাছের গোড়ায় মোহনমামা গোবর দেয়, গাছ বড় হয়। আমি একটু গোবর খাব মামা ?'

'দাঁড়াও, আমি একটু ভেবে দেখি। তবে কি জানো মানুষ বছরে বছরে বড় হয়। অঙ্কের মতো। যেমন ধরো, এই তো আজ তোমার জন্মদিন, সামনের বছর এই দিনে তুমি আর এক বছর বড় হবে।'

'কত বছর হলে মানুষ বড় হয়।'

'তা ধরো কুড়ি বছর।'

পিন্টু ভুরু কুঁচকে বললে, 'আচ্ছা, তখন কি আমার বাবা আর মা বেঁচে থাকবে ?'

'কেন থাকবেন না ?'

'এই তো তোমার মা নেই।'

'সে তো অন্য ব্যাপার গো। আমি যখন তোমার চেয়েও ছোট সেই সময় আমার মায়ের খুব অসুখ করল। সে আর আমি কি করব বলো ! ডাক্তাররা কিছুই করতে পারলেন না। শোনো, তুমি বড় হয়ে ডাক্তার হবে কেমন ? খুব বড় ডাক্তার। তোমার এই ছপটির মতো।

অসুখের গায়ে সপাসপ হাঁকাবে, অসুখ মরে যাবে রুগি ভাল হয়ে যাবে। তোমাকে দেখা মাত্রই সব অসুখ চিৎকার করবে, পালা-পালা, পিন্টু ডাক্তার এসে গেছে।'

পিন্টুর ভীষণ ভাল লাগল কথাটা। খুব হাসি,'আমি তো ডাক্তারই হবো। জানো তো, আমার মোহনমামার গলায় কি হয়েছে। ডাক্তারবাবু বললেন, মোহন, তুমি খুব সাবধান হও। খুব শক্ত রোগ। তিন বছরও বাঁচতে পারো, আবার দুবছরও বাঁচতে পারো, তবে জেনে রাখো মোহন মরতে তোমাকে হবেই। ইস্, এই সময়ে যদি আমি তাড়াতাড়ি বড় হয়ে ডাক্তারটা হয়ে যেতে পারতুম !'

পিন্টু আবার আকাশের দিকে তাকাল। আকাশ একেবারে স্বচ্ছ নীল। সেই চিলটা আর নেই। পিন্টুর চোখে জল। হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল, 'আমার মোহনমামা মরে যাবে।' আমি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলুম, 'তুমি কাঁদছ কেন ? কে বলেছে, মোহনমামা মারা যাবে কে এক ডাক্তার, বললেই হল। জানো তো, আমার যে দাদু এসেছেন, তাঁর খুব শক্তি। আমরা দুজনে মিলে ধরব। মোহনমামার অসুখ ভাল করে দেবেন।'

বুক থেকে মাথা তুলে, চোখ মুছতে মুছতে পিন্টু বললে, 'কখন বলবে ?'

'যখন সব কাজ হয়ে যাবে, তখন গিয়ে বলব, দাদু আমার মোহনমামাকে ভাল করে দিন।'

আমরা এসে দাওয়ার এক ধারে বসলুম। ছোটদাদু ঠাকুরঘরে পুজোর আসনে বসেছেন। তাঁর চওড়া, ফর্সা পিঠ দেখতে পাচ্ছি। বসে আছেন নিশ্চল ধ্যানে। হরিশঙ্কর এমন এক ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানেন। একটা হারিকেন নিয়ে পড়েছেন। কল গোলমাল করেছে, পলতে উঠছে না। সেইটাকে চেষ্টা করছেন ঠিক করার। চারপাশে ছড়ানো যন্ত্রপাতি। কোনওভাবে খবর পেয়েছেন কল কাজ করছে না, আর তো তাঁকে নিরস্ত করা যাবে না। কাজই ঈশ্বর, এই তাঁর বিশ্বাস।

তাঁর পাশে বসে, কানে কানে বললুম, 'আজ বিমলাদির ছেলের জন্মদিন।'

'ইজ ইট ? বেশ ব্যবস্থা হবে। চলো তাহলে কায়দা করে একবার বাজারে যাই।'

'এখন তো সব বন্ধ।'

'ক্যাশ টাকা দেওয়া তো ভাল দেখাবে না, তুমি একবার চুপি চুপি বেরিয়ে দেখো না। গঞ্জে কাপড়ের দোকান, বাসনের দোকান, এসব খোলা থাকে। এটা তো বিজনেস সেন্টার। দুটো জেলার বর্ডার। যাও, বেরিয়ে যাও।'

'একা পারব ? যদি হারিয়ে যাই।'

হরিশঙ্কর ভীষণ অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন, 'স্ট্রেঞ্জ ! তুমি মেয়েছেলে হলে না কেন ? ইউ নিড এ শাড়ি অ্যাণ্ড পেটিকোট।'

আমি তাঁর হাতে সামান্য চাপ দিয়ে বললুম, 'একটু আস্তে সবাই শুনতে পাচ্ছেন।'

ফিসফিস করে বললেন, 'এই লজ্জা যাতে পেতে না হয় সেই ভাবে চরিত্র সংশোধন কর না ? এটা ইউরোপ আমেরিকা নয়, একটা গঞ্জ, এখানে তুমি কোথাও হারাতে পারো !'

বেশ উত্তেজিত অবস্থায় পথে বেরিয়ে এলুম। নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরের সমস্ত মহিমায় মণ্ডিত হয়ে পড়ে আছে জনশূন্য পথ। মাঠের পর মাঠ। ছোট ছোট ডোবা। জলে ভাসছে নীল আকাশ।লেজের বহর নিয়ে ডালে বসে শিস দিচ্ছে ফিঙে পাখি। শীর্ণ চেহারার গাভী টুকুস টুকুস করে হেঁটে চলেছে অনিশ্চিত কোনও গন্তব্যে। একটা বাচ্চা মেয়ে এক্কা দোক্কা খেলতে খেলতে চলেছে। হাতে খোলামকুচি, ছেলেবেলায় যাকে আমরা বলতুম চাপ্পা। সেইটাকে দূরে ছুঁড়ে দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে একপায়ে। আবার তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে। রঙচটা ফ্রক। পিঠের বোতাম নেই একটাও। ছোট্ট একটা বিনুনি লাফানোর ছন্দে দুলছে এদিক ওদিক।

মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলুম, 'তোমাদের এদিকে দোকানবাজার কোন দিকে ?'

মেয়েটি ফিক করে একটু হাসল। আমি তার মাথায় হাত রেখে বললুম, 'বলো, কোন দিকে ?'

মেয়েটি ঘাড় হেঁট করে জড়োসড়ো হয়ে গেল।

'দোকানবাজার নেই ?'

ফিসফিস করে বললে, 'আছে।'

'বলো কোন দিকে ?'

দিগন্তের দিকে হাত তুলল। এইটুকু একটা হাত। বললে, 'ওই দিকে।'

'তুমি কোথায় যাচ্ছ ?'

লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে বললে, 'জানি না।'

এমন সময় পেছন দিক থেকে এক প্রবীণ মানুষ টুকটুক করে আমাদের অতিক্রম করে গেলেন। দেখে মনে হল পণ্ডিতমশাই। তাঁকেই ধরলুম, 'অনুগ্রহ করে বলবেন, এদিকে দোকানবাজার কোন দিকে গেলে পাবো ?'

তিনি ঘোর সন্দেহের চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'কেন ?'

'আজ্ঞে, আমি কিছু জিনিস কিনতে চাই।'

সহজে ছাড়ার মানুষ নন, পাল্টা প্রশ্ন করলেন, উদ্দেশ্য !'

ঘোর সমস্যা। কোনও কিছু কেনার উদ্দেশ্যটা কি ? তিনি থামেননি। চলতে চলতেই যাবতীয় প্রশ্নোত্তর। সঙ্কটে নিদানকালে মাগো আমি তোমার শরণ মাগি। পণ্ডিতমশাই বললেন, 'কি ধরনের বস্তু তুমি কিনতে চাও ? তুমি কি নবাগত ? নবাগত হওয়াই স্বাভাবিক, তা না হলে প্রশ্ন করবে কেন। তুমি কি চন্দ্রচূড় চৌধুরীর জামাতা !'

'আজ্ঞে না। তিনি কে ?'

পণ্ডিতমশাই নিজের মনেই বললেন, 'বিনীত ও সভ্য। অবশ্যই সদ্বংশোদ্ভূত।' আমার চরিত্র বিশ্লেষণের পর তাঁর মনে হল একটু ঘনিষ্ঠ হওয়া চলে। আমরা কিন্তু হেঁটেই চলেছি। পণ্ডিতমশাই প্রশ্ন করলেন, 'আমার' বয়স তুমার অনুমানে কত ?'

নিজের অজান্তেই শুদ্ধ ভাষা বেরিয়ে এল, 'আজ্ঞে পঞ্চাশোর্ধ্ব।'

তিনি বিজয়ী হাসি হেসে বললেন, 'অবাচীন তিরিশ বর্ষ পূর্বেই আমি পঞ্চাশ অতিক্রম

করেছি। এবং আমার মাতা আজও জীবিত। এই অঞ্চল একদা অতি সমৃদ্ধ ছিল। আজ অতিশয় শ্রীহীন। হেতু দুর্ভিক্ষ, ম্যালেরিয়া। মশককুল নিশ্চিহ্ন করেছে সভ্যতা, সংস্কৃতি। শ্রীমান চন্দ্রচূড় ছিলেন এতদ্ অঞ্চলের বদান্য ভূস্বামী। ওই দেখা যায় তাঁর প্রাসাদ। কালগর্ভে বিলীন। একটি প্রান্তে তাঁর বংশধরেরা অস্তিত্ব বজায় রেখেছেন এবং মরা হাতি লাখ টাকা। তা বাবাজী তুমি তাহলে কে ?'

'আজ্ঞে, সেই ভাবে বলতে গেলে, আমি কেউ নই। আমরা সোনামুখী অঞ্চলের এক গ্রামে যাচ্ছি।'

সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিতমশাই চেপে ধরলেন, 'বহুবচন ব্যবহার করলে কেন ? তুমি তো এক এবং একক।'

'আজ্ঞে, আমার পিতা এবং দাদু মোহনবাবুর অতিথি হয়েছেন।'

'কেমন দাদু ? পিতামহ না মাতামহ ?'

'আজ্ঞে পিতার ক্ষুদ্র মাতুল।'

'ক্ষুদ্র হবে না বাবাজী, বলো কনিষ্ঠ। মোহন অতি সদাশয় চরিত্র। বড় বংশের সন্তান। চন্দ্রচূড়ের সম্পর্কিত। বিমলার ওই বংশে বিবাহ হয়েছিল, সে বিবাহ সুখের হয়নি। বিমলা ঐশী শক্তির অধিকারী। তার ছেলেটি প্রতিভাধর। আমার বিশ্বাস মোহনের পিতামহ পুনর্জন্ম গ্রহণ করেছেন। তিনি ছিলেন বর্ধমানরাজের সভাসদ্, সঙ্গীতগুণী। মোহনের বাস্তুভিটে দামোদর নিয়ে গেছেন। মোহনের পিতামহ এক যবনীর আকর্ষণে পড়েসংসারে দুর্যোগ নিয়ে এলেন। মোহনের পিতা ছিলেন সৎ, সাত্ত্বিক। সৎ মানুষের পক্ষে বিত্ত, প্রভুত্ব অর্জন করা অসম্ভব। তোমার কি ধারণা ? পৃথিবীটা কার ?

বেশ একটু চিন্তায় পড়ে গেলাম। আধুনিক ধারণা বলব, না প্রাচীন ? মানুষটি যখন প্রাচীন তখন প্রাচীন বিশ্বাসই পছন্দ করবেন, 'আজ্ঞে, সৃষ্টি তো ভগবানের।'

বৃদ্ধ খাঁই খাঁই করে উঠলেন, 'অর্বাচীন। পৃথিবী শয়তানের। ভগবানের হলে তিনি এখানে বসবাস করতেন। মানুষ হল শয়তানের চেলা। শয়তানের সন্তান। এখানে যারা ঈশ্বরের ভজনা করে তারা সব বিদ্রোহী। বিধর্মী। কোথায় আছ, তুমি কে, কিছুই খবর রাখ না ! ট্যাকোস, ট্যাকোস করে এঁড়ে বাছুরের মতো পৃথিবীর পথে হেঁটে মরছ। এসো আমার সঙ্গে।'

সামনেই আটচালা। বাইরে বড় বড় করে লেখা—বলরাম চতুষ্পাঠী। সামনে একটু বাগানমতো। মাঝখান দিয়ে পথ চলে গেছে। বালি বালি মাটি। প্রচুর সাদা ফুল। সাদা জবা ডালের ডগায় নিশ্বাসের মতো প্রকৃতির ফিকে বাতাসে টুলুর টুলুর দুলে উঠছে। বৃদ্ধ আগে আগে চলেছেন টরটর করে।

চতুষ্পাঠীর দরজা খুললেন। মেঝেতে পাটি পাতা। আমাকে বললেন, 'বোসো। পাদুকা বাইরে।'

একটু ইতস্তত করে বললুম, 'আমি যে জামা কাপড়ের দোকান।'

বৃদ্ধ খিঁচিয়ে উঠলেন, 'হস্তিমূর্খ, এই বেলায় তুমি কোন্ চুলোয় যাবে, কে বসে আছে তোমার জন্যে ?'

একপাশে বসে পড়লুম। এ-পাশে ও-পাশে কয়েকটা লেখার চৌকি। দোয়াত কলম।

৩৮

God, like a gardener, sows people as they are leaving them to grow without interfering here on earth.

এমন ফাঁপরেও মানুষ পড়ে । বৃদ্ধ পণ্ডিতের অদ্ভুত এক আকর্ষণী শক্তি । বলতেও পারছি না, আমাকে যেতে হবে । আমার জন্যে সবাই অপেক্ষা করে বসে আছেন । দানাপানি পড়েনি পেটে । ঘরের কোথাও বোধ হয় চাঁপাফুল আছে । ভুর ভুর করে গন্ধ বেরোচ্ছে । বৃদ্ধ আমার সামনে বসলেন । একটা চৌকি টেনে নিয়ে হাত দুটো তার ওপর রাখলেন । আশি বছরের তুলনায় বেশ ভালই স্বাস্থ্য । চামড়ায় সামান্য কুঞ্চন ।

বৃদ্ধ প্রশ্ন করলেন, 'একটা গন্ধ পাচ্ছ ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, চাঁপাফুলের ।'

'ত্রিসীমানায় কোথাও চম্পক নেই । রহস্যটা আজও আমার কাছে পরিষ্কার নয়, তবে এই সময় একটা স্বর্ণগোধিকা আসে বাগানে । তার শরীর থেকে এই গন্ধ বেরোয় কি না জানি না । তোমার জানা আছে ?'

'আজ্ঞে না । আমি তো কলকাতার ছেলে ।'

'ও তার মানে সর্ব বিষয়ে অজ্ঞ । তোমরা তো দাসত্ব করার জন্যে জন্মাও । তুমি দাস হয়েছ ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ । একটা চাকরি করি ।'

'ঘোড়া হয়েছ ?'

'আজ্ঞে প্রশ্নটা সবিশেষ বোধগম্য হল না ।'

'মানে লাগাম চড়িয়ে কোনও রমণী পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করেছে ?'

'আজ্ঞে না, বিবাহ এখনো করিনি ।'

'আর দেরি নেই এইবার হয়ে যাবে । শোনো, যে কারণে তোমাকে বসালুম, আমি নৈয়ায়িক, তোমাকে আমি বুঝিয়ে দেবো, কেন পৃথিবী শয়তানের ? হিরণ্যকশিপুর নাম শুনেছ ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ ।'

আর কিছু জানো ?'

'অসুর ছিলেন ।'

'সুর অসুরের প্রশ্ন ছাড় । এই পৃথিবীরই এক সম্রাট ছিলেন । কার সন্তান ? না মহাঋষি

কশ্যপের সন্তান। বোঝো ঠ্যালা। ঋষিরও কাম আছে। তিনি আবার দুই স্ত্রী রেখেছিলেন দিতি আর অদিতি। আমরা এক বিবাহতেই ভয়ে মরি। ছেলেপুলে বেশি হলে লজ্জা পাই। এইবার কি হল? দিতি একদিন ভর সন্ধ্যাবেলা কশ্যপের কাছে এসে হাজির। পূজা-পাঠ-প্রার্থনার জন্যে নয়। সন্ধ্যার প্রদীপ দিতে বা শাঁখ বাজাতেও নয়। তিনি স্বামীকে বললেন, এসো আমাতে উপগত হও। আমি একটি বলবান পুত্র চাই। মহর্ষিও তেমনি, সন্ধ্যাহ্নিক ভুলে সেই কালবেলাতেই মেতে গেলেন কামকলায়। বলতে পারলেন না, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হোক, জপাহ্নিক সমাধা হোক, রাত্রি গভীর হোক, তারপর না হয় দেখা যাবে। শাস্ত্রের নির্দেশই আছে, প্রাতে, দ্বিপ্রহরে, সায়াহ্নে মিলিত হওয়া উচিত নয়। সন্ধ্যায় নিতান্ত সাধারণ মানুষও ক্ষণকালের জন্যে ঈশ্বর চিন্তা করে। যেমন ঋষি তাঁর তেমন পত্নী। কশ্যপ জানতেন কামজ সন্তান সুসন্তান হতে পারে না। তিনি যে সময়ের, সেই সময় হল ভারতের আধ্যাত্মিক উন্মেষের কাল। বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ তৈরি হচ্ছে ঋষিদের তপোবনে। প্রজনন কামক্রিয়া নয়, এক মহাযজ্ঞানুষ্ঠান। যোষারূপ অগ্নিতে বীর্যাহুতি। ছান্দোগ্য উপনিষদ বলছেন—যোষাবাব গৌতম! অগ্নিঃ। তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ দেবা রেতো জুহ্বতি, তস্যা আহুতেঃ গর্ভ সম্ভবতি। বুঝলে কিছু? সংস্কৃতর চর্চা তো উঠেই গেল দেশ থেকে। সায়েবরা সেবা দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, দিশি সায়েবরা এসে সোজা গলায় ঠ্যাং তুলে দিলে। পাতলুন পরা বড় সায়েবের দল। দেশটা তেনাদের বাতকর্মে দুর্গন্ধময়। তুমি অমন ছটফট করছ কেন বাবাজী? প্রকৃতির ডাক?'

'আজ্ঞে না, আমার তো এখনও আহারাদি হয়নি।'

'সে তো আমারও হয়নি। আমার তো স্বপাক। তুমি ব্রাহ্মণ? আমার তো তাই মনে হয়।'

'আজ্ঞে যথার্থই।'

'তবে? ব্রাহ্মণের জীবনধারণের বিধি কি? আমি কিভাবে বললুম তুমি ব্রাহ্মণ। তোমার শরীরে কোথাও লেখা আছে? না, আছে তোমার সূক্ষ্ম শরীরে। আমি সেই সূক্ষ্মের বর্ণ দেখতে পাচ্ছি—ব্রাহ্মণানাং সিতো বর্ণঃ ক্ষত্রিয়ানাং চ লোহিতঃ। বৈশ্যানাং পীতকশ্চৈব শূদ্রাণাম অসিতস্তথা ॥ পদ্মপুরাণে এ কথা বলা হয়েছে। মানুষের ভেতরের বর্ণ দেখা যায়, তোমরা ইংরিজিতে যাকে বল টাইপ। ব্রাহ্মণের বর্ণ শুক্ল, ক্ষত্রিয়ের লোহিত, বৈশ্যের পীত, শূদ্রের কৃষ্ণ। শুক্ল মানে শ্বেত, মানে সাদা, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হবে সাত্ত্বিক। খাওয়া হল না, খাওয়া হল না, বলে ছটফট করছ। একদিন আহার না হলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে! এক তো নিজেকে পতিত করে ফেলেছ শ্ববৃত্তি নিয়ে। শ্ববৃত্তির অর্থ বুঝলে?'

'আজ্ঞে না। তবে ওই ধরনেরই একটা শব্দের অর্থ কুকুর।'

'কাছাকাছি গেছ। শব্দটার অর্থ দাসত্ব। ব্রাহ্মণের দাসত্ব করা উচিত নয়। মনুর নির্দেশ, নিজের জীবনযাত্রার প্রয়োজন এরূপভাবে সঙ্কীর্ণ করবে যেন কোনওদিন না শ্ববৃত্তির আশ্রয় নিতে হয়। সংস্কৃত শুনলে ভয়ঙ্কর উত্তেজিত হয়ে পড়ছ, তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি, তবু আমি বলব যাতে তোমার কান তৈরি হয়—ঋতামৃতাভ্যাং জীবেৎ তু, মৃতেন প্রমৃতেন বা/ সত্যানৃতাখ্যয়া বাপি ন শ্ববৃত্ত্যা কদাচন ॥ ব্রাহ্মণ ঋত ও অমৃত দ্বারা, মৃত ও প্রমৃত দ্বারা, সত্য ও অনৃতদ্বারা জীবিকা অর্জন করবেন, কদাচ শ্ববৃত্তি করবেন না। এইবার আমার পিদ্রুসবাবু পড়েছেন বিপদে। শ্লোকে বহু শব্দ, যার অর্থ তিনি জানেন না। তাকিয়ে আছেন বোকার মতো। ঋতের অর্থ কি? শিলোঞ্ছবৃত্তি। সেটা কি? কৃষকেরা

ফসল কেটে নিয়ে যাবার পর ক্ষেত্রে যে শস্যকণা পড়ে থাকে তা সংগ্রহ করে জীবনধারণ । অমৃতের অর্থ অযাঞ্চা, অর্থাৎ কারোর কাছে কখনো কিছু না চাওয়া, মৃতের অর্থ ভিক্ষাচর্য । প্রমৃতের অর্থ কৃষিকর্ম আর সত্যানৃতের অর্থ বাণিজ্য ! তুমি এই সবকটি করতে পার ; কিন্তু শ্ববৃত্তি কখনো নয় ।'

সাহস করে বললুম, 'যদি অনুমতি করেন তাহলে আমি এইবার নিজকর্মে যাই ।'

'আজ্ঞে না, তোমার এখনো ছুটি হয়নি । বলরাম এখনো তোমাকে ছুটি দেয়নি অবোধ । এই প্রসঙ্গের শেষ কথাটি তোমাকে বলা হয়নি । সেটি মহাভারতের বনপর্বে আছে । মানুষের জীবনের কাম্য কি ? সুখ । সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু/আনলে পুড়িয়া গেল/অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে/সকলি গরল ভেল ।/সখি কি মোর করমে লেখি/শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু/ভানুর কিরণ দেখি । /উচল বলিয়া অচলে চড়িতে/পড়িনু অগাধ জলে/লছিমী চাহিতে দারিদ্র্য বেঢ়ল/মাণিক হারানু হেলে ॥- জ্ঞানদাসের পদ । সবই সুখের লাগি । সুখ কোথায় ? সুখ মহাভারতের বনপর্বে । যুধিষ্ঠির বলছেন ধর্মকে, পঞ্চমেহহনি ষষ্ঠে বা শাকং পচতি স্বেগৃহে/অনৃণী চাপ্রবাসী চ স বারিচর মোদতে ॥ হে জলচর যক্ষ ! যে ব্যক্তি পঞ্চম বা ষষ্ঠদিনে নিজের গৃহে বসে শাকান্নও পাক করে অথচ সে ঋণী ও প্রবাসী নয়, সে-ই সুখী । অতএব তুমি কি খাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হচ্ছে ! শ্ববৃত্তির জন্যে তোমাকে তো প্রবাসী হতে হবে !'

অবাক হয়ে চেয়ে রইলুম পণ্ডিতমশাইয়ের শীর্ণ কিন্তু উজ্জ্বল মুখের দিকে, 'আপনি কেমন করে জানলেন ?'

বৃদ্ধ রহস্যের হাসি হেসে বললেন, 'সৎ, সাত্ত্বিক, শাস্ত্রসম্মত জীবনযাপন করলে মানুষের মধ্যে একটা শক্তি জাগ্রত হয় ! তার প্রমাণ তুমি এইমাত্র পেলে ।'

'আজ্ঞে আমি এইবার আসি তাহলে । এইবার আমাকে খুঁজতে বেরোবে । বিশ্বাস করুন আমি প্রায় সবই বুঝতে পেরেছি ।'

'তুমি কিছুই যে বোঝোনি তোমার আচরণই তার প্রমাণ । তুমি শুধু জীবিকার দাস নও তুমি সময়ের দাস, পরিবেশের দাস, ঘটনার দাস । তোমার অবস্থা খোঁটায় বাঁধা গরুর মতো । তোমাকে অমূল্য কিছু সম্পদ দিতে চাইছি, তুমি নিতে পারছ না । তোমার ভেতরে আধ্যাত্মিক একটা আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল না ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ ।'

'কোথায় গেল ?'

'মনে হয় চাপা পড়ে গেছে ।'

'তোমার কিন্তু সংস্কার ছিল । কু-চিন্তা আসে ? কদাচারে অভ্যস্ত ?'

'আজ্ঞে না ।'

'তাহলে তো তুমি মহাপুরুষ হে !' বৃদ্ধ হা হা করে ব্যঙ্গের হাসি হাসলেন । হাসি থেমে গেল । মুখ ভয়াবহ আকার ধারণ করল । চোখ রক্তবর্ণ । হিরণ্যকশিপুর মতো হুঙ্কার ছাড়লেন, 'অনৃতভাষী । কুচিন্তা আর অবিরত বীর্যক্ষয় ছাড়া কারো এমন মলিন চেহারা হয় না । তোমার স্মৃতি-মেধা-ধৃতি-পুষ্টি, সবই সছিদ্রপাত্রের জলের মতো বেরিয়ে যাচ্ছে । তুমি পাপাচারী ।'

'আজ্ঞে, বিশ্বাস করুন আমার অসুখ করেছিল ।'

'করেছিল কি ? করে আছে । সেই অসুখ সারাতে হবে যুক্তি , তর্ক, বুদ্ধি দিয়ে । সঙ্কল্প দিয়ে, শ্রম দিয়ে ।'

'বিশ্বাস করুন, আমি খুব চেষ্টা করছি ।'

'কোথায় বসে ? জ্বরের রোগী বসে আছ আচারের ঘরে !'

'আমাকে একজন বলেছেন ডন-বৈঠক মারতে । হাজার ডন, হাজার বৈঠক । তাহলে কুচিন্তা, কুভাব কেটে যাবে ।'

'ঠিক, ঠিক বলেছেন । এ তো স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের দাওয়াই । তা তোমার যা শরীর পঞ্চাশে উঠতেই হার্টফেল করবে ।'

'একটা কথা বলব ? আমার পিতা আপনার চেয়েও ক্রোধী । আমি এখন যাই । ওদিকটা সামলে আবার আসবো ।'

'শোনো, যা দিয়ে শুরু সেটা শেষ না হলে যাবে কি করে ! পৃথিবী শয়তানের এইটাই তো ছিল আমাদের প্রমেয় । বললেই তো হল না, প্রমাণ করতে হবে । ধরো আমি বললুম আকাশ নীল । তুমি দেখলে । দেখে বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ, আকাশ নীল । বিজ্ঞানী এসে বললেন, 'তোমরা দুজনেই ভুল করলে, আকাশ কালো, অজস্র ধূলিকণায় সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হয়ে নীল দেখায় ।' বিজ্ঞানের প্রমাণ গবেষণাগারে । মতের প্রমাণ ন্যায়শাস্ত্রে, যুক্তিতে । আমি যদি বলি, মানুষ দেবতা নয় দানব, আমাকে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে হবে । সবার আগে নির্দেশ করতে হবে সংজ্ঞা । দানবের সংজ্ঞা কি ? দেবতার সংজ্ঞা কি ? আর দেব ও দানবের মাঝে মানবেরই বা সংজ্ঞা কি ? দিতি যখন শয্যা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন কশ্যপ তখন বললেন, তোমার চিত্ত অপবিত্র, তুমি কামাতুরা, তোমার দুই অধম পুত্র হবে, তারা হবে অসুর । তিনি যখন অসুর বলছেন, তখন অসুরের একটা সংজ্ঞা আছে । যেমন ধর আম । আমের সংজ্ঞা নির্দেশে বিচার্য কি কি ? প্রথম আকার, আকৃতি, বর্ণ । দ্বিতীয়, তার অভ্যন্তর, তৃতীয় তার স্বাদ । চতুর্থ বৃক্ষ । এখন তুমি যদি বলো, আমের স্বাদ মিষ্টি, তাহলে হল না । আম ভীষণ মিষ্টিও হতে পারে, ভীষণ টকও হতে পারে । তোমাকে বলতে হবে অম্লমধুর । এইবার এস জননী বৃক্ষে । আম্রবৃক্ষসকল একই রকম দেখতে হলেও ফল মিষ্ট হতে পারে, অম্লও হতে পারে, অতঃপর উপমা স্থানান্তর । বৃক্ষ থেকে মানবে । মানব যোনি থেকে দেবতা আবির্ভূত হতে পারে অসুরেরও জন্ম হতে পারে । যেমন, কশ্যপের দুই স্ত্রী, দিতি ও অদিতি । অদিতির পুত্ররা হলেন দেবতা, দিতির পুত্ররা হলেন দানব । সুতরাং আমের সংজ্ঞা নির্ধারণে বৃক্ষের যে ভূমিকা, দেব-দানবের সংজ্ঞা নির্ধারণে যোনিরও সেই ভূমিকা । অতএব ওটি গৌণ । আমাদের বিচার থেকে উৎসকে সরিয়ে রেখে আর একটি বিচার আনব যা ওই বিচার থেকেই উৎপন্ন, সেটি হল বীজ ও মৃত্তিকা । বীজ ও মৃত্তিকাকে ভেঙে আনব উপাদান ও পরিবেশ । পরিবেশকে ভাঙো, খনিজ উপাদান, জলবায়ু । বীজকে ভাঙো, অর্থাৎ বীজের সংস্কার । এখানে একটা ব্যতিক্রম চিহ্নিত করি । এক ল্যাংড়ার বীজে ল্যাংড়াই হবে । দুই, হিরণ্যকশিপুর বীজে অসুরই হবে । প্রশ্ন, হিরণ্যকশিপুর প্রহ্লাদ হল কেন, কশ্যপের কেন হিরণ্যকশিপু হল ? দ্বিতীয় প্রশ্ন, বীজ কি তাহলে মৃত্তিকার গুণে গুণান্বিত ! অনুসন্ধান, ল্যাংড়ার কি গুণভেদ হয় ? হয় । উত্তরপ্রদেশের ল্যাংড়া অতিশয় সুস্বাদু, আঁটি পাতলা, আঁশ নেই । পশ্চিমবাংলায় সামান্য আঁশ আছে, আঁটি বড়, স্বাদে অম্লমধুর । সিদ্ধান্ত, কশ্যপের বীজ, মূল বীজ, দিতির যোনি ভাল নয়, হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষের জন্ম । হিরণ্যকশিপুর স্ত্রী কয়াধুর যোনি ভাল ছিল তাই কশ্যপের বীজ হিরণ্যকশিপু বাহিত হয়ে কয়াধুর গর্ভে দেবোপম প্রহ্লাদের জন্মের কারণ । অতএব মৃত্তিকাই নিয়ামক । অর্থাৎ পৃথিবী হল অধঃপতনের স্থান । পতিত জায়গা । প্রমাণ ... ।'

আমি মৃত্তিকা ছেড়ে উঠেই পড়েছি । বিদ্যুৎগতিতে দরজার বাইরে থেকে জুতোজোড়া তুলে নিয়ে দে ছুট । কোন দিকে দৌড়োচ্ছি খেয়াল নেই । একটা কালভার্টের ওপর এসে জুতো গলাবার ফুরসত হল । ওরে সর্বনাশ, কি পাল্লায় পড়েছিলুম । এক সাঁওতাল রমণী পাশ দিয়ে চলেছে । খোঁপায় একটা কাঠি গোঁজা । এক থোকা সাদা ফুল । বয়স তেমন বেশি নয় । তবু সাহস করে জিজ্ঞেস করলুম, দোকানবাজার কোন দিকে বলতে পারেন ভাই ! বেশ সাহসের দরকার হল । শুনেছি, সাঁওতাল যুবতীদের সঙ্গে কথা বললেই বন থেকে তীর ছুটে আসে । মেয়েটি চিৎকার করল না বরং হেসে জবাব দিল, সে-ও ওইদিকেই যাচ্ছে । তাকে অনুসরণ করলেই বাজার । আমি ভয়ে ভয়ে একটু পেছিয়ে গেলুম । ভয়ঙ্কর শক্তিশালী চেহারা । পালিশ করা শরীর । উঁচু, নিচু, বর্তুল, যাবতীয় জ্যামিতির ছড়াছড়ি । অসহনীয় । কিছুক্ষণ অনুসরণের পর মনে হল, মন মহাভারত হয়ে যাচ্ছে । পণ্ডিতমশাইয়ের আর কি ? তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে । এখন তিনি দিবসের অষ্টমভাগে শাকান্ন খাবেন । যুবকের মন কি বুঝবেন ! এই যে আমি পশ্চাৎগামী আর ওই যে বনবালা পুরোগামী, ষাট বছর আগের পণ্ডিতমশাই হলে কি করতেন ? এখন তো তাঁর 'চর্পট-পঞ্জরিকা' অবস্থা—'অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং, দশনবিহীনং জাতং তুণ্ডম ।' এখন তো ভজ গোবিন্দং হবেই । হরিশঙ্কর বলেন নিরামিষাশী কেন, না দাঁত আর পারমিট করছে না হাড় চিবনো ।

হঠাৎ পেছনে হইচই, 'ওই তো, ওই তো যাচ্ছে ।'

হরিশঙ্করের গলা, 'পাতাল প্রবেশ করেছিল ।'

থেমে পড়ে পেছন ফিরে তাকালুম । তিনজন হন্তদন্ত হয়ে আসছেন, পিতা হরিশঙ্কর, ছোট দাদু, মোহনবাবু । তিনজনে এসে পড়লেন । হরিশঙ্কর বললেন, 'কি কায়দায় অদৃশ্য হয়েছিলে ! গ্রামাঞ্চলে ভুলভুলাইয়া বলে একটা ভূত আছে, তুমি কি সেইরকম কোনও ভূতের পাল্লায় পড়েছিলে ? তুমি জানো সবাই তোমার অপেক্ষায় থাকবে না খেয়ে । কবে যে তুমি একটু মানুষ হবে ! মাছ ধরছিলে, না পাখি দেখছিলে !'

'আজ্ঞে, ওসব কিছু নয়, আমাকে বলরাম পণ্ডিতমশাই ধরেছিলেন ।'

মোহনদা বললেন, 'সর্বনাশ, তুমি ছাড়া পেলে কি করে ! মহাপণ্ডিত, তবে ইদানীং মাথার গোলমাল দেখা দিয়েছে ।'

'আমাকে ওই চতুষ্পাঠীর ভেতরে নিয়ে গিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন, পৃথিবীটা শয়তানের, ভগবানের নয় । তারপর এক সময় আমি ছুটে পালিয়ে এসেছি ।'

হরিশঙ্কর ভয়ঙ্কর উল্লসিত হয়ে বললেন, 'তাই না কি, এমন এক পণ্ডিত আছেন এখানে? আমার মতের সমর্থক । তাহলে এক রাউন্ড বসে যাই । এমন সুযোগ আর পাবো না। আমি প্রথমে অস্বীকার করব । শুরু হবে তর্ক । কতকাল পরে আবার তর্কযুদ্ধ ।প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয়, নিগমন । ন্যায়শাস্ত্রের লণ্ডভণ্ড । চলো, চলো, যাই । এমন সুযোগ আর পাবো না ।'

ছোটদাদুও লাফিয়ে উঠলেন, 'চল, চল, দুই চৈতন্যের লড়াই দেখি ।'

মোহনবাবু করুণ মুখে বললেন, 'একেবারে অবেলা হয়ে গেছে, যা হয় কিছু সেবা করে নিন আগে । পিত্তি পড়ে যাচ্ছে । বিমলা বসে আছে পথ চেয়ে । তা ছাড়া দুর্ভাবনা, ছেলেটা দামোদরেই চলে গেল কি না !'

হরিশঙ্কর বললেন, 'তাহলে একবার দর্শন করে যাই । অন্তত জানিয়ে যাই, আমরা আসছি, একঘণ্টার মধ্যে ।'

আমি বললুম, 'পণ্ডিতমশাই মোহনবাবুর খুব প্রশংসা করছিলেন । তা তিনি নিজেও অভুক্ত । পণ্ডিতমশাইকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেলে হয় না !'

মোহনবাবু বললেন, 'তিনি স্বপাক ছাড়া খান না । আর এক যদি তাঁর মা রেঁধে দেন । চলুন তাকে আমরা বলে চলে যাই ।'

ছোটদাদু বললেন, 'আর কি আমরা সময় পাবো ! আমাদের তো যেতে হবে ।'

মোহনবাবু বললেন, 'আজ আর যাওয়া হবে না । কাল সকালে বেরোবেন । দূরের পথ । পৌঁছতে অনেক রাত হয়ে যাবে ।'

আমরা সদলে চতুষ্পাঠীতে প্রবেশ করলুম । জানতুম প্রথম থেকেই হরিশঙ্কর মুগ্ধ, বিমুগ্ধ হতে হতে একেবারেই সমাহিত অবস্থায় চলে যাবেন । এত গাছ, ফুল, প্রজাপতি, কঞ্চির বেড়া, মৌচাক, ভ্রমর । আহা, ওহো করছেন আর ছোটদাদু তাঁকে ঠেলছেন, 'চল, চল, এগিয়ে চল, এগিয়ে চল ।'

অবশেষে পণ্ডিতমশাইকে পাওয়া গেল পেছনের বারান্দায় । ইটের মাঝখানে কাঠ জ্বেলেছেন । যত না আগুন তার চেয়ে বেশি ধোঁয়া । মাটির হাঁড়িতে ভাত ফুটছে । আস্ত একটা বেগুন জলচর প্রাণীর মতো হাবুডুবু খাচ্ছে । পণ্ডিতমশাই একপাশে বেশ আরামে বসে শাক বাছছেন । এতই তন্ময় আমাদের উপস্থিতি টের পেলেন না । নিজের ভাবেই মৃদু মৃদু হাসছেন । হঠাৎ বললেন, 'যাবে যাও । কে তোমাকে ধরে রেখেছে ।'

মোহনবাবু যেই ডেকেছেন, 'পণ্ডিতমশাই', অমনি চমকে উঠেছেন, 'কার সঙ্গে কথা বলছেন ?'

'আরে একটু আগে একটি ছেলে এসেছিল, সে নাকি তোমার ওখানেই অতিথি হয়েছে, তাকে দেখতে ঠিক আমার সেই বড় ছেলেটার মতো, সেই যে গো জয়রাম, টাইফয়েডে মারা গেল, ছেলেটা ছুটে পালাল । অনেক দিন পরে, তার সঙ্গে বেশ একটু শাস্ত্র আলোচনা হচ্ছিল, যেমন হত জয়রামের সঙ্গে, আহা বেচারার বোধ হয় খুব খিদে পেয়েছিল, বুঝলে মোহন !

'পণ্ডিতমশাই, সে আবার এসেছে । সঙ্গে তার পিতা আর মহাসাধক দাদু এসেছেন ।'

পণ্ডিতমশাই তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন । তাঁর কোল থেকে কিছু শাকপাতা ঝরে পড়ল । তিনি আকুল হয়ে বলতে লাগলেন, 'কোথায় আমার জয়রাম কোথায়, কোথায় আমার রাম !'

রাম, রাম বলতে বলতে বৃদ্ধ অঝোরে কেঁদে ফেললেন । বৃদ্ধের চুল সাদা, বৃদ্ধের ভুরু সাদা, সাদা চোখের পাতা । দু'গাল বেয়ে জলের ধারা নেমেছে । ঠোঁট দুটো তির তির করে কাঁপছে, আর মাঝে মাঝে শব্দ বেরোচ্ছে, 'রাম, জয়রাম ।'

তিনি কাঁপতে কাঁপতে একপাশে হেলে পড়ছিলেন, ছোটদাদু এসে বুকে জড়িয়ে ধরলেন । তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'যো জিসকো শরণ লিয়ে সো রাখে/উসিকো লাজ/উলট জলমে মছলি চলে/ বহি যায় গজরাজ । পণ্ডিতমশাই কার কথা ?'

প্রশ্ন ? আর যায় কোথায়, পণ্ডিতমশাই কিছুটা ধাতস্থ হয়ে বললেন, 'মহামান্য, এ তো তুলসীদাস !'

ছোট দাদু বললেন, 'তবে ? অর্থ যথা পদধুলি হোয়, যৌবন নদী কর বেগ/মানুখ জলখে বিন্দু হোয়, জীবন ফেন করি লেখ ॥ এর অর্থ কি পণ্ডিতমশাই ?'

ছোটদাদুর আলিঙ্গনমুক্ত পণ্ডিতমশাই বললেন, 'ধন পদরজের ন্যায় অতি তুচ্ছ, যৌবনদশা বেগবৎ চঞ্চল, নরগণের শরীর জলবিন্দু সদৃশ ; অতএব ক্ষণভঙ্গুর দেহের জন্য

আপাতত সুখকর সংসারসুখে কেন মুগ্ধ, মোক্ষলাভের নিমিত্ত ধর্মোপার্জনই কর্তব্য ।'

'তবে আপনি এমন বিচলিত হচ্ছেন কেন ?'

'মহাশয়, মানুষের ধর্মই হল বিচলিত হওয়া । কারণ মনই মানুষের কর্তা । আমার আমি যতদিন এই দেহকে ঘিরে আছে, ততদিনই আমার দুঃখ, সুখ, জরা, ব্যাধি । তেষু বিনষ্টেষু সৎসু স্বয়ং বিনশ্যতি । ধর্ম হল দুর্বল মানুষের হাতিয়ার । ঈশ্বর হলেন জ্বরের রোগীর কপালের জলপটি । রোগারোগ্য হয় না, সাময়িক উপশম হয় মাত্র । আপনাদের তত্ত্ব কথা অনুলেপন মাত্র । আমি ভক্ত নই । আমি বিচারশীল এক মানব । ইহলোকাৎ পরো নান্যঃস্বর্গোহস্তি নরকা ন চ । ইহলোকের পর স্বর্গও নেই, নরকও নেই মহামান্য । সবই এইখানে । ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ । আমার দুঃখ-বেদনা- অনুশোচনার কোনও প্রলেপ নেই । সহ্যই আমার শক্তি ।

হরিশঙ্কর সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এসে করমর্দন করতে করতে বললেন, 'এই তো চাই, এই তো চাই । এতদিনে একজন বীর মানব খুঁজে পেয়েছি । এঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করা চলে ।'

পণ্ডিতমশাই বললেন, 'অনুমান সঠিক, আপনি আমার জয়রামের পিতা ।'

'আজ্ঞে, জন্মদাতা ।'

'উপযুক্ত উত্তর । আপনি অতিশয় জ্ঞানী । আর ইনি এক বিশ্বাসী সাধক । মাতৃ উপাসক । মানবের পাঁচটি পিতা, পঞ্চপিতা, জন্মদাতা ভয়ত্রাতা কন্যাদাতা বিদ্যাদাতা অথবা দীক্ষাদাতা ও অন্নদাতা ।'

মোহনবাবু আমার কানে কানে বললেন, 'হয়ে গেল । আজ সাড়ে সর্বনাশ । তিন জ্ঞানী একত্র হয়েছেন ।'

পণ্ডিতমশাই আবার শুরু করলেন, 'জগৎকারণের মূল হল অহঙ্কার । অহঙ্কার দুরকম, জীবের অহঙ্কার, মানবের সমবেত অহঙ্কার । সমবেত অহঙ্কার সভ্যতার চাকা । আর যে-শক্তিতে পশু লেজ নাড়ে, সেই শক্তিই ব্যক্তির অহঙ্কার । তর্জনগর্জন আস্ফালনাদি ইত্যাকার লাঙ্গুল সঞ্চালনাদি কর্ম, উপনিষদোক্ত, উত্তিষ্ঠত জাগ্রত । অহঙ্কারশূন্য মানব কর্তিতলাঙ্গুল বৃহন্নলাবৎ ।'

হরিশঙ্করের চোখমুখ উজ্জ্বল । সার পাওয়া লতার মতো । তিনি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন, 'সাবাশ্, সাবাশ্ ।'

এমন সময় ভাতের ফেন উতলাল । মোহনবাবু বললেন, 'পণ্ডিতমশাই অন্ন প্রস্তুত । আপনি আহারাদি সেরে নিন, আমরা আবার আসছি ।'

হরিশঙ্কর বললেন, 'শাক আপনি কিভাবে প্রস্তুত করবেন ?'

'অতি সহজ । পাত্রে জল, জলে কিঞ্চিৎ হলুদ, কালো জিরা ও লবণ । তাইতে শাক ছেড়ে দোবো । সুসিদ্ধ হলে নামিয়ে নোবো । অতিশয় সুস্বাদু ।'

ছোটদাদু জিজ্ঞেস করলেন, 'এই আপনার দিবসের আহার ? রাত্রিকালে ?'

'আমি একাহারী !'

'শরীর দুর্বল হয়ে পড়বে না ?'

'মহাশয়, মেধাই আমার বৃত্তি । শরীর নয় । আমার কায়িক-শ্রম নেই বললেই চলে । আমার কোনও ক্ষয় নেই । কোনও দুশ্চিন্তা নেই । একেবারে গণিতের নিয়মে শরীর চলছে ।'

গণিত ! গণিত হরিশঙ্করের ঈশ্বর । মেধা হরিশঙ্করের ইষ্ট । তিনি লাফিয়ে উঠলেন, 'এই তো চাই । গণিত আপনার জীবন ! আপনি সিদ্ধ মহাপুরুষ !'

৩৯

He that looks not before, finds himself behind

শিশুকে যে-ভাবে ভুলিয়ে শান্ত করে তার আকর্ষণের ক্ষেত্র থেকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়, মোহনবাবু ঠিক সেইভাবে হরিশঙ্কর ও ছোটদাদুকে নিয়ে এলেন । বিমলাদি দাওয়ায় বসে আছেন আপনার ভাবে বিভোর হয়ে । পিন্টু লাল মেঝের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে, দুহাতের ভরে চিবুক রেখে গভীর মনোযোগে কি একটা বই পড়ছে । পেছনের পা দুটো হাঁটুর কাছ থেকে মুড়ে ওপরে তোলা ।

আমাদের ফিরতে দেখে বিমলাদি তাড়াতাড়ি উঠে এগিয়ে এসে বললেন, 'আপনাদের ভারী দেরি হয়ে গেল আজ । কত বেলা হয়ে গেছে !'

ছোটদাদু বললেন, 'কিচ্ছু ভাবিসনি মা, আমরা সব চারটের পার্টি । সকাল সকাল খায় রোগীরা ।'

পিন্টু অদ্ভুত কায়দায় গড়িয়ে মেঝে থেকে ঝপ করে উঠে বললে, 'ছোটমামা তুমিও ছোট ছেলের মতো হারিয়ে যাও ! হারিয়ে গেলে কি করতে হয় জানো ? মামার নাম বলবে, আর বাড়ির ঠিকানা । তোমার মামা আছে তো !'

বিমলাদির দিকে তাকাতেই করুণ মুখে এক ঝলক হাসি এনে বললেন, 'ছেলের পাকাপাকা কথা শোনো ।'

ব্যাপারটা খুবই দুঃখের । বাবার পরিচয়ে পরচিত হবার উপায় নেই । মামার পরিচয়ই সব । শিশু জানে না তার জীবনের দুর্ভাগ্যটা কোথায় ! যখন জানবে তখন সে একটা বেদনারই উত্তরাধিকারী হবে । পুরো ইতিহাস আমার জানা হবে না । তবে যদি ধর্মের কারণে বিচ্ছেদ হয়ে থাকে, তাহলে বিমলাদির কাছে আমার নিরুচ্চার প্রশ্ন, সংসার করতে গিয়েছিলেন কেন ? এমন সুন্দর এক শিশুর জীবন কেন নষ্ট করলেন ! পণ্ডিতমশাই ঠিক, পৃথিবী শয়তানের । এখানে ভগবানও সময় সময় শয়তানের রূপ ধরেন । না কি শয়তান ধরেন ভগবানের রূপ !

আমরা লাইন দিয়ে খেতে বসেছি । এমন সময় মোহনদার এক পরিচিত এসে জানিয়ে গেলেন, দামোদর ভয়াবহ চেহারা ধারণ করেছে । জল বাড়তে বাড়তে একেবারে টইটম্বুর । যে কোনও সময় কূল ছাপিয়ে যাবে ।

হরিশঙ্কর সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ আগ্রহে বললেন, 'তার মানে বন্যা ! বন্যা হলে আমি কিন্তু

থেকে যাবো ! দুর্ভিক্ষ দেখেছি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দেখেছি, দাঙ্গা দেখেছি, ভূমিকম্প দেখেছি, মহামারী দেখেছি, দুটো জিনিস দেখা হয়নি, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত আর বন্যা ।'

মোহনদা বললেন, 'সে ভারী সুন্দর ! কোনওরকমে বেঁচে গেলে অভিজ্ঞতার মতো অভিজ্ঞতা । শুধু জল আর জল । সব সমান । এ-পাড়া ও-পাড়া নেই সব একাকার । গাছপালা সব ছোট ছোট, ঝোপের মতো । বাড়ির চালগুলো শুধু জেগে আছে । সেই চালে বসে আছি আমি । শুধু আমি একা নই, আমার সঙ্গে গরু আছে, ছাগল আছে, হাঁস-মুরগী আছে, সাপ আছে । ঘরে ঘরে মানুষ নেই, শুধু জল কলকল করছে । এরই মধ্যে ঘর ভাঙবে । ঝুপ করে দেয়াল ধসে পড়ে চালাটা ভাসতে ভাসতে চলে যাবে । না খাদ্য, না জল । এরই মাঝে আসবে নৌকো, হয় সেনাবাহিনীর না হয় মিশনের । অনেক দিন না খাওয়ার পর খাওয়া, মরতে মরতে বেঁচে ওঠার কি আনন্দ । মরে না গেলে একটা অভিজ্ঞতা । বিহারে খুব বৃষ্টি হচ্ছে, বন্যা হলেও হতে পারে । আপনাদের ভাগ্যে থাকলে দেখা হবে । বন্যা আমাদের গা সওয়া । হলেই হল ।'

হরিশঙ্কর বললেন, 'একবার নদীর ধারটা ঘুরে এলে হয় !'

ছোট দাদু বললেন, 'তুই কোনও রকমে আগে খাওয়াটা শেষ কর । নতুন ধরনের অভিজ্ঞতা হবে তো ! সে-অভিজ্ঞতাটা খুব সুখের হবে না । আমার সাধারণ বুদ্ধি যা বলে । যতটা পারো পেটে নিয়ে নাও । এমনও হতে পারে সাতদিন কিছু জুটল না ।'

বিমলাদি পরিবেশন করতে করতে বললেন, 'এখন বন্যা হবে না । আরো পরে হলেও হতে পারে । মাসখানেক পরে । এ-জল আমাদের বাগান পর্যন্ত এসে সরে যাবে । বড় জোর এই উঠোনটা ভরে যাবে । এ দাওয়া থেকে ও-দাওয়া জল ভেঙে ভেঙে যেতে হবে ।'

পিন্টু বলল, 'দেখবে কত মাছ আসবে । সাপ আসবে সুন্দর সুন্দর ।'

ছোটদাদু বললেন, 'অপূর্ব আহার হল । বিমলা মা আমার চমৎকার রেঁধেছে । এত সব করলে কখন ?'

মোহনদা বললেন, 'বিমলা ভীষণ ভাল রাঁধে । ওর রান্নার জন্যেই আমার খদ্দের । মানুষকে খাইয়ে আনন্দ পায় ।'

পিতা হরিশঙ্করের কানে কানে বললুম, 'কিছু তো কেনা হল না ! উপহার !'

হরিশঙ্কর চুপিচুপি বললেন, 'ব্যবস্থা হয়েছে একটা ।'

আমি আরো ফিসফিস করে বললুম, 'কি ব্যবস্থা ?'

'ছোটমামার পকেটে একটা সোনার মাদুলি ছিল তারা মায়ের চরণের ফুল ভরা । এর চেয়ে ভাল জিনিস আর কি হতে পারে ! ধর্মের সংসার, বেশ মানিয়ে গেছে !'

ছোট দাদু ভীষণ পান ভালবাসেন । দাওয়ায় মাদুর বিছিয়ে বসেছেন । পেছনে পরিষ্কার ওয়াড়ে-ঢাকা বেঁটে, মোটা তাকিয়া । সামনে পানের ডিবেতে সাজাপান । পাশে গোল ছোট্ট ডিবেতে চুন । আর একটা কৌটোয় জর্দা । ছোট দাদু চারপাশ আলো করে বসে আছেন । হরিশঙ্কর কবি হয়ে গেছেন । গাছ, আকাশ, নদী, পাখি । সামনেই বাঁশ-ঝাড় । হরিশঙ্কর বাঁশঝাড় ভীষণ ভালবাসেন । কচি, মসৃণ, তেলা বাঁশ তাঁর কাছে কবিতার মতো সুন্দর ।

হরিশঙ্কর বললেন, 'একটাই অভাব । একটা ছোট পাহাড় থাকলে বেশ হত ।'

ছোট দাদু বললেন, 'বাকি জীবনটা এখানে কাটালে কেমন হয় ? আমাদের তো কোথাও কোনও বন্ধন নেই । বড় শান্তির জায়গা । একটা পঞ্চমুণ্ডীর আসন পেতে বসে পড়

কাজের কাজে ।'

হরিশঙ্কর বললেন, 'বসতে হলে হিমালয়ের কোলেই বসা ভাল ।'

'হিমালয় হল শিবের, বিষ্ণুর,তারার সাধনা গরম ছাড়া হয় না । কাঁকুরে মাটি, জলের অভাব, ফোস্কা পড়ানো ভীষণ গরম, একটা বেলগাছ, পাশেই মহাশ্মশান, হোমের আগুন, তবেই না তাঁর আবির্ভাব । বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এই হল পীঠস্থান । চল না, আমার সঙ্গে একদিন শ্মশানে বসবি ।'

হরিশঙ্কর বললেন, 'শ্মশান করেছি হৃদি, শ্মশান-বাসিনী শ্যামা, নাচবি সেথা নিরবধি । আমি আর শ্মশানে গিয়ে কি করব ? আমার জীবনটাই তো শ্মশান । প্রহরে প্রহরে স্মৃতির শৃগালের হুক্কাহুয়া । হরি বাঁচ আরো বাঁচ । প্রতিদিন মরে মরে বাঁচ । মৃত্যুর হায়না রবীন্দ্রনাথের মতোই আমার জীবন নিয়ে খেলা করেছে । তাঁর সেই অপূর্ব গান নিজেকে গেয়ে শোনাই, গরব মন হরেছ, প্রভু, দিয়েছ বহু লাজ/কেমনে মুখ সমুখে তব তুলিব আমি আজ । মুকুজ্যে মশাই, এর দাদু, প্রেমিকের একটা গান গাইতেন । গেঁথে আছে আমার মনে । সুরটাও ছিল অসাধারণ, পরজবাহার । মন দিয়ে শোন, তুই তো গান লিখিস । বিশাল বিশ্বফলকে আঁকিছ প্রতিপলকে/সীমা করি লোকালোকে, মহামোহ রাগ সারে ॥আশারূপ মহাহ্রদে পড়ে যায় ধরিতে চাঁদে/কেহ কাঁদে মনের খেদে, মত্ত কেহ অহঙ্কারে/কেহ আনন্দে মগন পেয়ে তনয়-রতন/কেহ অশ্রু বিসর্জন করে মৃত সুত হেরে ॥কল্পনা-পাদপ-তলে বসেছে কেউ কুতূহলে । কেহ ভাসে সকল ফেলে অকালে কাল-স্রোত-নীরে/এ আকৃতির এমনি রীতি অসত্যে সত্য প্রতীতি ।" দেখ, আমি নাস্তিক । দেব-দেবীতে আমার বিশ্বাস নেই । জীবন হল যাপনের জিনিস । যেমন কম্বল । গায়ে দাও । ছাতা মাথায় দাও । জুতো পায়ে দাও । মানুষ হল বদ্ধ উন্মাদ । একটা মাছি তৈরি করার ক্ষমতা নেই, ডজন ডজন দেবতা তৈরি করে বসে আছে । আমি নিৎসের মতোই মাঝে মাঝে প্রশ্ন করি নিজেকে, মানুষ ভগবানের মারাত্মক ভুল না ভগবান মানুষের মারাত্মক ভুল । বিশ্বাস মানুষের মনে ঢোকানো যায় না, বিশ্বাস মানুষের মনে তৈরি হয় । ফুলের মতো ফুটে ওঠে । ঘাসের মতো অনায়াসে গজায় ।'

হরিশঙ্কর অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'কেন অকারণে এতো বকছি ! প্রত্যেকেই প্রত্যেকের পথে হাঁটবে । পথের শেষে খুঁজে পাবে বেঁচে থাকার উপলব্ধি । এত যুক্তিতর্কের কি বা প্রয়োজন ! কুকুরের লেজ বাঁকা,বাঁকাই থাকবে । ঘোড়ার লেজ সোজা ঝুলে থাকবে চামরের মতো । শত চেষ্টাতেও তার পরিবর্তন হবে না । বাজে না বকে, যাই দেখে আসি প্রকৃতির খেলা । দামোদরের জল কত দূর এল ! পথে উঠে পড়েছে কি না ?'

মোহনদা বললেন, 'পণ্ডিতমশাই-এর টোলে যাবেন না ! বললেন যে, খুব তর্ক হবে !'

হরিশঙ্কর উদাস মুখে বললেন, 'কি হবে, অহঙ্কারের কাঠি-নৃত্য করে । যুগ বদলে গেছে । শ্রীচৈতন্যের প্রেমের যুগ, শঙ্করের মেধার যুগ, বুদ্ধের বিচারের যুগ, প্রসাদের ভক্তির যুগ শেষ হয়ে গেছে । এখন চলেছে শিশ্নোদরের যুগ । খাও-দাও শুয়ে পড় কাঁথা মুড়ি দিয়ে ।'

ছোট দাদু বললেন, 'বিকেলটা তো কাটাতে হবে ! পণ্ডিতমশাইয়ের আশ্রমটা ভারী সুন্দর । তর্ক না হোক দু-দণ্ড বসা তো যাবে !'

হরিশঙ্কর কি ভাবলেন, চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন, 'আজই আমাদের চলে যাওয়া উচিত ছিল । একটা কাজের জন্যে আমরা অনেকটা সময় খরচ করে

ফেললুম ।'

ছোটদাদু বললেন, 'আমরা কি আর করলুম ! যাঁর ইচ্ছায় জগৎ-সংসার চলছে, তিনিই করাচ্ছেন ।'

মোহনদা বললেন, 'আপনারা যে দিকটায় যাবেন, সেদিকে বিশাল একটা জঙ্গল পড়বে । দুর্গাপুর হওয়ার পর, যত ডাকাত ছিল, সব চলে এসেছে ওই তল্লাটে । কি দরকার, রাত্তির-বেলা ঝুঁকি নিয়ে ! কাল-সকালে যাবেন । একটা রাতের তো ব্যাপার । আপনারা মহাপুরুষ । একদিনের জন্যে আপনাদের একটু সঙ্গ করি । সকালে বলেছিলেন, লুচি, কুমড়োর ছক্কা খাবেন, রাতে সেইটাই হবে মহামায়ার ভোগ । একটু পুজো হবে, আরতি হবে । আমাদের দুঃখের জীবনে আর কি আছে ! একটা আশা নিয়ে বেঁচে থাকি ।'

ছোটদাদু বললেন, 'মহামায়া ?'

মোহনদা বললেন, 'সে এক কাহিনী ! সে-বার বন্যা হয়ে গেল জোর । জল নেমে গেল । আমরা নেমে এলুম ডাঙ্গা থেকে । ভিজে-ভিজে তিন জ্বর । বাড়ি-ঘর মাটি ভর্তি । কোনও রকমে একটুখানি পরিষ্কার করে পড়ে আছি একপাশে । চোখ খুলতে পারছি না, পাশ ফিরতে পারছি না । রাত প্রায় ভোর হয়ে এসেছে । সে আমার স্বপ্ন, না আপনারা যাকে দর্শন বলেন, তা-ই বুঝতে পারলুম না । কুচকুচে কালো এক দেবীমূর্তি । আমার মাথার শিয়রে দাঁড়িয়ে বলছেন, হাত ধর্ । ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলুম । ভোরবেলা ঘুম ভাঙলো । দেখি হাতের পাশে বালিমাটির ওপর ছোট্ট এক দেবী-মূর্তি শুয়ে আছেন । পণ্ডিতমশাই দেখে বললেন, মহামায়া । সেই থেকে সংসারে বেশ যেন একটা আঁট এসেছে । মনটা আর আগের মতো টলে না । সহ্য করার শক্তি অনেক বেড়ে গেছে । পুজো আমি শিখিনি । যা পারি তা-ই করি নিজের মতো করে ।'

ছোটদাদু বললেন, 'এ-সব কথা কারোকে কোনও দিন বলবে না । চেপে রাখবে নিজের ভেতর । চারপাশে কত অবিশ্বাসী আছে, তোমার সহজ সরল বিশ্বাস ভেঙে দেবে ।'

মোহনদা বললেন, 'আপনারা মহাপুরুষ, তাই আপনাদেরই বললুম ।'

'কৃপা, দয়া এই সব অযাচিত আসে । হয় তো পূর্বজন্মের কর্মফল ।' ছোটদাদু বললেন ।

হরিশঙ্কর বললেন, 'ওই একটা জিনিস আমি মানি কর্মফল ।'

এক খিলি পান মুখে ফেলে ছোটদাদু বললেন, 'কেন মানো ? তুমি কি পুনর্জন্মে বিশ্বাস করো ?'

হরিশঙ্কর বললেন, 'কর্মফল হল চাষবাসের ব্যাপার, এগ্রিকালচার, সেই কারণেই মানি । বীজ যেমন বুনবে সেইরকম ফসল তুলবে । যেমন কর্ম তেমন ফল । এ জন্মে না পেলে পরের জন্মে সেইটাই হবে তোমার ভাগ্য, ডেস্টিনি । তুমি বুঝতেই পারবে না কোথা দিয়ে কি হয়ে যাবে !

ছোটদাদু বেশ জাঁকিয়ে বসলেন । তাকিয়াটা টেনে নিলেন কোলে । মজলিশি মানুষ । দুঃখ, সুখ কোনও কিছুই তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না । জ্ঞাতি শত্রুর অভাব নেই । তারা যা-তা অপবাদ রটায় । ভণ্ড বলে । বিষয়সম্পত্তির ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে অশান্তি করে । ছোটদাদু গ্রাহ্যই করেন না । কি সব ঘেউ ঘেউ করছে, কান না দিলেই হল । তুলসীদাসের মতো, হস্তী চলে বাজারমে কুত্তা ভুখে হাজার/সাধুনকে দুর্ভাব নহি যঁও নিন্দে সংসার ॥ সবসময় একটা ডোন্ট কেয়ার ভাব । মানিকজোড় বলে । হরিশঙ্কর আর ছোটদাদু সেই

মানিকজোড় ।

তাকিয়াটা কোলে টেনে নিয়ে ছোটদাদু বললেন, 'সেই গল্পটা শোনো । গভীর বন । মাঝ রাত । এক তান্ত্রিক জবরদস্ত আয়োজন করে শবসাধনায় বসেছেন এক গাছতলায় । কারণবারি, ফুল, ছোলাভাজা । শব জাগলে তাকে ছোলাভাজা খাওয়াতে হবে । শবকে স্নান করিয়ে সাধক তার বুকে চেপে বসে খুব জপ করছেন । ওদিকে গাছের ডালে একজন উঠে বসে আছে । সে পথিক । রাত হয়ে গেছে দেখে বাঘের ভয়ে ডালে উঠে বসে আছে । শবসাধনায় সাধক অনেক বিভীষিকা দেখে । সাহস করে বসে থাকতে হয় । সাহস থাকলে সিদ্ধি, ভয় পেলেই মৃত্যু । শবই ঘাড় মটকে দেবে । সাধক সেই বিভীষিকা দেখতে শুরু করেছেন । ভয়ে এমন অবস্থা, ভাবছেন নেমে পড়ে দৌড় লাগাবেন কি না ! এমন সময় কোথা থেকে বিশাল এক বাঘ এসে তন্ত্রসাধকের ঘাড় কামড়ে ধরে তুলে নিয়ে চলে গেল । পথিক বসে আছে গাছের ডালে । সে সব দেখছে । নিচে শুয়ে আছে শব । পূজার উপকরণ প্রস্তুত । সে তখন আস্তে আস্তে নেমে এল গাছ থেকে । খুব ইচ্ছে হল, দেখাই যাক না, বসে কি হয় । আচমন করে বসে গেল শবের ওপর । একটু জপ করতে না করতেই মায়ের দর্শন । সামনেই মা ভগবতী । তিনি বললেন, আমি তোমার ওপর প্রসন্ন হয়েছি, তুমি বর নাও । মার পাদপদ্মে প্রণত হয়ে সে বললে, মা একটা কথা জিজ্ঞেস করি, তোমার কাণ্ড দেখে অবাক হয়েছি ! যে-সাধক এত খেটে, এত আয়োজন করে, এত দিন ধরে তোমার সাধনা করছিল, তাকে তোমার দয়া হল না ! আর আমি কিছু জানি না, শুনি না, সাধনহীন, ভজনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন, আমার ওপর এত কৃপা হল মা ! ভগবতী হাসতে হাসতে বললেন, বাছা ! তোমার জন্মান্তরের কথা স্মরণ নেই, তুমি জন্ম জন্ম আমার তপস্যা করেছিলে, সেই সাধনবলে তুমি বসতে না বসতেই আমার দর্শন পেলে । এখন বলো, কি বর তুমি চাও ? 'এই হল কর্মফল । একটা বোকা, নিরেট, গাধামার্কা লোক সিংহাসনে বসে সবাইকে হুকুম করছে, আর বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, জ্ঞানী গুণী মানুষ, হা অন্ন হা অন্ন করে পরের দাসত্ব করছে । বাংলায় একটা সুন্দর প্রবাদ আছে, কপাল গুণে ঘি-ভাত, কপাল দোষে কি ভাত ।'

মোহনদা বললেন, 'আমার অবস্থাটাই দেখুন না । কোন্ ঘরের ছেলে আজ কোথায় নেমে কি কাজ করছি !'

হরিশঙ্কর একটু অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'তাতে কি হয়েছে, সৎপথে সৎভাবে উপার্জন করার জন্যে যে-কোনও জীবিকাই গ্রহণ করা যায় । এতে অসম্মানের কিছু নেই ।'

মোহনদা বললেন, 'না, আমি বলছি, ভাগ্যের কথা । মানে আমার ভাগ্যটা চিরকালই তেমন সুবিধের নয় । আমার জীবনে কিছুই তেমন হতে চায় না । কত লোকের কত কি হয় !'

'শোনো ভাগ্যে বিশ্বাস করো, শুধু শব্দটা পাল্টে নাও । ভাগ্যের জায়গায় বসাও কর্ম । যত খাটবে ততই তোমার বরাত ফিরবে । আমিও ভাগ্য বিশ্বাস করি । যত খাটি ততই আমার ভাগ্য ফিরে যায় । খাটলে খাটিয়া, আরো খাটলে খাট, আরো খাটলে সিংহাসন ।'

মোহনদা বললেন, 'আমিও তো কম খাটি না !'

হরিশঙ্করের স্প্রিং-এর মতো লাফিয়ে ওঠা দেখে ছোটদাদু ভয় পেয়ে গেলেন, 'কি হল ?'

হরিশঙ্কর কোনও কথা না বলে সোজা চলে গেলেন দাওয়ার উত্তরপ্রান্তে । সেখানে দাঁড়িয়ে মোহনদাকে ডাকলেন।মোহনদা বেশ থেবড়ে বসেছিলেন দেয়ালে পিঠ দিয়ে ।

ভয়ে ভয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে তাকাতে তাকাতে এগিয়ে গেলেন । হরিশঙ্কর মোহনদার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'এটা কি ?'

ছোটদাদু বললেন, 'দেখে এস তো, ওখানে মোহনের কোন্ ভাগ্য খেলা করছে ? সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য !' খোলার চাল । বাঁশের বাতা । বাঁশের খোঁটা বেয়ে পুরু হয়ে উইপোকা নেমেছে । যেন উইয়ের নদী । মূলধারা থেকে শাখা-প্রশাখা খেলে গেছে । কিছু শুঁড় আবার হিলহিলিয়ে মাথা তুলেছে, অশুভ অঙ্গুলি-সংকেতের মতো । দেখলেই গা শিউরে ওঠে ।

হরিশঙ্কর বললেন, 'এটা কি মোহন ?'

মোহনদা চমকে উঠলেন, 'এ তো উই ধরেছে ।'

'এটা উই নয় মোহন, এ তোমার আলস্য । আর এই আলস্যই তোমার ভাগ্য তৈরি করছে । আরো দেখবে ?'

হরিশঙ্কর মোহনকে নিয়ে তরতরিয়ে আরো কিছুটা উত্তরে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'ওপরে তাকাও ।'

মোহন ওপরে তাকালেন । ভাল করে দেখে বললেন, 'ঘুণ পোকা ধরেছে ।'

'এরপর কি হবে ? একদিন আচমকা ভেঙে পড়বে । ওই বাচ্চা ছেলেটাই এখানে বেশি খেলা করে । পড়লে তার মাথাতেই পড়বে । সেটা ভাগ্য ? না তোমার আলস্য ?'

মোহন মুখ কাঁচুমাঁচু করে বললেন, 'আজ্ঞে বাঁশ তো, ঘুণ আর উইপোকা ধরে ধরে আনে !'

'একটা টুল নিয়ে এসো ।'

'টুল কি করবেন ?'

'তোমাকে যা বলছি তাই করো ।'

হরিশঙ্কর আমাকে বললেন, 'বিমলাকে ডেকে আনো ।'

আমি জানি পিতা হরিশঙ্কর কি করতে চাইছেন। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে । বিমলাদি বাড়ির পেছন দিকে বাসন মাজছিলেন । পিঠে ছড়িয়ে আছে এলো চুল । গুনগুন করে গান গাইছেন আর একটা লোহার কড়া শালপাতা, ছাই দিয়ে ঘসঘস করে ঘষছেন । ঝকঝকে হয়ে গেছে, তবুও ঘষে যাচ্ছেন ।

'বিমলাদি !'

চমকে ফিরে তাকালেন, 'বলো ভাই । জল খাবে বুঝি ?'

'আজ্ঞে না, বাবা আপনাকে একবার ডাকছেন ।'

বিমলাদি বললেন, 'আমার হাতে একটু জল ঢেলে দেবে ভাই ।'

সামনেই বালতি আর মগ । ফর্সা গোল গোল হাত দুটো সামনে এগিয়ে দিলেন । সাবধানে জল ঢালতে লাগলুম । আমার পেছনেই একটা চালতা গাছ । ছায়া ছড়িয়ে আছে । একটা দোয়েল বেলা শেষের গান গাইছে । একটু পরেই উজ্জ্বল একটা দিনের মৃত্যু হবে । সেই দুঃখ পাখির ঠোঁটে গান হয়ে ঝরছে ।

বিমলাদি বেশবাস ঠিক করে হরিশঙ্করের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, 'কাকাবাবু !'

'আমাকে একটা খুন্তি এনে দাও । কেরোসিন তেল আছে ?'

বিমলাদি একটু অবাক হয়ে বললেন, 'ঘি-ও আছে ।'

এইবার হরিশঙ্করের অবাক হবার পালা । তিনি বললেন, 'ঘি কি হবে মা ?'

'রাতে লুচি খাবেন তো !'

'তুমি কি ভাবলে কেরোসিন তেল দিয়ে লুচি ভাজবো বলে খুন্তি চাইছি ?'

'আমি ঠিক ধরতে পারছি না কাকাবাবু ।'

'তোমাকে ধরতে হবে না, যা চাইছি নিয়ে এসো । সময় নষ্ট কোরো না ।'

মোহনদা বীর হনুমানের মতো একটা টুল মাথায় করে এলেন কোথা থেকে । মালকোঁচা মারা ধুতি । টুলটা বেশ বড় আর ভারী । হরিশঙ্করের সামনে নামিয়ে রেখে হাঁপাতে লাগলেন । যে-টুল দু'হাতে তুলেও মোহনদা কাঁপছিলেন, সেই টুল হরিশঙ্কর এক হাতে অক্লেশে তুলে ঠিক মতো জায়গায় নিয়ে গেলেন । এই হলেন হরিশঙ্কর ! কখন যে কোন্ শক্তি প্রকাশ পাবে ! কখনো মেধা, কখনো দেহ ! কখনো সূক্ষ্ম দেহ-বোধ । একেবারে পূর্ণ-মানব ।

মোহনদা বললেন, 'এক হাতে তুলবেন কি করে ! আমি যে দু'হাতে ধরেও কেঁপেছি ।'

হরিশঙ্কর বললেন, 'তোমার ব্লাড-সুগার হয়েছে মোহন । তাই ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়ছ । তোমার চিকিৎসার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে । অঙ্কটা কি দাঁড়াচ্ছে জানো, আলস্য থেকে সুগার, সুগার থেকে আলস্য, আলস্য থেকে উই আর ঘুণ, ভাগ্যের কাঠামো বিধ্বস্ত ।'

হরিশঙ্কর টক করে টুলে উঠে পড়লেন । বিমলাদি বললেন, 'সাবধান-সাবধান, টুলে উঠছেন কেন ?' হরিশঙ্কর কোনও-রকম উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করলেন না । খুন্তি দিয়ে উইপোকা চাঁচতে শুরু করলেন । চাবড়া-চাবড়া উইমাটি ঝরে ঝরে পড়ছে । মোটামোটা, সাদা সাদা উইপোকা ।'

বিমলাদি বললেন, 'আপনি নেমে আসুন কাকাবাবু আমি করছি ।'

নিচের দিক থেকে হরিশঙ্করের মুখ অন্যরকম দেখাচ্ছে । স্পার্টানদের মতো । কাজ করতে করতেই বললেন, 'দীক্ষা দেওয়ার মতো তোমাদের লজ্জা দিয়ে যাই । ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠাকুরঘরে বসে ভগবানের পায়ে ফুল চড়ালে, ভগবান এসে তোমার এইসব কাজ কোনও দিন করে দেবেন না । ওই দিকটা একটু কম করে এইদিকটা একটু বেশি করে করো । বাড়িতে কোদাল আছে ?'

মোহনদা বললেন, 'আজ্ঞে আছে । এক জোড়া আছে ।'

'রেডি করে রাখ । এর পরই লাগবে ।'

হঠাৎ হরিশঙ্কর টুল থেকে টুক করে নেমে এলেন । নেমে এসে বললেন, 'মোহন এইবার তুমি ওঠো । তোমার কাজ তোমাকেই করতে হবে । ঠিক আমি যে-ভাবে চাঁচছিলুম তুমিও সেইভাবে চাঁচো । আমি ততক্ষণ একটা নুটি তৈরি করি, কেরোসিন লাগাতে হবে । বিমলা বেশ মোটা দেখে একটা কাঠি জোগাড় করে আনো ।'

মোহনদা বললেন, 'কাকাবাবু, আমাকে যে দোকানে যেতে হবে !'

'এক ঘন্টা পরে যাবে । বিকেলের দিকে তেমন খদ্দের হয় না, তুমি না বললেও আমি জানি ।'

মোহনদা থমথমে মুখে টুলে উঠে পড়লেন । ছোটদাদু বসে বসে হাসছেন । আমি কাছে যেতেই বললেন, 'তোমার বাবা একটা চরিত্র ! কেমন নজর দেখলে ! বসে বসেই লক্ষ করেছে । মোহনের আজ দফারফা ।'

'ছেলেবেলায়, রবিবার হলেই আমার ভয় করত । খাটতে খাটতে শেষ বেলায় মনে হত আমি একটা গাধা ।'

কেরোসিনের তীব্র গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল । হঠাৎ হরিশঙ্কর আমাকে ডাকলেন, 'কেমিস্ট্রির

ছাত্র তো ! বলতে পারো বিমলার রান্নাঘরের ভেতর দিকের চালের বাঁশে কি আছে ?'

প্রথমে মনে হল বলি, টিকটিকি, গিরগিটি, হেলে সাপ । তারপরেই মনে হল ওটা কেমিস্ট্রি নয় । ঝট করে মাথায় এসে গেল, বললুম, 'কোলটার' ।

কেউ কিছু পারলে ঐশ্বরিক আনন্দে হরিশঙ্করের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে । মোটা টাকার লটারি পেলেও তাঁর এত আনন্দ হবে না । আমার উত্তর শুনে তিনি ছেলেমানুষের মতো চিৎকার করে উঠলেন, 'গুড, ভেরি গুড । যাও, তুমি আর বিমলা গিয়ে কিছুটা কালেক্ট করে আনো ।'

মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, 'কি ভাবে ?'

'মাথা খাটাও মাথা । নেসেসিটি ইজ দি মাদার অফ ইনভেনসান ।

৪০

When a man is wrapped up in himself he makes a pretty small package.

বিমলাদির রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ মাথা ঘামালুম। এমনই মাথা, শরীর ঘেমে গেল, মাথা ঘামল না। বিমলাদি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন পাশে। আমার অসহায় অবস্থা দেখে বললেন, 'এক কাজকরোভাই, আমি একটা গামলায় কেরোসিন তেল আর খানিকটা ন্যাকড়া নিয়ে আসি। তেলে ন্যাকড়া ভিজিয়ে বাঁশ মুছলেই যা চাইছ তা উঠে আসবে। ভেজাবো আর মুছবো। তেলটা কালো হয়ে যাবে। যখন একবারে ঝুল কালো হয়ে যাবে তখন নিয়ে গেলেই হবে। এটা আমার মেয়েলী বুদ্ধি। তোমার মাথায় কি এল !'

'এর চেয়ে ভাল বুদ্ধি আমার মাথায় আসত না দিদি। আমার বাবাকে আপনার কেমন লাগছে ?' বিমলাদির চোখে জল এসে গেল। বললেন, 'আমার যদি এইরকম বাবা থাকতেন ! তোমার কি ভাগ্য !' বাবার গর্বে নিজের বুকটা দশ হাত হয়ে গেল। শুরু হল আমাদের দিশি বিজ্ঞান। দু'জনেই মোছা শুরু করলুম। কেরোসিন আর কয়লার ঘামের গন্ধে ঘর ভরে গেল। বাঁশ তার পুরনো বর্ণ ফিরে পাচ্ছে ক্রমশই। বিমলাদির ডান হাতের ওপর বাহুতে একটা তাগা। বুকে একটা সোনার হার দুলছে। চমৎকার ঢলঢলে শরীর। ওদিকে ভয়ঙ্কর কাণ্ড চলেছে। হরিশঙ্করের নানা নির্দেশ চাবুকের মতো মোহনদার ঘাড়ে আছড়ে পড়ছে।

বিমলাদির ফর্সা হাত কুচকুচে কালো হয়ে গেল। একবার বোধহয় ভুলে গালে হাত দিয়েছিলেন। কালো ছোপ। আমার হাতের অবস্থা তো আমি দেখতেই পাচ্ছি। কাজের সঙ্গে গল্পও চলেছে আমাদের। আমাদের ছেলেবেলার গল্প। ঘুড়ি ওড়ানোর গল্প, লাট্টু খেলার গল্প। বকুনি খাওয়ার গল্প। ওদিকে বেলা পড়ে আসছে। রান্নাঘরের বাইরে ওপাশে একটা বেড়াল ডাকছে মেও মেও করে। আমরা দু'জনেই চলে গেলুম আমাদের শৈশবে। মনেই হচ্ছে না, মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে আমাদের পরিচয়। মনে হচ্ছে দুই সমবয়সী বন্ধু বিকেলে নয়নতারা আর কেষ্টকলি ফুলে ঘেরা উঠোনে খেলা করতে এসেছি। সেই ছেলেবেলার দিনগুলিতে যেমন হত। শরৎ শেষ হয়ে হেমন্ত আসছে শিশিরের কাল। মাটি থেকে ভিজে ভিজে একটা গন্ধ উঠছে। শিশুমনকে অবাক করে দিয়ে ঘাসের পাড় ধরে ধরে একটা শামুক চলেছে তার বিশাল বাসস্থানটিকে পিঠে নিয়ে। শম্ভুকাকার আটচালায় মা দুর্গা। সব মূর্তি বায়না অনুযায়ী বিক্রি হয়ে গেছে, পড়ে আছে

এই একটি মা। রায়েদের বাড়ির পুজো হল না। বিদেশে বড় ছেলে মেমের প্রেমে পড়ে আত্মহত্যা করেছে বোধনের দিন। অসময়ের মা দুর্গার দিকে আমরা হাঁ করে তাকিয়ে থাকতুম। ওই মুখ, ওই চোখ। নন্তু কিছু ফুল তুলে এনে ভয়ে ভয়ে মায়ের পায়ের ওপর রাখত। আমাদের মনে হত, সিংহ জ্যান্ত হয়ে গেল, অসুর যাত্রার দলের জীবনবাবুর মতো হাহা করে হাসছে। পরেশ যেই বলত, 'ওই দেখ মা দুর্গা ক্যাঁচা তুলছে', আমরা অমনি ভয়ে তীরবেগে মাঠময়দান ভেঙে ছুট লাগাতাম। শঙ্করী আমাদের সঙ্গে তেমন ছুটতে পারত না। নাকি সুরে বলত, 'আমাকে ফেলে যাসনি ভাই।' ছুটতে ছুটতে আমরা গঙ্গার ধারের উঁচু ঢিবিতে সেই বহু প্রাচীন বটগাছের তলায় গিয়ে দাঁড়াতুম, যে-গাছের তলায় অনেক অনেক আগে শ্রীচৈতন্যের নৌকো ভিড়েছিল। তখন এমন শহর তো ছিল না। গ্রাম, একটা দুটো চালা বাড়ি। সেদিন যে-গ্রামবাসী তাঁর সেবা করেছিলেন নিমাই তাঁকে যে কাঁথাটি দিয়েছিলেন, সেই পবিত্র গাত্রবাস ঘিরে ছোট্ট একটি মঠ হয়েছে। সন্ধ্যার গঙ্গায় প্রদীপ ভাসানর মতো শৈশবের একটি দিন ভাসিয়ে দিয়ে যে-যার গৃহে। সঙ্গীদের মধ্যে কেউ বড়লোক, কেউ মধ্যলোক, কেউ নিম্নলোক। এই ভূলোক, দ্যুলোক, খেলার মাঠে সব একাকার। বাড়ি গিয়ে যে-যার অবস্থা ফিরে পাবে। কেউ খাবে শুকনো রুটি, কেউ খাবে গরম লুচি, কেউ শোবে ভুঁয়ে, কেউ খাটে নরম বিছানায়। আমরা দু'জনেই চলে গেছি শৈশবের ঘোরে। হঠাৎ বহু দূর থেকে একটা গান ভেসে এল। বাতাসের ওঠা-পড়ায় কখনো স্পষ্ট কখনো অস্পষ্ট। সুর খুবই চেনা। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গলা। আমাদের দু'জনেরই কাজ বন্ধ হয়ে গেল।

বিমলাদি বললেন, 'মেলায় হচ্ছে। এই সময় এখানে একটা বড় মেলা বসে। মা মঙ্গলচণ্ডীর মেলা। যাবে না কি দেখতে! খুব জমজমাট। ম্যাজিক, পুতুলনাচ সব আসে। আউসগ্রামের পুতুল। বাঘমুণ্ডির মুখোশ। গ্রামের মেলা তো দেখনি কোনওদিন।'

'আপনিও যাবেন?'

'আপনিটা ছাড়। অনেকক্ষণ হয়ে গেছে আমাদের পরিচয়। হ্যাঁ, আমিও যাবো।'

'তা হলে তাড়াতাড়ি কাজ সেরেনি। হাত চালাই।'

'আর হয়ে এসেছে।'

হোটেলের কোনও বড় পরিবেশক যেন বিশেষ একটা কিছু পরিবেশন করছেন, আমরা সেই ভাবে ঝুল কালো তেল ভর্তি গামলাটা পিতা হরিশঙ্করের দরবারে স্থাপন করলুম। তিনি খুশি হয়ে বললেন, 'আমি জানি বুদ্ধিটা কার মাথায় এসেছিল, বিমলার। একেই বলে গুড-ক্যাচ। কনসেনট্রেশানটা ভালই হয়েছে। এইবার এতে একটু পয়েজন, বিষ যোগ করতে হবে। বিমলা তোমার বাড়িতে বিষাক্ত কি আছে?'

'আজ্ঞে কাকাবাবু বিষাক্ত তো কিছুই নেই।'

'হতেই পারে না, ভাল করে ভাব।'

বিমলা অন্যমনস্ক হলেন। হঠাৎ ঝলসে উঠে বললেন, 'ধুতরো ফল।'

'ভেরি গুড। নিয়ে এস আটটা ফল।'

বিমলা বললেন, 'চলো ভাই।'

বাগানের দিকে যেতে যেতে ছোটদাদুর দিকে একবার তাকালাম। এক মনে নিজের ছোট্ট পকেট বুকে লিখছেন। জানি কি লিখছেন, গান। হয় তো সন্ধের আগেই সুর হয়ে যাবে। রাগ-রাগিণীর প্রখর জ্ঞান। সুন্দর গলা। সাধক না হয়ে বড় ওস্তাদ হতে

পারতেন। বিপ্লবী হয়েছিলেন। শাক্ত বিপ্লবী। হিংসার বিরুদ্ধে হিংসা। দেশবিভাগের দাঙ্গারোধে তাঁর নিঃশব্দ ভূমিকা কেবল আমরাই জানি। ইচ্ছে করলে নামকরা রাঁধুনী হতে পারতেন। হতে পারতেন বিরাট ব্যবসায়ী। সিদ্ধি তাঁর হাতের মুঠোয়। ধুলো ধরে সোনা করার অলৌকিক ক্ষমতা তাঁর আয়ত্তে।

বাগানের শেষ মাথায় কোদাল পাড়ার আওয়াজ। মোহনদা মাটি কোপাচ্ছেন। আমাদের দেখে বললেন, 'আজ খুব জব্দ হয়েছি।'

ভদ্রলোক ঘেমে নেয়ে গেছেন। পিতার নিষ্ঠুর ব্যবহারে লজ্জা করছে। একদিনে এতটা অত্যাচার ওই শরীর সহ্য করতে পারবে! আমিই তাঁর হয়ে ক্ষমা চাইলুম, 'আপনি কিছু মনে করবেন না মোহনদা। ওঁর চরিত্রের এইটাই এক ভয়ঙ্কর দিক।'

কোদাল ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মোহনদা বললেন, 'উনি যে আমার কত উপকার করলেন! আমার চরিত্রের একটা বড় দিক খুলে দিলেন। কত আপনার ভাবলে তবেই এমন করা যায়।'

'একদিনে এতটা সহ্য হবে মোহনদা?'

'কাকাবাবু বললেন, সবাই ধর্মদীক্ষা দেয় আমি তোমাকে কর্মদীক্ষা দিলুম। আজ সবই একটু একটু হবে। আমার ভীষণ ভাল লাগছে। চনচনে খিদে।'

বাগানের একেবারে শেষপ্রান্তে পোড়ো একটা পাঁচিল। সেইখানে ধুস্তুর গাছের ছোটখাট একটা জঙ্গল। মহাদেবের প্রিয় গাছ। ভাঙ আর ধুতরো একসঙ্গে বেটে খেলেই—শিবোহং। সঙ্গে সঙ্গে নির্বাণ। জয় বাবা, বলে গোটা দশেক ফল আমরা ছিঁড়ে নিলুম। কবিরাজি আর অ্যালোপ্যাথি মতে উই মারা হবে। এই সাধক কীটকুলের প্রতি হরিশঙ্করের অসীম ক্রোধ। আমাদের প্রাচীন প্রাসাদে পিতামহের দুর্লভ গ্রন্থসংগ্রহ শত চেষ্টাতেও রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। প্রাচীন সেই সব বই, আকারে আকৃতিতে ছিল বিশাল। ওয়েবস্টার ডিকশেনারি প্রায় জলচৌকির মতো। দশ খণ্ড দর্শনের বই, একের পর এক সাজালে টুলের উচ্চতা। কোনান ডয়েলের, লস্টওয়ার্লড, পাতায় পাতায় ছবি। ইউক্লিডের বিশাল জ্যামিতি। স্কটের বই। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলি, কীটস, বায়রন, টেনিসান, মিলটন। উইপোকাদের মাথার ঠিক থাকে! অসীম জ্ঞানভাণ্ডার সীমাহীন তৃষ্ণায় মাটি করে ফেলেছে। শুধু খায়নি, খেয়ে হজম করে ত্যাগ করেছে। পিতার মন্তব্য, জ্ঞান যে একদলা ঝুরো ঝুরো মাটি ছাড়া কিছুই নয়, এ তারই রাসায়নিক প্রমাণ। এর পরই সেই বিখ্যাত সঙ্গীত বিভিন্ন রাগ সহযোগে, উই আর ইঁদুরের দেখ ব্যবহার। কাঠ কাটে বস্ত্র কাটে করে ছারখার। এই গান দিয়ে নাকি তবলায় বোল সাধা যায়। ত্রিতাল। তা ধিন্ ধিন্ তা।

নরম, সবুজ ঘাসের ওপর বিমলাদির পা পড়ছে। একটু উঁচু করে পরা শাড়ি। মনে হচ্ছে, বনপথ ধরে মা লক্ষ্মী চলেছেন হেমন্তের বিকেলে। আর কিছুক্ষণ। বিকেল, রাত, ভোর, নাটক শেষ। যতই কেন হোক না মধুর, যতই ভাল লাগুক, যতই মজে থাক মন, লতা যতই ভাবুক এতদিনে পেয়েছি লতিয়ে ওঠার মতো নির্ভর এক বৃক্ষ, বাউল-সময় একতারাটি বাজাতে বাজাতে এসে বলবে, হেথা নয়, হেথা নয়। তুমি চাইলেই তো হবে না, ভাগ্য তোমাকে দিয়েছে যা, তাই নিতে হবে মেনে। তুমি এখানে, তোমার ইতিহাস ওখানে। আমি জানি, এতদিনে আমার স্নেহশুষ্ক জীবন একটা দীঘির সন্ধান পেয়েছে। সেই কোন শৈশব থেকে মাতৃহারা এক শিশু, শাসনের ছায়াহীন মরুভূমিতে উটের মতো চলেছে তো চলেছেই। পিঠে তার উচ্চাশার কুঁজ। মনে তার দুরপনেয় খিদে। একটু

ভালবাসা, একটু স্নেহ, কোমল হাতের ছোঁয়া, দুটো মিষ্টি কথা। সেই কবে থেকে কাঁটা গাছই চিবোচ্ছি। কশ দুটো ক্ষত-বিক্ষত, রক্তাক্ত। মাঝে মাঝে একটু ছায়া খেলে যায় জীবনে। মায়ামৃগের মতো ছুটে পালায়। মরুদ্যান আজও মিলল না। সবই মরীচিকা। নিজের মনেই তৈরি করে রেখেছি মায়া মরুদ্যান। মনে মনেই সেখানে সরে যাই। রূপসাগরে তলিয়ে যাওয়ার সাধনা করি। ছোটদাদু শেখাবার চেষ্টা করেছেন, ষটচক্রে মনভ্রমণের কৌশল। এগিয়ে যাও। বাইরে নয় ভেতরে। ছোটদাদু গাইবেন, জাগ জাগ জননি/ মূলাধারে নিদ্রাগত কত দিন গত হল কুলকুণ্ডলিনি/ স্বকার্য সাধনে চল মা শির মধ্যে। পরম শিব যথা সহস্রদল পদ্মে/ করি ষড়চক্র ভেদ ঘুচাও মনের খেদ, চৈতন্যরূপিণি। কাটাকুটি করলে এই ষড়চক্র দেখা যাবে না। সার্জারির বিষয় নয়। এ হল মনের নানা অবস্থার কথা। মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর। গুহ্য, লিঙ্গ, নাভি। মন বেশির ভাগ সময় এই অঞ্চলেই ঘোরাঘুরি করে। তাই মানুষ শিশ্নোদরপরায়ণ। হৃদয় হল অনাহতপদ্ম। মনকে ঠেলে এইখানে তুলতে পারলেই অন্য অভিজ্ঞতা। জীবাত্মাকে তখন শিখার মতো দর্শন হয়। চোখ বুজোলেই জ্যোতি। সাধকের সে কি আনন্দ, 'এ কি ! এ কি !' পঞ্চম ভূমি হল বিশুদ্ধচক্র। মন এই ভূমিতে গেলে, কেবল ঈশ্বরের কথাই শুনতে ইচ্ছে করে। ষষ্ঠভূমি হল আজ্ঞাচক্র। সেখানে মন গেলে ঈশ্বরদর্শন হয়। কিন্তু যেমন লণ্ঠনের ভিতর আলো, ছুঁতে পারে না, মাঝে কাচ ব্যবধান আছে বলে। ছোটদাদু জনকরাজার কথা বলেন, ত্রৈলঙ্গস্বামীর কথা বলেন। জনকরাজা পঞ্চমভূমি থেকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিতেন। তিনি কখনও পঞ্চমভূমি, কখনও ষষ্ঠভূমিতে থাকতেন। ষড়চক্র ভেদের পর সপ্তম ভূমি। সহস্রার। মন সেখানে গেলে মনের লয় হয়। জীবাত্মা পরমাত্মা এক হয়ে যায়। তখন সমাধি। দেহবুদ্ধি চলে যায়, বাহ্যশূন্য হয় ; নানা জ্ঞান চলে যায় ; বিচার বন্ধ হয়ে যায়। সমাধির পর শেষে একুশ দিনে মৃত্যু হয়।

বিমলাদি কোথা থেকে এক ধরনের মাটি নিয়ে এলেন। বললেন, 'বেশ করে সারা শরীরে মেখে পুকুরে মারো এক ডুব।' তিনিও মাখতে লাগলেন। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। ঝোপঝাড় থেকে বেরিয়ে এসেছে বড়, ছোট ব্যাং। থুপুর থাপুর লাফ চলেছে এদিকে, ওদিকে। ভয় করছে। প্রথম হল, সাপ। তারপর মনে হল, সাপ মানুষকে একবারই কামড়ায়। বজ্রাঘাত একবারই হয়। অর্থাৎ মানুষ মারা যায়। আমি তো বেঁচে আছি। আর একবার কামড়ালে কি হবে !

বিমলাদি আমার পিঠে হাত রেখে বললেন, 'কি ভাই, ভয় করছে খুব ! দেখ, পুকুরের জলটা যেন ঠিক একটা আয়না !'

'দিদি, আমার বাবাকে তো দেখছেন ! তাঁর হাতে মানুষ। ভয় থাকলেও বলার উপায় নেই। করলেও বলা যাবে না। মানুষের তিনটি আদিম ভয় আছে, সর্পভয়, অগ্নিভয় ও জলভয়। তিনটেই আমার কাটিয়ে দিয়েছেন।'

'কি ভাবে ? সাপ দিয়ে কামড় খাইয়ে, আগুন দিয়ে পুড়িয়ে, জলে চুবিয়ে ?'

'সাপ আমাকে এমনি, নিজে নিজে এসে দয়া করে কামড়ে গেছে এই ক'দিন আগেই। জানি না বেঁচে গেছি কি ভাবে ? মনে হয় এক সন্ন্যাসীর কৃপায়। সে এক অলৌকিক কাহিনী। আগুন আমাকে ঘিরে থাকে। আমি একটা ল্যাবরেটারিতে কাজ করি। এমন সব জিনিস আগুনে ফোটাতে হয় যে কোনও মুহূর্তে আগুন লেগে গেলেই হল। ভীষণ সাহসের দরকার। আর জল ? গঙ্গার ধারে বাড়ি। সাত বছর বয়সেই বাবা কোমরে গামছা বেঁধে, জলে ভাসিয়ে রেখে সাঁতার শিখিয়েছেন। বর্ষার গঙ্গায় নৌকো করে

এ-পার, ও-পার করিয়েছেন। মাঝগঙ্গায় ভীষণ বাতাসে পালের দড়ি ছিঁড়ে গেল। নৌকোর চরকিপাক। যাত্রীরা গেল গেল করে আতঙ্কে চিৎকার করছে। নৌকো প্রায় ডোবে আর কি! পালের দড়ি বাঁধা কোণটা ঝোড়ো হাওয়ায় ফটাস ফটাস করে ছইয়ের ওপর আসছে আর ফিরে ফিরে যাচ্ছে। বাবা আর আমি ছইয়ের ওপর বসে ছিলুম। দড়িটা বারে বারে এসে ঝাপটা মেরে যাচ্ছে। পড়ে যাবার ভয়ে আমি গলুইয়ের একটা বাঁশ প্রাণপণে ধরে আছি। মনে মনে ভাবছি, আজই শেষ। যতই সাঁতার জানা থাক, এই উত্তাল নদীতে পড়লেই সব শেষ। বাবা গুনগুন করে গান গাইছেন। যেন ফুরফুরে বাতাসে পানসি চেপে বেড়াতে চলেছেন! নৌকোর যাত্রীরা যখন ভয়ে আধমরা, মড়াকান্না শুরু করে দিয়েছে, বাবা খপ্ করে ডান হাত বাড়িয়ে দড়িটা ধরে ফেললেন। তখন মাঝিরা চিৎকার করছে, বাবু ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন, রাখতে পারবেন না। পাল ততক্ষণে ফুলে উঠেছে ভরা বাতাসে। নৌকো ডান দিকে কাত হয়ে তীরবেগে এগোচ্ছে পাড়ের দিকে। হরিশঙ্কর অক্লেশে ধরে আছেন পালের দড়ি। হেড মাঝি এগিয়ে এসে দড়িটা কোনওরকমে খোঁটার সঙ্গে বেঁধে দিয়ে বললে, মানুষের এমন শক্তি আমি দেখিনি। বাবু আপনি দেবতা। পরে বাবাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম, কি করে এমন করলেন? সোজা বললেন, মনের জোরে। আমার দুঃখটা কোথায় জানেন দিদি, আমি বাবার নখের যোগ্য নই। কিছুই আমি নিতে পারিনি।'

দূরে গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। হরিশঙ্কর আর মোহন আসছেন। বিমলাদি তাড়াতাড়ি শরীর ঢাকলেন। আমাদের লক্ষ্যও করলেন না। সোজা নেমে গেলেন পুকুরে। হরিশঙ্কর প্রশ্ন করলেন, 'মাছ ছেড়েছ?'

মোহন বললেন, 'আছে কিছু।'

'কিছু কেন? ভাল করে চাষ করো না কেন? মোহন তোমার সবই আছে, প্ল্যানিং-এর অভাব। ইচ্ছে করলে তুমি রুপোর থালায় ভাত খেতে পার।'

'আমার আপনার মতো একজন গুরু দরকার।'

'জানো তো কর্তাভজা সম্প্রদায়ে মন্ত্র দেবার সময় গুরু বলবেন, এখন থেকে মন তোর। নিজের মন নিজে সামলাও। মনকে এগিয়ে নিয়ে যাও। মনই সব। মনেই সব। ওই একই কথা তোমাকেও আমি বলছি—মন তোর।'

ঝপাঝপ স্নান সেরে উঠে এলেন দু'জনে। যাওয়ার সময় হরিশঙ্কর আমাদের বলে গেলেন, 'একটু আধটু তেল-কালি থাকে থাক না। তাড়াতাড়ি সেরে নাও। তোমার তো আবার হাঁচিকাশির ধাত।'

একের পর এক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গান বেজে যাচ্ছে দূরের সেই মেলায়। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। যখন আমাদের পরিবার সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে বসেছে, সেই সময়, যেন চোখের সামনে দেখতে পেতুম। অধ্যবসায়ী এক মালী উবু হয়ে বসে আছে। এক খণ্ড জমি। লোমশ হাত দিয়ে খুঁটে খুঁটে একটি একটি করে ঘাস তুলে যাচ্ছে। হরিশঙ্করের অবাক প্রশ্ন, 'তুমি কে?' উত্তর, 'আমি মৃত্যু।' প্রশ্ন, 'তুমি কি করছ?' 'আমি নির্মূল করে দিচ্ছি। শুধু দুটি মাত্র ঘাসের ডগা থাকবে। পিতা আর পুত্র।' 'কেন?' 'বিধির বিধান।' হরিশঙ্কর পাথরের মতো মুখে বলতেন, 'তবে তাই হোক।' সন্ধ্যার ছায়ান্ধকারে, প্রকৃতি যখন দিবসের তীক্ষ্ণ রেখা হারিয়ে ক্রমশই নরম তলতলে হয়ে আসত, হরিশঙ্কর তখন গাইতেন, 'সন্ধ্যা হল গো—ও মা, সন্ধ্যা হল, বুকে ধরো/ অতল কালো স্নেহের মাঝে ডুবিয়ে আমায় স্নিগ্ধ করো। ফিরিয়ে নে মা, ফিরিয়ে নে গো—সব যে কোথায় হারিয়েছে

গো... ।' হঠাৎ একদিন গা ঝাড়া দিয়ে উঠলেন, তবে রে ষড়যন্ত্র ! দয়া ! তোমার দয়া কে চায় ! কে তুমি ! তুমি কার প্রভু ! আই চ্যালেঞ্জ ইওর অথরিটি। মন্দিরে মন্দিরে অসহায় মানুষের সেবা নিচ্ছ, ইউ লাইফলেস গড। মানুষ কেঁদে ভাসাচ্ছে। মাথা ঠুকে ঠুকে ফুলিয়ে ফেলছে। বাঁচাও বাঁচাও চিৎকার। উত্তরের বারান্দায় পিতা হরিশঙ্কর বিসর্জনের রঘুপতির মতো পায়চারি করতেন আর বলতেন, 'কোথাও সে নাই। ঊর্ধ্বে নাই, নিম্নে নাই, কোথাও সে নাই, কোথাও সে ছিল না কখনো।' সেই সময় হরিশঙ্করের একটা হাত ধরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, আর একটা হাত শেকসপীয়ার। একদিন আমাদের ঠাকুরঘরে মাতামহের পূজিত তারা মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ আবৃত্তি শুরু করলেন, 'দেখো, দেখো, কি করে দাঁড়িয়ে আছে, জড়/ পাষাণের স্তূপ, মূঢ় নির্বোধের মতো/ মূক, পঙ্গু, অন্ধ ও বধির ! তোরি কাছে/ সমস্ত ব্যথিত বিশ্ব কাঁদিয়া মরিছে !/ পাষাণ চরণে তোর, মহৎ হৃদয়/ আপনারে ভাঙিছে আছাড়ি। হা হা হা !/ কোন্ দানবের এই ক্রূর পরিহাস/ জগতের মাঝখানে রয়েছে বসিয়া/ মা বলিয়া ডাকে যত জীব, হাসে তত/ ঘোরতর অট্টহাস্যে নির্দয় বিদ্রূপ।' মূর্তি তুলে গঙ্গার জলে ফেলতে গিয়েছিলেন, মাতামহ ছুটে এসে বোঝাতে লাগলেন, 'মূর্তিতে কিছু নেই, আছে মানুষের বিশ্বাসে। একটা মূর্তি বিসর্জন দিয়ে কি হবে ! হাজার হাজার মানুষের মন থেকে যুগসঞ্চিত বিশ্বাস কি উৎপাটন করতে পারবে ?' হরিশঙ্কর ভাবলেন, হরিশঙ্কর শান্ত হলেন। অ্যালকোহলিকের মতো হয়ে উঠলেন ওয়ার্কোহলিক। কাজ, শুধু কাজ। কত রকমের কাজ আবিষ্কার করা যায় প্রতিভা সেইদিকে খেলে গেল।

দামোদরের তীরে এই সন্ধ্যা একে একে আমাকে সেই অতীত ফিরিয়ে দিতে লাগল। একটি মানুষের একক সংগ্রামের ইতিহাস। আমার অতীত কিছু নেই। অজগরের পৃষ্ঠে আরোহন করে পিণ্টু নামক ভেকের ভ্রমণবৃত্তান্ত। একেবারে অর্থহীন একটা জীবন। ঝকঝকে মানিব্যাগ। খোলো, একটাও নোট নেই। একটা বাসের টিকিট। চালক হরিশঙ্কর। জানালার ধারে বসে থাকা আমি এক সুখী যাত্রীমাত্র।

ভাবালুতা চটকে গেল। হঠাৎ হরিশঙ্কর সেনানায়কের মতো হুঙ্কার ছাড়লেন, 'উঠাও গাঁঠরি।' ছোটদাদু চোখ বুজিয়ে বসেছিলেন। চোখ না খুলেই প্রশ্ন করলেন, 'কি বলতে চাইছিস ? বাংলায় বল।'

হরিশঙ্কর বললেন, 'ভীষণ ঘাস ঘাস লাগছে। একটা আইডিয়া খেলে গেল। শুধুই কর্তব্য আকর্ষণ শূন্য। আমরা একটা জায়গায় যাবো। এর মধ্যে বাড়তি কোনও আকর্ষণ আছে ?'

ছোটদাদু বললেন, 'কেন নেই ? নতুন জায়গা, নতুন দৃশ্য, নতুন মানুষ।'

'এর বেশি কিছু আছে ?'

'না।'

'আমি আরো কিছু আকর্ষণ ঢোকাতে চাই।'

'কি ভাবে ?'

'আমি এই যাওয়াটাকে করে তুলব আকর্ষণীয় এক অ্যাডভেঞ্চার। এখনি আমরা বেরিয়ে পড়ব। এই অন্ধকার রাত, বনের পথ, ডাকাতের ভয়। সারা রাত আমরা হাঁটব। ভয়ে একজনের বুক ঢিপ্‌ঢিপ্ করবে।'

'কার, আমার ?'

'তোর বুক ? ওটা তো পাথরের বেদী। ভয় করবে আমার পুত্রের। ভাগ্য প্রসন্ন হলে

ডাকাতের কবলেও পড়তে পারি। ডাকাত, ডাকাতি, চিরকাল শুনেই এসেছি। একটা অভিজ্ঞতা হোক না। ইংরেজিতে একটা কথা আছে হ্যান্ডলিং। ব্যবহারবিধি। স্টোভ, বন্দুক, ক্যামেরা, টেলিস্কোপ, ঘড়ি, এক-একটা জিনিস এক-এক কায়দায় নাড়াচাড়া করতে হয়। ডাকাতকে কি ভাবে হ্যান্ডল করতে হয়, সেটা আমরা শিখতে পারব। তুই কোনও দিন ডাকাতের পাল্লায় পড়েছিস ?'

'না, উল্টোটা হয়েছে। ডাকাত আমার পাল্লায় পড়েছে। তারাপীঠে আমার আস্তানায় এসে কান্নাকাটি। বাবা ভাল করে দাও। ডাকাত বলে তো পীর নয়! আমরা ডাকাতকে ভয় পেতে পারি, ব্যাধি তো আর ডাকাত পুলিশ মানে না। দু'পক্ষকেই ধরে। একপাশে থানাদার বসে আছে, পেটে ক্যানসার। আর একপাশে ভৈরব ডাকাত, ডান অঙ্গে প্যারালিসিস।'

হরিশঙ্কর বললেন, 'নে উঠে পড়। রাতের জঙ্গল একটা দেখার জিনিস। শজারুর নাচ দেখেছিস ?'

'কি শজারু দেখাচ্ছিস, শেষ রাতে চাঁদের আলোয় শেয়ালের নাচ দেখেছিস ?'

'তুই হনুমানের ধ্যান দেখেছিস ?'

'তুই রাতচরা রাজহংস দেখেছিস ?'

উতোর-চাপান আরো কতদূর এগোতো কে জানে ? সামনে এসে দাঁড়ালেন পণ্ডিতমশাই। একেবারে রাজবেশ। গরদের ধুতি-পাঞ্জাবি। ভুর ভুর আতরের গন্ধ। চোখে কাজল। মুখে পাউডার। সবিনয়ে বললেন, 'এই আমার অভিসারের সময়। নিজেকে প্রস্তুত করে রাখতে হয়। বলা তো যায় না, দেখা তো হয়ে যেতে পারে, প্রস্তুত ছিলাম না বলে ফিরে চলে গেলে দুঃখের সীমা থাকবে না।'

হরিশঙ্কর বললেন, 'কার অভিসারে চলেছেন ? শ্রীরাধিকা ?'

পণ্ডিতমশাই বসতে বসতে বললেন, 'গণিতজ্ঞ হয়ে ধরতে পারলেন না ? আমি বৈদান্তিক, জ্ঞানমার্গী। মধুর রসের পথ আমার পথ নয়। মৃত্যুর অভিসার। ভোলানাথ আমার চোখ খুলে দিয়েছে।'

ছোটদাদু বললেন, 'কোন ভোলানাথ ? উমার স্বামী ?'

'না মহামান্য। গোয়ালা ভোলানাথ, যে আমাকে নিত্য আধসের করে দুধ সরবরাহ করত। সেই ভোলানাথ সদাসর্বদাই এই জেলার বিখ্যাত গামছা পরিধান করে থাকত। অর্থের অভাব ছিল না ; কিন্তু কৃপণ। বার বার বলেছিলুম, ভোলা ব্যাটা, তোর টাকা খাবে কে। সন্ধেবেলায় একটা ধুতি পরার মতো দয়ালু হ না। দিবা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত গামছা সহ্য করা যায়। তারপর নৈব চ। ভোলা গামছা পরেই মারা গেল। কি অগৌরবের কথা। গামছা, ফতুয়া, পকেটে বিড়ির ডিবে। পুষ্পক রথে আরোহণ করে স্বর্গে যায় কে ? ভোলা গোয়ালা। স্বর্গের সিংহদুয়ারে অপ্সরাগণ লজ্জায় অধোবদন।

বিষ্ণুপদ মাঠে প্রাতঃকৃত্য করতে করতে চলে গেল। কি অগৌরবের কথা! মানুষ বলে কি আমাদের কোনও মানসম্মান থাকতে নেই মৃত্যুর কাছে! তাই আমার এই রাজবেশ। রজনীতেই আমার মৃত্যু হবে। তারকারাজির পথ বেয়ে চলে যাবে আমার স্বর্গীয় শকট।'

ছোটদাদু বললেন, 'কেমন বৈদান্তিক! মৃত্যুর কথা ভাবছেন ?'

'ভাবব না! মৃত্যুই যে আমাকে ঝকঝকে নতুন, সুন্দর পোশাক দেবে। এই শততালি প্রাচীন পোশাক তো আর চলে না। জীর্ণ হয়েছে। আমি এখন তাম্বুলসেবা করব।

আমার বিমলা মা কোথায় !'

পণ্ডিতমশাই ডাকলেন, 'বিমলা মা।' উত্তর এল, 'যাই বাবা।'

পণ্ডিতমশাই বললেন, 'আসুন সুধিজন, আমরা বিচারে বসি। বিষয় আপনারাই নির্বাচন করুন।'

হরিশঙ্করের মুখে চোখে বুদ্ধির বিদ্যুৎ আভাস। এতক্ষণ বড় বোদা হয়েছিলেন। গণিত, জ্যামিতি, পরিমিতি থেকে দূরে। একদল সহজ-সরল মানুষের অতি সাধারণ জগতে। এখন সামনেই ন্যায় ও দর্শনের এক পণ্ডিত। বুদ্ধির ঘষাঘষির অপূর্ব সুযোগ উপস্থিত। জন্ম আর মৃত্যুর মাঝখানে এই জীবন উপত্যকায় মানুষ কি দর্শন করে ? কাকে দর্শন করে ? হঠাৎ রবীন্দ্রনাথ আমাকে ছুঁয়ে গেলেন। এই মুহূর্তে কেউ যদি আমাকে গাইতে বলতেন, আমি গেয়ে উঠতুম :

তার হাতে ছিল হাসির ফুলের হার কত রঙে রঙ-করা।
মোর সাথে ছিল দুখের ফলের ভার অশ্রুর রসে ভরা ॥

৪১

If you ever need a helping hand
You will find one at the end of your arm.

অতিশয় ভরসার কথা। বনপথে, গভীর রাতে আতঙ্ক বুকে নিয়ে সেই অচেনা গ্রামের দিকে আর যেতে হবে না। পণ্ডিতমশাই হঠাৎ কামজয়ের প্রসঙ্গ পেড়েছেন। একটু আগে বেশ একটু মজা হল, দুগ্ধধবল একটি গাভী কোথা থেকে হটরপটর করে উঠানে এসে দাঁড়াল। ছোটদাদু দেখেই বললেন, 'এই যে এসেছ, তোমাকেই আমি স্মরণ করছিলুম মা।'

গরু অমনি আমুদে চোখে ছোটদাদুর দিকে তাকিয়ে গদগদ একটি ডাক ছাড়ল, 'হাম্বা'।

ছোট দাদু বললেন, 'হ্যাঁ মা।'

গরু বললে, 'হাম্বা'।

মা আর হাম্বা এই চলতে লাগল। সে এক অপূর্ব ঐকতান। সন্ধ্যার মগ্ন পরিবেশ চনমন করে উঠল। মহামায়ার পূজার ঘণ্টার টিংলিং শব্দ। বিমলাদির উনুনের ধোঁয়া পাকিয়ে পাকিয়ে আকাশমুখী। পাতার ফাঁকে ধকধকে সন্ধ্যা তারা। আমরা নিঃস্তব্ধ। মানুষে আর পশুতে অদ্ভুত বাক্যালাপ।

বিমলাদি ছুটে এলেন, ব্যাপারটা কি। তাঁদের গরু তো কোনওদিন এমন উল্লাসে ডাকাডাকি করে না। আজ কি হল?

তাঁর বিস্ময় প্রশ্ন হবার আগেই ছোটদাদু বললেন, 'তোমরা বুঝবে না মা, আমাদের অন্তরের কথা কিছু হল। ওর সবটাই তো মা। দুগ্ধবতী জননী আমার। যাও দুধ দোয়ার ব্যবস্থা করো। তারপর ভর্তি এক গেলাস চা।'

ছোটদাদু গরুকে বললেন, 'যাও মা আজ একটু বেশি দুধ দিও, বাড়িতে অনেক অতিথি।' গরু আহ্লাদের শেষ ডাকটি ডেকে গোয়ালের দিকে চলে গেল হেলতে দুলতে, ভার ভরন্ত চালে।

এই ঘটনা দেখে পণ্ডিতমশাই মুগ্ধ হয়ে বললেন, 'আপনি অবশ্যই সাধনজগতে অগ্রসর হয়েছেন। শ্রবণ, দর্শন, আস্বাদন ইত্যাদি হয়েছে। আচ্ছা বলতে পারেন, কাম কি জয় করা যায়? কামই তো বড় শত্রু।'

হরিশঙ্কর সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'আজ্ঞে না, যায় না। ঈশ্বর যদি কোথাও থাকেন, তিনিও তা চান না, কারণ তাহলে তাঁর যাবতীয় পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে। কামই মানুষের জাগ্রত

অবস্থা।'

পণ্ডিতমশাই সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'হল না। নিদ্রাতেও কাম। কিছু করতে চাওয়াটাই কামনা। স্বপ্ন কামোত্থিত।'

হরিশঙ্কর বললেন, 'মানুষের জাগ্রত অবস্থা ও নিদ্রিত অবস্থার মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। চেতনা নিদ্রিত হয় না। ঢেউ থাকলেও সমুদ্র, না থাকলেও সমুদ্র। জল আর বরফে যে তফাৎ তা আমাদের দৃষ্টিতে। বুদ্ধিতে দুই সমান। জলই বরফ, বরফই জল। একমাত্র মৃত্যুতেই চিরনিদ্রা, চেতনার মৃত্যু। আমাকে জাগতে হবে এই কামনা নিয়েই মানুষ নিদ্রিত হয় আর ঠিক সময়ে জেগে ওঠে। কেন জাগতে হবে? সে এক কামনাপুঞ্জ, জীবিকা অর্জন করতে হবে, আহার করতে হবে, শরীরের চর্চা করতে হবে, শরীর রক্ষা করতে হবে। নিজের নিরাপত্তার তাগিদেই জাগরণ। এইবার আপনি খণ্ডন করুন।'

পণ্ডিতমশাই স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। অবশেষে বললেন, 'মহাশয়, আপনি তো প্রকারান্তরে আমাকেই সমর্থন করলেন। আমি শুধু মানুষের দুটি অবস্থাভেদের কথা বলেছিলুম, জাগ্রত সচল অবস্থা, নিদ্রিত অচল অবস্থা। আপনি সে-দুটিকে এক করে দিলেন। বেশ দিন। কিন্তু মূল প্রশ্ন, কাম কি জয় করা যায়? তা রয়েই গেল।'

'না যায় না। অসাধ্য।'

পণ্ডিতমশাই ছোটদাদুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি মহাসাধক। আপনার অভিমত?'

ছোটদাদু বললেন, 'তার আগে সমাধান করুন নিদ্রা কাকে বলে, জাগরণ কাকে বলে?'

পণ্ডিতমশাই বললেন, 'চেতনার আচ্ছন্ন অবস্থাই হল নিদ্রা। নিদ্রার দুটি ভেদ, ক্লান্তিতে নিদ্রা আবার মোহনিদ্রা। বিচার যেখানে অবসিত। এসবই হল তামসিক নিদ্রা। এর পাশেই আছে যোগনিদ্রা। অর্থাৎ চেতনা জাগ্রত অবস্থা থেকে অধোগমন করলে তামসিক, ঊর্ধ্বগমন করলে যোগারূঢ়। অর্থাৎ সমুদ্রে যদি তলিয়ে যাই তাহলে এক আর যদি মহাকাশে উড়ে যাই, তাহলে আর এক। অর্থাৎ দুটি অবস্থাই বাস্তবচ্যুত অবস্থা। একটি অন্ধকার, অন্যটি আলোকিত। একটিতে তামসিক অভিজ্ঞতা অন্যটিতে সাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা। অর্থাৎ নিদ্রা হল দেহগত চেতনার নিমজ্জন অথবা অতিজাগরণ। অর্থাৎ...।'

হরিশঙ্কর বললেন, 'অর্থাৎ নিদ্রা হল স্লিপ। একটা বিছানা, একটা বালিশ, এক গেলাস জল খেয়ে পা তুলে শুয়ে পড়। নিদ্রা দু' রকমের, এক নাক ডাকিয়ে ঘুম, আর এক নিঃশব্দে ঘুম। পেট গরমে স্বপ্ন, পেট ঠাণ্ডায় নিঃস্বপ্ন? মিটে গেল ঝামেলা।'

ছোটদাদু বললেন, 'শয়ন, অর্থাৎ শ-এ অন। অর্থাৎ অন শ। শ মানে চিতা। অর্থাৎ চিতায় ওঠার নাম শয়ন। শয্যা হল অস্থায়ী মৃত্যুর চিতা। আর শ্মশানে মহানিদ্রার চিতা। আমাদের তন্ত্রে শয্যা হল শ্মশান। সেই কারণে শয্যায় সাধনের বিধান।'

হরিশঙ্কর বললেন, 'আমাদের কর্মতন্ত্রে, নিদ্রা হল তামসিকতা। নিদ্রা হল আলস্য। ব্যাড হ্যাবিট। অনেকে জেগেও ঘুমোতে পারে।'

'এইবার এস বৎস, কামনা বাসনার নিদ্রার অর্থ হল যোগভূমিতে জাগরণ; সাধকের উঠে বসা।' ছোটদাদু বললেন।

পণ্ডিতমশাই বললেন, 'এই কামনা বাসনার নিদ্রা কেমন করে সম্ভব?'

হরিশঙ্কর বললেন, 'খুব সহজ, একটা ল্যাঙ্গোট পরুন। দুটো থান ইট একহাত এক বিঘত দূরে স্থাপন করে পঞ্চাশবার ডন, দরজার একটি পাল্লা ধরে একশোবার বৈঠক। এতেও যদি মন উসখুস করে তাহলে পঞ্চাশবার মুগুর ভাঁজুন, মনের তামসিকতা দূর হয়ে

যাবে। এতেও যদি না যায়, কুড়ুল দিয়ে কাঠ চেলা করুন।'

পণ্ডিতমশাই বললেন, 'অতিশয় দানবীয় পদ্ধতি। বুদ্ধিমান মানবীয় পদ্ধতির কথা জানতে চাই।'

ছোটদাদু বললেন, 'সে পথ হল বিচারের পথ। বিচার করুন। প্রথম বিচার, কে চায়?'

পণ্ডিতমশাই : 'আমি চাই।'

ছোটদাদু : 'কোন্ আমি?'

পণ্ডিতমশাই : 'অহং, অর্থাৎ যে আমি দেহবোধ জাগায়।'

ছোটদাদু : 'তাহলে ভোগ করতে চায় দেহ। দেহের ক্ষমতা কতটুকু! এইখানেই বিচারের শুরু। দেহের পক্ষে কতটুকু কতদিন ভোগ করা সম্ভব!'

হরিশঙ্কর : 'অর্থহীন আলোচনা। এই আত্ম-প্রশ্ন মানুষের সামনে ঝুলিয়ে রেখেছেন মহামানবেরা অনাদিকাল ধরে। সো হোয়াট, তাতে আমাদের বয়েই গেল। যতটুকু ভোগ সম্ভব, ততটুকুই করব, যতটুকু করা যাবে না, তার জন্যে আক্ষেপ করব। লালচ বুড়ি বালাই, জেনেও লালসায় ঘি ঢালব। তোরা যে যা বলিস ভাই, আমার সোনার হরিণ চাই ॥ মনোহরণ চপলচরণ সোনার হরিণ চাই॥ এই হল সাধারণ মানুষ; কিন্তু অসাধারণ রবীন্দ্রনাথ কোথায় গেলেন? শোনো তা হলে, তোরা পাবার জিনিস হাটে কিনিস, রাখিস ঘরে ভরে। যারে যায় না পাওয়া তারি হাওয়া লাগল কেন মোরে!! এই হাওয়াটা কে লাগাবে ভাই? যে হাওয়া গায়ে লাগলে রবীন্দ্রনাথের মতো বলা যায়, আমি আছি সুখে হাস্যমুখে, দুঃখ আমার নাই। আমি আপন-মনে মাঠে বনে উধাও হয়ে ধাই!! নিজের ভেতর থেকে কামনা বাসনার অন্ধ প্রকোষ্ঠ থেকে নিজেকে বের করে এনে উধাও করে দাও। সিনেমার হিরো- হিরোইনের মতো টুলুলুলু করে গাছের ফাঁকে ফাঁকে নাচানাচি নয়, মনে মুক্তি। মহামান্য নৈয়ায়িক পাত্রাধার তৈল কি তৈলাধার পাত্র এবম্বিধ বিচারে অশ্বডিম্ব হবে। বসে বসে নিতম্ব ভারি না করে আসুন নৃত্য করি। ফক্সট্রট ট্যাঙ্গো, কোনটা আপনি জানেন?'

পণ্ডিতমশাই : 'মহামান্য! আমি আপনাকে ঠিক চিনতে পারছি না। আপনি কি আমার সঙ্গে রসিকতা করছেন?'

ছোটদাদু : 'অবশ্যই নয়। যত মত তত পথ। মূল কথা হল ভুলে থাকা। ভাবে থাকা। ঘোরে থাকা। ও ওর নিজের ভাবে, নিজের ঘোরে আছে। পথ খুঁজে পেয়েছে। ওর কোনও কামনা বাসনা নেই। মায়ামুক্ত অঘোর।'

হরিশঙ্কর : 'মোটেই না। কামনা বাসনায় জরজর হয়ে আছি। সবচেয়ে বড় কামনা ছেলেটা যেন আমার মানুষ হয়। ছোট কামনা এখনো কেন চা আসছে না।'

ছোটদাদু : 'ওটা কামনা নয় আকাঙ্ক্ষা। দুটোই তোমার আত্মিক চাওয়া। না পেলে তুমি পাগল হবে না, পেলে তোমার একটাই লাভ, আত্মিক তৃপ্তি। যাকে আমরা ভোগ বলি তাতে তৃপ্তি নেই, শুধুই অতৃপ্তি। আত্মিক সুখে তৃপ্তি, দেহসুখে অতৃপ্তি।'

বিমলাদি একটা থালার ওপর চারটে গেলাস সাজিয়ে আসরে প্রবেশ করলেন। প্রায় নাচের ভঙ্গিতে। ছোটদাদু বললেন, 'এসেছে, এসেছে। বহু প্রতীক্ষিত সেই চা এসেছে।' হরিশঙ্কর তাড়াতাড়ি উঠে, থালাটা ধরে নিলেন। ছোটদাদু বললেন, 'পিন্টু কাজটা তোমারই করা উচিত ছিল।'

'বাবা এত তাড়াতাড়ি উঠলেন যে আমি হেরে গেলুম।'

হরিশঙ্কর বললেন, 'একেই বলে রিফ্লেক্স। ওর একটু তা না নানা স্বভাব। স্লাগিশ।'

বিমলাদি বললেন, 'আপনি আমার ভাইটাকে কেবল বকেন।'

হরিশঙ্কর বললেন, 'যুবক হবে চিতাবাঘের মতো। তীরের মতো, ইস্পাতের মতো। স্প্রিংয়ের মতো। সনি লিস্টনের মতো।'

ছোটদাদু চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন 'চমৎকার।' তারপর হরিশঙ্করকে বললেন, 'সনি লিস্টনকে টানলি কেন?'

হরিশঙ্কর গেলাসের গোলে পড়ে গেছেন। একটা গেলাসে সাদা দুধ। বিমলাদি বললেন, 'ওটা পণ্ডিতমশাইয়ের দুধসাবু।'

হরিশঙ্কর হাসিতে ফেটে পড়লেন, 'দুধসাবু! রোগীর খাদ্য শিশুর পথ্য! চা খেলে কি হত পণ্ডিতমশাই?'

'আমি যে চায়ে অভ্যস্ত নই।'

'ঠিক আছে, আজ যখন হয়েছে খেয়ে দেখুন না, ভেষজ পদার্থ।'

'যকৃৎ খারাপ হয়ে যাবে।'

'হায় নৈয়ায়িক! এখনো ভয়! খান, সাবু খেয়ে আরো একশো বছর বাঁচুন।'

পণ্ডিতমশাই কাতর কণ্ঠে বললেন, 'মহাশয় জীবনের আকাঙ্ক্ষা আমার নেই। আপনার পুত্রের মতো, আমার একমাত্র পুত্রটি চলে গেল। স্ত্রী গত। জননী আজও জীবিত। দুটি সেবার কারণে এই অক্ষম জীবন ধারণ, জননীর সেবা ও শাস্ত্রসেবা। এই দুধসাবুটুকুই আমার রাতের আহার। আমার বিমলামায়ের ব্যবস্থা। আরো একটু আছে। যাওয়ার সময় সেইটুকু নিয়ে যাবো। আমার মা খাবেন। এর মধ্যে আমার কোনও বাঁচার আকাঙ্ক্ষা নেই। আমি যেতেই চাই।'

হরিশঙ্কর কিছুমাত্র অপদস্ত না হয়ে বললেন, 'পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলেন পণ্ডিতমশাই।'

পণ্ডিতমশাই বললেন, 'পরীক্ষা? আমাকে আপনি কি পরীক্ষা করছিলেন?'

'আপনি জীবনের সত্যে উপনীত হতে পেরেছেন কি না! কতটা স্বাবলম্বী আপনি? আপনার ব্যক্তিত্বের তন্তুটি যথেষ্ট দৃঢ় কি না! দেখলুম না, আপনার মান ও অভিমান দুটিই প্রখর, যথেষ্ট রোমান্টিক। আপনার হরমোন বিভাজনে স্ত্রী হরমোনের প্রাচুর্যই বেশি। ন্যায়, বেদান্ত, স্মৃতি, শ্রুতির পরিবর্তে, কাব্য, অলঙ্কার, রসশাস্ত্র প্রভৃতির মধ্যে আপনার বিচরণ বাঞ্ছনীয় ছিল। মানুষের মধ্যে জাতিতে আপনি লতা, বৃক্ষ নন। আপনি অবলম্বন খোঁজেন। আপনি দুঃখবিলাসী। সহানুভূতিভোজী। সর্বোপরি আপনার ভোগবাসনার নিবৃত্তি হয়নি। আপনার উচিত এই সাধক, ওই যে চায়ের গলাসে নিরাসক্ত চুমুক দিচ্ছেন, আর মৃদু মৃদু হাসছেন, ওর শরণ নেওয়া। জীবনের অবশিষ্ট পথ কোন্ যষ্টি অবলম্বন করে হাঁটবেন, কি ভাবে সত্যদর্শন হবে, ওই মহাপুরুষই বলতে পারবেন। হয়তো আপনার কারণেই তাঁর এই আকস্মিক আগমন। আপনি কষ্টে আছেন পণ্ডিতমশাই। আপনি আপনার কোনও একটি অপরাধ ভুলতে চাইছেন।'

ছোটদাদু হাসতে হাসতে বললেন, 'কাছাকাছি যেতে পেরেছিস হরিশঙ্কর। এক একটা মানুষ হল অনধিত এক একটা বই। শুধু মাত্র মলাটটা আমরা দেখতে পাই। নাম লেখা। ভেতরে অধ্যায়ের পর অধ্যায়, ঘটনার ঘনঘটা। তুমি মলাটের ভেতর কিছুটা ঢুকতে পেরেছো। এঁর জীবনের চারটি অপরাধ, স্ত্রীর প্রতি অবহেলা, কৃপণতার জন্যে পুত্রের মৃত্যু, যৌবনে মাতাকে অসম্মান, অবশেষে এক বিধবার সম্পত্তি গ্রাস। এ ছাড়া কোনও এক সময় গোপনে গণিকাগমন ও মদ্যপান।'

পণ্ডিতমশাই কোনওরকমে গেলাসটি নামিয়ে রেখে থরথর করে কাঁপতে লাগলেন। মুখে ভয়ঙ্কর এক যন্ত্রণার ছায়া। ভীষণ খারাপ লাগল। কেন ছোটদাদু এমন করেন। শক্তি আছে বলেই কি যেখানে সেখানে তার অপপ্রয়োগ করতে হবে। কি প্রয়োজন ছিল মানুষের ভেতর থেকে মানুষকে টেনে বের করার। বেশ তো হচ্ছিল দাবাখেলার মতো কথার খেলা। মগজের চালাচালি। পণ্ডিতমশাইকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলুম। ভীত পশুর মতো কাঁপছেন।

ছোটদাদু বললেন, 'মন আর মুখ এক করবেন। মা বললে জননীই ভাববেন। শুধু শরীর নয়, মনেও ভোগ হয়। রমণের চিন্তাতেও রমণ হয়। স্বপাকে স্বর্গলাভ হয় না, স্ববশে হয়। জীবনদীপ নির্বাপিত হবার প্রাক্ মুহূর্ত পর্যন্ত নারীসম্ভোগ ইচ্ছা থাকে। জীব যোনিসম্ভূত। অবচেতনার গভীরে সেই চেতনা সুপ্ত। আপনি কি করবেন আমিই বা কি করব ? বারে বারে প্রশ্ন করছিলেন কামজয়ী কি হওয়া যায় ? অর্থাৎ ওই রিপুটি প্রৌঢ়কেও পীড়া দিচ্ছে। যায় না মহামান্যে। মহাভারতকার কি বলছেন ? ইন্দ্রিয়ানাঞ্চ পঞ্চানাং মনস্যে হৃদয়স্যচ। মনে পড়ছে পণ্ডিতমশাই ভীমসেন বলছেন যুধিষ্ঠিরকে। রূপাদি বিষয়ে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন ও বুদ্ধির যে প্রীতি, যে ভাললাগা তারই নাম কাম। ধর্ম, অর্থ, কাম জীবনে তিনটির উপাসনাই প্রয়োজন। সেইটাই বাস্তব পরামর্শ। শুধু ধর্ম শুধু অর্থ শুধু কাম এক ধরনের অসুস্থতা, অস্বাভাবিকতা। মানুষের একটি দিনকে তিন ভাগ করার পরামর্শ দিয়েছেন বেদব্যাস। ধর্মং পূর্বে ধনং মধ্যে জঘন্যে কামমাচরেৎ। দিনের প্রথম ভাগে কর্ম। কর্ম অর্থে ধর্মকর্ম। মধ্যম ভাগে অর্থ, অন্তিমভাগে কাম। এই হল প্রতিদিনের অনুশাসন। কিন্তু কতদিন ? বেদব্যাস বলছেন, আয়ুকেও ভাগ কর। সেখানে কি ? কামং পূর্বে ধনং মধ্যে জঘন্যে ধর্মমাচরেৎ। পণ্ডিতমশাই বিধান বদলে গেল। যুবাবস্থায় কাম, প্রৌঢ়াবস্থায় অর্থ, আর বৃদ্ধাবস্থায় ধর্ম। আপনার জীবন কি সেইভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে ? আপনি আফিং সেবা করেন কেন ?'

পণ্ডিতমশাই আবার চমকালেন। ভয়ে ভয়ে বললেন, 'আমার বংশের ধারা।'

'আপনি জ্ঞানী। আপনি তো জানেন আফিং-এ বুদ্ধিনাশ হয়।'

'আমার ভ্রম, আমি যৌবনকে স্থায়ী করতে চেয়েছি। আমি কামাসক্ত পণ্ডিত।'

ছোটদাদু বললেন, 'আপনার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। আর কয়েকটা বছর মাত্র। কবে তা আমি জানি, কিন্তু বলা নিষেধ। আর কৃপণতায় কি কাজ। দু'হাতে মায়ের সেবায় ব্যয় করুন। প্রতিদিন একবার করে মৃত্যু চিন্তা করবেন। মনে মনে গাইবেন, দিন যে আগত দেখি। আর করবেন দেহভ্রমণ। সেটা কি ? আসনে স্থির হয়ে বসবেন। মেরুদণ্ড সোজা। দেহ শিথিল। ভাববেন আপনি নগ্ন। চোখ মুদিত। প্রথমে চিন্তা করবেন, এই আমার পা, এই আমার শিথিল লিঙ্গ, উদর, বক্ষ, গলা, দুটো জরাগ্রস্ত হাত, মুখ, মস্তক বিরলকেশ, দ্যুতিহীন দুই চোখ, দুটো কান, মনে মনে নিজের দেহের পরিমাপ করবেন, চিন্তা করবেন পরিবেশ। ঘর, বাহির, গ্রাম, নগর, বিশ্ব, মহাকাশ, বিন্দুর মতো তিলের মতো হারিয়ে যাবেন। কিসের অহঙ্কার কার সঞ্চয়, কি ভোগ, কতটুকু ভোগ। চিন্তা করবেন বিশাল এক জ্যোতিঃপুঞ্জ। অসংখ্য আলোক বিন্দুর একটি হলেন আপনি, নিমেষে বিলীন হয়ে গেলেন। এরই নাম ধ্যান। একান্তভাবে এই চিন্তায় নিমগ্ন হবেন। মনে রাখবেন তুলসীদাসজীর একটি কথা : মালা জপে শালা, কর জপে ভাই। মন্ মন্ জপে যো, ওস্‌কো বলিহারি যাই ॥ ভণ্ড মালাজপকারীকে শ্যালক বললেও ক্ষতি নেই, সংযতচিত্তে করে অর্থাৎ আঙুলে যাঁরা জপ করেন, তাঁদের ভ্রাতা বলা যায়, আর মনে মনে

যাঁরা জপাদি সাধন করেন তাঁরাই বলিহারি। পুজোর চেয়ে জপ বড়, জপের চেয়ে ধ্যান বড়। আচ্ছা, এই নিন একটা লবঙ্গ খান।'

পণ্ডিতমশাই ফ্যাল ফ্যালে মুখে বললেন, 'এখনই ?'

ছোটদাদুর চেহারা সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। বিশাল মর্মর মূর্তির মতো আকৃতি। না, কোনও চোখের ভুল নয়। সবাই দেখছেন। গম্ভীর মুখে বললেন, 'বিলম্বে লাভ কি ?'

লবঙ্গটা হাতে নিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'চিবিয়ে খাবো ?'

'কচমচ করে।'

পণ্ডিতমশাই লবঙ্গ চিবোচ্ছেন। আমি জানি, এর মধ্যে অবশ্যই কোনও রহস্য আছে, বিজ্ঞানে যার ধরাছোঁয়া পাওয়া যাবে না। লৌকিক আর অলৌকিক মিলে জীবন আর জগৎ রহস্যময়। রহস্য আছে বলেই রহস্য শব্দের উৎপত্তি। লৌকিক আছে বলেই অলৌকিক।

পণ্ডিতমশাই ঢোঁক গিলে বললেন, 'হয়ে গেল। চলে গেল পেটে। এখন কি হবে ?'

'ধীরে ধীরে কিছু একটা হবে।'

'সামান্য লবঙ্গে ?'

'মটরের দানার মতো সামান্য একটা আফিংয়ের গুলিতে কি হয় পণ্ডিতমশাই! সেটা জ্ঞাত, তাই আপনার সন্দেহ হচ্ছে না, এটা আপনার কাছে অজ্ঞাত, তাই আপনার সন্দেহ। এই হল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা। পণ্ডিতমশাই এটা কি ?'

ছোটদাদু চায়ের গেলাসটা তুলে ধরলেন।

পণ্ডিতমশাই বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কেন গেলাস।'

'আমি যদি বলি গেলাসের আকার বিশিষ্ট একটুকরো শূন্যতা!'

পণ্ডিতমশাই একটু ভেবে বললেন, 'তর্কের খাতিরে বলা যেতে পারে। আধার ও আধেয়।'

'আধার ভাঙলে কি থাকে। আধেয় অর্থাৎ শূন্যতা। এখন আকার সত্য না নিরাকার সত্য। যা ভেঙে যায়, যা থাকে না, আর না থাকার পর যা থাকে, তার মধ্যে কোনটা সত্য ও শাশ্বত!'

'যার মধ্যে বসে আছে এই সৃষ্টি বা এই সৃষ্টির মধ্যে যা আছে, অর্থাৎ যা আমাতেও আছে আপনাতেও আছে, যা এই ঘরের বাহিরেও আছে ভেতরেও আছে, তার অনুভূতি কেমন লাগে। দেখুন তো পণ্ডিতপ্রবর।'

ছোটদাদু টকাস করে একটা টুস্‌কি মারলেন।

৪২

To see a world in a grain of sand
And heaven in a wild flower
Hold infinity in the palm of your hand
And eternity in an hour.

টুসকির শব্দটা ঠিক যেন বাজ পড়ার শব্দের মতো, কড়াক। সকলেই চমকে উঠলেন। অবিশ্বাস্য। দুটো আঙুলে এমন ভয়ঙ্কর শব্দ বের করা যায়! যায় তো। এই তো ছোটদাদু করে দেখালেন। সেই শব্দে পণ্ডিতমশাই কেমন যেন হয়ে গেলেন। হরিশঙ্কর আমার কানে কানে বললেন, 'খেলা খুব জমে গেছে।'

হরিশঙ্কর এইভাবে যখন কানে কানে কথা বলেন, তখন আর পিতা বলে মনে হয় না, মনে হয় সমবয়সী প্রিয় এক বন্ধু। মুখে অদ্ভুত সুন্দর পিপারমেন্টের মতো গন্ধ। আমার গুরু স্বামী নির্মলানন্দজী আমাকে বলেছিলেন, মানুষ যখন ইন্দ্রিয় জয় করতে পারে তখন তার ভেতরটা সাত্ত্বিকভাবে ভরে যায়। তখন তার শ্বাসে, তার দেহনির্যাসে সুগন্ধ বেরোয়। হরিশঙ্কর জ্বলজ্যান্ত উদাহরণ। মৎস্যগন্ধা, পদ্মগন্ধা শোনাই ছিল। এখন হয়তো দেখছি। ছোটদাদুর শরীর থেকে সব সময় গোলাপের গন্ধ বেরোয়। অবাক অবাক সব কাণ্ড চোখের সামনে ঘটে যাচ্ছে। ধন, জন, মান নয়, সেই সব দিব্যানুভূতি লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগছে। ক্ষুদ্র সামর্থ্যে কিছুতেই ধরতে পারছি না। ছটফট করেই মরছি।

টুসকির শব্দে পণ্ডিতমশাই কেমন যেন ধোঁয়াটে হয়ে গেলেন। চোখের ভুলও হতে পারে। আমার মন দুর্বল। দুর্বল আমার স্নায়ু। কঠিন ব্যক্তিত্ব সব সময়েই আমার ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এক সময় আমি সম্মোহনকারীর প্রিয় মিডিয়াম ছিলুম। আমাকে সহজে সম্মোহিত করা যেত বলে।

মৃদু আলো। চার পাশে গাছপালা, বাতাসের ঝপর ঝপর শব্দ। ধ্যানস্থ কিছু মানুষ। দূর থেকে ভেসে আসা আরতির শব্দ। এই সব মিলিয়ে যে মায়া তৈরি হয়েছে, তারই প্রভাবে হয়তো এই রকম মনে হচ্ছে। ছোট দাদু হঠাৎ পণ্ডিতমশাইকে নিয়ে পড়লেন কেন? কৃপা করার হলে আরো তো অনেকে রয়েছেন। আমি নিজেই তো আছি। দিন না সেই শক্তি, পৃথিবীতে থেকেও যেন পৃথিবীর বাইরে চলে যেতে পারি। অন্ধকারে থেকেও যেন আলোতে সাঁতার কাটতে পারি। কতবার বলেছি। পায়ে ধরেছি। সোডার বোতল খোলার মতো অলৌকিক হাসি ছড়িয়ে বলেছেন, 'জীবনটাকে নষ্ট করিসনি। মূর্খ, অশিক্ষিত, অক্ষম গ্রাম্যলোককে আমরা বোকা বানাই, শিষ্য করি, দীক্ষা দি। ধর্ম একটা

জোচ্চুরি ব্যবসা। আগে দেখা যেত বেদের মেয়ে, পাড়ায় পাড়ায় হেঁকে যাচ্ছে, দাঁতের পুকা বের করি। ওঝা এসে ভূত ছাড়াচ্ছে। সর্পাঘাতের চিকিৎসা করছে। সব বাজে। বুজরুকি। ধাপ্পা। কলাটা, মুলোটা পাবার ধান্দা। এ সব শিক্ষিত, শহুরে মানুষের জন্যে নয়। আমরা কোয়াক। বোকাদের শ্রদ্ধেয়। আমরা ম্যাজিক দেখাই। অসহায় অশিক্ষিত মানুষ ভেল্কি দেখে ভুলে যায়। আমরা মিঠাই-মণ্ডা খেয়ে ভুঁড়ি বাগাই। আমরা চিট। আমাদের ফাঁদে পা দিও না। তোমাদের জগৎ আলাদা। চাকরি কর, সংসার কর, ঘরদোর সাজাও, বিদেশ যাও, ছেলেমেয়ে মানুষ কর। ভগবান, ভগবান করে জীবন নষ্ট কোরো না। ভগবান হলেন অশিক্ষিত, দরিদ্র মানুষের অলীকে বিশ্বাস। ভগবান কোনওদিন তোমাদের বৈঠকখানায় চা খেতে আসবেন না।'

সে প্রায় তিরস্কারের মতো। ঠেলে সরিয়ে দেওয়ার মতো। তখনই বুঝেছি, সময় হয়নি। এ জীবনে নাও হতে পারে। অসুখ। ভীষণ অসুস্থ আমি। এর নাম ভবরোগ। এ রোগ সারবে কিসে! দাওয়াই আছে। কি রকম? স্বাতী নক্ষত্রের জল পড়বে মড়ার মাথার খুলির ওপর। সেই জল একটা ব্যাঙ খেতে যাবে। সেই ব্যাঙকে একটা সাপে তাড়া করবে। ব্যাঙকে কামড়াতে গিয়ে সাপের বিষ ওই মড়ার মাথার খুলিতে পড়বে, আর সেই ব্যাঙটি পালিয়ে যাবে। সেই বিষজলের একটু খেতে হবে।

এ তো অসম্ভব। না অসম্ভব নয়। ঈশ্বরের শরণাগত হয়ে, ব্যাকুল হয়ে ডাকতে হবে। কাটা পাঁঠার মতো ছটফট করতে হবে। সেই ব্যাকুলতা আমার নেই। মহাপুরুষ দেখেই বুঝেছেন, এর থাক আলাদা, জাত আলাদা। ব্যাঙ্কের কাউন্টারে নোট ভাঙাবার কায়দায়, মর্কট বৈরাগ্য ভাঙিয়ে ঈশ্বরপুরিয়া পেতে চায়।

পণ্ডিতমশাই হঠাৎ খিল খিল করে হাসতে লাগলেন। তারপর কোনও রকমে দাঁড়িয়ে, টলতে টলতে বেরিয়ে গেলেন। ছোটদাদু বললেন, 'হৃদকমলে বড় ধুম লেগেছে। মজা দেখিছে আমার মন পাগলে। ঘোর লাগিয়ে দিয়েছে ঘোর। এক জ্বালা মদ খাইয়ে দিয়েছি। সুরা পান করিনে আমি সুধা খাই জয় কালী বলে।' হঠাৎ ছোটদাদু গান শুরু করলেন, 'এ মদ যে রসে ভরা। ষড় রিপু চোলাই করা। যে খায় সে আত্মহারা। মদে তারে খায় না॥'

ছোটদাদু হঠাৎ উঠে পড়লেন।

হরিশঙ্কর বললেন, 'তুই একাসনে কতক্ষণ বসে আছিস জানিস? ছ ঘণ্টা।'

ছোটদাদু বললেন, 'এ কিছুই নয়। আমি পরপর তিন দিন একভাবে বসে থাকতে পারি। এর নাম স্থাণু যোগ। আমার গুরু শিখিয়েছিলেন। দাঁড়িয়ে থাকো। একটা দিন কেটে গেল। সে বেশ মজা। চুপচাপ, একভাবে দাঁড়িয়ে আছি; যেন একটা গাছ। অদ্ভুত সব অনুভূতি হতে থাকে। অনুভতিও তো একটা শিক্ষা।'

'অবশ্যই। ফিলিংস। তা চললি কোথায়?'

'চান করব।'

'কোথায় চান করবি?'

'পুকুরে।'

মোহনদা বললেন, 'তাহলে একটা লণ্ঠন নিয়ে আসি। একটা নতুন গামছা।'

'তুমি গামছা দাও। আলোর প্রয়োজন নেই। তারার আলোর প্রদীপ জ্বেলে চলব আমি আমার পথে। পিন্টু চলো আমার সঙ্গে।'

এত ঘনিষ্ঠতা হয়নি আগে। এই প্রথম বাইরের পরিবেশে দেখছি একজন সাধককে।

সাধনা, সাধক শব্দ দুটো শোনাই আছে। মনে হয় খুব পরিচিত। আসলে কিছুই জানি না। কি ভাবে ধাপে ধাপে সাধারণ থেকে অসাধারণ একটা স্তরে। থিওরি জানি, প্র্যাকটিস জানা নেই।

ছোটদাদু আগে আগে চলেছেন। আমরা পেছন পেছন। আমি আর মোহনদা। ছোটদাদু বললেন, 'মোহন, তুমি যাও। তোমার আসার প্রয়োজন নেই।'

মোহনদা ফিরে গেলেন। মোহনদা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অদ্ভুত একটা কাণ্ড হল। ছোটদাদু অন্ধকার পথে পা ফেলছেন, পা দিয়ে একটা আলো ঠিকরোচ্ছে। যেন টর্চলাইট হাঁটছে, যার ফোকাসটা নিচের দিকে। আমার সবেতেই ভীষণ ভয়। এত পরিচিত একজন মানুষকে ভীষণ অপরিচিত লাগছে। এর নামই কি ডাকিনী বিদ্যা। অস্বাভাবিক একটা আলো। নীল তার রঙ। সেই আলোয় ঘাস, আগাছা, স্পষ্ট। ছোট ছোট ব্যাং থমকে আছে লাফ মারার আগে। জ্বলজ্বল করছে ছোট ছোট চোখ। নানা রকম পোকা। ছোটদাদু চলেছেন অলৌকিক শরীর নিয়ে। কোন বিজ্ঞানে সম্ভব হচ্ছে। প্রশ্ন আসছে। সাহস হচ্ছে না করার। মানুষটি এখন আমার সম্পূর্ণ অচেনা। মহাকাশ থেকে নেমে আসা মহাজীবের মতো। আলোয় আলোকময় করে হে, রবীন্দ্রনাথের গান মনে পড়ছে, তোমার আলো গাছের পাতায় নাচিয়ে তোলে প্রাণ। তোমার আলো পাখির বাসায় জাগিয়ে তোলে গান।

আমাকে সঙ্গে আনার কারণ, আমার অবিশ্বাস ভাঙাবেন। আমি যা পারি না, আমি যা জানি না, আমি যা দেখিনি তা নেই। এই আমার বিশ্বাস। বাকিটা অবিশ্বাস। আমার সামনেই ছোটদাদু। হঠাৎ বললেন, 'চারপাশে সাদা সাদা সুবাসিত ফুল নেই কেন? ফুল। ফুল।'

ভেল্কি হয়ে গেল। ফুটফাট, ফুটফাট। ফুলে ভরে গেল। গোয়ালের গন্ধ ভরে গেল কনক চাঁপার গন্ধে। আমি কি জেগে আছি, না স্বপ্নে ভাবছি। এ কেমন ঘোর। ছোটদাদু জলে নেমে গেলেন। সে আর এক অলৌকিক দৃশ্য। যেন চাঁদ পড়েছে জলে। একটা আলোর শরীর জলের তলা পর্যন্ত ঝিলঝিল করে নেমে গেছে। এত আলো যে দেখতে পাচ্ছি, ছোট ছোট মাছ খেলা করছে। কি সুন্দর। স্লেটের মতো কালো আকাশ। খণ্ড খণ্ড তারা। ফুলের গন্ধ। মনে হয় স্বর্গে আছি।

জলে ওই অপূর্ব দৃশ্য দেখে মনে হল কেন আমি ম্যাজিক ভাবছি। আমার সেই শ্লোকটি যে মনে পড়ছে এই মুহূর্তে। কেন মনে পড়ছে? আমি সম্পূর্ণ আবিষ্ট। আমি কে? আমি কোথায়, সব ভুল হয়ে যাচ্ছে। প্রভাবের এক বৃত্তের মধ্যে ঢুকে গেছি আমি। যা মনে আসার কথা নয়, তাই মনে আসছে। সেরেছে, ভক্তি আসছে। একটা লীলার মধ্যে ঢুকে গেছি আমি। শ্রীরাধিকা কৃষ্ণকে দেখেছেন। কৃষ্ণ কেমন। বর্ণনা দিচ্ছেন বিশাখাকে: কুরঙ্গমদজিদ্বপুঃ পরিমলোর্মি কৃষ্টাঙ্গনঃ ইত্যাদি। কস্তুরীকে হার মানায় এমন দেহের সুগন্ধের ঢেউ দিয়ে যাঁর আনন পরিমার্জিত, নিজের অঙ্গস্থিত অষ্টনখে উৎপলের গন্ধযুক্ত, নতুন চাঁদের মতো চন্দনের ও অগুরর সুগন্ধ যুক্ত হে মদনমোহন।

সেই দৈবী দেহ আর এই দেহ, তফাৎ কোথায়। এরই নাম যোগবিভূতি। যোগে সবই সম্ভব। ছোটদাদু আমাকে একদিন ছান্দোগ্য উপনিষদ বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন। আমাকে নিয়ে যে চেষ্টা করেননি তা নয়। শ্বেতকেতুর গল্প বলছিলেন। উদ্দালক শ্বেতকেতুকে আদেশ করলেন, 'ওই জলের পাত্রে এই লবণ খণ্ডটা ফেলে দাও।'

শ্বেতকেতু আদেশ পালন করলেন। উদ্দালক বললেন, 'যাও, এইবার তুমি রাতের বিশ্রাম নাও। কাল সকালে আবার দেখা হবে।' সকালে শ্বেতকেতু এলেন।

উদ্দালক : সেই লবণ খণ্ডটি যা কাল রাতে তুমি জলে নিক্ষেপ করেছিলে, আমাকে এনে দাও।

পিতার আদেশে পুত্র জলাধারের কাছে গিয়ে উঁকি মেরে দেখালেন। লবণ খণ্ড কোথায়! জলে গুলে গেছে।

উদ্দালক : পুত্র, জলের উপরিভাগ আস্বাদন কর। স্বাদ কেমন?

শ্বেতকেতু : পিতা! জলের স্বাদ লবণাক্ত।

উদ্দালক : আচ্ছা মধ্যভাগের স্বাদ নাও।

শ্বেতকেতু : লবণাক্ত।

উদ্দালক : বেশ, এইবার একেবারে তলার জল গ্রহণ কর!

শ্বেতকেতু : পিতা। এর স্বাদও লবণ মিশ্রিত।

উদ্দালক : পুত্র, পাত্রের সমস্ত জল ফেলে দিয়ে আমার কাছে এস। আদেশ পালন করে পিতার কাছে ফিরে এলেন পুত্র। ফিরে এসে বললেন, 'জল ফেলে দিলেও ওই লবণ সব সময় জলেই থাকবে।'

উদ্দালক : পুত্র, এইটাই তোমার শিক্ষণীয়। লবণ 'দৃশ্যমান নয়। আস্বাদনে তুমি বুঝলে। আবার এও বুঝলে নিক্ষিপ্ত হলেও লবণ জলেই থাকবে। জগৎ-কারণে তিনি দৃশ্যমান নন; কিন্তু প্রতিটি কণায় কণায় তিনি উপস্থিত। প্রতিটি জলবিন্দুতে লবণকণার মতো। অনুভবে তাঁর উপস্থিতি।

'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে। হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে, হৃদয়ে রয়েছ গোপনে।'

ছোটদাদু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মিলিয়ে দিলেন। আমার, তোমার, তার, সকলের মধ্যেই সেই একের অস্তিত্ব। একটা পাথর তোলো, দেখো তিনি, একটা কাঠ চেরো, সেখানেও তাঁর উপস্থিতি। এই তাঁর, তাঁর বলতে বলতে ছোটদাদুর বড় বড় স্ফটিকের মতো চোখ জলে টলটল করে উঠল। কি ভয়ঙ্কর সেই বিচ্ছেদ বেদনা। পৃথিবীর সমস্ত স্বাদ যেন বিস্বাদ।

ছোটদাদু তখন ছান্দোগ্যের আর একটি শ্লোকে চলে গেলেন। এই শরীর, এ হল আত্মার পুরী। ছোট্ট একটি ঘর আছে সেখানে। পদ্মের মতো তার আকৃতি। সেই ঘরে ছোট্ট একটু স্থান। সেখানে কি আছে? কে আছে? সেই স্থানটুকুতে আছে সমগ্র বিশ্ব। বিশ্ব কেন। মহাবিশ্ব। চরাচর সৃষ্টি। সবই ওইখানে। স্বর্গ, পৃথিবী, অগ্নি, বাতাস, সূর্য, চন্দ্র, বজ্র, বিদ্যুৎ, তারকারাজি, যা আছে, যা নেই সবই অবস্থান করছে পদ্মস্থিত এই ছোট্ট স্থানটিতে। মানুষের শরীরেই যদি সব, এই সৃষ্টি, সর্বকাম, সর্ব বাসনা, তাহলে দেহের বিনাশে কি হবে! ওই স্থানটুকু, আত্মার ওই পদ্মনিবাসের বিনাশ নেই। কামনা, বাসনা, লয়, প্রলয়, সৃষ্টি, ধ্বংস, রূপ, অরূপ, বিকার, নির্বিকার, এই সোলার সিস্টেম, আরো কোটি সৌরজগৎ, আদিগন্ত, চরাচর, সব অবিনশ্বর।

এই বোধ আসবে কেমন করে? যা তোমার মধ্যেই অবস্থিত তাকে কেন পাওয়া যায় না খুঁজে! তুমি চাও না। মায়া তোমাকে ভুলিয়ে রেখেছে। মহামায়ার এমনি খেলা। এ কেমন জান, রাম লক্ষ্মণ সীতা। তিন জন চলেছেন। আগে রাম, মাঝে সীতা শেষে লক্ষ্মণ। লক্ষ্মণ রামকে দেখতে পাচ্ছেন না। কেন? মাঝে সীতা আবরণ। মায়া। সীতা সরে গেলে রামকে দেখা যাবে না। পরমাত্মা হলেন রাম, জীবাত্মা হলেন লক্ষ্মণ,

সীতা হলেন মায়া। এই তিন নিয়ে লীলা।

দুটি শোভন-পক্ষ পক্ষী, দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া। একই গাছে বসে আছে দুটি পাখি। গাছ কি ? তোমার দেহবৃক্ষ। পাখি দুটি বসে আছে কি ভাবে ? জড়াজড়ি করে। সযুজা সখয়া। যেন দুই প্রাণের বন্ধু। তাদের মধ্যে একজন সেই গাছের ফল, বিচিত্র অস্বাদযুক্ত ফল, স্বাদু পিপ্পলম অত্তি, ঠুকরে ঠুকরে খায়। সে কি ? সেই পাখিটি কে ? সেটি হল জীব। ফল কি ? সুখদুঃখাত্মক কর্মফল। অন্য পাখিটি কি করে ? সে কিছু খায় না, সে শুধু দেখে। দর্শন করে। তিনিই পরমাত্মা। জীবাত্মা পরমাত্মার আশ্রয়ে দেহবৃক্ষে অবস্থান করছে।

তুমি কি করে সেই ব্রহ্মকে ভেদ করবে। অমৃত আস্বাদনের জন্যে ব্রহ্মকে বিদ্ধ করতে হবে। জীবাত্মাকে পরমাত্মায় লীন হতে হবে। তোমার ধনুক কোথায়। কোথায় তোমার শর। প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা। ওঙ্কার সেই ধনু, জীবাত্মাই বাণ আর ব্রহ্মাই সেই বাণের লক্ষ্য। সারাটা দুপুর তাঁর ঘরে বসে আমাকে পাখি পড়ানোর মতো করে বোঝালেন। তিক্ত সংসার সম্পর্কে অসম্ভব একটা ঘৃণা জাগাবার চেষ্টা করলেন। অন্য ধরনের একটা আকাঙ্ক্ষায় আমাকে জাগ্রত করতে চাইলেন। ওঙ্কার সাধনার প্রাথমিক আভাস দিলেন।

পশ্চিমের অ্যানাটমিস্টরা মাথার মাঝখানে যে জায়গায় পাইনাল বা পিনিয়াল গ্ল্যান্ড আছে বলছেন, যেখান থেকে আমাদের স্বপ্নের উৎপত্তি, সেইখানেই হিন্দুযোগীরা দেখেছেন সহস্রার। সহস্র দল একটি পদ্ম। জ্যোতির্ময়। সেইটিকে ভেদ করতে হবে প্রণবমন্ত্রে। দু চোখের মাঝখানে ভ্রূ-মধ্যে যে-স্থান, মেয়েরা যেখানে টিপ পরে, অ্যানাটমিতে সেই বিন্দুটির নাম গ্লাবেলা। মনকে ওইখানে রাখো পদ্মাসনে বসে। সুস্থ সুন্দর জীবনের কথা ভাবো। শরীর শিথিল করো। এইবার ভাবো মাথার মাঝখানে একটি ছিদ্র। সেই ছিদ্রে স্থাপিত সহস্রদল এক পদ্ম। সহস্র কান্তমণি। সেই পদ্মে স্থির এক জ্যোতি। এইবার শ্বাসকে আকর্ষণ করে মূলাধার থেকে টেনে তোলো। ওই ছিদ্রটিকে ভরে দাও। চেষ্টা। অনন্ত চেষ্টা। প্রাণায়মই সব। কুম্ভক অভ্যাস করবে। দমভর বাতাস নেবে, বুক ভর্তি করে। ধরে রাখবে যতক্ষণ না কষ্ট হয়। ধীরে ধীরে ছেড়ে দিয়ে আবার নেবে। দিনের চারটে সময়ে কুড়িবার করে এই কুম্ভক করবে। সূর্যোদয়ে, দ্বিপ্রহরে, সায়াহ্নে, মধ্যরাত্রে। তোমার দেহ পবিত্র হবে, সমস্ত মালিন্য দূর হবে। শক্তিতে ভরে যাবে। দেহ সুবাসিত হবে। ত্বক উজ্জ্বল হবে। খিদে বাড়বে, হজম বাড়বে। তোমার কণ্ঠ মধুর হবে। আর কি হবে ? নরমগলার স্বরও বহু দূর পর্যন্ত পৌঁছোবে। প্রচণ্ড সাহস বাড়বে। আসবে অসীম কর্মোদ্দীপনা। মানসিকতার অদ্ভুত এক পরিবর্তন আসবে। দুঃখ-কষ্ট-নির্যাতন-নিপীড়ন, সংসার রূপ এই দুঃখজলধি তুমি অক্লেশে উত্তীর্ণ হওয়ার শক্তি পাবে। তোমার আকর্ষণীশক্তি, ম্যাগনেটিজম ভীষণ বেড়ে যাবে। সমস্ত মানুষ তোমার প্রতি আকৃষ্ট হবে। তুমি যা বলবে তাই শুনবে, পালন করবে। তুমি রোগমুক্ত, যন্ত্রণামুক্ত হবে ; কারণ তখন তুমি মায়ামুক্ত, মোহমুক্ত।

ছোটদাদু এমন লোভ দেখিয়েছিলেন, লোটাকম্বল নিয়ে বেরিয়ে পড়ি আর কি। মহাজীবনের লোভে ভেতরটা খচরমচর করে উঠল, তারপরে এক সময় নেতিয়ে পড়লুম। মনে পড়ে গেল এক মহাত্মার অদ্ভুত কথা ; বোল সবহীঁ ঢোল বরাবর,/পোল সবহীঁ মে পুরা।/অবোল তত্ত্ব কো সমঝাওত নহীঁ/জো সমঝাওত সো কুরা ॥ ঢোলের মধ্যে যেমন ফাঁক বা শূন্য থাকে, সেই রকম বোল বা বাক্যের মধ্যেও ফাঁক থাকে। বাণীর অতীত তত্ত্বকে প্রকাশ করা যায় না। যা প্রকাশ হয় তা মিথ্যা। সার নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণকে একজন বলেছিলেন, 'মহাশয় আমাকে সমাধিটা শিখিয়ে দিতে পারেন ?' শুনে সবাই হেসেছিলেন। সমাধি শেখানো যায় না। শিরোদেশ হল, সপ্তমভূমি—সেখানে মন গেলে সমাধি হয়। ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ দর্শন হয়; কিন্তু তখন আর শরীর থাকে না। সব সময় বেহুঁশ, কিছু খেতে পারেন না, মুখে দুধ দিলে গড়িয়ে যায়। ওই ভূমিতে একুশ দিনে মৃত্যু।

বাস্তববাদী হরিশঙ্কর এই প্রসঙ্গে সুন্দর একটি গল্প বলেছিলেন :

এক শহরে এক সিঁদেল চোর বাস করত। সিঁদ কেটে লোকের বাড়িতে চুরি করাই তার পেশা। লোকটির বয়স হল। যুবক ছেলে হঠাৎ একদিন এসে বললে, 'বাবা তোমার তো যাওয়ার সময় হল, বিদ্যেটা আমায় শিখিয়ে দিয়ে যাও, আমাকে তো করে খেতে হবে।' বাবা বলল, 'ঠিক আছে, আজই তাহলে চল আমার সঙ্গে।'

গভীর রাতে একটা বাড়ি বেছে নিলে। বড় চোর নিপুণ একটি সিঁধ কেটে ছেলেকে নিয়ে ঢুকে গেল। ঘরে এসে দেখলে বিশাল এক সিন্দুক। বড় চোর সিন্দুকের তালা খুলে দিয়ে ছেলেকে বললে, 'ঢোকো। সব মালপত্র বেছে বেছে বাইরে ফেলো।'

বাবার আদেশ। ছেলে ভেতরে ঢুকলো। সঙ্গে সঙ্গে বড় চোর সিন্দুকের ডালা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিল। নিঃশব্দে গর্ত দিয়ে বেরিয়ে এল রাস্তায়। তারপর করল কি! বাড়ির গেট ধরে নাড়া দিয়ে চিৎকার করে বলে গেল, 'তোমাদের বাড়িতে চোর পড়েছে গো।'

বাড়িসুদ্ধ সবাই উঠে পড়ল। আলো নিয়ে খোঁজাখুঁজি। স্টোর রুমে গিয়ে দেখলে সবই ঠিক আছে। সিন্দুকও তালা বন্ধ। কোথায় চোর! ঘর ছেড়ে সবাই বেরিয়ে গেল। সব শেষে দাসী। তার হাতে বাতি। সিন্দুকে বন্ধ চোরের ছেলে ভাবছে, সর্বনাশ! বেরোতে না পারলে তো দম আটকে মরতে হবে। সে তখন বার কয়েক খুড়ুর খুড়ুর শব্দ করল। দাসী যেতে গিয়েও ফিরে এল। মরেছে, ইঁদুর ঢুকেছে। সে তখন তাড়াবার জন্যে যেই ডালা খুলেছে, চোরের ছেলে এক লাফে বেরিয়ে এসে, দাসীকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে আলো নিবিয়ে অন্ধকারে দে চম্পট। দাসীর চিৎকার চোর, চোর। বাড়ির সবাই রাস্তায় নেমে চোরের পেছনে ছুটছে। চোর দেখলে, সে আর পারছে না ছুটে। প্রায় ধরা পড়ে যায় আর কি! পথের পাশেই মস্ত এক ইঁদারা। চোর দু'হাতে বেশ বড় একটা পাথর তুলে তার মধ্যে ফেলে দিয়ে, আবার ছুটতে লাগল। যারা অনুসরণ করছিল, তারা বোকা বনে গেল। ভাবলে চোর ইঁদারায় ঝাঁপ মেরেছে।

ভোর হচ্ছে, ছেলে বাড়ি ঢুকলো। দেখলে বাবা আয়েস করে বসে চা খাচ্ছে। ছেলের রাগ অভিমান দুটোই হয়েছে। বাবাকে বললে, 'তুমি আমার সঙ্গে এইরকম একটা ব্যবহার করতে পারলে ?'

বাবা হেসে, শান্ত গলায় বললে, 'বোস, আগে বল, তুই কি ভাবে ফিরে এলি ?'

ছেলে সব বললে।

বাবা বললে, 'পুত্র, তুমি তো সবই শিখে গেছ। এ তো শেখানো যায় না, নিজেকে শিখতে হয়।'

হরিশঙ্কর বলেছিলেন, ধর্ম, পথ, নিরাসক্তি, মায়ামুক্তি, সংসার থেকে বেরিয়ে আসার কায়দা শেখানো যায় না, নিজেকে শিখতে হয়।

ছোটদাদুর ভিজে ভারি হাত আমার কাঁধে এসে পড়ল, 'চলো আমার হয়ে গেছে।'

এইবার পট পরিবর্তন। আমি আর বিমলাদি মেলায়। বিমলাদির ছেলে ঘুমিয়ে

পড়েছে। একটা জায়গায় গ্রামের সব মানুষ এসে জড়ো হয়েছে। আলোয় আলো। ক্যাঁ কোঁচ নাগরদোলা, পুতুল নাচ। মহাভারতের পালা। দিব না, দিব না, সূচ্যগ্র মেদিনী। দুই মাতাল টলছে। একজন বলছে, 'আমি নিমাইচন্দ্র।' আর একজন বলছে, 'চিনি রে শালা। আমি যে নিতাইচন্দ্র।' বিমলাদি কাঁধ ধরে বললে, 'সরে এসো, জাত মাতাল।'

৪৩

Every man is a volume, if you know how to read him.

রাত হয়েছে, তাও কি জমজমাট মেলা। প্রায় দামোদরের তীর পর্যন্ত চলে গেছে। মানুষ ঘুমোবে না। ঘুম তো আছেই। তিনটে দিন না হয় জাগলো। এত আনন্দ একসঙ্গে এক জায়গায় এসে জড়ো হয়েছে। একপাশে একটু নিরালা জায়গায় রামায়ণ হচ্ছে। বাঁকুড়ার বিখ্যাত পাঠক হারমোনিয়াম বাজিয়ে রামায়ণ গান করছেন। বেশ ভিড় হয়েছে। এক ছাউনির তলায় এসেছে কৃষ্ণনগরের পুতুল। পুতুলের কি আকর্ষণ। বিমলাদি আর আমি দুজনেই দাঁড়িয়ে পড়েছি। জীবন্ত সব চরিত্র। কৃষ্ণ। গোপাল হামা দিচ্ছে। কলসী কাঁখে মহিলা। জাল কাঁধে জেলে। সাপুড়ে সাপ খেলাচ্ছে। কি নেই। হ্যাজাকের জোরালো আলোয় কল্পনার জগৎ।

বিমলাদি বললেন, 'কিনতে ইচ্ছে করে, কিন্তু ভীষণ দাম।'

'আমি আপনাকে কিনে উপহার দি। বলুন, আপনার কোনটা পছন্দ।'

'আমি নোবো কেন?'

'ভাই দিচ্ছে বলে।'

'আপনি, আপনি করলে বোন হয়!'

'এই কথা? বেশ তুমি বলছি। বলো দিদি তোমার কোনটা পছন্দ!'

'বাঁশি হাতে কৃষ্ণ। এখন কিনো না আগে সবটা ঘুরে আসি। নাগরদোলায় চড়বো। ভীষণ মজা লাগে। মনে হয় ছোটো হয়ে গেছি।'

'আমার যে ভীষণ ভয় করে দিদি।'

'দূর! তুমি আমার পাশে বসবে, আমি তোমায় দুহাতে শক্ত করে ধরে থাকবো। চীনেবাদাম খাবে? গরম চীনেবাদাম খেতে ভীষণ ভাল লাগে।'

'এত রাতে বাদাম খাবে দিদি? পেট ভরে যাবে।'

'তোমার মাথা। এক মুঠো বাদাম থেকে বড় জোর পঞ্চাশটা পুঁচকে পুঁচকে দানা বেরোবে। এই তে যদি পেট ভরে যায়, পেট কেটে বাদ দাও। মেলায় এসে হিসেব করতে নেই। যা প্রাণ চায় তাই করতে হয়। বালির খোলায় চীনেবাদাম নাড়ার গন্ধটা কি সুন্দর লাগে! মনে হয় মেলার গন্ধ। বছরে তো এই একবারই মেলা বসে গো। তাও

তুমি এইরকম করছ !'

দিদি ছেলেমানুষ হতে হতে একেবারে ছেলেমানুষ হয়ে গেছে। মুখচোখের চেহারা পাল্টে গেছে। আমরা নাগরদোলার দিকে এগোচ্ছি। পরপর এক সার চটঘেরা খুপরি। অনেকে এদিক ওদিকে তাকাচ্ছে। চটের পর্দা তুলে টুপ টুপ ঢুকে পড়ছে। দিদি আমার হাত চেপে ধরল ;

'সাবধান !'

'কেন দিদি ?'

'অনেক সময় হাত ধরে টেনে নেয়।'

'কে টেনে নেয় দিদি ?'

'ওই যে ওর মধ্যে যারা আছে, সেই মেয়েরা। পা চালাও, পা চালাও।'

'ওদের এখানে কেন আসতে দিয়েছে দিদি ?'

'মেলায় আসে অমন। ওদেরও তো খেয়ে পরে বাঁচতে হবে।'

মাঝে মাঝে খিলখিল হাসি আসছে কানে। অল্প অল্প ঘুঙুরের শব্দ। আমরা প্রায় ছুটে জায়গাটা পেরিয়ে এসে এমন এলাকায় পড়লুম, যেখানে শুধুই কাচের জিনিসপত্র। আলোয় ঝলমল করছে। যেন কোনও মুঘল রাজার শিশমহলে এসে পড়েছি।

'দিদি, দেখো কি সুন্দর ! কিছু কিনবে ?'

'কাচের জিনিস থাকে না। একদিন না একদিন ভেঙে যায়। কাচ, পাথর খুব সাবধানে রাখতে হয়। একটু পরেই কত পাথরের কাজ দেখবে। শুশুনিয়ার পাথর কেটে তৈরি। লোভ লেগে যাবে। কিনতে ইচ্ছে করবে। আমাদের ঘরে কাঁসার জিনিসই ভালো।'

আমরা নাগরদোলার কাছে চলে এলুম। দাঁড়ানো মাত্রই একটা পালা শেষ হল। দিদি বললে, 'আমাদের ভাগ্যটা ভীষণ ভালো। একটুও অপেক্ষা করতে হল না।'

নাগরদোলা কোম্পানির লোক, আমাদের একটা দোলায় বসিয়ে দিলে। একটু না ধরলে তো বসা যায় না। আমরা যেটায় বসলুম সেটা এক ধাপ ওপরে উঠে গেল। পরেরটা ভরে গেল। আমরা আর একটু ওপরে উঠে গেলুম, শেষে একেবারে টংয়ে। শুরু হল ঘুরপাক, আর ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ। প্রথম নাগরদোলায় চড়া। যখন হুস্ করে নিচের দিকে নামছে, মনে হচ্ছে আছড়ে মাটিতে ফেলে দেবে। আমার ভয় দেখে দিদি ডানহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল। কাঁধে কাঁধ ঠেকে আছে। যখন সবেগে নিচের দিকে নামছে, দিদি সুরেলা গলায় চিলের মতো শব্দ করছে। বাঁই বাঁই করে ঘুরছে দোলা। মনে হচ্ছে ছিটকে আকাশের দিকে উঠে যাবো। শরীরের কোনও ওজন আছে বলে মনে হচ্ছে না। দিদির কাঁধে মাথা রেখে, চোখ বুজিয়ে ফেললুম। দোলা ঘুরছে। নিবিড় স্নেহে জড়িয়ে রেখেছেন দিদি। এই সময় মনে হল নাই বা থামল এই দোলা। কিন্তু থামল।

দিদি বললে, 'নামবে ? না আর একপাক ঘুরবে ?'

'ঘুরবো। আমার ঘুম এসে গেছে।'

'দেখেছ তো অভ্যাস হয়ে গেলে কেমন ভাল লাগে।'

আমি হাসলুম। আবার শুরু হল ঘোরা। এইবার দিদিকে আমি দু'হাতে জড়িয়ে ধরলুম। ধূপ, ধুনোর গন্ধ শরীরে। তুলোর মতো নরম। পাথরের মতো শীতল। অদ্ভুত একটা ভাব আসছে মনে। আনন্দের হিমপ্রবাহ নেমে আসছে অদৃশ্য উৎস থেকে। এইবার শেষ পাকে আমাদের দোলাটা থামাল সবার ওপরে। শূন্যে ঝুলে রইলুম বেশ

কিছুক্ষণ।

মাটিতে নেমে এলুম। শরীর টলছে। নেশা লেগে গেছে। পাঁই পাঁই করলে ঘুরলে খিদে পায়। আমরা চীনেবাদামের কাছে গেলুম। বাদাম কিনে আমরা একটা কদমগাছের তলায় গিয়ে বসলুম। সেখানে আমাদের জন্যে কেউ একটা গরুর গাড়ির চাকা ফেলে রেখেছিল। আমরা পাশাপাশি সেই চাকার ওপর বসলুম। চীনেবাদামের খোলা ভাঙার পুটুসপুটুস শব্দ। দিদির সাদা শাড়ি অন্ধকারে আরো সাদা দেখাচ্ছে। আমাদের পেছন দিকে একটু দূরে লোহার জিনিসের স্টল। কড়া, চাটু, হাতা, খুন্তি। সামনের দিকে একসঙ্গে অনেক কিছু চলছে। ইন্দ্রজালের তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে একটা লোক ভয়ঙ্কর চিৎকার করছে।

দিদি বললে, 'ভীষণ ভাল লাগছে। আরো ভাল লাগছে তুমি আছ বলে। মাঝেমাঝে মনে হচ্ছে তুমি আমার কৃষ্ণ। সংসারের বাঁধা ধরা আমার একদম ভাল লাগে না। কি ছাই হাতা-খুন্তি-বেড়ি। মাঝে মাঝে মনে হয় বাউল হয়ে যাবো। কেমন দেশে দেশে ঘুরবো গান গেয়ে। অত দূরে বসেছ কেন? কাছে সরে এসো, গায়ে গা লাগিয়ে বোসো। দাঁড়াও বাদামগুলো আমার কোলে ঢালি। নাও এইখান থেকে তুলে তুলে নাও। আজ আকাশের রঙ দেখেছো? একেবারে শ্রীকৃষ্ণের গায়ের রঙ।'

আমার শরীরে দিদির শরীর ঠেকে আছে। আকাশের রঙ শ্রীকৃষ্ণের মতো বলার সঙ্গে সঙ্গে দিদির শরীর থর থর করে কাঁপতে লাগল। ফিসফিস করে বললে, 'শিগগির, শিগগির, আমাকে নামিয়ে আনো।'

ভয় পেয়ে গেলুম। কোথা থেকে নামাবো! 'কোথা থেকে নামাবো দিদি? তুমি তো আমার পাশেই রয়েছ।'

দিদির কাঁপুনি আরো বেড়ে গেছে। ম্যালেরিয়া রোগীর মতো কাঁপছে ঠকঠক করে। কোনও রকমে বললে, 'আমার মন ওপরে উঠে যাচ্ছে। আমি অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছি। শিগগির আমার বুকে হাত রাখো।'

অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে গেলুম। কোনও চিন্তার অবকাশ নেই। খুব ভয়ে ভয়ে বুকে হাত দিলুম। সেই অভিজ্ঞতা বর্ণনার অতীত। মেলার নেশা ধরানো রাত। শ্যামকৃষ্ণ আকাশ। স্ফটিকের টুকরো তারা। ঝাপুর ঝুপুর কদমের পাতায় বাতাসের হিমসিম শব্দ। ইন্দ্রজালের চিৎকার। নাগরদোলার ছুঁচোর ডাক। আমার হাত। দিদি আমাকে পাগলের মতো জড়িয়ে ধরল। এই প্রথম একটা অনুভূতি হল, দেহ দিয়ে দেহের বাইরে যাওয়া যায়। আমার অস্তিত্ব মন্দির চূড়ার পতাকার মতো পতপত করে উড়তে লাগল। আমার এমন কিছু দর্শন হল, যা অতীন্দ্রিয়। অলৌকিক। দিদি আমার শরীরের সর্বত্র হাত বোলাচ্ছে। সাধারণ কোনও মানুষ আড়াল থেকে দেখলে ভাববে অশ্লীল একটা কিছু হচ্ছে। একমাত্র আমিই জানি কি হচ্ছে! ইন্দ্রিয়ের জট খুলে বেরিয়ে আসছে নিরাসক্ত, বিশুদ্ধ অনুভূতি। সমস্ত শরীরে যেন অমৃতক্ষরণ হচ্ছে। সারা শরীর মধুরমতোচটচটে। মাথার ঢাকনা যেন খুলে গেছে। সেখানে কে যেন একখণ্ড বরফ বসিয়ে দিয়েছে। কানে শুনতে পাচ্ছি, ঠিন ঠিন খঞ্জনির শব্দ। দেখতে পাচ্ছি, সামনের জমিতে চূর্ণ চূর্ণ চাঁদের টুকরো। নাকে আসছে পদ্মের গন্ধ। কখনো মনে হচ্ছে, আমি বিশাল, কখনো মনে হচ্ছে বিন্দুর মতো ক্ষুদ্র। প্রসারিত হচ্ছি, সঙ্কুচিত হচ্ছি। কখনো মনে হচ্ছে, আমি জমাট বরফ, কখনো তরল নদী।

কতক্ষণ এই অবস্থায় ছিলুম জানি না, যখন সম্বিৎ ফিরে পেলুম, তখন মেলা প্রায়

ভেঙে এসেছে। স্থির নাগরদোলা সামনের জমিতে। ইন্দ্রজালের চিৎকার নেই। রামায়ণ গান কানে আসছে না। দিদির এখন অন্য ব্যক্তিত্ব। আদেশের কণ্ঠস্বর, 'চলো, বেশ রাত হয়েছে। বুঝতে পারছো, বাতাস ঘুরে গেছে! হাওয়া দিয়ে সময় ঠিক করা যায়।'

'দিদি তোমার কৃষ্ণ?'

'মাটির কৃষ্ণের আর দরকার নেই। আমি জ্যান্ত কৃষ্ণ পেয়ে গেছি। শোনো তোমাকে একটা কথা বলি, যা হোলো, যা পেলে, আরো যা পাবে, তোমার দাদু, তোমার বাবাকে বলবে না। তোমার কেমন লাগল?'

'আমি বলতে পারবো না। বলা যায় না।'

'হঠাৎ কি হয়ে গেল! জানো তো অনেকেই এ-সব বোঝে না। অপবাদ দেয়।'

'দিদি তোমার শক্তির পরিচয় আমি পেয়েছি। তোমার জীবনে এর দাম আছে। আমার এ-সবে কি প্রয়োজন!'

'প্রয়োজন? তোমার কি ধারণা এ-সব চাইলেই পাওয়া যায়! তোমার মনে হল, আর তুমি পেয়ে গেলে। তোমার মনে হল, আমি চাই না, আর সব ফিরে গেল! মানুষের জীবনে না চাইতেই আসে। সকলের জীবনে আসে না। যার আসে তার আসে। এরই নাম কৃপা। করা থাকলে তবেই পাওয়া যায়। করে পাওয়ার নাম কৃপা। ধরো, তোমার চুল, পড়ে যাচ্ছে, তুমি চাইলেই কি পড়া বন্ধ হবে। পড়ার হলে পড়বে, থাকার হলে থাকবে। সময় হলে শিশুর দাঁত উঠবে, বয়স হলে পড়ে যাবে, চোখে যখন ছানি আসবে আসবেই, তুমি না চাইলেও আসবে। শোনো, তোমার আগের জন্মে বেশ কিছু করা আছে। তুমি সে খবর রাখো না। তোমার দাদু আজ তোমাকে কিছু দেখিয়েছেন, বলো ঠিক কি না?'

'হ্যাঁ দিদি।'

'তোমার বাবার শক্তি তোমাকে ঘিরে আছে। তোমার ভেতরে ভোগ আর যোগ দুটোই সমান সমান মাত্রায় আছে। তোমাকে ভোগের পর্বটা আগে শেষ করে নিতে হবে। তোমার স্ত্রীর শক্তি তোমার চেয়ে বেশি হবে। তোমার স্ত্রীকে ধরেই তোমাকে এগোতে হবে। এইটাই তোমার পথ; কিন্তু আসতে হবে অনেক ঘাটের জল খেয়ে ঘুরপথে।'

সেই অদ্ভুত মহিলা আমাকে একটি অসাধারণ গল্প বলেছিলেন। হরিশঙ্কর প্রায়ই বলেন, জ্ঞানের মনোপলি হয় না। তোমার কাছেই সব জ্ঞান। কৃপা করে তুমি ছাড়বে, তবেই আমার বরাতে সামান্য জুটবে, এই একটি ক্ষেত্রে সেই ব্যবসা অচল। জ্ঞান সকলের। সকলেই জ্ঞানী হতে পারে। যদি ইচ্ছে থাকে, যদি চেষ্টা থাকে। মানুষের ভেতরে জ্ঞান উদিত হয় সূর্যের মতো। এই মহিলাও সেইরকম জ্ঞানী। শুধু জ্ঞানী নন, সাধিকাও।

দিদি বলছেন, 'একটা কুঁড়েঘর। একটা লণ্ঠন জ্বলছে। একজন লোক শুয়েছিল। হঠাৎ উঠে বসল। এক ছিলিম তামাক খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে। হুঁকো কল্কে বেরলো। এইবার চাই টিকে। খুঁজে খুঁজে কয়েকটি টিকেও বেরলো। এইবার যে একটু আগুন চাই। আগুন না হলে যে টিকে ধরবে না। তার যে চকমকি পাথরটা ছিল, সেটা হারিয়ে গেছে। পাথর আছে প্রতিবেশীর বাড়িতে; কিন্তু এই মাঝরাতে ডাকাডাকি করাটা কি উচিত হবে! সবাই ঘুমোচ্ছে। কিন্তু তামাকের নেশা! একটু না হলে যে প্রাণ ছটফট করছে। লণ্ঠন হাতে লোকটি বেরিয়ে পড়ল রাতের অন্ধকারে। প্রতিবেশীর দরজায় গিয়ে ধাক্কাধাক্কি। বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন বাড়ির কর্তা। কি চাই? বড় তামাক খাওয়ার

ইচ্ছে হয়েছে। টিকে ধরাতে হবে। একটু আগুন চাই। আপনার চকমকি পাথরটা যদি একবার দেন কর্তা! কর্তা বললেন, আগুন ধরাবে? তা তোমার হাতে ওটা কি? আজ্ঞে লণ্ঠন। লণ্ঠনের ভেতর ওটা কি? আজ্ঞে, তাই তো। তোমার নিজের হাতে আগুন, আর তুমি মাঝরাতে প্রতিবেশীর ঘুম ভাঙিয়ে আগুনের খোঁজ করছ।'

দিদির বক্তব্য, তোমার ভেতর আছে, তোমার হুঁশ নেই। সেই হুঁশটা তোমার করিয়ে দিতে হবে। সেইটা হবে তোমার গুরুর কাজ। ভেতরে থাকলে তবেই তাকে টেনে বের করা যায়। যেমন গান, শিল্প, সাধনা। ভেতরে থাকা চাই। তোমার আছে। প্রকাশ নেই। তীর্থে তীর্থে ঘোরো, সাধুসঙ্গ করো। তা না হলে, তোমার এদিকও যাবে, ওদিকও যাবে। সংসার তুমি করবে। শুরুটা ভালই হবে, শেষটা গোলমেলে। নির্জনে একা। তখনই হবে মুখোমুখি।

সারাটা পথ এই ধরনের অদ্ভুত সব কথা বলতে বলতে দিদি এসে ঢুকলেন বাড়িতে। ঢুকেই হরিশঙ্করের গলা, 'এই নে কিস্তি। সামলা।'

দাওয়ায় বসেছে দাবার আসর। হ্যারিকেনটা ঝুলছে বাঁশের বাতায়। গাওয়া ঘিয়ে একটা কিছু ভাজা হচ্ছে। গন্ধে আকাশবাতাস ভরে গেছে। মোহনদা নেমে পড়েছেন রান্নায়।

ছোটদাদু টুক করে একটা ঘুঁটি সরিয়ে বললেন, 'এই নাও বন্ধনমুক্ত করে দিলুম ; কিন্তু এইবার তোমার বিপদ।'

হরিশঙ্কর চালটার খুব তারিফ করলেন। আমি একপাশে বসলুম। ছক থেকে মুখ না তুলেই ছোটদাদু বললেন, 'কেমন হল মেলা?'

আমার উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে একটা ঘুঁটি চেলে বললেন, 'কিস্তি।'

হরিশঙ্কর বলছেন, 'এ একেবারে জীবনমরণ লড়াই চলেছে। একবার এদিক যায় তো, একবার ওদিক।'

ছোটদাদু হাসছেন, 'রাজারাজড়ার ব্যাপার। রাজ্যপাট সামলানো কি মুখের কথা! আচ্ছা নে এইবারও সামলে দিলুম ; কিন্তু তোর মন্ত্রী ইন ডেঞ্জার।'

খেলার কোনও সমাধান শেষ পর্যন্ত হল না। খাওয়ার ডাক পড়ে গেল। হরিশঙ্কর আসনে বসতে বসতে বললেন, 'কাল শেষ রাতেই কিন্তু আমরা বেরিয়ে যাবো।'

ছোটদাদু হঠাৎ বললেন, 'শেষ রাত নয়। এই রাতেই বেরোবো। অদৃশ্য নির্দেশ।'

মোহনদা পরিবেশন করছিলেন, বললেন, 'কিছুতেই কি কারোর কথা শুনবেন না!'

ছোটদাদু বললেন, 'অবশ্যই শুনবো একজনের কথা। তিনি বসে আছেন অন্তরে।'

'পথটা ভালো নয়। কেন অমন করছেন। একবার ইনি বলছেন। ইনি শান্ত হলেন তো আপনি। আর তো কয়েকঘণ্টা! তারপরেই তো ভোর!'

'এক মুহূর্তে বিশ্বজুড়ে কত কাণ্ড হয়ে যায় মোহন! এই মুহূর্তে কত জন্মাল, কত মরল, কত খুন হল, কত সংসার ভাঙল! কত বরফ জল হয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়ল! কত মানুষ এগোলো, কত মানুষ পেছলো। এই মুহূর্তে একটা ট্রেন গন্তব্যের দিকে কতটা এগিয়ে গেল! সে খবর রাখো মোহন!'

'সবই ঠিক ; তবে এই কষ্ট। আমরা আরামে ঘুমোবো, আপনারা হাঁটবেন!'

'পুরোটাই মনের ব্যাপার মোহন। কেউ ঘুমিয়ে আরাম পায়, কেউ পায় বনের পথে হেঁটে।'

খাওয়া হয়ে যাওয়ার পর হাত ধুচ্ছি, বিমলাদি বললেন, 'কোনও রকমে আটকাও না।

রাতে তোমাকে নিয়ে যে একটু বসবো ভেবেছিলুম। এমন একটা ক্রিয়া তোমাকে শেখাবো ভেবেছিলুম যা তোমার সংসারপথের সহায় হবে।'

'কি দিদি!'

'বজ্রোলী মুদ্রা। এক মহাযোগী আমাকে শিখিয়েছিলেন। তুমি কোনওরকমে বোঝাও।'

ছোটদাদু প্রস্তুত হচ্ছেন। হরিশঙ্কর প্রায় তৈরি। ছোটদাদুকে আস্তে আস্তে বললুম,

'ছোটদাদু আর তো কয়েকঘণ্টা, একেবারে ভোরবেলা বেরোলে হয় না!'

গম্ভীর গলায় বললেন, 'না হয় না!'

'এই রাত! এতটা পথ! জঙ্গল! ডাকাত!'

'তাতে তোমার কি? তুমি কি সঙ্গে মোহরের থলে নিয়ে চলেছো!'

বেশ রাগের গলা! বিমলাদি ওপাশে ছিলেন। গিয়ে বললুম। বিমলাদি বললেন, 'তুমি বলো, আমি থাকছি। ফেরার পথে আপনাদের সঙ্গে চলে যাবো।'

আমি একটা ভেড়ার মতো সেই কথা বলার জন্যে ফিরে এলুম। একটা অদৃশ্য শক্তি যেন আমাকে পরিচালিত করছে। একটা ঘোরের মধ্যে আছি।

ছোটদাদুর সামনে দাঁড়ানো মাত্রই, তিনি খপ্ করে একটা হাত ধরলেন আমার। ভয়ঙ্কর একটা ঝাঁকুনি মারলেন। তারপর টানতে টানতে একেবারে রাস্তায়। হরিশঙ্কর অনুসরণ করছেন। ছোটদাদু, আমাকে নিয়ে হাঁটছেন হনহন করে।

নিমেষে চলে এলুম পণ্ডিতমশাইয়ের চতুষ্পাঠীর কাছে। মিটমিট একটা আলো জ্বলছে ভেতরে। এসে গেল সেই সাঁকো। পথ ঢালু হল। সামনেই সেই মেলার জায়গা। অন্ধকারে দৈত্যের মতো খাড়া হয়ে আছে নাগরদোলা। টিং টিং আলো এখানে ওখানে। সেই মেয়েরা এখন বেরিয়ে এসেছে। অসংলগ্ন কথা, চুটকি হাসি, মাতালের প্রলাপ।

আমরা যেন বাতাসে উড়ে চলেছি পক্ষীরাজের মতো। বিশাল একটা ধ্বংসাবশেষ এগিয়ে আসছে। হরিশঙ্কর পেছনে আসছেন সৈনিকের মতো মার্চ করে।

৪৪

There is an Eye that never sleeps
Beneath the wing of night;
There is an Ear that never shuts
When sink the beams of light.

পণ্ডিতমশাইয়ের জন্যে আমার খুব দুঃখ হচ্ছিল। ছোটদাদুর ভয়ঙ্কর আক্রমণ, তারপরে অসীম কৃপা, সবই হল : কিন্তু মানুষটি বড় নিঃসঙ্গে আছেন। শাস্ত্র আর পাণ্ডিত্যের ভারে নুয়ে পড়েছেন। বাঁচার ইচ্ছা প্রবল, অথচ সময়ের বালুকণা অবিরত ঝরেই চলেছে। যৌবনে না হয় একটু বেহিসেবী ছিলেন। হয়তো টাকাপয়সার ব্যাপারে একটু হিসেবী। মানুষের সবটাই কি ভাল হতে পারে! মানুষ তো তাহলে ভগবান হয়ে যাবে। দুটো পা, দুটো হাত, দুটো কান, দুটো চোখ, অর্থাৎ পাপ আর পুণ্য। বৃদ্ধ মানুষটি আমার মধ্যে তাঁর সন্তানকে দেখেছিলেন। আর হয়তো দেখা হবে না কোনওদিন। এই সব ঠুন্‌কো সেন্টিমেন্টের অর্থ হয় না কোনও।

হরিশঙ্করের হাতে একটা শুকনো গাছের ডাল। গাছের ডাল, কচি বাঁশ, বেত, কুড়িয়ে পাওয়া পাথর এই সব হরিশঙ্করের প্রাণের জিনিস। প্রকৃতিতে মিলিয়ে যেতে হরিশঙ্কর ভীষণ ভালবাসেন। এত বড় মাপের মানুষকে সংসারে ধরে রাখা যায় না। অসম্ভব। আকাশ মানুষের জানালায় উঁকি দেয় বলে, আকাশকে ছোট ভাবা, জানালার আকাশ, ঘরের আকাশ ভাবা মূর্খতা। হরিশঙ্কর গুনগুন করে গান গাইছেন। কেদারার আলাপ। পথ বন্ধুর। খন্দে ভরা। যখন ঝোপঝাপ গাছের দঙ্গলে ঢুকছি তখন নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। আর টেনিস বলের মতো আলো ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। চিনতে পারিনি। হরিশঙ্কর বললেন, 'ভয় পেয়ো না। ভূত নয় জোনাকি। এর আলাদা রূপ।'

এক জোনাকি দর্শনেই হরিশঙ্কর যেন সমাধিস্থ। সৃষ্টিবিজ্ঞানের সূক্ষ্মতায় চলে গেলেন। স্রষ্টার বিশাল পরিকল্পনা যে কতটা বিশাল তারই আলোচনা চলল! যেখানে যা প্রয়োজন, যতটা প্রয়োজন সবই আছে। কিছু আবার রেখেছেন লুকিয়ে, গুপ্তধনের মতো করে। মানুষের অনুসন্ধানী প্রতিভা যাতে বাড়ে। মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান যাতে আরো উন্নত হয়। যেমন অসুখ। অসুখ যেমন দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ওষুধের ব্যবস্থাও করে রাখলেন। খুঁজে নাও। দেহটাকে করে দিলেন ফিজিক্‌স কেমিস্ট্রি কম্বাইন্‌ড। স্টম্যাক একটা ল্যাবরেটরি। স্কেলিট্যান পারফেক্ট ফিজিক্‌স। হিঞ্জ, ফালক্রাম, গিয়ার, পিনিয়ান। ব্রেন কম্পিউটার। চোখ ক্যামেরা। হরিশঙ্কর এতটাই অভিভূত যে হাঁটা বন্ধ হয়ে গেল।

অন্ধকারে আমরা দাঁড়িয়ে পড়লুম সেই ধ্বংসাবশেষের সামনে। কোনও এক সময় ছিল বিশাল প্রাসাদ। বাঁকুড়ার ইতিহাস তো সামান্য নয়। এক সময় নাম ছিল জঙ্গলমহল। শুধু গণিত ? ইতিহাসেও হরিশঙ্কর অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কোথাকার ইতিহাস চাই ? গ্রীস, রোম, ইজিপ্ট, অটোমান টার্ক্, ভারত, এমন কি পশ্চিমবাংলার প্রতিটি জেলা।

আমরা যেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তিন গেরিলা সোলজার। এইমাত্র প্যারাসুট নিয়ে আকাশ থেকে নেমে এসেছি মধ্যপ্রাচ্যের কোনও রণাঙ্গনের পশ্চাৎভূমিতে। সামনেই ফোর্ট নক্স। দুই জেনারেলে যুক্তি হচ্ছে। পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে। ঝিঁঝিঁ পোকার ঐকতান যে কি ভয়ঙ্কর হতে পারে, সে-ই টের পেলুম। দু'কানের পর্দা যেন খুলে পড়ে যাবে।

হরিশঙ্কর আর ছোটদাদুর মুখের ওপর এক ভৌতিক আলো খেলা করছে। দু'জনকেই মনে হচ্ছে, আমার অচেনা। হরিশঙ্কর হঠাৎ বললেন, 'ক্রিস্টাল অফ বীরভানপুর অ্যান্ড দেজুরি।'

ছোটদাদু সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, পরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞরা রায় দিলেন...।'

হরিশঙ্কর ধরে নিলেন, 'প্রাগৈতিহাসিক যুগেও এই জেলায় মানুষের বাস ছিল, আর সে-মানুষ অরণ্যচারী, কাঁচা খেকো মানুষ ছিল না, ছিল সুসভ্য, শিল্প নিদর্শন যা আবিষ্কৃত হয়েছে সেইটাই তার প্রমাণ। অন্ধকারের এই স্তূপটি কি ? এনি আইডিয়া ?'

'আদি রাজা ছিলেন মহারাজা সিংহ বর্মন। এটা তাঁর স্মৃতি নয়। শুশুনিয়া পাহাড়ের একপাশে পাথরের গায়ে বিরাট এক জ্বলন্ত চাকার তলায় নিজের কালকে, নিজের রাজত্বের কাহিনীকে কালজয়ী করে রেখে গেছেন। আমার মনে হয় এটা রাজা গোপাল সিংহের কালের।'

'কোন গোপাল সিংহ! সেই রাজপুত ব্রাহ্মণ, যার রাজত্বসীমা ঘুরে দেখতে ষোল দিনেরও বেশি সময় লাগত। রাজস্ব থেকে বাৎসরিক আয়ের পরিমাণ ছিল তিরিশ থেকে চল্লিশ লক্ষ টাকা। শত্রু-দমনের কাজে যিনি জলকে ব্যবহার করেছিলেন শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে।'

'সেই সুজা খাঁ!'

'ঠিক, ঠিক বলেছিস। হান্ড্রেড আউট অফ হান্ড্রেড।'

'গোপাল সিংহের রাজত্ব ছিল দুর্ভেদ্য। সুজা খাঁ বিশাল বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করেছিলেন। মনে পড়েছে ?'

'পড়বে না! গোপাল সিংহ-র কি ট্যাকটিক্স! এসো। এগিয়ে এসো। আরো এসো। একেবারে হাতের মুঠোয়। তারপরেই খুলে দেওয়া হল ড্যামের গেট। জলের তোড়ে সব হাবুডুবু।'

'কি রাজাই ছিলেন! হোয়ট এ কিং হি ওয়াজ। জমজমাট রাজত্ব। চুরি নেই, ডাকাতি নেই, চোর-জোচ্চর, বাটপাড় নেই। দিগ্বিদিক থেকে বণিকরা আসছেন, ভ্রমণার্থীরা আসছেন। অ্যান্ড হোয়াট এ সিস্টেম! রাজসীমায় ঢোকামাত্রই নিরাপত্তার দায়িত্ব রাজপ্রহরীর। ঘাঁটির পর ঘাঁটি। প্রহরী এক ঘাটি থেকে আর এক ঘাঁটিতে এনে আর এক প্রহরীর হাতে দায়িত্ব দিয়ে ফিরে যাবে। রিলে সিস্টেম। শুধু হাতে ফিরবে না, ফিরবে রিসিট নিয়ে। পারসন ডেলিভার্ড। মুখ্য প্রহরী আবার রাজার কাছে নিয়মিত খবর পাঠাতে থাকবেন, অতিথি কেমন আছেন, কোথায় আছেন। গোপাল সিংহের রাজত্বে

ঢোকা মানে, তুমি স্টেট গেস্ট। তোমার আর কোনও খরচ নেই। সব ফ্রি। থাকা খাওয়া। এমন কি তোমার সওদা, তোমার সম্পদ বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে বিনা পারিশ্রমিকে একজন বাহক পাবে। যদি তুমি কিছু হারিয়ে ফেলো, ধরো টাকার থলে তাহলেও চিন্তার কিছু নেই। যিনিই সেই থলি কুড়িয়ে পান না কেন, সবচেয়ে কাছের কোনও গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে তিনি নিকটবর্তী চৌকিতে গিয়ে সেই খবর দেবেন। চৌকিরক্ষক ঢেঁড়া পিটিয়ে সেই খবর সমস্ত জেলাবাসীকে জানিয়ে দেবেন।'

ছোটদাদু বললেন, 'এই ধ্বংসাবশেষ হয়তো সেই গ্রেট কিং গোপাল সিংহের রাজত্বকালের।'

একটা তোরণের মতো প্রবেশপথ। সময় যেন সলিড হয়ে গেছে। তারপর প্রবল জঙ্গল। টলের মতো জোনাকির আলো, ফুরফুরে বুদ্বুদের মতো ভাসছে। তারপর ছোট বড় অন্ধকারের টুকরো। ইতিহাসের অন্ধকার।

হরিশঙ্কর বললেন, 'আমি ভেতরে দু'এক কদম এগিয়ে দেখি। শুধু ইতিহাস নয়। রহস্যের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।'

ছোটদাদু বললেন, 'ইদানীং লক্ষ করছি তোর মধ্যে একটা ইনস্যানিটি আসছে। মাঝে মাঝে মনে হয় পাগলামি আসছে। এই অন্ধকারে যেখানে একটা শেয়াল ঢুকতে ভয় পায়, তুই সেখানে কি কারণে ঢুকবি ? সাপের ছোবল, বিছের কামড় খাওয়ার জন্যে ? না কি পড়ে হাত পা ভাঙার জন্যে !'

'শোন, আদি পৃথিবীটা কেমন ছিল ?'

'তুই আদিম মানুষ নোস !'

'আমি কিন্তু একেবারে মাথায় এক বিন্দু আলো দেখতে পাচ্ছি।'

আমরা তাকালুম। সত্যিই তাই, একটা আলোর ফুটকি জ্বলছে নিবছে। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে একটা নয় দুটো বিন্দু। গাটা ছাঁত করে উঠল। অবশ্যই কোনও ভয়ঙ্কর ডাকাত। হাওয়া থেকে টঙে চড়েছে। সিগারেটে টান মারছে।

ছোটদাদু হঠাৎ হেসে উঠলেন, 'ভায়া, ওটি একটি বৃহৎ আকারের প্যাঁচা, একটু বাতাস নিচ্ছেন। জানবে শিকারী পাখি, শিকারী জন্তুর চোখ রাত্তির বেলায় আগুনের মতো জ্বলে। হিংসার আগুন।'

হরিশঙ্কর বললেন, 'ইউ আর রাইট। রাত যদি না হত আমি এই রেলিকস দেখে ছাড়তুম। এমন একটা জিনিস না দেখে চলে যেতে হচ্ছে, ভেরি স্যাড। ফেরার পথে আমাকে দেখতেই হবে।'

'তোর সঙ্গে আমি একমত। অতীতের চেয়ে দর্শনীয় আর কি আছে !'

আমার হঠাৎ মনে হল, আমাদের কোনও অদৃশ্য শক্তি এখানে ধরে রেখেছে। যে-ভাবে দু'জনের কথা-বার্তা আলোচনা চলেছে, তাতে মনে হচ্ছে এইখানেই রাত ভোর হয়ে যাবে। একপাশে বসে পড়লেই তো হয় !

হঠাৎ আলোচনা থেমে গেল। গোটাকতক প্যাঁচা চ্যাঁ চ্যাঁ করে ডেকে উঠল। ভয়ঙ্কর ডাক। ছোটদাদু বললেন, ' একটা প্রহর শেষ হল। চলো, আমরা পা চালাই।'

হরিশঙ্কর বললেন 'এই সময়টায় আমি পৃথিবীর আহ্নিকগতি যেন অনুভব করতে পারি। পৃথিবী তার নিজের অ্যাক্সিসে ধীরে ধীরে রিভল্ভ করছে। রাত থেকে দিন, দিন থেকে রাত। রাতের মতো সময় আছে ! এমন ঘন, এমন একান্ত একটা সময় ! সব কিছুই রহস্যাবৃত। আচ্ছা চলো। এগিয়ে পড়ি।'

হঠাৎ ঝুনঝুন্ শব্দ। যেন অনেক কঙ্কাল একসঙ্গে নৃত্য করছে। এ শব্দ আগে কখনো শুনিনি। হরিশঙ্কর চলতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন, 'রাজপুরীতে নাচের আসর বসল না কি?'

ছোটদাদু বললেন, 'শব্দটার সঙ্গে পরিচয় নেই, তাই না!'

'আগে শুনিনি।'

'একসঙ্গে অনেক শজারু নাচছে কোথাও। রাতের বেলা ওদের খুব আনন্দ হয়।'

হরিশঙ্কর বললেন, 'দৃশ্যটা দেখে গেলে হত।'

'ছেড়ে দে, বিনা নিমন্ত্রণে না যাওয়াটাই ভালো।'

আমরা হাঁটছি। একটা ভারী বাতাস বইছে। কষা কষা গন্ধ। জঙ্গলে কত গাছ! কোন গাছের কি গন্ধ বলা কঠিন। আমাদের হাঁটার গতি একটু কমেছে। ইতিহাস আমাদের ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। হঠাৎ ভীষণ একটা পচা গন্ধ এল নাকে।

ছোটদাদু বললেন, 'মেরেটেরে এনে ফেলে রেখে গেছে। পচা মড়ার গন্ধ।'

জায়গাটা আমরা পেরিয়ে এলুম। জঙ্গল কমে আসছে। সামনেই একটা গ্রাম। মাঝরাতে ঘুমিয়ে আছে। ছোট্ট একটা মন্দির। মাথায় একটা সাদা পতাকা উড়ছে। একটা পথ মাঠের ওপর দিয়ে গ্রামের দিকে চলে গেছে। চালা বাড়ি জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঝুপুর ঝাপুর আম গাছ। খেজুর গাছ। মন্দিরটা আমাদের পাশেই পড়ল। সিমেন্ট বাঁধানো ছোট্ট লাল চাতাল। টগর, কল্কে আর জবা গাছ। মাঝ রাতেই ফুট ফুটিয়ে বসে আছে।

ছোটদাদু বললেন, 'মিনিট পনেরো বসে গেলে কেমন হয়! জায়গাটা ভারী মিষ্টি। যে-ই করুক তার টেস্ট আছে।'

হরিশঙ্কর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার ঘড়িতে কটা বাজছে?'

কবজির দিকে তাকিয়ে ভেতরটা ছাঁত্ করে উঠল। ঘড়িটা নেই। কোথায় গেল ঘড়ি! ভাববার চেষ্টা করলুম। হাতেই তো ছিল। সুইশ ঘড়ি। ওই নামের ঘড়ি আর বাজারে পাওয়া যায় না। এভার হার্ড। সোনার ঘড়ি। জ্যাঠামশাই আমাকে দিয়েছিলেন। মিষ্টি রঙের ডায়াল। সোনার কাঁটা। অপ্রচলিত গড়ন। পিতা হরিশঙ্কর হাতঘড়ি ব্যবহার করেন না। বাবু, বাবু দেখায় বলে।

হরিশঙ্কর বললেন, 'কি হল? দেখতে পাচ্ছ না?'

ভয়ে গলা শুকিয়ে গেছে। কোনওরকমে বললুম, 'ঘড়িটা দেখতে পাচ্ছি না।'

'সময় দেখতে পাচ্ছ না, না ঘড়িটাই দেখতে পাচ্ছ না!'

'আজ্ঞে, ঘড়িটাই দেখতে পাচ্ছি না।'

'তার মানে, মোহনের ওখানেই ফেলে চলে এলে!'

'মনে হচ্ছে পরেছিলুম।'

'এখন, এই মুহূর্তে কি মনে হচ্ছে!'

'মনে হচ্ছে, ছোটদাদু আমার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসছিলেন, সেই সময় যদি ব্যান্ড ছিঁড়ে পড়ে গিয়ে থাকে!'

ছোটদাদু বললেন, 'ঘড়ি কি তুমি আজকাল ডান হাতে পরছ? তোমার ডান হাতই তো আমি ধরেছিলুম। তন্ত্রে নির্দেশ আছে কারোকে সঙ্গে নিয়ে বেরোতে হলে, ডান হাত ধরে বাঁ পা আগে ফেলতে হয়। এর ব্যতিক্রম তো হবার কথা নয়। ঘড়িটা তুমি ফেলেই এসেছ।'

হরিশঙ্কর আর দ্বিতীয় কথা বললেন না। কোনও হাহাকার নেই, হায় হায় নেই। গেলে গেছে। পাওয়া গেলে পাওয়া যাবে। আপন মনে হাঁটতে শুরু করলেন। পথের পাশের মন্দির পেছনে পড়ে রইল। আমি আর ছোটদাদু পাশাপাশি হাঁটছি। ঘড়ি হারাবার বেদনায় অতিশয় কাতর ; যেন ঘড়িটার জন্যেই পৃথিবীতে বেঁচে ছিলুম এতকাল। কত স্মৃতি ! দামও যথেষ্ট। ঘড়ি তো গেলই, সঙ্গে চলে গেল জ্যাঠামশাইয়ের স্মৃতি।

ছোটদাদু বললেন, 'খুব মন খারাপ ?'

'ঘড়িটা তো খুবই দামী ছিল। সোনার বডি। কম্পানিও উঠে গেছে। কত সাবধানে ব্যবহার করতুম ! অ্যাকিউরেট টাইম দিত।'

'তুমি কতক্ষণ বেহুঁশ ছিলে ?'

'বেহুঁশ মানে ?'

'মানে নাগরদোলায় চড়লে। দু'পাক মারলে। চীনেবাদাম কিনলে। কদমতলায় কাঠের চাকার ওপর বসলে। তারপর হুঁশ হারালে। এই অবস্থায় কতক্ষণ কাটালে ?'

ছাত্রজীবনে প্রথম সিগারেট খেয়ে ধরা পড়ে যাওয়ার পর যে অবস্থা হয়, আমার সেই অবস্থা। ছোটদাদু জিজ্ঞেস করছেন, 'তখন তোমার হাত ঘড়ি ছিল ?'

'খেয়াল নেই দাদু।'

'কি করে থাকবে ? তুমি তো সম্মোহিত ছিলে। তোমার হাতে ঘড়ি ছিল না। তুমি কি খেয়েছো মনে আছে ?'

'না।'

'তুমি একটা ভয়ঙ্কর পাল্লায় পড়েছিলে। তোমার জন্যেই ছিটকে বেরিয়ে আসতে হল আমাকে। এই দেখো, তোমার ঘড়ি আমার পকেটে।'

ছোটদাদু ঘড়িটা বের করে আমার হাতে দিলেন। হারিয়ে পাওয়ার কি আনন্দ ! সবচেয়ে প্রিয়জনের মুখের মতো সেই ঘড়ি। তাড়াতাড়ি হাতে পরতে গেলুম। ছোটদাদু বললেন, 'সকাল না হওয়া পর্যন্ত আমার পকেটেই থাক। পথের বিপদ কাটেনি এখনো।'

ছোটদাদু ঘড়িটা আবার পকেটে পুরলেন।

'সময়টা বাবাকে তাহলে বলে দিন।'

'ওর আর সময় জেনে কি হবে ! ও কি অফিসে যাবে বলে বেরিয়েছে।'

আবার আমাদের হাঁটার গতি বেড়ে গেল। যেন পেছন দিক থেকে অদৃশ্য কোনও শক্তি আমাদের ঠেলে নিয়ে চলেছে। চলার বেগ বাড়লেও আমার প্রশ্ন থামল না,

'ছোটদাদু, মেলার ঘটনা জানলেন কেমন করে !'

'অতি সহজে। তোমাকে অনুসরণ করে।'

'কই আপনাকে তো দেখতে পাইনি কোথাও !'

'তুমি যদি আমাকে দেখতেই পাবে, তাহলে আমার গোয়েন্দাগিরির কি মানে রইল ! ওটা বোঝার চেষ্টা কোরো না। শোনো, তুমি এমন এক সাধিকার পাল্লায় পড়েছিলে, যিনি ডাকিনী-হাকিনী চ বিদ্যাচতুষ্টয়ে সিদ্ধ। সহজিয়া বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের মতোই এঁদের বিশ্বাস,

এথুসে সুরসুরি জমুণা এথু সে গঙ্গা সাঅরু।
এথুসে পআগ বণারসি এথুসে চন্দ দিবাঅরু ॥

দেহেই সব। সুরেশ্বরী যমুনা, এখানে গঙ্গাসাগর, এখানেই প্রয়াগ বারাণসী, চন্দ্র, সূর্য, ক্ষেত্র, পীঠ, উপপীঠ, তীর্থক্ষেত্র ও সুখভূমি। তোমাকে বিন্দুসাধনার স্বাদ দিয়েছেন ওই শক্তিময়ী ; কিন্তু তোমার আধার অন্য। তাই তোমাকে ঝটকা মেরে নিয়ে এলুম। ওই

পথে গেলে তুমি পাগল হয়ে যাবে।'

'পাগল হয়ে যাবো কেন?'

'তোমার কাম বেড়ে যাবে; তুমি ধারণ না করে বর্জন করবে; তোমার শরীর ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হবে। তোমার ক্ষয়রোগ হবে। তোমার মেধা কমে যাবে। তুমি জড় হয়ে যাবে। নিজের ইন্দ্রিয়ের ওপর অসম্ভব সংযম না থাকলে ওই পথ ধর্মের পথ না হয়ে ব্যভিচারের পথ হবে। দেখলে না, তুমি আসতে চাইছিলে না। সামান্য যেটুকু স্বাদ পেয়েছ, তাইতেই অস্থির হয়ে গেছ।'

হরিশঙ্কর হঠাৎ থেমে পড়ে হাসতে লাগলেন।

ছোটদাদু জিজ্ঞেস করলেন, 'হাসির কারণ?'

'উল্টোটা যদি হয়!'

'মানে?'

'আমাদেরই ডাকাত ভেবে গ্রামের লোক যদি পেটায়!'

'হুঁ, কথাটা তুই মন্দ বলিসনি। সে-সম্ভাবনা অবশ্যই আছে।'

'তার মানে, ডবল রিস্ক। ডাকাতেও মারতে পারে, গ্রামের লোকও পেটাতে পারে; কিন্তু এতটা পথ চলে এলুম, এখনো একেবারেই নিরামিষ। ভেবেছিলুম ফাঁকা মাঠে অন্তত একটা ভূতও দেখতে পাবো। সাধারণত খেজুরগাছের তলায় দর্শন হয়। সাদা কাপড় পরা মেয়েছেলে।'

'তোকে আমি বলিনি, এক একবার আমরা চারজন হয়েছি। চতুর্থজন কে আমি বলতে পারবো না। ঘাড় ঘোরালেই অদৃশ্য। এইবার বুঝে নে।'

আমার বুক ঢিপ ঢিপ। পৃথিবীর যত রকম ভয় আছে সবই আমার আছে। কি পাল্লায় পড়া গেল। একজন ডাকাত হ্যান্ডল করবেন; আর একজন ভূত নাচাবেন। এইবার আমরা গভীরতর জঙ্গলে ঢুকলুম। হরিশঙ্করের কি আনন্দ! এই হল মানুষটির চরিত্রের অনন্য এক দিক। যত বিপদ তত আনন্দ। বল্লভভাই বলেছিলেন, 'ডেঞ্জার ইজ দি ব্রেদ অফ মাই লাইফ।' এই আর একজন তাঁর দোসর। আমাদের সামনে হাতে একটা গাছের শুকনো ডাল নিয়ে নেচে নেচে চলেছেন।

ছোটদাদু বললেন, 'আমি যখন টেররিস্টের দলে ছিলুম স্বদেশী-আন্দোলনের সময়, তখন এই জঙ্গলে তিনটে রাত কাটিয়েছিলুম। তখন বুঝেছিলুম, বিদেশী পুলিসের চেয়েও মারাত্মক হল দিশী মশা। এই জঙ্গলের ভেতরেও একটা ধ্বংসাবশেষ আছে। সেইটাই হয়েছিল আমাদের আশ্রয়। বাড়িটার চারপাশ ভেঙে গেলেও মাঝখানটা আস্ত ছিল। সাদা পাথরের মেঝে। অবাক কাণ্ড, ছোট্ট একটা ঘরে এক দেবী মূর্তি, সিংহবাহিনী। মনের আনন্দে তিন দিন পুজো করলুম।'

বহু দূরে একটা আগুন দেখা গেল। হরিশঙ্কর বললেন, 'যাক মনোবাসনা পূর্ণ হল। ডাকাতে আগুন পোহাচ্ছে, এইবার আমাদের জীবনে একটা নতুন অভিজ্ঞতা হবে। নিজেদের একটু প্রস্তুত করে নাও।'

৪৫

কোথায় পালাবে তুমি তোমারই এ স্মৃতির পাহাড়
অগস্ত্যেরও কাছে কখনো সে নোয়ায়নি ঘাড় ॥

হরিশঙ্কর হন্‌হন্‌ করে এগোচ্ছেন। ডাকাতদের সভা তাঁকে টানছে। একটা অ্যাডভেন্‌চারের গন্ধ পেয়েছেন। আমাকে প্রায়ই বলেন, নিজেকে বিপদের মধ্যে ফেলবে, কষ্টের মধ্যে ফেলবে, ঝুঁকি নেবে, বেরিয়ে আসবে লড়াই করে। একটু ক্ষতবিক্ষত হবে, হয় তো মরতে মরতে বেঁচে যাবে ; কিন্তু বাঁচাটা শিখবে। পাখির মা বাচ্চাকে ওড়া শেখায়, দেখেছ নিশ্চয়। ডানার জোর নেই, কাক তাড়া করছে, পাখি উড়তে শিখছে। একটা দুটো মরেও যেতে পারে। তবু এইটাই নিয়ম। বিপদের চেয়ে বড় শিক্ষক কেউ নেই। আলতো জীবন, ওয়ার্থলেস জীবন। লিভ লাইক এ হিরো। স্বামী বিবেকানন্দের ওই ছবিটা দেখেছো ? বুকে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছেন বীর সন্ন্যাসী। জীবনের সামনে ওই হল জীবনের দাঁড়াবার ভঙ্গি। দৃপ্ত, বেপরোয়া। 'লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর ! দুঃখরাশি জগতে ছড়ায়,/ নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে ; মৃত্যুরূপা মা আমার আয় !/ করালি ! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে/ তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে !/ কালী, তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মা গো আয় মোর পাশে। /সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,/ কাল-নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।'

সন্ন্যাসী হবার প্রয়োজন নেই, সাহসী হও। হরিশঙ্কর রবীন্দ্রনাথের গলায় গাইতে লাগলেন, 'ভয় হতে তব অভয়মাঝে নূতন জনম দাও হে ॥ দীনতা হতে অক্ষয় ধনে, সংশয় হতে সত্যসদনে জড়তা হতে নবীন জীবনে নূতন জনম দাও হে ॥' হরিশঙ্কর যা বিশ্বাস করেন, তা প্রতিফলিত করেন নিজের জীবনে। আমি তা পারি না। এক ধাতুতে গড়া, হরিশঙ্কর, ছোটদাদু সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ধাতুতে।

ছোটদাদু আমাকে ছেড়ে জোর কদমে হরিশঙ্করকে ধরে ফেললেন। আমি একটু পেছনে। চিরটা কালই আমি একটু গদাইলস্কর ধরনের। খুব জোরে হাঁটতে পারি না। ভূত আর ডাকাতের ভয়ে চেষ্টা করছি, যতটা সম্ভব জোরে হাঁটার। তবু হাত দুয়েকের ব্যবধান। ভেতরটা হাঁকপাঁক করছে। স্বপ্নেও আমার একই অবস্থা হয়। ভয়ের পরিবেশে সবাই আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আমি দৌড়োবার চেষ্টা করছি ; কিন্তু পা চলছে না। শেষে হামাগুড়ি দিয়ে এগোবার চেষ্টা করছি চতুষ্পদ প্রাণীর মতো। তাও পারছি না।

শেষে কান্না। আর তখনই ঘুম ভেঙে যায়। বিছানায় পড়ে থাকে পাথরের মতো ভারী একটা শরীর।

দুজনের বাক্যালাপ কানে আসছে।

ছোটদাদু : 'ডাকাতদের কি বলে সম্ভাষণ করবি ? গুড মরনিং !'

হরিশঙ্কর : 'অবশ্যই। সেইটাই তো ফর্ম্যালিটি।'

ছোটদাদু : 'কিছু নজরানা দিবি না কি ?'

হরিশঙ্কর : 'ইনসাল্ট করা হবে। ডাকাতরা গ্রহণ করে না, কেড়ে নেয়। যার যা ধর্ম। সামনে গিয়ে দাঁড়াবো। হকচকিয়ে যাবে। না চাইতেই শিকার।'

ছোটদাদু : 'তারপর কি হবে ?'

হরিশঙ্কর : 'তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। হয় ঝটাপটি, না হয় বন্ধুত্ব।'

দেখা গেল চারজন সাঁওতাল শুকনোপাতায় আগুন জ্বেলে কি একটা পোড়াচ্ছে। হরিশঙ্কর ভয়ঙ্কর হতাশ হলেন। আগুনে ঝলসাচ্ছে বুনো একটা খরগোস। ব্রেকফাস্টের আয়োজন। দৃশ্যটা সহ্য করতে পারলেন না হরিশঙ্কর। মনে হল, পারলে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কিন্তু, নিজেই সিদ্ধান্তে এলেন—খরগোস ইজ্ ডেড বাই দিস টাইম। সাদা ধবধবে একটা খরগোস, গোল গোল উজ্জ্বল দুটো লাল চোখ, সৃষ্টির সৌন্দর্যশালার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনের একটি, লাল আগুনে ঝলসে কালো।

হরিশঙ্কর প্রায় ছুটে পালিয়ে গেলেন। সাঁওতাল চারজন আমাদের গ্রাহ্যই করল না। একপাশে একটা বাঁশি পড়ে আছে, অদূরেই শুয়ে আছে শ্রান্ত তীরধনুক। সংগীত, হিংসা, ক্ষুধা, অগ্নি, সম্পূর্ণ এক জীবনদর্শন। সেই দর্শনে আতঙ্কিত হরিশঙ্কর বুদ্ধের মতো পলাতক।

ভোর হয়ে আসছে। গাছের পাতায় সামান্য সামান্য রূপালী আলোর ছোঁয়া ; যেন রাতের কেশপাশে দিনের বার্ধক্যের স্পর্শ। টিট্ টিট্ করে একটা পাখি দামি ঘড়ির অ্যালার্মের মতো বেজেই থেমে গেল।

ছোটদাদু আবার হরিশঙ্করের পাশে চলে গেছেন। দু'জনের বাক্যালাপ কানে আসছে। পায়ের তলায় শুকনো পাতার মচ্‌মচ্ শব্দ।

ছোটাদাদু : 'ছুটে পালিয়ে এলি !'

হরিশঙ্কর : 'সহ্য করা শক্ত। ন্যাচারাল ডেথ স্ট্যান্ড করা যায়, হত্যা অসহ্য। খরগোস, পাখি, প্রজাপতি, আমার প্রিয় প্রাণী।'

ছোটদাদু : 'জীবই তো জীবের আহার।'

হরিশঙ্কর : 'এ হল মানুষের কথা। মানুষের সব কথাই মানুষের নিজের স্বার্থে।'

ছোটদাদু : 'আহা ! দর্শন থেকেই তো দর্শন !'

হরিশঙ্কর : 'ঠিকই। কিলার্স ফিলোজফি। একদল বুদ্ধিমান, লোভী, ক্ষুধার্ত মানুষ জ্ঞানের কথা ধর্মের কথা দর্শনের কথা বলছে। সবই আপেক্ষিক, রিলেটিভ, সেল্‌ফিশ্। কোনোটাই আমি বিশ্বাস করি না। নিজের কোলে ঝোলটানা কথা। সময়ের লাইব্রেরিতে ভাবনার সেলফ্, দর্শনের পাখির বাসা, উড়ে গিয়ে বসলেই হল। আশ্রয়ের অভাব নেই। খুনীরও যুক্তির অভাব নেই। বুদ্ধই আমার আশ্রয়। নিরীশ্বরবাদী। বুদ্ধ কি বলছেন শোন্।'

হরিশঙ্কর নিমেষে এক ভাবলোকে চলে গেলেন। বিশাল, বিশাল গাছ। মাথায় ভোরের আলো ধরেছে। অন্ধকার চুঁইয়ে চুঁইয়ে নিচে নামছে। ঝিঁঝিঁর কলরোল। পাখির

টুইট্ টুইট্। ধ্রুপদের মতো একটা পরিবেশ। হরিশঙ্কর বলছেন, 'জন্ম এক যন্ত্রণা, ক্ষয় এক যন্ত্রণা, রোগ এক যন্ত্রণা, মৃত্যুও এক যন্ত্রণা, দুঃখ, শোক, কাতরতা, বিলাপ, হতাশা, শুধু যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা। যা পছন্দ করি না তার মধ্যে পড়ে থাকা যন্ত্রণা, যা পছন্দ করি তার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াও এক যন্ত্রণা। যা পেতে চাই তা না পাওয়া এক যন্ত্রণা, এই দেহ, পঞ্চভূতের এই পিণ্ড যা শুধু ভোগ করতে চায়, সব যন্ত্রণার উৎস এই দেহ। তার আবার জীবনদর্শন! দর্শনের কথা আমাকে বলিসনি। যন্ত্রণার কথা বল, বল দুঃখের কথা।'

ছোটদাদু প্রসঙ্গ থেকে সরে গেলেন। বললেন, 'ভোর হল। বেশ তাজা লাগছে। ভোরের ফোটা ফুলের মতো। একটা অভাব বোধ করছি, এই সময় এক কাপ গরম চা পেলে বেশ হত।'

'চল্, সামনেই গ্রাম, কিছু মেলে কি না দেখি।'

'গরম জিলিপি আর মোটা চা।'

আমরা তরতর করে এগিয়ে চললুম। সিনেমা শেষ হওয়ার মতো ঝপ্ করে জঙ্গল শেষ হয়ে গেল। বিশাল একটা ডাঙ্গা। কোথা থেকে শীর্ণ একটা নদী জেগে উঠেছে। অপূর্ব দৃশ্য। রুপোর মতো আলো। ছোটদাদু মিছরির মতো মিষ্টিগলায় গেয়ে উঠলেন, 'তব চরণ ধোয়াবে শারদ-শিশির, শেফালী অর্ঘ্য দেবে/ ধরণী শ্যামল আসন বিছাবে, তুমি আসিবে যবে/ রক্ত উষাতে সিন্দুরের টিপ পরাবে মা তোর ভালে/ চাঁদিমা আরতি দিয়ে যাবে মাগো সুনীল গগন-তলে ॥ কত শতশত কমল কুমারী তোমারে পূজিতে চাহে। দিকে দিকে তব আগমন-গীতি দোয়েল শ্যামা গাহে ॥'

হরিশঙ্করের রাতজাগা সাত্ত্বিক মুখে অদ্ভুত একটা ভাব খেলা করছে। বিশাল প্রান্তর, শীর্ণ নদী, ভিজে ঘাস আর ওই গান। স্বাভাবিক জগতের। ভেতর থেকে আর একটা অন্য জগৎ বেরিয়ে এল। গানটা যেন ঠিক এই পরিবেশে, এই সময়ে গাইবার জন্যেই রচিত হয়েছিল। ভৈরবীর মন কেমন করানো সুরে। জীবনের সব ভোর যদি এই ভাবেই হত!

'একটা কাজ করা যাক্, নদীর জলে মুখ ধুয়ে নেওয়া যাক।' হরিশঙ্কর বললেন।

ছোটদাদু বললেন, 'প্রকৃতির বড় কাজ কি সারার প্রয়োজন আছে কারো?'

হরিশঙ্কর বললেন, 'আমার ডাক আসেনি।'

ছোটদাদু আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার?'

ফাঁকা মাঠে প্রকৃতির ডাক? অসম্ভব ব্যাপার। ভাবাই যায় না। আমরা নদীর কিনারে চলে এলুম। টলটলে জল। অসম্ভব ঠাণ্ডা। দূর আকাশে ধূসর হয়ে আছে শুশুনিয়া। চানটা করে নিতে পারলে মন্দ হত না। ছোটোখাটো একটা আলোচনাও হল। অবশেষে সিদ্ধান্ত হল, অতটা সময় দেওয়া যাবে না। লটঘট ব্যাপার। এইবার আমাদের এগোতে হবে মিলিটারি কায়দায়, দ্রুত পায়ে। মনে রাখতে হবে, আমরা চলেছি একটা পরিবারকে উদ্ধার করতে। বেড়াবার বিলাসিতা করতে নয়।

ডাঙ্গাটা পেরিয়ে আসতেই একটা গ্রাম পাওয়া গেল। একটু শ্রীহীন। গাছের তলায় উননু। উনুনে সাতসকালেই গুড় জ্বাল দিচ্ছে একদল নারী-পুরুষ। তালের গুড় তৈরি হচ্ছে। জায়গাটা পেরিয়ে এসে আমরা একটা পিচের রাস্তায় উঠলুম। হেলেদুলে ক্যাঁচকোঁচ শব্দে একটা গরুর গাড়ি চলেছে। মনে হয় একটু পরেই গঞ্জের মতো কোনও জায়গা পাওয়া যেতে পারে। পাকা বাড়ি দেখতে পাচ্ছি। একটা ফুটবল খেলার মাঠ। উচ্চ বিদ্যালয়। সাইকেল আরোহী। সরকারি দপ্তর।

দোকানও পাওয়া গেল। পাওয়া গেল গরম জিলিপি আর মোটা চা।

ছোটদাদু বললেন, 'জিলিপি কিন্তু জোলাপের কাজ করে। সেই বুঝে খেয়ো।'

হরিশঙ্কর বললেন, 'জিলিপির লোভ আমার নেই। চা হলেই হবে।'

ছোটদাদু বললেন, 'এনারজির জন্যে প্রয়োজন। সারা রাত আমরা হেঁটেছি। রেলের ইঞ্জিন হলে এতক্ষণে কতটা কয়লা খেত!'

বাইরে খাওয়া হরিশঙ্কর একেবারে পছন্দ করেন না, কিন্তু উপায় নেই। সেই জিলিপি আর চা। বাবু-খদ্দের দেখে দোকানদারের খুব খাতির। গরমজলে তিন তিনবার গেলাস ধোয়া হয়ে গেল। বেশ মজবুত চা এসে গেল। পাকা রাস্তা গঞ্জের বুক ফেঁড়ে দৌড় মেরেছে বিহারের দিকে। তারই পাশে এই দোকান। বেশ পরিচ্ছন্ন। দোকানের মালিক এক সময় সেনাবাহিনীতে ছিলেন। হরিশঙ্করের সঙ্গে জমে গেল খুব। শ্রম, নিষ্ঠা, নিয়মানুবর্তিতা, এই তিন হল মন্ত্র। পৃথিবীতে কেউ কারোর নয়। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা যেমন অদৃশ্য আকর্ষণে ঘুরছে, মানুষ মানুষের চারপাশে ঘুরছে স্বার্থের টানে। যতক্ষণ স্বার্থ ততক্ষণই প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা। স্বার্থ ফুরোলেই, তুমি কে? কে তোমার! বিবেক আর কর্তব্য ভুলো না। প্রত্যাশায় জলাঞ্জলি। সুখের চাবিকাঠি।

দু'জনে মেতে উঠেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আলোচনায়। নেতাজী, আই এন এ, হিটলার, ব্লিৎসক্রিগ। দুজনের আলোচনা শুনলে মনে হবে, দু'জনে এই মাত্র যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরলেন। দোকানের মালিক তিন তিনবার মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন। মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন শুনে হরিশঙ্করের ভীষণ দুঃখ। সেইভাবে মৃত্যুর মুখোমুখি তিনি কেন হতে পারলেন না! বহুবার বহুভাবে চেষ্টা করেছেন। সেই সুযোগ একবারই এসেছিল বেনারসে। ছাত্রজীবনে। কাশীর বাড়ির তিনতলার ছাদে, বাঁদরের সঙ্গে যুদ্ধ। একটা নয়, একদল। সুগ্রীব ভার্সাস হরিশঙ্কর। পাথরের সিঁড়ি দিয়ে হরিশঙ্কর আর বানরাধিপ জড়াজড়ি করে গড়াতে গড়াতে সোজা একতলায়। জয়পরাজয়ের মীমাংসা হয়নি রেফারির অভাবে। হরিশঙ্করকে তিন দিন হাসপাতালে কাটাতে হয়েছিল। ফিরে এসেছিলেন নাকের ওপরে কপালের মাঝখানে নিখুঁত অর্ধচন্দ্রাকৃতি একটি ক্ষতচিহ্ন নিয়ে। সেই চিহ্নটি স্থায়ী হয়ে আছে। সকলেই বলেন, শুভ চিহ্ন। শিবের দান।

ভদ্রলোক প্রয়োজনীয় কিছু নির্দেশ দিলেন। আমরা যেখানে যাচ্ছি, সেখানে একটি আশ্রমে আধুনিক থাকার ব্যবস্থা আছে। আমরা ইচ্ছে করলে থাকতে পারি। ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা পথে নামলুম।

পাকা রাস্তার সুখ বেশিক্ষণ সহ্য হল না। নেমে আসতে হল কাঁচা পথে। ধানক্ষেত, গমক্ষেত, আমবাগান। পুকুর। এ-দেশ হল পুকুর-থানার দেশ। বেশ কিছুটা হাঁটার পর আমরা এসে গেলুম সেই গ্রামে। অজগাঁ নয়। বড়মানুষের বসবাস আছে। বেশির ভাগ শিক্ষিত মানুষই কলকাতায় চাকরি করেন। পাকা বাড়ির সংখ্যা কম নয়। বড় স্কুল, হাসপাতাল আছে।

রাধাবিনোদবাবুর বাড়ি বলতে সকলেই চিনতে পারলেন। সুপুরুষ, আলাপী মানুষ ছিলেন তিনি। উপকারী, দাতা। তবে? এই তবেটাই মারাত্মক। ছোট ভাইটা একটা জানোয়ার। যাবতীয় বদগুণের অধিকারী। কালীসাধকের ভেকধারী অকৃত্রিম এক শয়তান। বিয়ে করেননি। একজন ভৈরবী আছেন। সেই ভৈরবীই ওঠ-বোস করায়। সে-দৃশ্য জীবনে ভোলার নয়। মানুষের হাতে মানুষের নির্যাতন। একটা উঠোন।

উঠোন পেরিয়ে দাওয়া। চারজন প্রাণী হতাশ হয়ে বসে আছে। ছোট ছোট দুটি মেয়ে, একটি ছেলে আর আমার পিসিমা। পিসিমার মাথায় পুরু একটা ব্যাণ্ডেজ। চারজন বসে আছেন, যাদের কাছে সবদিনই একরকম। কোনও আশার বাণী বহন করে আনে না। শুধু যন্ত্রণা। যন্ত্রণারই রকমফের।

পিসিমা আমাদের দেখে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেন, 'ছোড়দা তোমরা? ছোটমামা আপনিও এসেছেন!' পিসিমাকে অবিকল শ্রীশ্রীসারদামায়ের মতো দেখতে।

ছোটদাদু বললেন, 'আশা, মাথাটা ফাটালি কি করে?'

আমাদের আগমন যেন ভোরের সূর্যের আলো। সেই আলো খেলছে আমার পিসিমার মুখে। কোনও উত্তর নেই। নীরবে দাঁড়িয়ে আছেন। ইতস্তত করছেন। বড় মেয়ে জবাব দিল, 'ওই জানোয়ারটা চেলা কাঠ মেরে মায়ের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। সাতটা পলাই পড়েছে।'

পিসিমা মেয়েকে ধমক দিলেন, 'ছিঃ, কাকাকে জানোয়ার বলতে নেই কাঁদু।'

'না, বলবে না।' মেয়ে যেন মা দুর্গা! কথায় সাঙ্ঘাতিক তেজ।

হরিশঙ্কর দপ্ করে উঠলেন, 'কোথায় সেই সোয়াইন? আমি আজ কীচক বধ করব।'

ছোটদাদু বললেন, 'অতটা উত্তেজিত হোসনি। মাথা ঠাণ্ডা রাখ। আগে দেখতে হচ্ছে ওর শক্তি কতটা? দলবল কতটা ভারী?'

হরিশঙ্কর বললেন, 'দল! যে নারীর গায়ে হাত তোলে সে কাওয়ার্ড। তার দলে যদি একশোজনও থাকে, মেরে ছাতু করে দোবো। সে শক্তি আমার আছে। আই ক্যান ফাইট।'

ছোটদাদু বললেন, 'আমি জানি, তুমি তা পারো; তবে আমাদের আইনের কথা ভাবতে হবে। ফৌজদারি মামলায় জড়িয়ে পড়লে চলবে না।'

'মামলা? এই মাথা ফাটানোর মামলা হবে না? তাকে তো এখনি অ্যারেস্ট করানো যায়।'

'না, যায় না। এখন আর যায় না; কারণ সঙ্গে সঙ্গে থানায় ডায়েরি করা হয়নি। তা ছাড়া এটা তার এলাকা। সাক্ষীসাবুদের প্রশ্ন আছে। হটকারিতায় ফল ভাল হবে না। ব্যাপারটা আমার হাতে ছেড়ে দে।'

'তুই কি করবি? লবঙ্গ খাওয়াবি? কুলকুণ্ডলিনী জাগাবি?'

'কি করবো তা জানি না। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।'

'শোন্, ধর্ম হল শৌখিন জিনিস। ফুল, বেলপাতায় শয়তান সন্তুষ্ট হয় না। শয়তানের প্রয়োজন বেধড়ক ধোলাই।'

'প্রয়োজন হলে তাই হবে। তার আগে ভাবা দরকার আমাদের প্ল্যানটা কি! আমরা এখানে এসেছি কি কারণে!'

'এসেছি আমার বোনকে উদ্ধার করতে।'

'এই তো সামনেই দাঁড়িয়ে আছে, উদ্ধার করো।'

'তার আগে এই মারের আমি বদলা নোবো। হরিশঙ্করের একটাই মন্ত্র, টিট ফর ট্যাট।'

'উত্তেজনায় তুই ভুলে গেছিস, আশাকে আমরা এখানে প্রতিষ্ঠিত করতে এসেছি। ওর বিষয়সম্পত্তি পাওনাগণ্ডা আমরা বুঝে নিতে এসেছি।'

পিসিমা বললেন, 'সে তো আর হবার উপায় নেই ছোটমামা। সবই তো সই করিয়ে

নিয়েছে।'

'কে সই করেছে ?'

'এদের বাবা।'

হরিশঙ্কর বললেন, 'তাহলে তো হয়েই গেছে। ফিনিনশ্ড়।'

ছোটদাদু বললেন, 'তোরা দাওয়ায় বসে আছিস ? ঘরে তালা ? ব্যাপারটা কি ?'

'কাল রাতে মেরে বের করে দিয়েছে আমাদের। ঘরে ঢুকতে দেবে না।'

হরিশঙ্কর বললেন, 'তোদের জিনিসপত্তর ?'

পিসিমা করুণ হেসে বললেন, 'কি-ই বা আছে ছোড়দা ! যা আছে সব ওই ঘরে বন্ধ।'

'সারা রাত এইখানে বসে আছিস ?'

'কি করব ছোড়দা ? আর তো কোনও উপায় নেই।'

'গ্রামের আর সব মানুষ কি মরে গেছে ?'

'তাদের হাত করে ফেলেছে। সবাই ভয় পায়। তন্ত্রমন্ত্র, তুকতাক করে তো হাতে খাঁড়া নিয়ে ঘোরে।'

হরিশঙ্কর একটা হুঙ্কার ছাড়লেন,'তন্ত্রের নিকুচি করেছে। ভাঙো তালা।'

ছোটদাদু বললেন, 'সেখানেও একটা আইনগত সমস্যা আছে রে ? প্রপার্টি তো তার।'

হরিশঙ্কর আগুনের মতো উত্তপ্ত, বললেন, 'আইন তাহলে সবসময় অপরাধীর দিকেই থাকবে ! আর আমরা কেবল ধর্মের লেজ নাড়বো ! এই দেশ থেকে যেদিন ধর্ম যাবে সেইদিন থেকে আমরা সুখে থাকবো। তাহলে চলো সেই রাস্কেলটাকে আগে খুঁজে বের করি। পাড়া-প্রতিবেশীকে ডাকি।' ছোটদাদু দাওয়ার একপাশে বসে পড়লেন। হরিশঙ্কর উঠোনে খানিক পায়চারি করে নিলেন সম্রাটের মতো। আমার শরীরে আর কোনও বল নেই। একটা ঠেলা মারলেই পড়ে যাবো। সারা রাত জেগে তার ওপর ওই প্রচণ্ড হাঁটা। পায়ের খিল খুলে যাওয়ার মতো অবস্থা। ছোটদাদুর পাশে থপাস করে বসে পড়লুম। জেলিফিশের মতো। আমার ভাইবোনেরা কেউই আমার সঙ্গে কথা বলছে না। সেই কতকাল আগে যখন ছাত্র ছিলুম তখন একবারই দেখা হয়েছিল কলকাতায়। বয়েস তখন খুবই কম। একেবারেই শিশু। তিনজনে করুণ চোখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। এখন কেউই আর শিশু নয়। বড় বোন কিশোরী। তারপরে সবাই বছরের ব্যবধানে সাজানো। অর্থাৎ মাথায় মাথায়।

হরিশঙ্কর দাঁড়িয়ে পড়লেন। ছোটদাদুকে বললেন, 'তাহলে ব্যাপারটা এই দাঁড়াচ্ছে, আমরা এখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাঁ করে বসে থাকবো সেই ধর্মাবতার, সেই মদ্যাবতারের আবির্ভাবের অপেক্ষায়। তিনি এসে কৃপা বর্ষণ করবেন।'

পিসিমা বললেন, 'সে তো এখন সেই বাগদীপাড়ায় তার সেই মেয়ে মানুষের ঘরে আছে। বারোটার আগে আসছে না। আসবে তার চেলাচামুণ্ডা নিয়ে। এই উঠোনেই হয়তো ছাগবলি হবে। ওরাই রাঁধবে। গেলাসে গেলাসে মদ ঢালা হবে। তখন আর আমরা ত্রিসীমানায় থাকি না। লাল ঢ্যালা, ঢ্যালা চোখ। বিশ্রী গালাগাল। হাত ধরে টানাটানি।'

হরিশঙ্কর বললেন, 'এখানে তোদের আপনার লোক বলে কি কেউ নেই ! জ্ঞাত-গুষ্টি সব মরে গেছে ? না, রাধা এমন ব্যবহার করে গেছে যে কেউই আর তোদের ছায়া মাড়ায় না।'

'কার অত সাহস আছে ছোড়দা ! সকলেই ছেলে পুলে নিয়ে সংসার করে। তুকতাক

করে দিলে মুখ দিয়ে রক্ত উঠে মরে যাবে।'

হরিশঙ্কর হাঁটুতে চাপড় মেরে বললেন, 'উঃ, দেশটা কি কুসংস্কারে পড়ে আছে। জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্ল্যানিং সব ব্যর্থ। এই অন্ধকারে কিছুই ঢুকতে পারছে না। তাহলে তোদের আর এখানে রেখে লাভ কি?'

৪৬

Keep your fears to yourself, share your courage with others.

অদ্ভুত একটা বিষণ্ণ পরিবেশে আমরা থম মেরে বসে রইলুম কিছুক্ষণ। সামনে কোনও পথ নেই। বরাত আর মানুষ, দু'তরফ হাতিয়ার ধরেছে। মেরে পাট করে দেবে। আমার পিসিমা আর বিমর্ষ ভাইবোনদের পাশে নিজেকে অপরাধীর মতো সুখী ও শৌখিন লাগছে। যেমন ড্রেস, সেই রকম ভোগীর মতো চেহারা আমার। শ্যাম্পু করা চুল। ফুর ফুর কপালে খেলছে। পরিষ্কার, দামী জামা-কাপড়। শহরের জল আর দুধেল সাবানে রঙের জেল্লা। মনে শহুরে অহঙ্কার। নিজেকে মনে হচ্ছে ত্রাণ-মন্ত্রী। বিমানে করে বন্যা দুর্গতদের দেখতে এসেছি। কথা বলতে গেলেই, গলায় এসে আটকে যাচ্ছে, বক্তৃতার মতো শোনাবে। বন্ধুগণ! কষ্ট করো, ত্যাগ স্বীকার করো। জীবন হল সংগ্রাম। যেমন বলেন আর কি ক্ষমতার আসনের নেতারা!

হরিশঙ্কর হঠাৎ লাফিয়ে উঠলেন, 'পেয়ে গেছি। পথ পেয়ে গেছি।'

ছোটদাদু বললেন, 'তোমার পরিষ্কার মাথা। পথ তো পাবেই। জানতে ইচ্ছে করছে।'

'আমরা ডেকরেটারকে দিয়ে এই উঠোনে একটা প্যাণ্ডাল করাবো। রাইট নাও। এখনি।

'তাতে লাভ?'

'সেই প্যাণ্ডেলে আমরা বসবাস করবো। পুরো বাজারটাকে তুলে এনে, বেশ বড় মাপের রান্নাবান্না, খাওয়া দাওয়া লাগিয়ে দোবো। ঘোর উৎসব। পালা করে প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করবো।'

'কি হবে তাতে?'

'হিংসেয় জ্বলেপুড়ে যাবে সেই মহাসাধক।'

'তাতে আমাদের কি মঙ্গল হবে হরিশঙ্কর?'

'পৃথিবীর দুটো দিক, একটা, স্পিরিচ্যুয়াল অন্যটা মেটিরিয়াল। ইট, কাঠ, বালি, পাথর, চুন, সুরকি, দেহবল, অর্থবল, রূপ, যৌবন, ঐশ্বর্য। আমাদের এই লড়াই সেই তামসিকতার বিরুদ্ধে। এখানে তামসিক ঐশ্বর্যের স্রোত বইয়ে চোখ ঠিকরে দোবো। যেখানেই অর্থ সেখানেই লোভীদের ভিড়। মানুষ তো ঐশ্বর্যের পদানত। ক্ষমতার পদানত। এখানে

হরিনাম সংকীর্তনে কোনও কাজ হবে না। টাকা, ক্ষমতা, রাজসিক অহঙ্কার!'

'তারপর। শেষটা কি হবে?'

'শেষে, আমরা এই তালুক, মৌজা সব কিনে নোবো।

'অত ঘুরপথে না গিয়ে সরাসরি এখনই সেই শয়তানটাকে ডেকে কিনে ফেলো না।'

'না, ওকে আমি স্যাণ্ডউইচ করে মারবো। চারপাশ থেকে ঘিরবো। মামলায় জড়াবো। এখান থেকে উৎখাত করবার জন্যে দাঙ্গা করবে। আমি ইচ্ছে করে আহত হবো। মার খাবো, ডায়েরি করবো, মামলা ঠুকবো। লোকটার শেষ দেখে আমি ছাড়বো। আমি ওর সঙ্গে সাংঘাতিক একটা কনফ্রন্টেশানে যেতে চাই। তার মধ্যে পাওয়ার থাকবে, বুদ্ধি থাকবে, কূটনীতি থাকবে, আইন থাকবে, প্যাঁচ থাকবে। লোকটাকে একেবারে জেরবার করে মারতে হবে।'

'মশা মারতে কামান দেগে কোনও লাভ আছে? ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ!'

হরিশঙ্কর বড় বড় চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'সাবেক আমলের এই রকম একটা যুক্তিই আমি আশা করেছিলুম। পাশকাটানো পরামর্শ। এই ভাবেই আমরা লোচ্চা ক্রিমিন্যালদের বাড়ার সুযোগ করে দি। জেনে রাখ মহামানবদের মারতে কয়েক সেকেন্ড লাগে; কারণ এক অর্থে তাঁরা নির্বোধ, তাঁরা মানুষকে বিশ্বাসের ব্ল্যাঙ্ক-চেক দিয়ে রেখেছেন।'

হরিশঙ্কর গলাটাকে সামান্য বিকৃত করে বললেন, 'ভালবাসা, প্রেম, বিশ্বপ্রেম, অমৃতস্য পুত্রাঃ! লিভিং ইন এ ফুলস প্যারাডাইস। পণ্ডিতমশাই ঠিকই বলেছেন, পৃথিবীটা শয়তানের। মশা-মাছির মতো মহামানব মরেন, মহাত্মা গান্ধী, লিঙ্কন, মার্টিন লুথার, শ্রী চৈতন্যকে সমুদ্রে ঠেলে ফেলে দিলে, না জীবন্ত পাঁচিল তুলে দিলে আনারকলির মতো, সে-রহস্য আজো রহস্য। অত প্রেম! যীশু খ্রীষ্টকে কোলে করে ক্রুশে তুলে দিলে, তোমার এই মানুষ শয়তানের দল। বিদ্যাসাগরের গায়ে কাদা ছেটালে। নন্দকুমারের গলায় ফাঁসির দড়ি লটকে দিয়ে এল এক ব্রাহ্মণ। মশা মারা খুবই কঠিন কাজ রে! মশারাই থাকে, সহজে নির্মূল হয় না। তোর আর আমার রক্তেই তাদের প্রজনন, বংশবৃদ্ধি ঝাঁকে ঝাঁকে এই মশাটিকে মারার জন্যে আমি সর্বশক্তি নিয়োগ করবো। আমার এক ফোঁটা রক্ত ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু হিজ ওয়ান বাকেট। এই জেলার এই মাটিতে আমি একটা ইতিহাস সৃষ্টি করে যাবো। ফর এজেস টু কাম, মানুষ মনে রাখবে, নারী হল শক্তি। শক্তির অপমানে, নির্যাতনে ধ্বংস হতে হয়। একথা তোমার শাস্ত্রে আছে। শাস্ত্রেই আছে, হয় না কিছুই। নির্বিচারে নারী-নির্যাতন হয়েই চলেছে। ভাগ্য নিয়ে, দেহ নিয়ে খেলা। সেই শাস্ত্রবাক্যের একটা উদাহরণ আমি রেখে যাবো। মুরগীর মতো সেই জানোয়ারের পালক ছাড়াবো। হরিশঙ্কর এখন বিষধর কেউটে। সেই কেউটের লেজে পা পড়েছে।'

অশান্ত হরিশঙ্কর পায়চারি শুরু করলেন আবার। ব্যায়াম করা চকচকে শরীর ফুলে উঠেছে। বাঘের মতো বিক্রম। এ সেই ছেচল্লিশের দাঙ্গার সময়ের চেহারা। রাত বারোটার সময় আমাদের পাড়া আক্রান্ত হল। হাতে একটা শোর্ড নিয়ে হরিশঙ্কর বেরিয়ে এলেন। সেই সময় তিনি 'ডুমা'-র বই খুব পড়ছেন, থ্রি মাস্কেটিয়ার্স, কাউন্ট অফ মন্টিক্রিস্টো, ব্ল্যাক টিউলিপ। সেই শোর্ড ফাইটের সুযোগ সেদিন এসেছিল। নেতৃত্ব দেওয়ার কি ক্ষমতা। সমস্ত পাড়া তাঁর পেছনে। ক্লাবের ছেলেরা। হাতে হারোয়া খেলার লাঠি। মরচে ধরা তরোয়াল। ঘরে ঘরে নারীবাহিনী বঁটি, কাটারি হাতে প্রস্তুত।

তেমন প্রয়োজন হলে জহরব্রতের জন্যে টিন টিন কেরোসিন মজুত। হরিশঙ্করের নিজের তৈরি মলোটভ ককটেল। বাংলায় বোতোল বোমা। স্বদেশী চেতনায় সবাই টগবগ করছে। ইংরেজ দ্বিজাতি তত্ত্ব-র তরোয়াল চালিয়ে দেশ টুকরো করতে চাইছে। যারা এতকাল পাশাপাশি বসবাস করে এসেছে বন্ধুর মতো, তারাই ধর্মের দোহাই পেড়ে ছুরি ধরেছে। কলকাতায় এক ধর্মের মানুষ স্লোগান দিচ্ছে—ঠোঁট মে বিড়ি, মু মে পান লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান।

সেই হরিশঙ্কর আজ বেরিয়ে এসেছেন আবার বাঁকুড়ার মাটিতে। এবার তাঁর স্ট্র্যাটেজি ভিন্ন। ধর্মের নামে কত অধর্ম তিনি দেখেছেন। ধর্মের নামে ব্যভিচার তিনি দেখেছেন। দেখেছেন সাধুর ক্ষমতার লড়াই। দেখেছেন আশ্রমে ভোগের জীবন। দেখেছেন, ধনীর খাতির, গরিবের প্রতি অবহেলা, দুঃসহ ঘৃণা। যে কারণে তিনি গুরু গ্রহণ করেননি। পাহাড়ে গেছেন, জঙ্গলে গেছেন, কখনও কোনও আশ্রমে যাননি। কখনও কখনও এই সাধক ছোটমামাকে গুরু হিসেছে মেনেছেন। দীক্ষা গ্রহণ করেননি। অভিমত, কানে ফুসমন্তরে ধার্মিক হওয়া যায় না। ধর্ম মনে গ্রহণ করতে হয়। সেটা একটা টোট্যাল প্রসেস। কম্‌প্লিট রূপান্তর। বাঘকে হরিণ হতে হবে। খাদককে হতে হবে খাদ্য। দস্যুকে হতে হবে প্রেমিক। অর্ধমানব, অর্ধদানব হলে হবে না।

সেই অশান্ত হরিশঙ্কর সামনে ঘুরপাক খাচ্ছেন। প্রশান্ত ছোটদাদু বসে আছেন ছোটখাট একটা টিলার মতো। অচঞ্চল। হরিশঙ্কর আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, 'তাহলে তোমরা আমাকে কেউ সমর্থন করছ না ? একলা চলো রে ! তাই তো !' ছোটদাদু মৃদু হেসে বললেন, 'ঠিক তা নয়। নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে আছি তোর শান্ত হওয়ার অপেক্ষায়। তোর চিন্তা, বোধ, বুদ্ধি সব আচ্ছন্ন হয়ে আছে এই মুহূর্তে। এই ধোঁয়াটা কেটে গেলেই তুই দেখতে পাবি, তোর পথটা কত জটিল। সময়, অর্থ শ্রমের অপচয়। তখন তোর মাথা থেকেই অন্য পথ বেরোবে। যা স্বাভাবিক, যুক্তিপূর্ণ।'

হরিশঙ্কর কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে বললেন, 'আমাদের স্বার্থপরতাই এই পরিবারটাকে অস্তিত্বের শেষ সীমায় নিয়ে গেছে। কখনও সে-ভাবে খবর নেওয়া হয়নি। বছরে দু'চারটে পোস্টকার্ড চালাচালি। আশা করি ঈশ্বরের কৃপায় সকলে কুশলে আছে। প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। উত্তরের অপেক্ষায় রইলুম। হয়ে গেল। কর্তব্য শেষ। পাহাড়ে যাই, সমুদ্রে যাই, লুচি মোহনভোগ খাই। দামোদর পেরিয়ে বোনকে দেখতে আসি না। বিয়ে হয়ে গেছে, আর তার খবর রাখার প্রয়োজন কি ? মরল না বাঁচল !'

পিসিমা ঝেড়েঝুড়ে উঠে দাঁড়ালেন, 'ছোড়দা শান্ত হও। ভাগ্য মানতেই হবে। চিরটা কালই তো আমার এইভাবেই কাটছে। তুমি কি করবে ! যাঁর সঙ্গে বিয়ে হল, তিনি তো খারাপ ছিলেন না। অসুখেই সব শেষ করে দিলে। ভগবান যাকে মারবেন, মানুষ তার কি করবে ! আমি জল আনি, তোমরা হাত-পা ধোও। আমি চা জলখাবারের ব্যবস্থা করি।'

হরিশঙ্কর বললেন, 'সেটা কি ভাবে সম্ভব হবে ! তোর তো কিছুই নেই। শ্মশানে বসে আছিস ধূমাবতী হয়ে।'

'তিন দিন আগে গলার চেন বাঁধা রেখে কিছু টাকার জোগাড় করেছিলুম তোমার কাছে যাবো বলে। মাথায় ব্যান্ডেজ নিয়ে যাই কি করে ! তাই অপেক্ষা করছিলুম। এখন তোমরা এসে গেছ, আর ভয় কি ! নতুন হাঁড়িতে ভাতেভাত চাপাই। দেখি ঘি পাওয়া যায় কি না ! চা, চিনি কিনে আনি।'

হরিশঙ্কর বললেন, 'তোকে কিচ্ছু করতে হবে না। সব আমরা করছি। শুধু সেই রাস্কেলটা এখনও আসছে না কেন ? লোহা গরম থাকতে থাকতেই ঘা মারতে হয়।'

ছোটদাদু বললেন, 'মুখ, হাত, পা তো ধুতেই হবে হরিশঙ্কর, আর একটা অবশ্য করণীয় কাজ তুমি ভুলে গেছ। দাঁত মাজা। গাবভ্যারেন্ডার বেড়া দেখতে পাচ্ছি। দাঁতনের অভাব হবে না।'

হরিশঙ্কর বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস। দাঁত মাজাটা বাকি আছে।'

দাওয়ার এক পাশে একটা বালতি ছিল। পিসিমা সেই দিকে এগোলেন। ছোটদাদু বললেন, 'আশা তোর মেয়েকে বল না। জল আনবে কোথা থেকে ? টিউবওয়েল ?'

'ও পারবে না ছোট মামা। পাতকোটা খুব বড় আর অনেক নিচে জল।'

'তা হলে আমরাই কেন যাই না !'

পিসিমা বললেন, 'তুমি তো জানো আশা কিরকম খাটতে পারে ! মাথার চোট আমাকে কাবু করতে পারবে না।'

পিসিমা বালতি হাতে বাড়ির পেছনদিকে চলে গেলেন। হরিশঙ্করের পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা ছুরি বেরলো। বিদেশী জিনিস। শেফিল্ডে তৈরি। চকোলেট রঙের বাঁট। পেতলের কাজ করা। খুবই লোভনীয়। জিনিসটা হরিশঙ্করের বিশ্বস্ত বন্ধুর মতো। পকেটে পকেটে ঘোরে। ফলকাটা, গাছের ডালকাটা, সবেতেই লাগে। এইসব কাজে হরিশঙ্করের নিপুণতা তুলনাহীন। সব কাজেই হরিশঙ্কর অসাধারণ দক্ষ। তিনি বলেন, কাজের চেয়ে কাজের ফিনিশই বড় কথা। যেমন শিক্ষার সঙ্গে সংস্কৃতি।

হরিশঙ্কর দাঁতনের জন্যে ডাল কাটতে গেলেন। ভেঙে নিলেই হয়, কিন্তু না, তা হবে না, নিখুঁত করে কাটতে হবে। ছুলতে হবে। একটা ডাল কেটেছেন। দাঁড়িয়ে আছি পাশে। ডাল থেকে ফোঁটা ফোঁটা রস ঝরছে। হঠাৎ পিসিমা প্রায় ছুটতে ছুটতে এলেন। মুখে চোখে ভয়ঙ্কর এক আতঙ্ক। যেন ভূত দেখেছেন।

আমাদের কাছে এসে প্রায় অজ্ঞানের মতো হয়ে গেলেন।

হরিশঙ্কর বললেন, 'কি হল আশা ? ও-রকম করছিস কেন ?'

পিসিমা ধরা ধরা গলায় বললেন, 'পাতকোর মধ্যে।'

'পাতকোর মধ্যে কি ?'

'কি একটা রয়েছে।'

'কি একটা রয়েছে মানে ? জল ছাড়া আর কি থাকবে ?'

'একটা মানুষ।'

'মানুষ। কি করছে মানুষ ? চান করছে !'

'মরা মানুষ।'

'সে কি ?'

আমরা সবাই ছুটলুম কুয়োতলার দিকে। শ্যাওলা শ্যাওলা একটা জায়গা। কয়েকটা ইট এলোমেলো পাতা। একপাশে বিশাল একটা ছাইগাদা। বড়বড় মান গাছ। বিশাল একটা কাঁঠাল গাছ। খা খা করে কাক ডাকছে। হঠাৎ একটা কাক ক্রাঙ্ক ক্রাঙ্ক করে ডাকতে লাগল। কাক সাধারণত এইভাবে ডাকে না। ছোটদাদু আমাকে বললেন, 'শুনছো ? ভীষণ অমঙ্গলের ডাক। কাক সব জানিয়ে দেয়। অদ্ভুত এক পাখি। কাকের ডাক নিয়ে আমাদের শাস্ত্রে অভ্রান্ত গবেষণা আছে, কাকতত্ত্ব।'

তিন পাশ থেকে আমরা পাতকো দেখতে লাগলুম ঝুঁকে। পাতকোর বেড় বিশাল।

ইঁদারার মতো। তেমনি গভীর। বাঁকুড়া খুব শুকনো জায়গা। জলের খুব কষ্ট। অনেক নিচে জল। সেই জলে ভাসছে সাদা কাপড়। একটা চুলঅলা মাথা। তালের ফোঁপলের মতো। সব তালগোল পাকিয়ে আছে। বেশ বোঝা যায়, ওঠার জন্যে হাঁচোড়পাঁচোড় করে এলিয়ে পড়েছে এক সময়। মাথার ওপর সূর্য। ফলার মতো কিরণ পড়েছে। ভেতরটা বেশ স্পষ্ট। দশাসই একজন মানুষের সলিল-সমাধি। জলের ভেতরে একটা লালের আভা।

মানকচুর ঝোপে একটা কিছু ভয়ঙ্কর চকচক করছে। দেখা গেল, সেটা একটা টিনের খাঁড়া। এক জোড়া খড়ম পড়ে আছে একপাশে। আমরা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। সেই কাক তারস্বরে চিৎকার করছে, ক্রাঙ্ক ক্রাঙ্ক। হরিশঙ্কর যার পালক ছাড়াতে চেয়েছিলেন, সে ওই কূপে মৃত।

প্রথমে কথা বললেন ছোটদাদু,'এ তো সাংঘাতিক ব্যাপার! হয় নিজেই ঝাঁপ মেরে আত্মহত্যা করেছে, না হয় কেউ মেরে ফেলে দিয়ে গেছে। পুলিস-কেসের ব্যাপার।'

হরিশঙ্কর বললেন, 'আমাদের এখন কি করা উচিত?'

ছোটদাদু পিসিমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোরা তো সারাটা রাত ওই দাওয়ায় ছিলিস, এত বড় একটা জিনিস কুয়োয় পড়ল, তোরা কোনও শব্দ পেলি না!'

পিসিমা ভয়ে ভয়ে বললেন, 'আমরা বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। আর এটা তো বাড়ির পেছন দিক।'

হরিশঙ্কর বললেন, 'আমাদের এখন থানায় যাওয়া উচিত।'

ছোটদাদুর চেহারা, গলা সবই হঠাৎ পাল্টে গেল। একেবারে অন্য মানুষ। চাপা গলায় বললেন, 'কোনও চিৎকার, চেঁচামেচি না করে সব ওদিকে চলো। মনে করো, তোমরা এটা দেখনি। তোমরা কিছুই জানো না।'

আমরা এইবার চোরের মতো অপরাধীর মতো দাওয়ায় এসে বসলুম। ঝলমলে দিন; কিন্তু আমার মনে হচ্ছে গভীর রাত। গভীর এক ষড়যন্ত্রে বসেছি আমরা। আমরাই যেন খুনী। বেশ বোঝা যাচ্ছে, হরিশঙ্কর কোনও রকমে নিজের ভয়ঙ্কর উত্তেজনা চেপে রেখেছেন। আমি জানি তিনি কি চাইছেন! এখনি ওই মৃতদেহ তোলার ব্যবস্থা করতে চাইছেন। মানুষটির প্রতি রাগ-দ্বেষ যা ছিল আর নেই। এখন আছে মৃতের প্রতি কর্তব্য, শেষ সংস্কার। মৃতের কোনও জাত নেই। পাপ-পুণ্য নেই।

হরিশঙ্কর বললেন, 'থানায় খবর দিলে ক্ষতিটা কি? যতই হোক আমাদের একজন আত্মীয়!'

ছোটদাদু বললেন, 'একটু আগেই তো তুমি কীচকবধ করতে চেয়েছিলে।'

'মৃতের কোনও শত্রু থাকে না।'

'তুমি যা ভেবেছিলে, এখন কাজে তাই হয়ে গেছে। এখন আমাদের সম্পর্ক—হত আর হত্যাকারী।'

হরিশঙ্করের বিস্মিত প্রশ্ন,'আমরা হত্যাকারী?'

'সন্দেহটা প্রথমে আমাদের দিকেই আসবে। পুলিশ আশাকে ধরে টানাটানি করবে। আমাদেরও জড়াবে। এই দাওয়া, ওই ইঁদারা। অত বড় একটা শরীর পড়ল, শব্দ হল, কেউ শুনতে পেল না। কথাটা বিশ্বাসযোগ্য হবে? আদালত মানবে!'

'তুমি খুন ভাবছ কেন? অ্যাকসিডেন্টালি পড়ে যেতেও তো পারে!'

'ভুলে যেয়ো না আশা বসে আছে শত্রুপুরীতে। জমি-জমা, বিষয়সম্পত্তি অতি ভয়ঙ্কর

জিনিস। মানুষের আদিম লোভের একটি। এই মৃত্যুর পর এদের জমিজমার কে মালিক হবে? কে হতে চলেছে। তোমাকে একটা কথা বলি, মানবতা, কর্তব্য এই সব ভুলে, এখনি যে যে-অবস্থায় আছো বেরিয়ে পড়ো, বাঁচতে যদি চাও। বিশাল, বিশ্রী এক ঝামেলা আসছে। হরিশঙ্কর জেল জিনিসটা খুব সুখের নয়। জায়গাটাও খুব খারাপ। স্বদেশী করার সময় আমার অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে। ভাগ্য ভাল এখনও কেউ আসেনি। আগে এখান থেকে বেরিয়ে চলো, তারপর বলবো চক্রান্তটা কি? আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। আমার অনুমান মিথ্যে হবার নয়।'

হরিশঙ্কর ভয়ঙ্কর অবাক হয়ে বললেন, 'সে কি পালিয়ে যাবো? ভয়ে পালাবো?'

ছোটদাদু বললেন, 'কার ভয়ে তুমি পালাচ্ছ হরিশঙ্কর! কেউ কি তোমাকে ভয় দেখিয়েছে?'

'মানুষ নয়, ভয় দেখাচ্ছে আশঙ্কা।'

'তুমি ভয়ে পালাচ্ছ না, পালাচ্ছ বুদ্ধিমান বলে। নির্বোধ নয় বলেই আমরা ফাঁদে পা দিচ্ছি না।'

আমরা অপরাধী নই, তবু একদল খুনীর মতো বেরিয়ে এলুম সেই ভিটে ছেড়ে। কেবলই মনে হচ্ছে, কেউ দেখছে না তো! কেউ হঠাৎ জিজ্ঞেস করবে না তো, যাচ্ছ কোথায়। কেউ ফিরে তাকালে অস্বস্তি হচ্ছে।

ছোটদাদু বললেন, 'ভাগ্যের পরিহাস। সত্যিই আমাদের অপরাধীর মতোই পালাতে হবে। কারোর চোখে যেন না পড়ে যাই। একটু ছাড়া ছাড়া হাঁটো সবাই। দল তৈরি কোরো না।'

হরিশঙ্কর বললেন, 'আবার কি আমাদের হেঁটেই যেতে হবে। জঙ্গলের পথ ধরে!'

'না ও-পথের শেষ মাথায় অমঙ্গল বসে আছে। এবার আমরা রেলে ফিরবো।'

স্টেশানের দিকে এগোলুম আমরা। আমাদের নিয়ে কারোরই তেমন মাথা ব্যথা নেই। আমরা চলেছি আমাদের মতো; মনে কিন্তু অদ্ভুত একটা ভয় কাজ করছে। মৃত্যু মানুষকে কেন এত ভয় দেখায়!

৪৭

An animal with some instincts of a God,
His life a story too common to be told.

হরিশঙ্কর বেশ নিজের মনেই হাঁটছিলেন, হঠাৎ থেমে পড়লেন। পাদমেকং ন গচ্ছামি। ছোটদাদু বললেন, 'আবার কি সমস্যা ?'

হরিশঙ্কর বললেন, 'কোনও পরিস্থিতি থেকে কখনও আমি পলায়ন করিনি, আর সবচেয়ে বড় কথা হল, ট্রুথ ইজ ট্রুথ। সত্য হল, আমরা খুনী নই, তাহলে আমরা কেন সিচ্যুয়েসান ফেস করব না ! দিস ইজ কাওয়ার্ডিস ?'

ছোটদাদুর মুখে খেলা করে গেল সেই উদ্ভাসিত হাসি। আমরা গ্রামের সীমানার বাইরে চলে এসেছি। মন্দির, মসজিদ, পাম্প হাউস সব পেছনে ফেলে এসেছি। ফেলে এসেছি সায়েবকুটি বলে বিশাল এক বাগান বাড়ি। স্বদেশী আমলের চরকা প্রতিষ্ঠান। এখন যেখানে মেয়েদের তাঁত শেখানো হয়। হাতের কাজ শেখানো হয়। স্বদেশী কাগজ আর সাবান তৈরি হয়। সব পেছনে ফেলে এখন আমরা শুধু প্রান্তরে। রোদে চারপাশ দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। কি দুর্গতি আমাদের। চামড়া পুড়ে কালো হয়ে আসছে।

ছোটদাদু বললেন, 'আমরা ওই ছায়ায় একটু বসি। তোদের একটু বোঝানো দরকার পরিস্থিতিটা কি দাঁড়িয়েছে। খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়।'

বাঁপাশে মাঠের মাঝখানে ঝাঁকড়া একটা গাছ। ভাঙা একটা ঘর। কোনও সময় কিছু একটা ছিল। আমরা সেই দিকে এগিয়ে চললুম। হরিশঙ্কর লক্ষ্মী ছেলের মতো কেন এগিয়ে যাচ্ছেন আমি জানি। ওই ভাঙা বাড়ি। একটা সমাধি মতো রয়েছে পাশে। অতীত ডাকছে ইশারায়, ডাকছে অখ্যাত ইতিহাস। কেউ ছিল একদিন। কে তিনি ? হরিশঙ্করের জানা চাই। লতাপাতার ইতিহাসে পড়ে আছে কারো পরিত্যক্ত সংসার। আমরা সকলেই বসে পড়লুম হরিশঙ্কর ছাড়া। তিনি সেই ভগ্ন কুটিরের ইতি উতি উঁকি মারতে লাগলেন।

ছোটদাদু বললেন, 'তুই তাড়াতাড়ি তোর অনুসন্ধান শেষ করে এদিকে আয়।'

হরিশঙ্কর খুঁজে খুঁজে ঠিক একটা প্রস্তরফলক আবিষ্কার করলেন। উদ্ভাসিত মুখে বললেন, 'পেয়ে গেছি। সবই অস্পষ্ট, নামটা কোনও রকমে পড়া যায়, স্বামী তপানন্দ। এখানেও সন্ন্যাসী। ধর্মের এলাকা থেকে বেরোবার উপায় নেই। যেদিকেই যাও ধর্ম।'

ছোটদাদু বললেন, 'বেশ হয়েছে এখন চলে এসো।'

হরিশঙ্কর এসে বসেই বললেন, 'তপানন্দ কে ?'

ছোটদাদু বললেন, 'নিশ্চয় কোনও সন্ন্যাসী।'

'তাঁর চেলারা কোথায় ? এইভাবে একটা সাধনপীঠ নষ্ট হয়ে গেল !'

'কত পীঠ এইভাবে নষ্ট হয়, ও নিয়ে মাথা খারাপ করার দরকার নেই। তুমি আসল সমস্যায় এসো।'

হরিশঙ্কর গুছিয়ে বসলেন। ছোটদাদু পিসিমাকে প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা আশা, তুই আমাকে একটা সত্যি কথা বল, তুই তোর ঠাকুরপোকে ঠেলে ফেলে দিসনি তো ?'

হরিশঙ্কর লাফিয়ে উঠলেন, 'সে কি ? আশা ঠেলে ফেলবে কেন ? আশা খুনী ? অসম্ভব ! তুমি ভুল পথে যাচ্ছ। ঠিক হচ্ছে না।'

পিসিমার মুখ ভয়ে সাদা। থেমে থেমে বললেন, 'এ তুমি কি বলছ ছোটমামা ! অত বড় একটা মানুষকে ঠেলে ফেলা সম্ভব !

'মাতালকে ফেলা সম্ভব। বিয়ের আগে পর্যন্ত তুই খুব ডাকাবুকো ছিলিস। সত্যি কথা বল। তুই খুব রাগী। রেগে গেলে তোর জ্ঞান থাকে না। একবার তুই আমাদের জানলার গরাদ বাঁকিয়ে দিয়েছিলিস।'

পিসিমা ছোটদাদুর গায়ে হাত দিয়ে বললেন, 'বিশ্বাস করো, তোমার গা ছুঁয়ে বলছি, আমি কিচ্ছু জানি না।'

'তুই কোনও শব্দ পাসনি !'

'সত্যি পাইনি।'

ছোটদাদু ছেলে আর মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোরা কোনও শব্দ পাসনি ?'

তিনজনেই বললে, 'না।' কোনও শব্দ শোনেনি।

হরিশঙ্কর বললেন, 'তুই কোনও ক্রিমিন্যাল ল-ইয়ার হলে মিজারেবলি ফেল করতিস। এটা একটা জেরা হচ্ছে ?'

ছোটদাদু বললেন, 'এদের ঘুম তাহলে কুম্ভকর্ণের ঘুম।'

বলেই ছোটদাদু লাফিয়ে উঠলেন। আমি ভাবলুম পিঁপড়ে কামড়েছে। না, তা নয়।

ছোটদাদু বললেন, 'ইঁদারায় তাহলে একজন নয়, দু'জন পড়েছে।'

হরিশঙ্কর বললেন, 'ফ্যানটাসটিক ইম্যাজিনেসান। একা রামে রক্ষা নেই, দোসর লক্ষ্মণ। আর একজন কে ? এ ধারণাটা তোর এল কোথা থেকে ?'

'আমি একটা লাল কাপড় দেখতে পেয়েছি। সেটা একটা শাড়ির অংশ।'

'তার মানে ?'

'মানে ভৈরব আর ভৈরবী দু'জনে জড়াজড়ি করে পড়েছে।'

'অসম্ভব। দু'জনের জায়গা হতেই পারে না।'

'অবশ্যই পারে। একজনের ওপর আর একজন। ঘটনাটা আমিদেখতে পাচ্ছি। ওই ভৈরবী ঠেলে ফেলে দিচ্ছিল। ভৈরব তার শাড়ির আঁচল টেনে ধরেছিল। একজনের ভারে আর একজনও তলিয়ে গেল।'

হরিশঙ্কর হাসলেন, 'তোর কাব্যপ্রতিভা আমি মেনে নিচ্ছি ; কিন্তু গোয়েন্দা গল্প লেখার ক্ষমতা একেবারেই নেই। দু'জন পড়ল, যে কোনও একজন তার ঘাড়ে পা রেখে উঠে দাঁড়াত। সে বেঁচে থাকত। বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করত। বেশ ! হাতে পাঁজি মঙ্গলবার করে তো লাভ নেই, চলো তাহলে, ফিরে গিয়ে থানায় ইনফর্ম করি। দেখা যাক ক'জন ওঠে, একজন না দু'জন। কেস কোথায় গড়ায় চলো দেখি।'

'একটা অনুমানের ওপর ভিত্তি করে অত বড় একটা ঝুঁকি নেওয়া যায় না। যদি ভৈরবী ইঁদারায় থাকে আশার ওপর পুলিসের সন্দেহ পড়বে না ; আর ভৈরবী যদি বেঁচে থাকে আশাকে নিয়ে টানাটানি হবেই।'

'কেন হবে ?'

'খুব সহজ। পুরো সম্পত্তিটা ভৈরবী দানপত্র করে নিয়েছে।'

'যদি সম্পত্তিটা নিজের নামে করিয়েই নিয়ে থাকে তাহলে খুনের কি প্রয়োজন ?'

'দখল নেবার জন্যে।'

'শোন, তুই আধ্যাত্মিক লাইনের লোক, জাগতিক ব্যাপারে মাথা ঘামাসনি। শোন, আশাকে নিয়ে তোরা কলকাতায় চলে যা, আমি ব্যাপারটার শেষ দেখে যাই।'

'তোকে আর শেষ দেখতে হবে না। অনেক কিছু আছে যার শেষটা না দেখাই ভাল।'

'আমার এই পালিয়ে যাওয়াটা ভাল লাগছে না। ভীরু, কাপুরুষ মনে হচ্ছে নিজেকে।'

'কিছুকাল আগে তুই ছেলেকে ছেড়ে পালিয়েছিলিস।'

'ওটা পালানো নয়, ওটা ছিল শিক্ষা দেওয়া। স্বাবলম্বী করার শিক্ষা। নিজের পায়ে দাঁড়ানোর শিক্ষা।'

'ঠিক আছে, এখন চলো। আমাদের যাত্রা শুরু করা যাক।'

'শোন, তোর ভুল ধারণাটা ভেঙে দি। ইঁদারায় একজনই আছে। দু'জন নয়। দেহটা ভাসছে। তলায় আর একটা দেহ থাকলে ওই ভাবে ভাসতে পারত না। জলের ঊর্ধ্বচাপ অতটা কাজ করতে পারত না। দিস ইজ সায়েনস। আনন্দের কারণ নেই। ভৈরবী বেঁচেই আছে।'

পিসিমা বললেন, 'ছোড়দা আমরা চলে গেলে কোনও অন্যায় হবে না। তুমি আর ওই গ্রামের নোংরামির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ো না। সবাই গেঁজেল আর মাতাল। আমাদেরই জমি চারপাশ থেকে দখল করে বসে আছে। ওখানে বেড়া চলে চলে বেড়ায়। আজ দেখলে ওখানে, সকালে উঠে দেখলে তিন হাত সরে এসেছে তোমার জমির ভেতরে। ক্ষমতা থাকে লড়াই করো। মাথা ফাটাফাটি, রক্তগঙ্গা। ওই ইঁদারাটা ওকে টানত। কেন জানো তো ! সাত বছর আগে বুড়ো বাপকে পাঁজাকোলা করে ওর মধ্যে ফেলে দিয়েছিল, বুড়ো মরছে না বলে। মদের ঘোরে। তারপর থেকেই মাঝরাতে ইঁদারার পাড়ে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে কাঁদত, বাবা, তুমি কি করছ ওখানে ! উঠে এসো। তোমার জন্যে কাঁঠালি কলা এনেছি। ও তো আগে এইরকম ছিল না। মিলিটারিতে কাজ করত। এতখানি চেহারা ছিল। তারপর অসৎসঙ্গে পড়ে, মদ, ভাং, জুয়ায় এইরকম হয়ে গেল। আত্মহত্যাই করেছে ছোড়দা। মনটা তো খুব নরম ছিল।'

আমরা আবার রাস্তায় এসে উঠলুম। আমাদের মুখ স্টেশনের দিকে। হরিশঙ্করের মুখ ছেড়ে আসা গ্রামের দিকে। ছোটদাদু ভাবলেন হরিশঙ্কর দিক ভুল করেছেন। বললেন, 'তুই যে উল্টো দিকে চললি। স্টেশান তো এইদিকে !'

হরিশঙ্কর চলা শুরু করে দিয়েছেন। চলতে চলতে বললেন, 'দিক ভুল করিনি। যেদিকে যাওয়ার সেইদিকেই চলেছি। ফলো মি।'

ছোটদাদু ভীষণ অবাক হয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি করতে চাইছে বলো তো ?'

'কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'এতক্ষণ ধরে এতভাবে বোঝালুম, কিছুই ঢুকলো না কানে !'

দ্রুত এগিয়ে গেলেন ছোটদাদু, 'কি করতে চাইছিস ?'

হরিশঙ্কর বললেন, 'তুমি মামলায় হেরে গেছ। আমাকে অনুসরণ করো।'

'অনুসরণ করে ?'

'সোজা থানায়। আমরা ছ'জন। ওরা ছিল দু'জন। এখন একজন। একা সেই ভৈরবী। আমরা হেরে যাবো ? তোমাকে দেখাতে চাই, সত্যের জয়। তুমি ধার্মিক, ঐশী শক্তির অধিকারী। তোমাকে দেখাতে চাই ধর্মের জয়। চোরের মতো পা টিপে টিপে পালাবো। পালিয়েও শান্তি নেই, সর্বক্ষণ উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা। এই বুঝি পুলিস এল। ধরে নিয়ে গেল খুনের দায়ে। তোমার কোনও ভয় নেই। আমার সঙ্গে চলো। আমার আত্মবিশ্বাস জয়ী হবেই। আমি যদি এই সিচ্যুয়েশান ফেস না করি, আমার বিবেক আমাকে সারা জীবন ঘুমোতে দেবে না। বিবেক হল মেরুদণ্ড। তোমার এত কেন ভয় !'

ছোটদাদু কিছুক্ষণ গুম মেরে রইলেন। তারপর বললেন, 'ঠিক বলেছিস। ভীরুতাই পাপ। ভীরুতাই অধর্ম। যা হবার তা হবে। চলো, লেট আস ফেস দি সিচ্যুয়েসান।'

আবার মাইল দুয়েক হাঁটতে হবে ভেবে আমার কান্না পেয়ে গেল। সারা রাত জেগে। চান হয়নি। দানা-পানি পড়েনি পেটে। রোদে সব ঝলসে যাচ্ছে। এই উদ্বেগ, এই উৎকণ্ঠা। জীবনের এই সব মুহূর্তে আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে। ঘটনা থেকে পালাতে না পারলে দেহ থেকেই পালানো ভাল। সে উপায়ও তো নেই। মৃত্যু ও হরিশঙ্কর সমান একগুঁয়ে। কারও কথা শোনে না। থানা, হাসপাতাল, সরকারী দপ্তর, কোর্টকাছারি, আমার ভেতরে অদ্ভুত এক অসুস্থ ভাব আনে। কি কুক্ষণেই আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলুম। ছোটদাদু এমন একজন অলৌকিক পুরুষ। মা কালীর সঙ্গে যাঁর সরাসরি যোগাযোগ, তাঁর শক্তিও বেকায়দা। মানুষ যে-ঘটনা ঘটাবে, যে-চক্রান্তে ফেলবে, সেখান থেকে বের করার ক্ষমতা ভগবানের নেই। ভগবান অতিশয় শৌখিন এক বড়বাবু। সুখীর সঙ্গ করেন। যে-মানুষ বিপদে পড়েছে তাকে বিপদের বিচারেই ছেড়ে দেন। ভাল যার হয় তার নিজের শক্তিতেই হয়। আশ্রমের ছবি, মন্দিরের ছবি চোখের সামনে ভাসছে। একদল আর্ত, কাতর নরনারী। জীবনের মুড়ো ঝ্যাঁটায় ক্ষতবিক্ষত। মন্দির, দাতব্য চিকিৎসালয়, বড়লোকের চ্যারিটেবল ট্রাস্ট, এক চেহারা। মানুষ চাইতে এসেছে। শেষের দুটোয় তবু কিছু মেলে। প্রথমটায় সবই ফক্কা। বসে বসে নিজের বুড়ো আঙুল চোষো।

হঠাৎ হরিশঙ্কর আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, 'কেন এমন বিরস বদন হেরি সখী। বড় বিপদে পড়েছ তাই না ? কোথায় তোমার সুখশয্যা। সুদৃশ্য স্নানঘর, সুগন্ধী সাবান। Soak your life in a gallon of danger, spice it with powder of time and slowly roast it in the fire of your courage and enjoy a good dinner. বুঝলে কিছু ? এক গ্যালন বিপদে জীবনটাকে চোবাও, চূর্ণ সময়ের মশলা মেলাও, সাহসের আঁচে ধীরে ধীরে রোস্ট করো, বসে যাও জীবনের মহাভোজে। আজ তাই হবে। তোমাদের সন্দেশ মারা ফুরফুরে আধ্যাত্মিকতার কোনও স্থান নেই রক্তমাংসের পৃথিবীতে। ওটা এক ধরনের রোমান্টিকতা। বড়বাবুদের বিলাসিতা। লাঙল, কোদাল, কুড়ুল, খোন্তা, ছোরাছুরি, কাড়াকাড়ি, ছেঁড়াছিঁড়ি, এই হল জীবন। কোথায় গেল তোমাদের হিউমার। মুখ দেখে মনে হচ্ছে বধ্যভূমির দিকে চলেছ। এসো গান ধরো,

জগতজননী জাগিয়াছে আজি, জয় মা তারিণী গাও রে,/ বাজাও ডঙ্কা, নাহিক শঙ্কা, ঘুচে গেছে ভবভয় রে ॥

হরিশঙ্কর নিজেই গাইছেন। এই অবস্থায় গলায় সুর আসছে। কোন উৎস থেকে এই ভয়ঙ্কর শক্তি আসে! আমার ভীষণ জানতে ইচ্ছে করে। ছোটদাদু কি পরাজিত হলেন হরিশঙ্করের জীবনবেদের কাছে! তন্ত্র-মন্ত্র সব বোগাস! আমরা দেখতে দেখতে থানার চৌহদ্দির মধ্যে এসে ঢুকলুম। বিশাল একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ ঝিলমিল করে আলোর বিলিব্যবস্থা করছে। ঢন্‌ঢনে একটা জিপ গাড়ি জরদ্‌গব প্রশাসকের মতো একপাশে পড়ে আছে। একজন হাবিলদার বগলে লাঠি চেপে হাতের তালুতে খইনি ডলছে। আমাদের দেখে ফটাস ফটাস করে তিনবার চাপড় মারলে, সাদা চুনের গুঁড়ো উড়ে গেল খানিক।

কৃষ্ণচূড়ার ছায়ায় পিসিমারা থমকে দাঁড়ালেন। আমরা তিনজন এগিয়ে গেলুম। হরিশঙ্কর হঠাৎ আমাকে বললেন, 'মনে করো আমি নেই, তুমি কেসটা হ্যাণ্ডল করো তো।'

ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে গেল। এ যে দেখি বিপদের ওপর বিপদ। ডবল বিপদ। তবু মনে হল হেরে যাবো। মনে পড়ে গেল হরিশঙ্করের পুরনো শিক্ষা! লেখা-পড়ায় লাগাতে বলেছিলেন—সব সময় ভাববে তুমি একজন অথরিটি। তুমি কারোর চেয়ে কম যাও না। কেউ তোমার চেয়ে শক্তিশালী নয়। হারার আগে হেরে যাবে না। লড়াই করে হারো, হারবে। 'আমি ভয় করব না ভয় করব না/ দুবেলা মরার আগে মরব না, ভাই, মরব না ॥/ তরীখানা বাইতে গেলে মাঝে মাঝে তুফান মেলে—'

এগিয়ে গেলুম সেই কনস্টেবলের দিকে। বেশ বড় একটা গোঁফের মালিক; কিন্তু গলাটা ভীষণ সরু। যতটা কঠোর হবেন ভেবেছিলুম ততটা কঠোর নন। মোটা লাঠিটা শুধুমাত্র প্রভুত্বের প্রতীক। গরম বাতাস, কৃষ্ণচূড়ার ঝিলিমিলি ছায়া। অসম্ভব সরু গলায় প্রশ্ন এল, 'কি চাই?'

'অফিসার ইনচার্জের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'কি কেস!'

একটু থতমত খেয়ে গেলুম। কেসটা কি? কি বলব? হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'আমরা কলকাতা থেকে আসছি।'

কনস্টেবল অবাক করে দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ আপনাদের তো আসার কথা ছিল। এত দেরি হল!'

অবাক হয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে হরিশঙ্করের দিকে তাকালুম। ছোটদাদু হাসছেন মৃদু মৃদু। কি উত্তর দোবো। হয় তো অন্য কারো আসার কথা।

কনস্টেবল বললেন, 'যান যান, তাড়াতাড়ি যান। অফিসঘরে অপেক্ষা করছেন।'

একটু আগে কেসটা যাই থাক, এখন আরো জটিল হয়ে গেল। কে আসবে, কারা আসবে! সম্মানিত ওপরঅলা কেউ। এসে পড়েছি আমরা। প্রথমে খাতির। তারপর যেই জানবেন, আমরা তাঁরা নই, তখনই ভয়ঙ্কর অবহেলা। তুচ্ছ তাচ্ছিল্য। বলতেও পারছি না। অহঙ্কারের বাধা।

হঠাৎ ছোটদাদু এগিয়ে গেলেন। এক মাথা কাঁচাপাকা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। ধবধবে সাদা টুইলের শার্ট রোদে ঝলসাচ্ছে। অপরাজেয় ছোটদাদু। পেছনে আমরা। হরিশঙ্কর অবিচলিত। দেখে মনে হচ্ছে, কোনও ঘটনার মধ্যেই তিনি আর নেই। থেকেও না-থাকাটা হরিশঙ্করের সাধনা। এ আমি আগেও দেখেছি অজস্রবার।

রক পেরিয়ে অফিস। থানার অফিস যেমন হয়। কেঁদো টেবিল। গোদা চেয়ার। অসম্ভব সুন্দর, ইউনিফর্ম পরা একজন মানুষ বসে আছেন। সামনে খোলা খাতা। একপাশে ব্যাটন, আর একপাশে টুপি। আমরা ঢোকামাত্রই বললেন, 'আসুন, আসুন। আপনারা এই বাঁকুড়ার অজ-শহরে ?'

ছোটদাদু চেয়ার টেনে আর এক অফিসারের মতো বসতে বসতে বললেন, 'আপনি যাঁদের কথা ভাবছেন আমরা কিন্তু তাঁরা নই।'

অফিসার বললেন, 'আপনারাই। আপনি তারাপীঠের মহাসাধক। আপনার লেখা বই আমার বাবা পড়েন। আমার ছোট ভাই জেসপের ইঞ্জিনিয়ার। কলকাতায় থাকে। তাকে আপনি গত বছর দীক্ষা দিয়েছেন।'

ছোটদাদু বললেন, 'আমরা আসবো জানলেন কি করে ?'

'ওইখানে একটু পুলিসী বুদ্ধি আছে। আপনারা সকালে যে-দোকানে জিলিপি আর চা খেয়েছেন, সেই দোকানে রোজ আমাকেও একবার যেতে হয়। সেরা খাবার। সেখানে গিয়ে শুনলুম, আপনারা গ্রামে ঢুকেছেন। তা থানায় কেন আসবেন! হঠাৎ স্কুলের হেডমাস্টারমশাই তারিণীবাবু খবর আনলেন রাধাবাবুর ইঁদারায় মৃতদেহ। আরো বললেন, তিন ভদ্রলোকের সঙ্গে রাধাবাবুর পরিবার ছেলে-মেয়ে নিয়ে স্টেশানের দিকে গেলেন। আবার এও বললেন, রাধাবাবুর ভাই গতরাতে রাধাবাবুর বিধবা পত্নীকে বেধড়ক পিটিয়ে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। ঘর থেকে টেনে বাইরে ফেলে দিয়ে দোরতাড়ায় তালা মেরে হাওয়া হয়ে গেছে। এইবার আমার ডিডাকসান, ঝামেলার ভয়ে প্রথমে আপনারা পালাতে চাইবেন, তারপর আপনাদের বিবেক আর বুদ্ধি কাজ করবে। আপনারা ফিরে আসবেন। কোথায় আসবেন ? থানায় আসবেন। এমন সময় আমাদের হেড কনস্টেবল এসে জানাল, আপনারা আসছেন। সে আপনাদের ওভারটেক করে জিপে করে আসছিল।'

হরিশঙ্কর বললেন, 'ওয়াণ্ডারফুল! পারফেক্ট ম্যাথেমেটিক্স। আমি ভাবলুম অলৌকিক কোনও দূত এসে আপনাকে খবর দিয়েছে।

অফিসার বললেন, 'আপনি ? আপনার পরিচয় !'

ছোটদাদু বললেন, 'আমার ভাগনে।'

অফিসার হুঙ্কার ছাড়লেন, 'উদাস।'

উদাস যে কারো নাম হতে পারে, ভাবা যায় না। কুচকুচে কালো একটি ছেলে ঘরে এল। চায়ের হুকুম হল। পুলিস ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে গেছেন। ডেডবডি তুলতে সময় লাগবে কিছুক্ষণ। তারপর যাবে পোস্টমর্টমে।

ছোটদাদু বললেন, 'আমার ভগিনী বাইরে দাঁড়িয়ে আছে ছেলেমেয়ে নিয়ে।'

অফিসার বললেন, 'এখুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি আমার কোয়ার্টারে।'

হরিশঙ্কর বললেন, 'সেটা যে বড় অস্বস্তিকর হবে আপনার পরিবার-পরিজনের পক্ষে। আচ্ছা কোনওরকমে তালা ভেঙে ওদের গৃহপ্রবেশ করানো যায় না!'

অফিসার চেয়ার ছেড়ে উঠেছিলেন, আবার বসে পড়লেন। কিছুক্ষণ ভাবলেন। ভেবে বললেন, 'তালাটা ভাঙলে কি এমন বেআইনি হবে! প্রপার্টিটা কার ?'

হরিশঙ্কর বললেন, 'রাধা ভাইকে লিখে দিয়েছিল এটুকু জানি। তারপর কার হাতে গেছে জানি না। তবে এর মধ্যে কে এক ভৈরবী আছে।'

'ও-সব ভৈরবীটৈরবী আমরা গ্রাহ্য করি না। আমরা আইন দেখব। তালা ভাঙার অধিকার পুলিসের আছে। অনুসন্ধান, সার্চ আমাকে করতেই হবে। এটা যদি মার্ডার কেস

হয় ?'

হরিশঙ্কর বললেন, 'মার্ডার হতে পারে ?'

'সবই হতে পারে। পুলিস লাইনে থেকে বুঝেছি, পৃথিবীতে কিছুই অসম্ভব নয়। টাকার জন্যে মানুষ পারে না এমন কাজ নেই। সব পারে।'

প্রায় মগের মতো আকার এক একটা কাপের। স্ট্রেচারের মতোই বড় ট্রেতে চেপে চলে এল চা। চায়ে চান করা যায়। এদিকে খালি পেটে চোঁ চাঁ শব্দ হচ্ছে।

অফিসার বললেন, 'তাড়াতাড়ি শেষ করে নিন। চায়ের সঙ্গে আর কিছুই দেওয়া গেল না।'

আমরা কোঁত কোঁত করে চা শেষ করলুম। জিপ আমাদের নিয়ে চলল ঘটনাস্থলের দিকে। বেশ ভিড় জমে গেছে। দেহ সবে তোলা হয়েছে ইঁদারা থেকে। মাঝারি গড়নের একজন মানুষ। ঝাঁকড়া চুল। গলায় জড়ান লাল একটা কাপড়ের টুকরো। ঠোঁট ফাঁক। গ্যাঁজলা বেরিয়েছে। হাতের মুঠোয় শক্ত করে কি একটা ধরা। দেহটা উঠোনে চিৎ হয়ে পড়ে আছে।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক তারিণীবাবুর সঙ্গে পরিচয় হল। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'একটা মহৎ পরিবার এইভাবে শেষ হয়ে গেল। নেশা-ভাঙ মানুষকে কোন দুর্গতির দিকে নিয়ে যায়! কি ছেলে ছিল! শেষ পরিণতিটা কি হল!'

তাঁর আক্ষেপ শোনার মতো কেউ নেই। ভয়ঙ্কর কর্মযজ্ঞ শুরু হয়ে গেছে। পুলিসের নানা ফ্যাচাং। কোথায় কি পড়ে আছে তার অনুসন্ধান ? খাঁড়া, খড়ম। বিড়ির টুকরো। পায়ের ছাপ। সেই ছাপে আমাদের পা আছে। দাওয়া থেকে ইঁদারার দূরত্ব। শুরু হল জেরা। কি ক্লান্তিকর ঘটনা। এরই নাম তল্লাস। খাতায় লেখা হচ্ছে মৃতের বর্ণনা। মিডিয়াম বিল্ট। ফেয়ার কমপ্লেকসানড। লং কারলি হেয়ার। হাইট। বার্থমার্ক। পার্টেড লিপস, ফোমিং। বালজিং আইজ। ঘাস্টলি স্টেয়ার। ক্লেঞ্চড ফিস্ট। ব্রুইজ, কাট্‌স, ল্যাসিরেসান। সোলেন টেস্টিকলস। ডিস্টেণ্ডেড স্টম্যাক। ফেন্ট রেড স্পট অন দি ফোরহেড,নট ব্লাড। রাইগার মরটিস হ্যাজ স্টার্টেড। বর্ণনার শেষ নেই।

রামশঙ্কর, কুম্ভকার। তিনি কাল মৃতকে কখন দেখেছেন! কি অবস্থায় দেখেছেন। প্রসাদ রায়, পুরোহিত কাল শেষ কথা কখন বলেছেন, কি বলেছেন! আমরা প্রথম এসে কি দেখেছি! ইঁদারায় প্রথম কে দেখে। কি অবস্থায় দেখেছে। আমরা কি দেখলুম। আমরা কেন এলুম। কি জন্যে এলুম। কাল রাতে কোথায় ছিলুম। প্রশ্নের পর প্রশ্ন।

অবশেষে চাদর চাপা দেহ চলে গেল পুলিসের হেফাজতে। অফিসার কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে বললেন, 'এইবার তালাটা ভাঙা যাক। তারিণীবাবু আপনি সাক্ষী থাকুন।'

একটা চাড় মারতেই তালা খুলে গেল। দরজাটা খোলার সময় কব্জায় কিঁচ করে একটা শব্দ হল। ঢুকতে গিয়ে সবাই থমকে গেলেন। তারিণীবাবু, অফিসার, সহকারী সবাই। ঘরটা বেশ বড়ই। চাপা আলো থমথম করছে। সামনেই লাল মেঝেতে স্বাস্থ্যবান এক মহিলার মৃতদেহ চিৎ হয়ে পড়ে আছে। পরনে লাল টকটকে কাপড়। গলার ক্ষত থেকে রক্ত ঝরে বুকের কাছটা দগদগে লাল। এলোচুল ছড়িয়ে আছে চারপাশে। কপালে বিশাল লাল টিপ। ফর্সা টকটকে রঙ। কশ বেয়ে পিল পিল করে নেমে আসছে কালো পিপড়ের দল। পা দুটো দু'পাশে ছড়ানো। এক হাতের মুঠোয় একটা তাবিজ।

অফিসার বললেন, 'ঘাস্টলি মার্ডার। গ্যাপিং উণ্ড।'

৪৮

Every man is the architect of his own fortune,
Every man is the son of his own works.

কোনও কোনও সময় বেঁচে থাকলেও মানুষের মরে যাওয়ার মতো একটা অনুভূতি হয়। বোধ, বুদ্ধি, সব লোপাট হয়ে যায়। নিজেকে মনে হয় চলমান যন্ত্রের মতো। এক ঝলকের দেখা কিন্তু কিছুতেই ভুলতে পারছি না সেই দৃশ্য। কেবলই ভাবছি, এমন একটা দেহ, এমন একটা সৌন্দর্য মানুষ ধ্বংস করে কি ভাবে! কি ভেবে। পাথরে কোঁদা শরীর, যেন খাজুরাহোর মন্দিরগাত্র থেকে একটা মূর্তি খুলে পড়ে গেছে। চরিত্র যাই হোক, প্রকৃত সাধিকা কি-না সে-বিচারেও যাচ্ছি না, সুন্দরী এক মানবী, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কোথায় যেন বিমলাদির সঙ্গে একটা সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। আমার চোখ পাপীর চোখ, ভোগীর চোখ। নিজেকে তিরস্কার করতে ইচ্ছে করছে।

হরিশঙ্কর পাশেই ছিলেন। ছোটদাদুকে বললেন, 'জীবনের আর একটা ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা হয়ে গেল। মনে হচ্ছে সহজে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে না। আইন বেশ আষ্টেপৃষ্টে জড়াবে। জেল, প্রাণদণ্ড সবই হয়ে যেতে পারে। মন্দ হবে না। আমার ধারণা, ফাঁসি বেশ আরামদায়ক। গলার কাছে বেশ একটা টান পড়ে তো! শিরা-টিরা বেশ ছেড়ে যায়।'

ছোটদাদু সংশোধন করলেন, 'ছেড়ে যায় না, ছিঁড়ে যায়।'

'ছেঁড়ার আগে ছেড়ে যায়।'

'তোর কোনও দুঃখ হচ্ছে না?'

'কিসের দুঃখ, কার জন্যে দুঃখ। এ গ্রুপ অফ ক্রিমিন্যালস। তোদের এই ধর্মটাকে দেশ থেকে বিদায় কর।'

'ধর্মকে তো বিদায় করা যাবে না ভাই। ওটা মানুষের সঙ্গেই জন্মেছে। পাখি থাকলে ডিম থাকবে, ডিম থাকলে পাখি। তুই যা দেখছিস, এ হল ধর্মের ব্যভিচার। এর মধ্যে সেক্স আছে, গ্রিড আছে। ধর্ম এখানে ভেক। ধর্মের আড়ালে অনাচারের খেলা।'

'তোরা এইটাকে কন্ট্রোল করতে পারছিস না কেন?'

'কারণ ধর্মের জগতে কোনও পুলিস নেই। তোমরা ধর্মবিতার বলে যাঁদের আদালতে বসিয়ে রেখেছ, তাঁদের এক্তিয়ারে এই অধর্মটা পড়ে না। ধর্মের আদালতের ধর্মবিতার হল মন। সত্য-পথে মন কর আরোহণ প্রেমের আলো জ্বালি চল অনুক্ষণ/ সঙ্গেতে সম্বল

রেখো পুণ্যধন, গোপনে অতি যতনে ॥ লোভ মোহ আদি পথে দস্যুগণ পথিকের করে সর্বস্ব লুণ্ঠন/ পরম যতনে রাখ রে প্রহরী শম দম দুই জনে ॥'

ছোটদাদু সম্পূর্ণ ভাবস্থ হয়ে বিখ্যাত গানের লাইন বলছেন। সামান্য সুরও আছে। এমন অদ্ভুত রচনা অযোধ্যানাথ পাকড়াশীর, হরিশঙ্করও তন্ময় হয়ে গেছেন। স্বামীজীর বড় প্রিয় গান। ঠাকুরকে প্রায়ই শোনাতেন। ছোটদাদু পরের অনবদ্য লাইনকটি বলছেন, 'সাধু-সঙ্গ নামে আছে পান্থধাম, শ্রান্তি হলে তথায় করিও বিশ্রাম। পথভ্রান্ত হলে সুধাইও পথ, সে পান্থ-নিবাসী জনে ॥যদি দেখ পথে ভয়ের আকার প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার/ সে পথে রাজার প্রবল প্রতাপ, শমন ডরে যাঁর শাসনে ॥'

হঠাৎ তাকিয়ে দেখি, হরিশঙ্করের দু' চাখ বেয়ে নিঃশব্দে জলের ধারা নেমেছে। এই মূর্তি আমার চেনা, ক্ষতবিক্ষত এক যোদ্ধার। জতুগৃহ দগ্ধ হয়ে যাওয়ার পর যদি জীবিত কেউ দগ্ধাবশেষ থেকে উঠে আসতে পারতেন, তাঁর চেহারা এইরকম হত। মনের চেহারা। হরিশঙ্কর তাঁর নিখুঁত উচ্চারণে 'সাবিত্রী'র কয়েকটি লাইন বললেন,

'Ardent from the sack of happy peaceful homes/ And gorged with slaughter, plunder, rape and fire/ They made of human selves their helpless prey/ A drove of captives led to lifelong woe./'

অফিসার এগিয়ে এসে ফিশ ফিশ করে বললেন, 'কেস খুব ঘোরালো। দুটো ক্লু পাওয়া গেছে। ইঁদারার লাশের মুঠোয় কিছু চুল পাওয়া গেছে। ভৈরবীর মুঠোয় একটা তাবিজ। লাশের মুঠোয় মেয়েদের চুল থাকলে ব্যাপারটার একটা সহজ সমাধান হয়ে যেত। মুঠোয় পুরুষের চুল। তার মানে তৃতীয় আর একজন একসঙ্গে এই ডবল মার্ডারের জন্যে দায়ী। সে কে ? গভীর জলের ব্যাপার।'

হরিশঙ্কর খুব সহজ গলায় বললেন, 'আমাদের মধ্যে কারোকে অ্যারেস্ট করতে চান ?'

অফিসার অবাক হয়ে বললেন, 'আপনাদের অ্যারেস্ট করব কেন ? আপনারা তো এই একটু আগে স্পটে এলেন। এ সব কাল মাঝ রাতের ঘটনা। আমাদের প্রথম সন্দেহভাজন লোক হল, ভৈরবীর স্বামী।'

হরিশঙ্কর বললেন, 'আমার বোন আশাকে সন্দেহ হয় না !'

ছোটদাদু অবাক হয়ে হরিশঙ্করের মুখের দিকে তাকালেন। কত সহজে একজন মহিলাকে বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। হরিশঙ্কর যেন আসামী পক্ষের উকিল !

অফিসার বললেন, 'না, হচ্ছে না। দুর্বল মহিলার দ্বারা এ কাজ সম্ভব নয়।'

'সারা রাত ওই দাওয়ায় শুয়ে থেকে এত বড় একটা ঘটনা টের পেল না !'

'তার সহজ ব্যাখ্যা, মহিলা রাতে ত্রিসীমানায় ছিলেন না।'

'কোথায় ছিল তাহলে ?'

ছোটদাদু বললেন, 'তুই কি আশাকে অপরাধী প্রমাণ করতে চাস ?'

হরিশঙ্কর সকলকে অবাক করে বললেন, 'মিথ্যে কথা বলবে কেন ?'

অফিসার বললেন, 'আশ্চর্য মানুষ আপনি ? সত্যের জন্যে এত বড় একটা বিপদ ডেকে আনতে চাইছেন ! আপনি ঠিকই বলছেন, উনি সত্য গোপন করছেন।'

তারিণীবাবু বললেন, 'সত্যটা আমি বলছি, আশা আমার কাছে ছিল। আমি অবিবাহিত পুরুষ। জায়গাটা শহর নয় গ্রাম, হাজার কথা হবে, সেই কারণেই মিথ্যা বলেছে। আমি একটু দেখাশোনা করি বলে ইতিমধ্যেই অনেক কথা হয়েছে। সে-সব আমি গ্রাহ্য

করিনি। তবু একটু সাবধান হতেই হয়। আমি শিক্ষক।'

হরিশঙ্কর বললেন, 'তার মানে কোথাও একটু পাপবোধ আছে!'

ছোটদাদু সামান্য ধমকের সুরে বললেন, 'কি হচ্ছে হরিশঙ্কর?'

হরিশঙ্কর অম্লান বদনে বললেন, 'সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যাওয়া ভাল। লুকোচুরিটাই পাপ। আশা আমাদের সত্য কথাটা বললেই পারত। আমরা তো গ্রামের লোক নই। আই হেট লায়ারস দ্যান মার্ডারারস, দ্যান প্রস্টিটিউটস।'

যেন বাজ পড়ল! আমরা সবাই স্তম্ভিত। তারিণীবাবুর মুখটা ভীষণ করুণ দেখাল।

অফিসার বললেন, 'কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, আপনারা সোজা কলকাতায় চলে যান। দায়িত্ব আমার। এখন ট্রেন নেই। বাসে করে বর্ধমানে চলে যান। সেখান থেকে লোকাল ধরে কলকাতা। এইসব ভুলে যান। আমি আর সময় দিতে পারছি না। আমার এলাকায় খুন এই প্রথম।'

সদলে আবার আমরা রাস্তায়। যথারীতি হরিশঙ্কর আবার একটা সমস্যা তৈরি করে ফেললেন, 'এদের জিনিসপত্তরের কি হবে! সবই তো পড়ে রইল!'

ছোটদাদু বললেন, 'ও সবই এখন পুলিশের হেফাজতে। সুখে থাকতে ভূতের কিল খেয়ে লাভ কি?'

'আশার ছেলে মেয়ের স্কুল ট্রান্সফার সার্টিফিকেটের কি হবে?'

'সব, সব হবে। পরে হবে। ঠিক সময়ে হবে।'

আবার আমাদের চলা শুরু হল। এইবার আর স্টেশানের দিকে নয়, বাস স্ট্যান্ডের দিকে। আর যেন পারা যাচ্ছে না। শরীর ভেঙে আসছে। বিমলাদি বলেছিলেন, থেকে যাও তুমি। বিদ্রোহী সন্তান হয়ে যদি রয়ে যেতুম, তাহলে অন্য এক ধরনের অভিজ্ঞতা হত। হয় তো ভেড়া হয়ে যেতুম। ভয়ও ছিল। ইঁদারায় না পড়ে হয় তো গলায় দড়ি দিতে হত। এখন বুঝতে পারছি, মেলায় বিমলাদি আমাকে কি করেছিলেন। যা কোনওদিন কেউ করবে না। বাস স্ট্যান্ডে এসে হরিশঙ্কর বললেন, 'খাওয়া দাওয়ার প্রয়োজন আছে?'

সকলেই সমস্বরে বললেন, 'না।' কারো কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না।

আমরা বাসে উঠে বসলুম। কারো মুখে কোনও কথা নেই। আমরা বেঁচে ফিরছি, না মরার জন্যে দল বেঁধে চলেছি, মনের অবস্থা দেখে বোঝার উপায় নেই। বিষণ্ণ, বিভ্রান্ত। হরিশঙ্কর পকেট থেকে ছোট্ট একটা নোটবুক বের করে মগ্ন হয়ে আছেন। আমি ঠিক তাঁর পেছনে বসে যতটুকু দেখতে পাচ্ছি, তাইতে মনে হচ্ছে, লেখা আছে উদ্ধৃতি। ছোটদাদু বসেছেন হরিশঙ্করের পাশে।

ছোটদাদু জিজ্ঞেস করছেন, 'কিসে ডুবে গেলি?'

হরিশঙ্কর বললেন,' নোটস। এতে কিছু কিছু পয়েন্টস লেখা আছে। মেডিক্যাল গাইডসের মতো, লিভিং গাইডস। প্র্যাকটিক্যাল নোটস ফর এফেকটিভ লিভিং। কি ভাবে তুমি বাঁচবে। সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার গণিত। মানুষ গাছে সার দেয়, পেটে দানাপানি দেয়, অভিভাবক হীন, নিঃসঙ্গ মনকে মানুক কি দেয়! অনাথ বালকের মতো বসে আছে ফুটপাথে। ঢোলসহরত করে মিছিল যাচ্ছে আলোর রোশনাই দিয়ে, দেখছে। সেজেগুজে বড় মানুষের মেয়ে যাচ্ছে, দেখছে। ঝকঝকে মটোরগাড়ি যাচ্ছে, দেখছে। দুটো লোক ঝগড়া করতে করতে যাচ্ছে, দেখছে। কেউ ভুট্টা খেতে খেতে চলেছে,

দেখছে। রাত হল, দেখছে। পথ নির্জন থেকে নির্জনতর হয়ে গেল। নিবে গেল দীপাবলী। বন্ধ হয়ে গেল বাহারী সব দোকান। রাতের বাতাস বহে গেল রাজপথের ছেঁড়া কাগজ উড়িয়ে। অনাথ বালক বসে আছে দেয়ালে ঠেসান দিয়ে। কেউ এসে হাত ধরে বলবে না, চলো, ওঠো, রাত হল। কেউ তাকে গরম জলে চান করাবে না, ভালো পোশাক পরিয়ে সেন্ট ছিটিয়ে দেবে না, গরম খাবার খাইয়ে নরম বিছানায় শুইয়ে দেবে না। মধ্যরাতের নির্জন পথে একা বালক। নিরাশ্রয় একটি পাখি। সেই মনের ধাত ধরতে পারে আমার এই ছোট্ট খাতা। আমি এটাকে আরো বড় করব। নাম হবে, মাই এনকাউন্টার উইথ লাইফ। জীবন পথিক।'

বাস চলেছে প্রচণ্ড গতিতে। আমার পাশে জানালার ধারে আমার পিসতুতো ভাই। বাসে এখনো তেমন ভিড় হয়নি। চিৎকার চেঁচামেচি তেমন শুরু হয়নি। মানুষের কপচাকপচি। ভাইয়ের চোখ বুজে আসছে। মুখ দেখে মনের ভাব পড়া যাচ্ছে না। বাস কলকাতার দিকে যাচ্ছে, না যাচ্ছে অনিশ্চিত এক ভবিষ্যতের দিকে। আকাশে প্যারাসুট নিয়ে ঝাঁপ মারার মতো ; একমাত্র বাতাসই ভরসা।

ছোটদাদু বলছেন, 'তোর একটা টুকরো শোনা না !'

'শুনবি ? তাহলে শোন, সুইচ অফ সুইচ অন। কখনো তুমি থাকবে কখনো তুমি থাকবে না। মন বসাবে, মন তুলবে। উপমা পাখি। ডালে বসল, ফল ঠোকরাল, শিস দিল, পোকামাকড়ের দিকে নজর গেল, হঠাৎ উড়ে চলে গেল একসময়। মনের দেহ-যুক্তি, দেহ-বিযুক্তি। ঘটনার মধ্যে দেহ আছে ; কিন্তু মন নেই। পাখি উড়তে পারে, মন কেমন করে উডবে। ঘুড়ি ওড়ে, ঘুড়ির লেজ ওড়ে কেমন করে ? ঘুড়ির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে। মন উড়বে ভাব আর ভাবনার লেজ ধরে। মনকে তল্লাস দিতে হবে, যাও মন পাহাড় চূড়োয়, যাও মন সমুদ্রের ঊর্মিমালায়, যাও মন আমাজনের রেনফরেস্টে। ক্ষুদ্র থেকে বিশালের দিকে ঠেলে দাও। এইটা রপ্ত করার জন্যে ছোটখাটো ব্যায়াম অভ্যাস করা যেতে পারে। যেমন বাস চলার এই শব্দে তুই কি আমার শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিস ?'

ছোটদাদু বললেন, 'না।'

'আচ্ছা, এইবার চেষ্টা কর।'

ছোটদাদু কিছুক্ষণ স্থির থেকে বললেন, 'এইবার পাচ্ছি।'

'কোন কায়দায় পেলে ?'

'কিছুই না মনটাকে গুটিয়ে নিয়ে এলুম। সব কিছু থেকে সরিয়ে উৎকর্ষ হতেই শুনতে পেলুম।'

'ছোটদের ম্যাগাজিনে এক ধরনের ধাঁধা ছাপা হয় দেখেছিস ? একটা ম্যাপের মতো, রোড ম্যাপ। এক গাদা পথ। একটার ঘাড়ের ওপর দিয়ে আর একটা চলে গেছে, দুটোকে জড়িয়ে তৃতীয় আর একটা। সব পথই কিছু দূর পর্যন্ত গিয়ে আর নেই। আটকে গেছে। এর মধ্যে শেষ পর্যন্ত যাওয়ার একটা পথই খোলা আছে। সেটাকে খুঁজে নিতে হলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চাই, কনসেনট্রেশান চাই। পৃথিবীর জটিল আবর্ত থেকে পথ চিনে লক্ষ্যে পৌঁছবারও সেই একই কায়দা। দৃষ্টি স্থির, মন স্থির। প্লেন থেকে নিচে তাকালে কি দেখবে ? ছবির মতো পড়ে আছে জনপদ। নদী, খাল, ব্রিজ, পথ, বাড়ি, মনুমেন্ট, গির্জা, মন্দির। কোথাও কোনও জটিলতা নেই। কোনটা কোথায়, কোথায় শুরু, কোথায় শেষ, একেবারে পরিষ্কার ছবি। জীবন থেকে সরে গিয়ে জীবনের নকশা দেখে নিতে হয়

মাঝেমাঝে। মনকে সরাও, মনকে ঢোকাও। ঘাড়-মুখ গুঁজড়ে সংসারে পড়ে থেকো না। সবেতেই আছি আবার কিছুতেই নেই। ইউ লিড এ লাইফ অ্যান্ড লার্ন দি আর্ট অফ লিভিং।'

ছোটদাদু বেশ আগ্রহের সঙ্গে বললেন, 'বেশ বলেছিস তো! তোর নোটবুকে আর কি আছে?'

বাস থামছে, বাস চলছে। আমার পিসতুতো ভাইয়ের মাথাটা আমার ডান কাঁধে নেমে এসেছে। গভীর ঘুমে কাদা। অন্য কোনও সহযাত্রী হলে জাগিয়ে দিয়ে বলতুম, সোজা হয়ে বসুন। এখন একটা কেমন করুণার ভাব আসছে। কি অসহায়! দুটো বোন। তাদের লেখা-পড়া, বিয়ে। এই ছেলেটিকেই হতে হবে পিলার, হতে হবে ছাতা। কত রাজপথ, জনপথ পেরিয়ে, মরুভূমি, সাগরের সীমানায়, এই ছেলেটিকে যেতে হবে। তেল চিটচিটে চুল। জামার কাঁধে ছোপ পড়ে যাবে। আমার শহুরে মনের সঙ্কীর্ণতায় নিজেকেই নিজে ধমক দিলুম। কাঁধটাকে আরো এগিয়ে দিলুম মাথাটা যাতে পড়ে না যায়।

হরিশঙ্কর বলছেন, 'মানুষ যখন বাঁচতে শেখে তখন তার জীবন শেষ হয়ে আসে। আমাদের স্কুল, কলেজের আধুনিক শিক্ষা বড় একপেশে। রোজগার করতে শেখায়, সুখে বাঁচার কায়দাটা শেখায় না।'

'সুখে বাঁচার কায়দাটা কি?'

'দুঃখটাকে মেনে নেওয়ার মানসিক প্রস্তুতি। রিক্ততার মধ্যে পূর্ণতার অনুভূতি। প্রত্যাশা বর্জিত জীবন। আমাকে কেউ কিছু দেবে না, পারলে কেড়ে নেবে, পথ আর বাধা দুটোই থাকবে একসঙ্গে। কেউ আমার প্রশংসা করবে না, নিন্দাই করবে। আমাকে নিয়ে আলোচনা হবে না, হবে সমালোচনা। আমার কোনও বন্ধু থাকবে না, সকলেই শত্রু। সকলেই আমাকে ব্যবহার করবে। যারা কাছে আসবে, আসবে স্বার্থের কারণে। স্বার্থ ফুরিয়ে গেলে আর চিনতে পারবে না। আমার ভাল হলে সবাই দুঃখ পাবে, খারাপ হলে ভয়ঙ্কর আনন্দ হবে। তোমাকে শুধু দিতে হবে পাবে না কিছুই। পৃথিবীতে ভালবাসা নেই, আছে ঘৃণা। জীবন একটা খেলা, চালে ভুল হলেই হার। তাহলে তোকে একটা কবিতা শোনাই:

The world won't care if you quit
And the world won't whine if you fail;
The busy world won't notice it,
No matter how loudly you wail.
Nobody will worry that you
Have relinquished the fight and gone down
For it's only the things that you do
That are worth while and get your renown.
The quitters are quickly forgot;
Of them the world spends little time;
And a few e'er care that you've not
The courage or patience to climb.
So give up and quit in despair
And take your place back on the shelf
But don't think the world's going to care;
You are injuring only yourself.

কি অসাধারণ স্মৃতি হরিশঙ্করের। এই কবিতাটা আমাকে একসময় মুখস্থ করিয়েছিলেন। কোথাও এতটুকু বিস্মরণ হল না। অপূর্ব উচ্চারণ। কখনো কোনও রেফারেন্স দিতে হলে বইয়ের পাতা ওলটাতে হয় না। আমাকে একদিন কথামৃত খুলে দেখিয়েছিলেন স্মৃতির রহস্যটা কি। শ্রীরামকৃষ্ণ মহিমাচরণকে বলছেন, 'আর এক আছে ধৈয্যরেতা। আগে রেতঃপাত হয়েছে, কিন্তু তারপর বীর্যধারণ। বার বছর ধৈর্যরেতা হলে বিশেষ শক্তি জন্মায়। ভিতরে একটি নতুন নাড়ী হয়, তার নাম মেধা নাড়ী। সে নাড়ী হলে সব স্মরণ থাকে— সব জানতে পারে।'

হরিশঙ্কর আণ্ডারলাইন করে রেখেছেন ঠাকুরের উক্তি, 'বীর্যপাতে বলক্ষয় হয়। স্বপ্নদোষে যা বেরিয়ে যায়, তাতে দোষ নাই। ও ভাতের গুণে হয়। ও-সব বেরিয়ে গিয়েও যা থাকে, তাতেই কাজ হয়। তবু স্ত্রীসঙ্গ করা উচিত নয়। শেষে যা থাকে, তা খুব রিফাইন হয়ে থাকে। লাহাদের ওখানে গুড়ের নাগরি সব রেখেছিল, —নাগরির নিচে একটি একটি ফুটো করে, তারপর এক বৎসর পর দেখলে ; সব দানা বেঁধে রয়েছে— মিছরির মতো। রস যা বেরিয়ে যাবার, ফুটো দিয়ে তা বেরিয়ে গেছে।'

হরিশঙ্করের স্মৃতির রহস্য এই মেধা নাড়ী। ছোট দাদুরও স্মৃতিশক্তি অসাধারণ। দুই যোগী আমার সামনের আসনে পাশাপাশি। হরিশঙ্কর তাঁর সামনের আসনের জানলার ধারের ভদ্রলোককে বললেন, 'চলন্ত বাসে, অনবরত ওই ভাবে থুতু ফেললে, পেছনে যারা বসে আছে তাদের গায়ে লাগে।'

ভদ্রলোক গম্ভীর গলায় বললেন, 'কোথায় ফেলবো ? নিজের কোলে ?'

হরিশঙ্কর বললেন, 'তখন থেকে অত থুতু ফেলছেন কেন ? আপনার মনে হয় কৃমি হয়েছে। ভাল ওষুধ আছে হোমিওপ্যাথিতে, সিনা থার্টি।'

ভদ্রলোক বললেন, 'আপনাকে আমার ডাক্তারি করতে বলিনি। চুপচাপ বসুন।'

হরিশঙ্কর মৃদু হাসলেন। জামার বুকপকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে একটা কোণ ছিঁড়ে গোল করে পাকিয়ে নিজের নাকে ঢুকিয়ে সুরসুড়ি দিতে লাগলেন। এইবার যা হবে আমি জানি। ভয়ে সিঁটিয়ে রইলুম। নির্ঘাৎ মারামারি। হরিশঙ্কর বরদাস্ত করেন না অসভ্যতা। বিশাল একটা হাঁচি একেবারে ভদ্রলোকের ঘাড় তাক করে। আপ্লুত করার মতো নিখুঁত একটি হাঁচি। বম্ব-ব্লাস্টের মতো।

ভদ্রলোক ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন, ' এ কি অসভ্যতা ?'

হরিশঙ্করও বললেন, 'এ কি অসভ্যতা !'

ভদ্রলোক বললেন, 'গায়ে লাগছে না ?'

হরিশঙ্কর বললেন, 'গায়ে লাগছে না ?'

ভদ্রলোক বললেন, 'আশ্চর্য।'

হরিশঙ্কর বললেন, 'আশ্চর্য !'

ভদ্রলোক বললেন, 'অদ্ভুত।'

হরিশঙ্কর বললেন, 'অদ্ভুত।' যেন আয়নায় বিম্ব আর প্রতিবিম্ব। বাস ছুটছে হইহই করে।

৪৯

The time, which steals our years away
Shall steal our pleasures too;
The memory of the past will stay
And half our joys renew.

হরিশঙ্কর আর সেই বাসযাত্রীর দ্বন্দ্ব আরো কতদূর এগতো কে জানে ? হয় তো হাতাহাতির পর্যায়ে চলে যেত। ভদ্রলোক একবার মাত্র ছোটদাদুর চোখে চোখ রেখে স্থির হয়ে গেলেন। কি ছিল সেই চোখে ? আমি তো বসে আছি পেছনে, প্রস্তুত হয়ে। তেমন কিছু হলেই ঝাঁপিয়ে পড়ব।

ছোটদাদু বললেন, 'ছি ছি। যাচ্ছেন জামাই বাড়ি। নাতিকে কি শিক্ষা দেবেন ? পিচিক পিচিক থুতু ফেলা !' ভদ্রলোক কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠলেন। ছোটদাদু বললেন, 'শ্বশুর বাড়িতে মেয়ে এত অশান্তিতে রয়েছে, বনিবনা হচ্ছে না, মেয়ে কি আপনার স্বভাবই পেয়েছে ? এইরকম উদ্ধত, অসভ্য ! মেয়ের মা তো মাটির মানুষ ছিলেন ! সেইজন্যই বুঝি তাঁকে ধামসে শেষ করে দিলেন ! আপনি তো মশাই মহাবদ ! কাছারির চাকরিটা খোয়ালেন কি করে ! এদিকে তো পাইলসের যন্ত্রণায় ছটফট করেন।'

উলঙ্গ মানুষ যে-ভাবে নিজেকে ঢাকবার চেষ্টা করে, ভদ্রলোক সেই ভাবে জড়সড় হয়ে গেলেন। মুখে অদ্ভুত একটা ভয়ের ভাব। পারলে, কান ধরে জিভ বের করেন, এই রকম একটা অবস্থা। ছোটদাদুর এই কাণ্ডটা আমি খুব উপভোগ করি। ভীষণ একটা শ্রেষ্ঠত্বের ভাব আসে আমার মনে। এমন একজন মানুষ আমার দাদু, যিনি সমস্ত তামসিকতা এক ফুৎকারে স্তব্ধ করে দিতে পারেন। প্যাঁজা তুলোর মতো উড়িয়ে দিতে পারেন মানুষের যত নীচ অহংকার। লোকটি কেঁচোর মতো গুটিয়ে গেলেন। আর বাসের কন্ডাক্টার, এতক্ষণ যিনি পুরো পর্যায়ের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি এগিয়ে এসে বললেন, 'মহাপুরুষের চরণে প্রণাম।'

ছোটদাদু এক ঝলক তাকিয়েই বললেন, 'শীঘ্রি তোমার এই কর্ম ঘুচে যাবে। তোমার শ্বশুরমশাইয়ের এখন-তখন অবস্থা। সাতদিনের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হবে। তাঁর সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে তুমি ; কারণ তাঁর ছেলেটি উন্মাদ।' লোকজন সরিয়ে কন্ডাকটার ছোটদাদুর পায়ের পাশে বসে পড়লেন। মুখে কথা সরছে না। কেবল বলছেন, 'বাবা, বাবা।' ছোটদাদু তাঁর মাথায় হাত রেখে বললেন, 'তোমার ত্রিতাপ জ্বালা জুড়িয়ে যাবে। তুমি শুদ্ধ প্রাণ। জননীর সেবা যে-ভাবে করছ, সেই ভাবে করে যাও। ইষ্টদর্শন হবে। পারলে তারাপীঠে এসে আমার খোঁজ কোরো। বোলো, অথরবাবার আশ্রমে যাবো।'

বাসের প্রায় সমস্তযাত্রী পাগলের মতো হয়ে উঠেছে ; যেন স্বয়ং যীশুখ্রীষ্ট এই বাসের যাত্রী। কৃপা চাই, একটু কৃপা। বাসচালক একধারে নিয়ে গিয়ে বাস থামিয়ে দিয়েছেন। চিৎকার করছেন, 'সকলের হবে, আমার কিছু হবে না।'

হরিশঙ্কর বলছেন, 'নাও, এইবার বোঝো ঠ্যালা, কাঙালদের দেখিয়েছো শাকের ক্ষেত।'

ছোটদাদু বাসচালককে বললেন, 'তুমিই তো আমাদের চালাচ্ছো! তোমার না হয়ে যায়! বর্ধমান চলো, সেখানে তোমার ব্যবস্থা হবে।'

সহজে কেউ শান্ত হয়! মানুষ নয় তো, সবাই এক একটি তোলা উনুন। অশান্তির কালো কয়লা জীবনের আঁচে জ্বলছে। ছোটদাদু হঠাৎ দু'হাত তুলে বললেন, 'আচ্ছা, তাহলে আজ এই হোক, যাঁরা আমার সহযাত্রী তাঁদের সকলেরই মঙ্গল হোক। যেখানে যার যা বাধা আছে সব সরে যাক। মোটা ভাত-কাপড় আর শান্তির অভাব যেন না হয় কারো। সবাই একটু মিষ্টি খাও। মিষ্টি মুখ করো। মিষ্টি মুখ। যার যা ইচ্ছে।'

জীবনে আমার এমন অভিজ্ঞতা কখনো হয়নি। মিষ্টির কথায়, আমি দেওঘরে বাবা বৈদ্যনাথ ধামের পাশে যে পেঁড়ার দোকান থেকে স্বামী বিবেকানন্দ পেঁড়া খেয়েছিলুম, সেই দোকানের পেঁড়ার কথা ভেবেছিলুম, আমার মুখ সেই স্বাদে ভরে গেল। আমার মতোই অভিজ্ঞতা হল সকলের। বাসের সমস্ত যাত্রী বুঁদ হয়ে গেছেন। বাস আবার যাত্রা শুরু করল। সেই একই বাস, একই যাত্রী। পরিবেশ ভিন্ন ; যেন চলমান একটা ধ্যানঘর। সবাই মৌনী।

মহাভারতের বনপর্বের উপাখ্যান মনে পড়ছে। দুর্যোধন, কর্ণ ও দুঃশাসনের দুষ্ট পরামর্শে তপস্বী দুর্বাসা তাঁর অযুত শিষ্য নিয়ে কাম্যকবনে উপস্থিত হলেন। অতিক্রান্ত মধ্যাহ্নে। পঞ্চপাণ্ডবের আহারাদি সমাপ্ত। দ্রৌপদী সবার শেষে আহার করে সবে সামান্য বিশ্রামের আয়োজন করছেন। যুধিষ্ঠির দুর্বাসার সশিষ্য আগমন সংবাদ জানালেন। যুধিষ্ঠির যথাবিধ পুজো করে বলেছেন, ভগবান, আপনি আহ্নিক করে শীঘ্র আসুন, আপনার সেবা আমরা প্রস্তুত করছি। দ্রৌপদী মহাচিন্তায় পড়লেন। সশিষ্য দুর্বাসা স্নানে গেছেন। স্নান আর আহ্নিক এইটুকুমাত্র সময়। এর মধ্যে অন্নের আয়োজন কি-ভাবে হবে! অগতির গতি শ্রীকৃষ্ণ। দ্রৌপদী আকুল প্রার্থনা শুরু করলেন, হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো, হে দুঃখনাশন, একটা কিছু উপায় করো ঠাকুর। দ্যূতসভায় দুঃশাসনের হাত থেকে রক্ষা করেছিলে, আজ এই সংকট থেকে ত্রাণ করো প্রভু।

কৃষ্ণ ঠিক শুনতে পেলেন, প্রিয়জনের প্রার্থনা। রুক্মিণীকে ছেড়ে চলে এলেন দ্রৌপদীর কাছে। দুর্বাসার আগমনের কথা শুনে তিনি বললেন, 'কৃষ্ণা, আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত, শীঘ্র আমাকে খাওয়াও তারপর তোমার অন্য কাজ। শীঘ্রং ভোজয় মা কৃষ্ণে পশ্চাৎ সর্বং করিষ্যসি। দ্রৌপদী লজ্জিত হলেন। যতক্ষণ না আমি নিজে আহার করি ততক্ষণ পর্যন্তই সূর্যদত্ত অন্নপাত্রে অন্ন থাকে। আমার আহার যে হয়ে গেছে প্রভু। আর যে কিছু নেই। ভুক্তবত্যস্মাহং দেব তস্মাদন্নং ন বিদ্যতে। ভগবান বললেন, কৃষ্ণা, এখন পরিহাসের সময় নয়, শীঘ্র যাও, ওই হাঁড়িটি এনে আমাকে দেখাও। দ্রৌপদী নিয়ে এলেন সেই অন্নপাত্র। কৃষ্ণ দেখলেন, তার কানায় একটু শাকান্ন লেগে আছে। স্থাল্যাঃ কণ্ঠেহথ সংলগ্নং শাকান্নং বীক্ষ্য কেশবঃ। সেই শাকান্নটুকু মুখে দিয়ে কেশব বললেন, বিশ্বাত্মা প্রীয়তাং দেবস্তুষ্টশ্চাস্ত্বিতি যজ্ঞভুক্। বিশ্বাত্মা যজ্ঞভোজী দেব তৃপ্তিলাভ করুন, তুষ্ট হ'ন।

দুর্বাসা ও তাঁর শিষ্য মুনিগণ তখন নদীতে স্নানের জন্য নেমে অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করছিলেন। সহসা তাঁরা উদ্গার তুলতে শুরু করলেন। যেন কতই খাওয়া হয়েছে। উদ্গারে আহারের গন্ধ। তাঁরা তৃপ্ত হয়ে জল থেকে উঠে এলেন। পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছেন। মুনিরা দুর্বাসাকে বললেন, ব্রহ্মর্ষি আমরা যেন আকণ্ঠ ভোজন করে তৃপ্ত হয়েছি, এখন আবার কি করে ভোজন করব! দুর্বাসা বললেন, বটেই তো! ওদিকে রাজর্ষি যুধিষ্ঠিরকে বৃথাই অন্নপাক করতে বলে মহা অপরাধে অপরাধী হলুম। হরিচরণাশ্রিত পাণ্ডবদের আমিও ভয় করি। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিপাতে আমাদের দগ্ধ না করেন। চলো, আমরা পালাই।

কেশবের আদেশে তাঁদের ডাকতে নদীতীরে এসে সহদেব দেখলেন কেউ কোথাও নেই।

ছোটদাদু যা করলেন, অনেকটা এইরকম। এ যে অদ্ভুত এক যোগশক্তি! সেই শক্তির অনুভব আমার মধ্যেও হল। কেমন করে অবিশ্বাস করি! নিপুণ শিল্পীর মতো ছোটদাদু ছোটখাটো নানা বিভূতি দেখিয়ে চলেছেন। বিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা নেই আমার। হরিশঙ্করের ঠোঁটে এক ফালি হাসি লেগে আছে। তিনি মগ্ন হয়ে আছেন তাঁর সেই বিখ্যাত নোট খাতায়।

অলৌকিক সেই যাত্রার শেষ মিলল বর্ধমানে এসে। এতটা পথ ড্রাইভার ও কন্ডাক্টার কোনও যাত্রী তোলেননি, শুধু নামিয়ে গেছেন। ছোটদাদুর সম্মানে বাসটা স্পেস্যাল বাস হয়ে গেছে। টার্মিনাসে বাস লাগল। কোনও আরোহী আগে নামলেন না। ছোটদাদু ও আমরা নামার পর সবাই নামলেন একে একে। বাসের চালক, ছুটে এলেন। ফর্সা, সুন্দর চেহারার এক যুবক। এক-মাথা কালো কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। প্রণাম করে বললেন, 'আপনি বলেছিলেন বর্ধমানে বলবেন।'

ছোটদাদু তাকে টেনে নিয়ে গেলেন একপাশে। বেশ কিছুক্ষণ কথা হল দু'জনে অন্তরঙ্গ ভাবে।

রাজসমারোহে আমরা ট্রেনে চাপলুম। এইবার ছোটদাদু আমার পাশে। উল্টোদিকে হরিশঙ্কর। হরিশঙ্করকে আমরা এমন ভাবে ঘিরে রেখেছি যাতে আর কোনও গোলোযোগ না হয়। ট্রেন অবশ্য খুবই ফাঁকা।

ছোটদাদু বললেন, 'ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল।'

'কেন? মন খারাপ কেন?'

'অত সুন্দর ছেলে; কিন্তু বাঁচবে না বেশি দিন।'

'কে? ওই ড্রাইভার?'

'হ্যাঁ। খুব সামান্য আয়ু হাতে নিয়ে এসেছে।'

'আপনি পারেন না বাড়াতে?'

'ওই একটা জায়গায় কেরামতি চলে না পিন্টু।'

বিধ্বস্ত সৈন্যবাহিনীর মতো আমরা একটা দল পাড়ায় ঢুকলুম। আমাদের বিশ্বস্ত দুই অভিভাবক, দুটো কুকুর, মোহর আর পন্টু, মাঝ রাস্তাতেই ধরে ফেলল আমাদের। তাদের সে কি নর্তন-কুর্দন। হরিশঙ্কর, ছোটদাদু দু'জনেই এদের ভক্ত। সকাল, বিকেল, দুপুর ভোজনের অন্ত নেই। তন্ত্রের সঙ্গে কুকুরের গভীর যোগ। হরিশঙ্কর জীবজন্তুপ্রেমী। গাড়ি চাপায় মোহরের ঠ্যাং ভেঙেছিল, হরিশঙ্কর প্ল্যাস্টার করেছিলেন। সকলের চিৎকার, কামড়ালেই জলাতঙ্ক। হরিশঙ্কর বলেছিলেন একটি কথা, মোহর মানুষ নয়। সবাই ঠোঁট

উল্টেছিল। বলেছিল, কামড়ালেই বুঝবেন, মোহর মানুষ না কুকুর! হরিশঙ্করের হাতে ছোট একখণ্ড কাঠ, প্ল্যাস্টার অফ প্যারিসের টিন, ব্যান্ডেজ। তিনবার টুস্কি মেরে মোহরের সামনে বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল মোহরের কান্না। মোহর লেজ নাড়ছে। হরিশঙ্কর নিপুণ একটি প্ল্যাস্টার করে উঠে দাঁড়ালেন। কারোর মুখে কোনও কথা নেই।

একটা স্টেশনারি দোকান তখনো খোলা ছিল। ছোটদাদু একগাদা বিস্কুট কিনলেন। বাড়ির সামনে এসে রকের ওপর বিস্কুটগুলো ছড়িয়ে দিলেন। মোহর আর পল্টুর ভোজন শুরু হল। পল্টু মোহরের ছেলে। খাওয়ার আগে দু'জনেই আকাশের দিকে মুখ তুলে, তাদের বিখ্যাত সেই উল্লাসের ডাকটি ছাড়ল।

কানে আসছে গান। মাতুল জয়নারায়ণ দোতলায় গান ধরেছেন,

পড়িয়ে ঘোর সঙ্কটে ডাকি তোমায় অকপটে
নিকটে বারেক আসি দাঁড়াও না।
পক্ষ হইয়ে বিপক্ষ, প্রতিপলে করে লক্ষ্য, দিতেছে দারুণ মন বেদনা।
দুটি খুঁটির উপরে, দিয়াছ রহিতে ঘরে, ঘুণ ধ'রে সে যে আর থাকে না।

সুরটা মনে হচ্ছে খট। আমার মাতামহের কণ্ঠে শুনেছি এই গান, রাম দত্তের লেখা। আমাদের বিখ্যাত সদরের কালোয়াতি দরজা খোলাই ছিল। ঠেলতেই হড়াস হয়ে গেল। তিন ভাঁজ দরজা পৃথিবীর কোথাও আছে কি? একমাত্র এই বাড়িতে।

সিঁড়ির মাথায় প্রথমেই দেখা হল মুকুর সঙ্গে। আনন্দের উল্লাস, 'আপনারা এসেছেন?'

আরো কিছু বলত, পিসিমাদের দেখে থমকে গেল। জড়োসড়ো হয়ে উঠে আসছে চারটি প্রাণী। পিসিমার মাথায় মোটা ব্যান্ডেজ। এটা পিসির নিজের বাড়ি, তবু কি সঙ্কোচ!

জয়নারায়ণ বেরিয়ে এলেন গান থামিয়ে। পরিবেশ বদলে গেল। জয়নারায়ণ হই হই করে বললেন, 'আশাদি তুমি তা হলে এলে? মাথাটা ফাটালে কি করে?'

পিসিমা অবাক হয়ে বললেন, 'জয় তুমি? কেমন আছ তোমরা? কতদিন পরে দেখা! তুমি আগের চেয়ে আরো ফর্সা হয়েছ; কি সুন্দর দেখতে হয়েছে তোমাকে?'

সবাই বারান্দায়। কেউই সাহস করে ঘরে ঢুকছে না। মুকু পিসিমার ছেলেমেয়েদের হাত ধরে বললে, 'নতুন জায়গা। আড়ষ্ট লাগছে তাই না! চলো ভেতরে চলো। ভয় কি?'

হরিশঙ্কর ডাকলেন, 'মুকু!'

অতন্দ্র প্রহরীর মতো উত্তর, 'মেসোমশাই।'

'তোমার অনেক কাজ। ছেলেমেয়ে তিনটেকে ফলাও করে চানের ব্যবস্থা করে দাও। সাবানের কৃপণতা কোরো না। চুলে উকুন থাকা অসম্ভব নয়। তার ব্যবস্থা কাল হবে। পরিষ্কার জামা কাপড় পরাও।' জামাকাপড়, বলে হরিশঙ্কর হোঁচট খেলেন। ছোটদাদুকে বললেন, 'গ্রেট মিসটেক। প্রলিফিক ব্লান্ডার।'

ছোটদাদু বললেন, 'কি হল আবার?'

'আমাদের উচিত ছিল এক সেট করে জামাকাপড় কিনে আনা। এখন এরা কি পরবে!'

মুকু বললে, 'আপনি ভাবনেন না মেসোমশাই। আমি ইমপ্রোভাইস করছি।'

হরিশঙ্কর বললেন, 'এই তো চাই! যাও মা। তুমি এদের ইনচার্জ।'

রান্নাঘরে কাকিমা রাঁধছিলেন। বেরিয়ে এলেন। এসেই গুনতে শুরু করলেন, এক, দুই, তিন, চার। নিজের মনেই বললেন, 'পার হেড আটখানা, তার মানে আরো ছাপ্পান্ন খানা রুটি। আধখানা কুমড়ো, দু'সের আলু। মাছ হবে না। দুধ আছে, সুজি দিয়ে পায়েস হবে। মুকু!'

কাকিমা মুকুকে ডাকলেন। 'দু' সের আটা বের করে, ঠাসতে শুরু করি।'

হরিশঙ্কর বললেন, 'চিন্তার কিছু নেই। আমি সাফা হয়ে এসে তোমাকে সাহায্য করছি।'

পিসিমা বললেন, 'ছোটদা, আমি আছি।'

মুকু বললে, 'আমি কি করতে আছি!'

আমাদের বাড়ির পুরনো রীতি অনুসারে মাঝরাতে জেগে উঠল সংসার। জয়নারায়ণ রান্নার এক্সপার্ট। তিনি বসে গেলেন হামানদিস্তা নিয়ে। ভাজা মশলা গুঁড়ো করতে। কুমড়োর ছককায় ভাজা মশলা না পড়লে জমে না। তালে তালে হামানদিস্তা চলেছে। জয়নারায়ণ বলছেন, 'প্রথমটা ঢিমে তিনতাল, তারপর ঝাঁপতাল, তারপর দাদরা। দাদরায় মশলা মিহি।'

মুকুর মাথা খাটানোর ফলে গোটাকতক ক্লাউন বেরিয়ে এল ভেতরের ঘর থেকে। পিসতুতো ভাই একটা আন্ডারওয়ার পরেছে। বিশাল তার সাইজ ; ফলে মনে হচ্ছে থ্রি কোয়ার্টার পায়জামা, তার ওপর হরিশঙ্করের সুবৃহৎ হাতাঅলা গেঞ্জি। সেটা আর গেঞ্জি নেই, মনে হচ্ছে পাঞ্জাবি। মেয়ে দুটো পরেছে মুকুর শাড়ি, পাটে পাটে জড়িয়ে। জ্যান্ত মমির মতো পায়ে পায়ে ঘুরছে। বাড়ি একেবারে জমজমাট। রান্নার ছ্যাঁকছোঁক শব্দ। চাকি বেলনে রুটি ঘুরছে গোল হয়ে।

একপাশে বসে বসে ঢুলছিলুম। মুকু এসে বললে, 'তুমি আগে খেয়ে শুয়ে পড় না! তোমাকে দেখে আমার কষ্ট হচ্ছে।'

'শুয়ে পড়লে বাবা বকবেন। আর শোবোই বা কোথায়? এতগুলো মানুষের বিছানার কি ব্যবস্থা হবে! কটা মশারি লাগবে জানো?'

'সে-ভাবনা তোমার নয়, আমার। তোমাকে যা বলছি তাই করো। তোমাকে ভূতের মতো কাহিল দেখাচ্ছে।'

মুকুর কি উপমা! ভূতের মতো কাহিল! মুকুকে একেবারে গার্ডেন-ফ্রেশ দেখাচ্ছে। শিশির-ভেজা গোলাপের মতো। টুসটুসে গাল, টসটসে ঠোঁট। আকাশী রঙের শাড়ি। মুকুর নিজস্ব একটা সুগন্ধ আছে লিলিফুলের মতো। আজ যদি কেউ কোথাও না থাকত, তাহলে মুকুর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়তুম, সাবিত্রীর কোলে সত্যবানের মতো। অরণ্যের গল্প বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়তুম। স্বপ্ন দেখতুম, দামোদরের কূল ছাপিয়ে বান আসছে। প্রতিমুহূর্তে মানুষের প্রায় প্রতিটি ইচ্ছারই মৃত্যু হয়। মন হল ইচ্ছার মহাশ্মশান। মনে হচ্ছে হাত বাড়িয়ে মুকুর গোল কবজিটা ধরি। বুকের কাছে মাথাটা একটু রাখি। উপায় নেই, একটা ছেলে একটা মেয়ে, সংসারের যত পাপের উৎস! লেবরেটারিতে আমরা যে-রকম কালচার প্লেট তৈরি করি, এক জীবাণুর সঙ্গে আর এক জীবাণুকে মিলিয়ে, ছেলে আর মেয়ে সেইরকম পাপের কালচার প্লেট।

এই ঘোর বেশিক্ষণ স্থায়ী করা গেল না, ও-ঘর থেকে হরিশঙ্করের ডাক এল, 'প্লিজ হেল্প মি।' ছোটদাদু তাঁর সেই অসাধারণ লাল সিল্কের লুঙ্গি পরে অনাবৃত ঊর্ধ্ব-দেহে বসে

আছেন মহাযোগী। প্রশস্ত ফর্সা বুকে স্ফটিকের মালা শীতল আগুনের মতো খণ্ড-শোভা ধরেছে। হরিশঙ্কর আমাদের সেই বিখ্যাত মর্গের পাল্লা খুলেছেন। একটা আলমারি। ছোট একটা ঘরই বলা চলে। জয়নারায়ণ ধরে আছেন টর্চ।

হরিশঙ্কর বললেন, 'আমাদের সেই উৎসবের মশারিটা বের করতে হবে।'

তাঁবুর মতো বিশাল তার আকৃতি। ভেতরে দশ-বারোজন স্বচ্ছন্দে সিঁধিয়ে যেতে পারে। হরিশঙ্কর পরিকল্পনা মতো তৈরি করিয়েছিলেন। মশার উৎপাতে জর্জরিত। সন্ধের পর চলতে গেলে ধাক্কা লাগে। মাথায় খেলল মশারি দিয়ে ঘরের মধ্যে ঘর হবে। ঘরের অন্তর্বাস। তার ভেতর চেয়ার, টেবল, যাবতীয় আয়োজন। পড়া তো যাবেই, তেমন হলে খানা খেতেও অসুবিধে হবে না। চাটনি আর গুড় তো খাওয়ার উপায় নেই। চাটনিতে মশার আত্মবলি, গুড় হল মশার কদমা। পরিকল্পনা মতো চলেছিল বেশ কিছু দিন। বাধ সাধলে আমাদের প্রিয় বেড়াল। মশারির গা বেয়ে চড়চড়িয়ে চালে গিয়ে ওঠে। চাল ঝুলে গেল। সেখানে সার্কাসকুমারীর মতো তার হরেক কসরত। লেখা-পড়া তো মাথায় উঠলই। মশারিরও অস্ত্রোপচার। সে যে কি নিদারুণ দুষ্টুমি, অথচ কি সুইট!

সেই গ্রাম-বিশেষ মশারির সন্ধানে, একদিক থেকে আমি, একদিক থেকে মুকু অ্যাডভেঞ্চারে ঝাঁপিয়ে পড়লুম।

'আমি ভয় করবো না ভয়, করবো না। দুবেলা মরার আগে...।'

জয়নারায়ণ বললেন, 'এর তো আলাদা একটা মৌজা, দাগনম্বর, খতিয়ান নম্বর থাকা উচিত, আলাদা পোস্টাপিস! আচ্ছা চাটুজ্যেমশাই, আর ইউ সিয়র, যে এর মধ্যে অন্য আর কোনও প্রাণীর বসবাস নেই, যেমন ধরুন আরশোলা।

হরিশঙ্কর বললেন, 'আরশোলাকে আমি প্রাণী বলেই গণ্য করি না। ও আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো। ভয় হল ইঁদুর।'

জয়নারায়ণ একটু পিছিয়ে গেলেন। বলতে লাগলেন, 'সাবধান! সাবধান! লাফ না মারে।'

হরিশঙ্কর বললেন, 'ওদের সাবধান করার আগে নিজের পালাবার পথটা দেখে রাখো। জয়, তুমি যদি কোনও আর্মির জেনারেল হতে তাহলে কি দশা হত!'

'চাটুজ্যেমশাই, ছোটখাটো প্রাণীকেই আমি একটু সমীহ করি। বড়দের আমি ভয় পাই না। আপনি একটা বাঘ আনুন, আমি মালকোষ মেরে ঠাণ্ডা করে দেবো।'

এদিকে লেপ-কম্বল, বাড়তি বালিশের স্তূপে আমাদের দধিমন্থন চলেছে। সাদা মতো, গোল গোল, গোটাকতক কি পুট্‌পুট্‌ করে মেঝেতে পড়ে গড়িয়ে গেল। মাতুল লম্ফপ্রদান করে বললেন, 'গোখরো সাপের ডিম।'

হরিশঙ্কর বললেন, 'আই অ্যাম সরি জয়। ওগুলো ন্যাপথলিনের বল।'

শব্দ করে একটা পিতলের পিলসুজ মেঝেতে পড়ে কিছুদূর গড়াল। জয়নারায়ণ বললেন, 'শব্দটা শুনলেন চাটুজ্যেমশাই! পারফেক্ট পঞ্চমে স্টার্ট করে গান্ধার ছুঁয়ে নেমে গেল, বিশুদ্ধ ভূপালী।'

হরিশঙ্কর বললেন, 'ওই জন্যেই তোমাকে ভালবাসি জয়। সঙ্গীত তোমার ধ্যানজ্ঞান। সত্যিই তুমি গন্ধর্ব।' বহুত হাঁটকা হাঁটকির পর সেই মশারির গোলা বেরলো। হরিশঙ্কর বললেন, 'সাবধানে খোলো। দু'চারটে আরশোলা বেরোতে পারে।'

আরশোলা নয় কিছু উচ্চিংড়ে পুট্‌পাট লাফিয়ে এদিকে ওদিকে চলে গেল। সেই

তালে মাতুল একটু নাচানাচি করলেন। হরিশঙ্কর বললেন, 'জয়, তোমার নাচের দক্ষতাও অস্বীকার করা যায় না। এটা ন্যাচারাল না শিখেছিলে ?'

জয়নারায়ণ বললেন, 'আজ্ঞে আরশোলাই আমার গুরু। সেই ছেলেবেলা থেকেই তালিম দিয়ে আসছে। এটা যা দেখলেন, কক্‌রোচ ড্যান্‌স।'

'অনেকটা কথাকলির মতো।'

সেই রাতে বারান্দায় বিশাল পঙ্‌ক্তি ভোজ। পরপর বসে গেছি। জয়নারায়ণ বললেন, 'বেশ বিয়ে বাড়ি, বিয়ে বাড়ি লাগছে।'

আমার পাশে আমার পিসতুতো ভাই। চুপিচুপি বললে, 'এরা জল দেবে না।'

চুপিচুপি বললুম, 'এদের নিয়ম খেতে বসে জল না খাওয়া। কড়া নিয়ম। খাওয়ার পাতে জল খেলে হজমশক্তি কমে যায়। গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিড ডাইলুট হয়ে যায়। অম্বলের ব্যায়রাম হয়।'

'আমার যে গলায় আটকে যাচ্ছে।'

'কড়িকাঠের দিকে তাকাও নেমে যাবে।'

ছোটদাদু আমার আর একপাশে। তিনি বললেন, 'বলেছ ভাল। ওপর দিকে তাকালে সব বাধা সরে যায়।'

মুকু একটা জায়গান্টিক বিছানা তৈরি করেছে। দেখার মতো। সেই বিশাল মশারি। পিসিমার পুরো পরিবার সেই মশারির ভেতর। পিসিমার ছোট মেয়ে হঠাৎ ফোঁস ফোঁস করে কান্না শুরু করল। পিসিমা বললেন, 'শুরু হল। কাঁদছিস কেন ? বলবি তো কি হয়েছে !'

কি বলবে ? ওই বালিকার গুছিয়ে বলার ভাষা আছে কি ? একটা সংসার চুরমার হয়ে যাওয়ার বেদনা। একটা গ্রাম, চেনা পরিবেশ, পরিচিত জীবন ছেড়ে আসার বেদনা। শিকড়সুদ্ধ তুলে এনে ভিন্ন এক মাটিতে বসিয়ে দেওয়া। মুকু মেয়েটিকে কোলের কাছে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়ল। সে তখন স্বপ্ন দেখছে, সবুজ মাঠ, একটি ছাগলছানা, ছাতা বগলে পণ্ডিতমশাই, যত খেলার সাথী। দূর থেকে ভেসে আসছে কিশোরীকণ্ঠের ডাক—উষি।

৫০

The flowers fall for all our yearning;
Grasses grow, regardless of our dislike.

মাতুল জয়নারায়ণ আর আমি একই বিছানায়। মুকু মশারি ফেলে গুঁজে দিয়ে গেছে। শৌখিন জয়নারায়ণের জন্যে বিছানাটাকে যতদূর সম্ভব পরিপাটি করেছে। বালিশে পরিচ্ছন্ন তোয়ালের ঢাকা। মাথার কাছে একটা টুলে চাপা দিয়ে গেছে এক গেলাস জল। ছোট একটা পেতলের পদ্মকাটা বাটিতে লবঙ্গ, বড় এলাচ। মাঝরাতে জয়নারায়ণের কাশি হয় ; তখন প্রয়োজন হতে পারে। মুকুর নজর সব দিকে।

বিছানায় আমরা দু'জনে গড়াচ্ছি, বাইরে গড়াচ্ছে রাত। রাতের ভেলায় ভেসে চলেছে জীব জগৎ, নতুন দিনের কূলে। দু'জনেই চিৎ।

মাতুল জিজ্ঞেস করলেন, 'তুই কোন পাশে শুস ?'

'সাধারণত বাঁ পাশে।'

'ধনুক হয়ে যাস ?'

'না, স্ট্রেট।'

'তোর নাক ডাকে ?'

'মনে হয় না।'

'আমার নাকে এফ শার্পে তারার সা বাজে, সিঁসিঁ ক'রে। তখন আমাকে ঠেলে দিবি।'

'আমি তো এখনি ঘুমিয়ে পড়ব মামা।'

'হাই পিচ সাউন্ডে তোর যদি ঘুম ভেঙে যায় তাহলে আমাকে ঠেলে দিবি। জানিস তো, সারা রাত আমি গান গাই। স্বপ্নে। বিশাল বিশাল সব আসর। মাথার ওপর ঝাড়লণ্ঠন। এ-পাশে, ও-পাশে জাফরির কাজ। চারটে তানপুরা, সুরমণ্ডল, তবলায় আল্লারাখা, সারেঙ্গিতে লড্ডন খান, চারপাশে সমঝদার স্রোতা। ধরেছি মারুবেহাগ।'

মাতুল হঠাৎ একটা ইংরেজি কবিতা ধরলেন

There they stand, the innumerable stars,
Shinning in order like a living hymn, written in light.

নীরব রইলেন কিছুক্ষণ। ফর্সা কপালে আলতো পড়ে আছে বাঁ হাত। পূর্ণ চন্দ্রের আলো মাথার কাছের জানালা দিয়ে মুখে এসে পড়েছে। জয়নারায়ণকে অবিকল কবি কিটসের মতো দেখতে। দুধসাদা একটা ধুতি দু'ভাজ করে লুঙ্গির মতো পরেছেন।

ধবধবে সাদা গেঞ্জি। শরীরের ত্বক এত পাতলা যে ছোট ছোট শিরা আর ধমনীর রক্তস্রোত গোলাপী আভা ছাড়ে। খুব সাবধানে সংগ্রহে রাখার মতো একজন পরিপূর্ণ শিল্পী।

মাতুল আপন মনে গুনগুন করে খাম্বাজ আলাপ করতে লাগলেন। আমি জেগে থাকার অনেক চেষ্টা করেও এক সময় ঘুমিয়ে পড়লুম। কতক্ষণ নিদ্রায় পাথরের একটা বাটির মতো তলিয়ে ছিলুম জানি না। হঠাৎ একটা ধাতব শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। যেন পেল্লায় এক ঘড়ি বাজল কোথাও। শব্দটা মনে হয় পাশের ঘরে হল। মাতুল ধারে শুয়েছিলেন, আমি দেয়ালের দিকে। অনেকক্ষণ হিসেব করলুম, অতল নিদ্রায় শান্ত শোলার মতো একটি মানুষকে না জাগিয়ে কি ভাবে ভূতলে অবতীর্ণ হওয়া যায়! টপকাতে হবে। সাবধানে পায়ের ওপর দিয়ে শরীর স্পর্শ না করে মেঝেতে নেমে মশারিটা আবার গুঁজছি, জয়নারায়ণ বললেন, 'একটা কিছু হাতে নিয়ে বেরোও, চোর হতে পারে!' জয়নারায়ণ নিদ্রা আর জাগ্রত অবস্থার পাতলার স্তরে অবস্থান করছিলেন, পা ডোবে না এমন জলে নৌকো বাওয়ার মতো। চোরের ভয় ধরিয়ে দিলেন। মুহূর্তের জন্য থমকে যেতে হল। অতীতের ঘটনা মনে পড়ে গেল। চোরের সঙ্গে শুভ দৃষ্টি বিনিময়। চোর দাঁড়িয়ে আছে জানালার শার্সির বাইরে, আমি ঘরে। দু'জনেই দু'জনের দিকে তাকিয়ে আছি। প্রথমে আমি ভেবেছিলুম, ওটা আমারই প্রতিবিম্ব। হঠাৎ খেয়াল হল, তা কি করে হয়! আমার নাক তো অমন নয়। আমার ভুরু আছে, প্রতিবিম্বের ভুরু নেই। রঙ কালো। চোখ দুটো মরামরা। ওটা তো আমি নই। তখনই আমি চোর চোর বলে চিৎকার করলুম। চোর লজ্জায়, আমার ভয় পাওয়ার লজ্জায় দোতলার কার্নিস থেকে এক লাফ মেরে একতলায় পড়ে পাঁচিল টপকে ছুটে পালাল। চোরের দোষ কেউ দিলে না, সকলে আমাকেই তিরস্কার করতে লাগল, তুই চিৎকার করলি কেন ইডিয়েট! চোর এলে নিজে চোর হতে হয়। পা টিপে টিপে পেছন দিক থেকে গিয়ে জাপটে ধরতে হয়। ধরেছি প্রভু! আর তোমাকে ছাড়ব না। যত বলি, কার্নিসের তো পেছন নেই। তার সবটাই তো সামনে। কেউ মানতে চায় না। তখন বললে, তাহলে নেমে গিয়ে লুফে নিলে না কেন! চোর যেন ক্রিকেট বল! ওভার বাউন্ডারির মারে আসছিল, ব্রাডম্যানের মতো ক্যাচ করব আমি। সিদ্ধান্ত হল, আমার মতো ভীতু, এর চেয়ে আর কি করতে পারে!

দরজা খুলছি, জয়নারায়ণ বললেন, 'আগেই ঝট্ করে বেরোসনি। মাথাটা এগিয়ে দিয়ে বাইরেটা দেখে নে। কত বড় চোর। ধরার শক্তি তোর আছে কি না! চোর ধরা প্রায় মাছ ধরার মতোই।'

বাইরের দালান চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত। রুপোর তবক মোড়া। দেয়ালে ঠাকুরদার অয়েল পেন্টিং চন্দ্রালোকিত মধ্যরাত্রে রহস্যমণ্ডিত হয়ে জীবন্ত। ভিক্টোরিয়ান চেয়ারে আসীন গম্ভীর এক পুরুষ। হাতে আড়াআড়ি একটি ছড়ি। সেকালের সুখ্যাত, প্রখ্যাত এক শিক্ষক। একালে তাঁর জীবিত ছাত্ররা শ্রদ্ধায় মাথা নত করেন। তাঁর পৌত্র বলে অযাচিত স্নেহ করেন।

সেই মায়াময় দালানে অন্ধের মতো এক কিশোর টাল খাচ্ছে। পা লেগে গলা উঁচু মোরাবাদী ফুলদানি উল্টে পড়েছে একপাশে। এই মাঝরাতে আমার পিসতুতো ভাই কি করতে চাইছে! দিগ্‌জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে বলেই মনে হয়! নিচে নামার সিড়ির দিকে এগোচ্ছে। সাবধানে দরজা খুলে এগিয়ে গেলুম।

কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলুম, 'কোথায় যাচ্ছ ?'

চমকে ফিরে তাকাল, ভয়ে ভয়ে বললে, 'আমি ছোট বাইরে করব।'

'ওদিকে নয়, বাথরুম এই দিকে।'

ভাই বাথরুমে ঢুকেছে। দাঁড়িয়ে আছি। দালানের একেবারে শেষ ঘরে চাপা গলায় দু'জনে কথা বলছেন। অনুচ্চ কণ্ঠে মন্ত্রপাঠের শব্দের মতো। যেন রাজকীয় দুটো ভোমরা ঘরে ঢুকে আছে। ভাইকে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলুম। রাতের অন্ধ পাখির মতো তার অনিশ্চিত ঘোরাফেরা মনে বড় দাগ ফেলে গেল। শীর্ণ এক কিশোর, সহায়-সম্বলহীন। আমাকে এই আঁধারে চালায় কে গো ! এই রকম একটি সচল প্রশ্ন। বাইরে চাঁদের আলোর মুশায়েরা চলেছে। বৃক্ষ, লতা, গুল্ম অপ্সরার মতো বাতাসে নাচছে। নিস্তব্ধ চরাচর। মনে হচ্ছে, বৃহৎ এক স্বপ্নের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি। ঘুমের জগতেই জেগে উঠেছি অশরীরী হয়ে। পায়ে পায়ে এগোতে লাগলুম শব্দ লক্ষ্য করে। ঠাকুরদার অয়েল পেন্টিং যেন ফিসফিস করে ডাকলেন, 'পিণ্টু ! চললে কোথায় ! নিদ নাহি আঁখিপাতে !' 'আমি তো আপনাকে দেখিনি কোনওদিন ; কিন্তু আপনি ওমনিপ্রেজেন্ট। যেখানেই যাই আপনার নাম।'

দালানের শেষ ঘর। দরজার পাল্লা, আধ ভেজানো। দু'জনের কথা বলার শব্দ আরো স্পষ্ট। বাইরের দিকে তাকালুম, রুপোর আঁচল উড়িয়ে সুন্দরী রাত বিশ্ব সভায় নাচছে। কোনও কবি কোথাও লিখছেন,

কাল চৌধভিঁ কি রাত থি,
সফর রাহা, চর্যা তেরা
কুছ্ নে কহা ইয়ে চাঁদ হ্যায়,
কুছ্ নে কহা চেহেরা তেরা ॥

হরিশঙ্কর যথার্থই বলতেন, রাত কত রহস্যময়। যারা ঘুমিয়ে কাটায় তাদের মতো বঞ্চিত আর কেউ নেই। সমস্ত অপ্রাণ বস্তুও রাতে প্রাণ পায়। সামান্য একটা চেয়ার, দেয়াল, ছড়ি, বেড়ানোর ছবি, সব জীবন্ত। দূর থেকে একটা চেয়ারকে দেখ। শূন্য ঘর, শূন্য টেবিল, শূন্য চেয়ার, দেয়ালে পূর্ব পুরুষের একটি ছবি। সেই ছবি থেকে নিঃশব্দে তিনি নেমে এলেন। চেয়ারে বসলেন। চারপাশে তাকালেন। হয়তো হাসলেন, নয়তো রাগত। অদৃশ্য কাগজে লিখে গেলেন, অদৃশ্য চিঠি। 'তোমরা ঠিক পথে চলছ না। আমি যা চাইনি, তোমরা ঠিক সেইটাই করছ। আমার ধারা তোমরা ঘুরিয়ে দিতে চাইছ। আদর্শ-ভ্রষ্ট হচ্ছ !' কিংবা তিনি কোনও নির্দেশ দিলেন। 'ভয় পেয়ো না। সত্যকে আঁকড়ে ধরে থাকো। তোমাকে অপমান করেছে করুক, প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা কোরো না, তাতে তুমি নিজেই অপরাধী হবে। একা হয়ে যাবে। গডস জাস্টিস, ডিভাইন প্রোটেকসান আর পাবে না।' অথবা লিখবেন, 'প্রিয়জনের অসুস্থতায় তুমি বিচলিত। অসহায় বোধ করছ ? প্রার্থনা করো। নিজেকে বোঝাও, জন্ম, মৃত্যু তোমার হাতে নেই। ধৈর্য, সহ্য এই তোমার হাতিয়ার। বি কাম, বি পেসেন্ট, সারেন্ডার।'

তিনি তোমার জন্যে সব লিখে যাবেন, দূরে দাঁড়িয়ে তুমি শুধু অনুভব করো। মধ্যরাতের নিথর বায়ুমণ্ডলে ভেসে আসছে ভিন্ন জগতের বার্তা। তুমি ধরার চেষ্টা করো। গুড সোল এই সময়ে ঘুরে বেড়ান তোমাকে সাহায্য করার জন্যে। শুদ্ধ মনে তুমি তা গ্রহণ করো। তোমার সেন্স, তোমার পারসেপসানকে অসীম করো। দেহসীমাকে লঙ্ঘন করো। সূক্ষ্ম থেকে অতিসূক্ষ্ম হয়ে চেষ্টা করো আই অফ দি নিডল

দিয়ে গলে যেতে। আদার ওয়ার্লডে যাওয়ার পথ ভারী সূক্ষ্ম। পথ আছে। সেটা স্থূল নয়। ভেরি মাইক্রসকোপিক। চেষ্টা করতে হবে, আঁকুপাঁকু করতে হবে। এই জগতের নিয়মে, সে-জগৎ চলে না। সেখানে টাইম সাইকল ভিন্ন। সেখানে গ্রাভিটি নেই। সে জলে লোহা ভাসে, শোলা ডুবে যায়। হরিশঙ্কর এমারসনকে উদ্ধৃত করবেন, Great men are they who see that spiritual is stronger than any material force, that thoughts rule the world.

হঠাৎ পেছনে একটা খসখস শব্দ হল। ভয়ে চমকে উঠেছি। সাদা একটা মূর্তি। মাতুল জয়নারায়ণ। কাছে এসে চাপা স্বরে বললেন, 'কি রে, চোর পলিয়েছে ?'

'চোর নয়, পিসতুতো ভাই।'

'তা তুই এখানে চোরের মতো দাঁড়িয়ে আছিস কেন চাঁদের আলোয় ! জানিস না চাঁদের আলোয় অ্যানিমিয়া হয়।' ঠোঁটে আঙুল রেখে ইশারায় বোঝাতে চাইলুম, চুপ করুন।

কানের কাছে মুখ এনে বললেন, 'কেন রে ?'

'ঘরের ভেতর গুঞ্জন।'

মাতুল শুনলেন। বললেন, 'চল না যাই। কেন বঞ্চিত হব চরণে !'

দরজাটা ধীরে খোলা হল। ভেতরটা প্রথমেই দেখা গেল না। ডান দিক থেকে একটা দেয়াল দরজার দিকে অনেকটা এগিয়ে এসেছে। তৈরি করেছে বড় মাপের একটা খাঁজ। সেই অংশে হরিশঙ্করের নিজস্ব ল্যাবরেটারি। লম্বা একটা টেবিল। অ্যালুমিনিয়ামের পাত মোড়া। টেস্ট টিউব, ফ্লাস্ক, জার, ব্যুরেট, ডিক্যান্টার, ডিস্টিলেসান ফ্লাস্ক, স্পিরিট বার্নার, কেমিক্যালস, রিত্রজেন্ট বটল, ছোট একটা হাপর। রাতের পর রাত এখানে কাজ চলে। ভেষজ কিছু একটা তৈরি করতে চাইছেন। একটা আমি জানি, দুরারোগ্য একজিমার ওষুধ।

বাঁ দিকে ঘুরতেই ঘরের ভেতরটা দেখা গেল। জানলার দিকে মুখ করে, মেঝেতে আসন পেতে পাশাপাশি বসে আছেন, ছোটদাদু আর হরিশঙ্কর। দুধের মতো চাঁদের আলোয় দু'জনে ভাসছেন। দু'জনের নাভির কাছ থেকে অদ্ভুত একটা শব্দ উঠছে। ওঙ্কারের সঙ্গে আরো কিছু জড়িয়ে আছে। সেই শব্দে আমার বুকের কাছটা কাঁপছে, রোম খাড়া হয়ে উঠছে।

জয়নারায়ণ কানে কানে বললেন, 'অনাহত ধ্বনি।'

আমরা সেই অপূর্ব দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছি পাথরের মূর্তির মতো। এই সময় তো বিরক্ত করা উচিত হবে না। জয়নারায়ণ যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন সেখানেই বসে পড়লেন। আমিও বসে পড়লুম। বসেই মনে হল, যে ভূমিতে বসেছি, সেটাও প্রসারিত, সঙ্কুচিত হচ্ছে। যেন বিশালের বুকের ওপর বসে আছি।

জয়নারায়ণ এই প্রলোভন থেকে আর সরে থাকতে পারলেন না। নাভির কাছ থেকে ওঁম বলে একটা শব্দ তুললেন। মাতুলের সুরের সঙ্গে ওঁদের সুর মিলে ঘরে এমন একটা রেজোনেন্স তৈরি হল ওপাশের টেবিলে রাখা কাঁচের সব জিনিসপত্র ঝন্‌ঝন্ করে উঠল। মনে হল আমার মাথাটায় ভেতর থেকে চিড় ধরে যাবে। বেলের মতো ফটাস করে ফেটে যাবে। আমার আধার অতি ক্ষুদ্র। গুড়গুড়ে ভয়ে সিঁটিয়ে গেলুম। মরে যাবো না তো ! জয়নারায়ণকে আর কে পায়। নাভি উন্মোচিত হয়েছে। স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞাচক্র ভেদ করে সহস্রারে ফেটে পড়ছে শব্দ। অদ্ভুত তার কম্পন। শরীর ঝিঁঝি পোকার মতো থিরথির করে কাঁপছে। জয়নারায়ণ সব ভুলে

ভৈঁরোতে ধরলেন সেই বিখ্যাত গান :

মা মা রবে মন সুখে মন ত্রিতন্ত্রী বাজাও রে,
মায়ের রচিত সুমধুর বীণা বাজায়ে মা নাম গাও রে।
স্মরিয়ে ধূর্জটি মন্দ্র হতে উঠি, মধ্যগ্রামে যাও মন রে,
ক্রমে তারাপুরে উঠে তার স্বরে, তারা তারা ধ্বনি করবে ॥

ভৈরবের অলৌকিক চলন। ষড়জ থেকে পঞ্চমে উঠে, কোমল মধ্যম শুদ্ধ গান্ধার কোমল ঋষভ স্পর্শ করে আবার ষড়জে নেমে আসছে। ঐশ্বরিক সুর লহরী। দুই যোগীর সাধন ভঙ্গ হল। তাঁরা উঠে এলেন। বসে পড়লেন জয়নারায়ণের সামনে। জয়নারায়ণের কণ্ঠ ইস্পাতের ফলার মতো, উদারা, মুদারা তারায় অনায়াসে বিচরণ করছে। জয়নারায়ণ গাইছেন,

মিলায়ে অকার উকার মকার, মা নামের অগ্রে দিয়ে অলঙ্কার
বাজাও সাধের বীণা বার বার, ভুবন কম্পিত কররে।
মূলাধারে আছে নিদ্রতা যোগিনী, নতমুখে সেই শিব সোহাগিনী,
তব বীণার ঝঙ্কারে সুষুপ্তা দেবীরে, জাগায়ে প্রসন্না কররে।
গঙ্গা যমুনা সরস্বতী ঘেরি, সার্দ্ধ ত্রিকোটী তন্ত্রী সারি সারি,
বাজিছে নিয়ত মা মা করি, তব বীণার ভিতরে শুন রে ;
দীন রাম বলে মন কোরোনাক হেলা, বাজাও সাধের বীণা এই বেলা
অজপা ফুরালে বীণা ফেলে যাবে আনন্দে আনন্দ নগরে।

ঝকঝকে মেঝে থেকে চাঁদের আলো ঠিকরে জয়নারায়ণের ঝিনুকের মতো মুখে পড়েছে। মনে হচ্ছে দেবতার মুখ। এক ফোঁটা, দু ফোঁটা, জলের মুক্তোদানা গাল বেয়ে নামছে, যেন গাছের পাতা ভোরের শিশির ঝরাচ্ছে। গান শেষ করে জয়নারায়ণ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। ছোটদাদু তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'তুমি মহাসাধক। এইবার তোমার সব চলে যাবে জয়, অর্থ, বিত্ত, ভোগ, দেহসুখ, থাকবে শুধু তোমার মাতৃনাম। জেনে নাও, এই তোমার শেষ জন্ম। তুমি হলে সুরলোকের গান্ধার। রিক্ত হয়ে সুরের ভেলায় চড়ে চলে যাবে পূর্ণের কূলে।'

জয়নারায়ণ বললেন, 'তাই হোক। তবে তাই হোক।'

চন্দ্রালোকের ঘনত্ব কমছে। 'আগামী দিন' জল ঢালতে শুরু করেছে দুধে। বিশ্বপ্রসবিনী এক আশ্চর্য কামধেনু। আমরা আমাদের উল্লাসে অন্যান্য ঘুমন্ত প্রাণীদের কথা ভুলেই গিয়েছিলুম। ধীরে দরজা খুলে মুকু এসে একপাশে বসল। শেষ রাতের ঘুম ভাঙা মেয়েদের দেখলে মনে হয় রাতের ট্রেনে বিদেশ যাচ্ছি সুখের সুটকেস নিয়ে। মুকুর আয়ত চোখে নিদ্রার তলানি। বাসি মুখ প্রসন্ন। শাড়ি নিভাঁজ নয়। গোল গোল ফর্সা হাতে সোনার চুড়ির চেকনাই।

ছোটদাদু বেশ আয়েস করে বসেছেন, খুশি খুশি মুখে। আসনে বসলেই এঁদের বিশ্রাম হয়ে যায়। হরিশঙ্কর প্রসন্ন। মনে হল এইবার কিছু প্রশ্ন করা যেতে পারে, এমন পরিবেশ, এই সুযোগ আর হয়তো আসবে না জীবনে। জানতে চাইলুম, কেমন করে একজন মানুষকে দেখেই তিনি তাঁর সম্পর্কে গড়গড় করে সব কিছু বলে যান। এর কি কোনও বিজ্ঞান আছে!

ছোটদাদুর মুখে হাসি খেলে গেল। বললেন, 'অবশ্যই আছে। প্র্যাকটিক্যাল সায়েন্স। করে পেতে হবে, অর্থাৎ কৃপা। শুদ্ধ, পবিত্র, নিষ্কাম জীবন যাপন করলেই

এই শক্তি অর্জন করা যায়। অহঙ্কার খুলে বেরিয়ে আসতে পারলেই যে কোনও মানুষের জীবনে প্রবেশ করা যায়। অন্যের উনুনের ধোঁয়া যে ভাবে বাড়িতে ঢোকে সেই ভাবে তোমার মনও অন্যের মনে ঢুকে যেতে পারে। তুমি তখন অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সবই দেখতে পাবে ছবির মতো। তাহলে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের একটি গল্প শোনো। মহাত্মা রামচন্দ্র দত্ত ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তমণ্ডলীর একজন। একদিন তিনি চলেছেন দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুরকে দর্শন করবেন। শ্যামবাজারের পোলের কাছে ময়রার দোকান থেকে কয়েক পয়সার জিলিপি কিনেছেন। জিলিপি কিনে ঘোড়ার গাড়িতে উঠেছেন। গাড়ি ছাড়বে। কোথা থেকে ছ-সাত বছর বয়েসের এক মুসলমান ছেলে এসে বলছে, বাবু একটা জিলিপি। রামচন্দ্র কিছুতেই তাকে জিলিপি দেবেন না। জিলিপি কিনেছেন ঠাকুরের জন্যে। তাকে কেন দেবেন! গাড়ি চলতে শুরু করল। নাছোড়বান্দা ছেলেটি পেছন পেছন ছুটছে। হঠাৎ রামবাবুর মনে হল, এ হয়তো ভগবানের ছলনা। ভগবান পরীক্ষা করছেন। তাঁর মনে পড়ে গেল সেই গল্পটি, এক সাধু রুটি তৈরি করে একটু ঘি আনতে গেছেন। এসে দেখেন, একটা কুকুর রুটি মুখে করে পালাচ্ছে। সাধু তার পেছন পেছন দৌড়োচ্ছেন আর বলছেন, রাম অপেক্ষা কর, রুটিগুলোয় ঘি মাখিয়ে দি। মনে হওয়া মাত্রই রামবাবু একটা জিলিপি তুলে ছেলেটিকে ছুঁড়ে দিলেন। দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছে এই ঘটনা তিনি আর কাউকে বললেন না। বিকেলবেলা শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞেস করলেন, রাম, তুমি আমার জন্যে কি এনেছ? রামবাবু ভয়ে ভয়ে জিলিপির ঠোঙাটি তাঁর সামনে রেখে পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। ঠাকুর বাঁ হাতে জিলিপিগুলো চটকে হাত ধুয়ে ফেললেন। খেলেনও না, কিছু বললেনও না। পরে একদিন রামবাবুর বন্ধুস্থানীয় একজনকে বলেছিলেন, ওদের সাবধান করে দিও, দ্রব্যের অগ্রভাগ বেরিয়ে গেলে, সে জিনিস আর ঠাকুরের সেবায় ব্যবহার করা যায় না।

'ঠাকুর কিভাবে জেনেছিলেন! মনকে যদি বিশ্বমন, চোখকে যদি বিশালের চোখ করা যায়, তাহলে সবই জানা যায়। একবার ঠাকুরের এক ভক্তের পালিতা কন্যার কলেরা হয়েছে। তিনি রামকৃষ্ণকে স্মরণ করছেন। ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে সেখানে উপস্থিত। অর্থাৎ, শোনা যায়। বহুদূর থেকেও শোনা যায় ভক্তের কাতর ডাক। সে-ডাক কান শোনে না, শোনে মন। তুমি যে-বিজ্ঞান জানতে চাইছ, সে-বিজ্ঞান হল, মনের নিয়ন্ত্রণ। এদিকে কিছু করলে ওদিকে কিছু হয়। যেমন ঘটি মাজলে ঝকঝকে হয়, আয়নার কাঁচ পরিষ্কার করলে নিজের মুখ আরো পরিষ্কার দেখা যায়। যেমন গ্রামাফোনের স্টাইলাস পরিষ্কার করলে রেকর্ডের শব্দ আরো ঝনঝনে শোনায়। যেমন দূরবীনে চোখ রাখলে অনেক দূর দেখা যায়। এ-ও তাই। এর মধ্যে অলৌকিক যা, সেটা হল এক ধরনের জীবনযাপন। নাক বুজে থাকলে গন্ধ পাবে না, কানে খোল থাকলে শব্দ পাবে না। ব্যাপারটা হল, খুলে দেওয়া, খুলে যাওয়া।'

হরিশঙ্কর বললেন, 'ওপনিং আপ।'

ছোটদাদু বললেন, 'এই বিজ্ঞান রবীন্দ্রনাথের সেই সুন্দর গানে একেবারে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে,

না চাহিলে যারে পাওয়া যায়, তেয়াগিলে আসে হাতে
দিবসে সে ধন হারায়েছি আমি—পেয়েছি আঁধার রাতে ॥
না দেখিবে তারে, পরশিবে না গো, তারি পানে প্রাণ মেলে দিয়ে জাগো
তারায় তারায় রবে তারি বাণী, কুসুমে ফুটিবে প্রাতে ॥

'বৃষ্টিতে পড়ে থাকলে ভিজবে, রোদে ফেলে রাখলে পুড়বে, ফুলের বাগানে রাখলে সুগন্ধ পাবে, মাছের বেপারি হলে আঁষগন্ধ নেবে নাকে, সংসারে সংসারীর কোলাহল, মন্দিরে মন্ত্র, আরতির ঘণ্টা, নিজেকে রাখা এইটাই হল বিজ্ঞান। মিনারে রাখলে আলো, বাতাস, দূরদর্শন, পাতালে অন্ধকার। কাকে রাখবে ? দেহ নয়। এ-বিজ্ঞানের সম্পর্ক দেহের সঙ্গে নয়, সে হল ভোগ-বিজ্ঞান, এ হল মনের ব্যাপার, মনোবিজ্ঞান।'

প্রশ্ন করলুম, 'দামোদরের তীরের সেই গ্রামের পুকুরে আপনি যখন গভীর অন্ধকারে স্নান করতে যাচ্ছিলেন তখন আপনার পায়ের কাছে অলৌকিক আলো দেখেছি। সেটা কি ?'

'আজ তুমি সবই জেনে নিতে চাইছ ! তা নাও। আর তো তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে না। আর আমার কণ্ঠও রুদ্ধ হয়ে যাবে। কোলাহল তো বারণ হল, এবার কথা কানে কানে।

হরিশঙ্কর বললেন, 'তার মানে ?'

ছোটদাদু হাসলেন। গানের বাকি অংশটা শোনালেন,

এখন হবে প্রাণের আলাপ কেবলমাত্র গানেগানে ॥

রাজার পথে লোক ছুটেছে, বেচা কেনার হাঁক উঠেছে
আমার ছুটি অবেলাতেই দিন-দুপুরের মধ্যখানে
কাজের মাঝে ডাক পড়েছে কেন যে তা কেই-বা জানে ॥'

হরিশঙ্কর অধৈর্য হয়ে বললেন, 'রহস্যটা কি ?'

'রহস্য ! এই পথে এক কাঁকড়া বিছে আছে ; তার নাম কর্কট। শেষ সংগীত সেই লেখে। সে হল ঈশ্বরের দূত। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কি হয়েছিল হরি ?'

হরিশঙ্কর কেমন যেন আতঙ্কিত হলেন, 'তার মানে ক্যানসার ! তোর ক্যানসার হবে ?'

'হবে কি ! হয়ে আছে।'

'সে কি ! আমরা জানি না !'

'জানালে তো জানবি ! কাল, কাল কেন আজই বলি, ভোর তো হয়েই এল। আজ বেলা বারোটার সময় আমার স্বর বন্ধ হয়ে যাবে। আর ঠিক এক মাস পরে আমার স্বরনালী ফেটে যাবে। ইট উইল ওপন আপ। আমি ধীরে, নিঃশব্দে বিলীন হয়ে যাব মহাকালে।'

জয়নারায়ণ বললেন, 'তা কি করে হয়। আমাদের ফেলে চলে যাবেন ? আমরা চিকিৎসা করাবো।'

ছোটদাদু বললেন, "কর্কটের কোনও চিকিৎসা নেই। সারেন্ডারই চিকিৎসা। শুনে রাখো, আজ এই ঘরে এই মুহূর্তে আমরা যারা বসেছি জলসায়, সকলেই ওই একই আশীর্বাদে দেহমুক্ত হব। তোমার হবে প্রসট্রেটে, হরির হবে ইসোফেগাসে, পিন্টুর হবে লিভারে, মুকুর হবে ব্লাডে। নদীর এপার থেকে একটি, একটি করে খুলে যাবে তরী। আগে আর পরে। এই পথের এই পরিণতি, মন খারাপ কোরো না। মনে দুটো আকার যোগ করো, হয়ে যাবে মানা। মন, মান, মানো, মানা, এই হল ম-এর শব্দরূপ। এখন পিন্টুর প্রশ্নের উত্তর, শোনো পিন্টু, যোগ মানে নিজের শক্তি বলয়ের সঙ্গে সম্যক সংযোগ। যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে তা আছে এই দেহভাণ্ডে। তুমি বসে আছো ভূমিতে। তোমার মাথার চাঁদি, তার পরেই আকাশ। এই তো তোমার বিস্তৃতি। আকাশ মানে অবকাশ মানে আভাস মানে অক্লেশ মানে অশেষ। গুহ্য থেকে মস্তক-শীর্ষ, সাতটি

ভূমি। সপ্তমভূমিতে সহস্রার। সেই সহস্রদলকমলে পরমশিব, পরমাত্মা। কুণ্ডলিনীদেবী সেই পরমাত্মার সঙ্গে মিলনের বাসনায় সদা ছটফট করছেন। পিন্টু, রমণ বাইরে নেই, আছে জীবের ভেতরে। যোনি দেহনিম্নে নেই আছে দেহশীর্ষে। কুণ্ডলিনী দেবী কখনো ভেক, কখনো মীন কখনো বা মর্কট গতিতে মূলাধার থেকে সহস্রারে উঠছেন, নামছেন। পরমশিব কুণ্ডলিনীশক্তির আশ্রয়ে পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হতে চাইছেন। দেখছেন চিদাকাশে বিবিধ নাম রূপ-বিশিষ্ট বিশ্ব বুদবুদের মতো ফুটছে ফাটছে। কখনো তিনি সচ্চিদানন্দ সাগরে লীন হয়ে যাচ্ছেন। পিন্টু, সাধন ছাড়া এই উপলব্ধি কথার কথা। রাজপথ বাইরে নেই আছে ভেতরে। স্বর্গ, মর্ত, পাতাল এই ভেতরে। ভেতর থেকে বাইরে যেতে হয়। দু'জন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী পাহাড়তলিতে হাঁটছেন। গুরু আর শিষ্য। হঠাৎ এক সার হাঁস উড়ে গেল। গুরু শিষ্যকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি গেল?' শিষ্য বললে, 'বুনো হাঁস।' 'উড়ে যাচ্ছে কোথায়?' শিষ্য বললে, 'প্রভু ওরা উড়ে চলে গেছে।' গুরু সঙ্গে সঙ্গে শিষ্যের নাক খামচে ধরে মোচড়াতে লাগলেন। শিষ্য যন্ত্রনায় আর্তনাদ করে উঠল। গুরু বললেন, 'এই যে তুমি বললে উড়ে চলে গেছে। আমি দেখছি, শুরু থেকেই তারা এখানেই রয়েছে।'

"পিন্টু এর মানে কি? মন দেহেই বদ্ধ। দেহ ছেড়ে উড়তে পারে না, জানে না, অভ্যাস নেই। পারলে, বলতে পারত, হংসবলাকা কোথায় উড়ে যায়! জানতে পারত, জীব, কোথা হতে এসে কোথা ভেসে যায়।'

ছোটদাদু হঠাৎ ধ্যানস্থ। নীরব সরবতায় ঘর ভরে গেল। চাঁদ তুলে নিয়েছে লোটানো আঁচল। সূর্যসারথির স্বর্ণ ছায়ার মৃদু আভাস পূর্ব গবাক্ষে।

৫১

Thirty spokes will converge
In the hub of a wheel
But the use of the cart
Will depend on the part
Of the hub that is void.

রাত শেষ হয়ে এলে কেন আমার দুঃখ হয়। কেন হায়, হায় করে ওঠে আমার ভেতরটা ! হরিশঙ্কর, জয়নারায়ণ আমাকে এই উত্তরাধিকার দিয়েছেন। আমার মায়ের শরীরে যে-রক্ত ছিল, জয়নারায়ণের শরীরেও সেই রক্ত। তার সঙ্গে মিশেছে হরিশঙ্করের ধারা ! হরিশঙ্করে মিলেছে ছোটদাদুর বংশের বীজ। এঁরা সবাই নিশাচর। যত রাত বাড়ে, তত এঁদের আনন্দ বাড়ে, কর্মোদ্দীপনা বাড়ে। সবাই জেগে ওঠেন ভিন্ন এক জগতে। সে-জগতে রহস্য, সে-জগতের অন্য মাত্রা, অন্য বায়ু চলাচল। আকাশের ছায়াপথ নক্ষত্রপুঞ্জ নিয়ে নেমে আসে, ভেসে আসে পরলোকের কণ্ঠস্বর, বিশাল বিশাল ভাব অতিথি হয়ে আসে, মনের ঝিনুক খুলে গড়িয়ে পড়ে চিন্তার মুক্তো। আমি যে এঁদেরই শরিক।

ছোটদাদু হঠাৎ সচেতন হলেন। নিজেকে গোটাতে চাইলেন একটি শ্লোকে,

'কিমন্যৈরসদালাপৈরায়ুষো যদ্ অসদ্ব্যয়ঃ।
মন্দস্য মন্দপ্রজ্ঞস্য বয়ো মন্দায়ুষশ্চ বৈ।
নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং দিবা চ ব্যর্থকর্মভিঃ ॥'

শ্রীমদ্‌ভাগবত থেকে বললেন ছোটদাদু। এই বংশের সমস্ত মানুষের অসাধারণ স্মৃতি। ছোটদাদু শৌনকের উপলব্ধিই ব্যক্ত করলেন, 'কি লাভ অযথা গালগল্পে। আয়ুক্ষয় ছাড়া তো অন্য কোনও ফল হবে না। যারা অলস, যারা নির্বোধ, তাদের পরমায়ু এই ভাবেই ক্ষয় হয়, রাতে ঘুম, দিনে বৃথা কর্ম।'

ছোটদাদু কাচের টুকরোর মতো হাসলেন। হেসে বললেন, 'পিন্টু, জীবনে এমন কিছু আশা কোরো না যা তোমার আয়ত্তের বাইরে। সাধনজগতের একটা সত্য তোমাকে বলে যাই, এখানে জোর করে, লড়াই করে কিছু পাওয়া যায় না। আপনি এসে ধরা দেয়। There is a treasure in the deep mountains; He who has no desire for it finds it. এ-জগতে এক হাতে তালি বাজে, এক ডানাতে পাখি ওড়ে, এক পায়ে মানুষ চলে, একটা চোখে মানুষ দেখে। এ তোমার সোনার খনি দেখে এগনো নয়, এগিয়ে সোনার খনি পাওয়া। এক কাঠুরে মাথায় এক বোঝা ডালপালা নিয়ে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসছে। এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা। তিনি বললেন, জঙ্গলের মধ্যে এগিয়ে যাও। পরের দিন সে সন্ন্যাসীর কথায় এগিয়ে গেল। দেখলে, মোটা মোটা কাঠের জঙ্গল ; সেদিন যতদূর

পারলে কেটে এনে বাজারে বেচে অন্য দিনের চেয়ে অনেক বেশি পয়সা পেলে। পরের দিন আবার সে মনে মনে ভাবতে লাগল, তিনি আমায় এগিয়ে যেতে বলেছেন ; ভাল, আজ আর একটু এগিয়ে দেখি না কেন। সে এগিয়ে গিয়ে চন্দনকাঠের বন দেখতে পেলে। সে সেই চন্দন-কাঠ মাথায় করে নিয়ে বাজারে বেচে অনেক বেশি টাকা পেলে। পরদিন আবার মনে করলে, আমায় এগিয়ে যেতে বলেছেন। সে সেদিন আরও খানিক দূর এগিয়ে গিয়ে তামার খনি দেখতে পেলে। সে তাতেও না ভুলে দিন দিন আরও যত এগিয়ে যেতে লাগল— ক্রমে ক্রমে রুপো, সোনা, হীরের খনি পেয়ে মহা ধনী হয়ে পড়ল। এই হল ধর্মের পথ। ভ্রমণকাহিনী পড়লে হবে না। সংকল্প নিয়ে, নির্দেশ মেনে এগোতে হবে। একটু-আধটু রূপ, জ্যোতি দেখে বা সিদ্ধাই লাভ করে যে মনে করে আমার সব হয়ে গেছে, সে মরেছে।'

ছোটদাদু শব্দ করে হাসলেন। আমরা বসে আছি স্তব্ধ হয়ে। গলাটা একটু ধরা-ধরা লাগছে।

হরিশঙ্কর বললেন, 'ধর্ম ছাড়া কি পৃথিবীতে আর কিছু নেই ?'

ছোটদাদু বললেন, 'অবশ্যই আছে। ভোগ আছে, দুর্ভোগ আছে। সাফল্য-অসাফল্য আছে। রোগ শোক জরা ব্যাধি আছে। ধর্ম হল বিচার। ধর্ম হল গণিত। ধর্ম হল হিসেব। ধর্ম হল ইনসেকটিসাইড, পেস্টিসাইড। ধর্ম হল বুদ্ধি। লেজে-গোবরে না হওয়ার কায়দা। বাঁচবো, মরার সময় মরবো। রোজ একবার করে মরব না। ধর্ম মানুষকে ঝকঝকে একটা জীবনদান করে। ধর্ম হল অলৌকিক এক টুথপেস্ট। মনের দাঁতকে ঝকঝকে করে। জীবনের দুর্গন্ধ দূর করে। ধর্ম নিয়ে ন্যাকামি চলে না, কাব্য চলে না। রোমান্টিকতা চলে না। ধর্ম হল কোদাল। মনের কৃষিকাজ ধর্মের কোদাল ছাড়া চলে না। হয় না।'

হরিশঙ্কর বললেন, 'একটা জিনিস আমার মাথায় আসছে না, তোমার যদি মনেই হয় ক্যানসার হয়েছে, তা হলে ভাগ্যের হাতে নিজেকে সমর্পণ না করে, বিজ্ঞানের হাতে নিজেকে সমর্পণ করছ না কেন ! এটা কি একটা ন্যাকামি, একটা রোমান্টিকতা নয় !'

ছোটদাদু হেসে বললেন, 'এটা আমার মনে হওয়া নয়, এটা ডাক্তারদের ডায়াগনোসিস। ক্যানসার সারে না। চিকিৎসা মানে শরীরের ওপর অকারণ অত্যাচার আর টাকার শ্রাদ্ধ। বুদ্ধিমানের কাজ হল, চুপ করে বসে দেখো কি হয় ! প্রেমিক হয়ে যাও। মৃত্যু-প্রেমিক। ধীরে ধীরে তাকে আসতে দাও। আমি ন্যাকা নই, রোমান্টিক ফুল নই, আমি বুদ্ধিমান। এ বিট ইনটেলিজেন্ট। ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ নয়, এ হল দুরারোগ্য ব্যাধির কাছে সারেন্ডার। ছোট জীবন সুখের, দীর্ঘজীবন দুঃখের। আমার কোথাও কোনও বন্ধন নেই। তোমাদের একটা হেঁয়ালি শোনাই। একটু বোঝার চেষ্টা করো।

'মনে করো একটা সাপ। এই মেঝেতেই শুয়ে আছে। সাপটা কপাৎ করে একটা ব্যাঙ গিলেছে। গেলার পর অলৌকিক কারণে সাপটা স্রেফ উবে গেল। সাপটার পেট যে জায়গায় ছিল মেঝেতে, দেখা গেল সেই জায়গায় ব্যাঙটা বসে আছে হতভম্ব হয়ে, ব্যাঙটা মরেনি। এইবার ওই ব্যাঙটাকে বোঝার চেষ্টা করো। ব্যাঙ কি ভাবছে, তার মনের অবস্থাটা কি ?'

হরিশঙ্কর হা হা করে হেসে বললেন, 'আরে এ তো চরম বেদান্তের গল্প। সুন্দর একটা অ্যালিগরি অথরবাবা। সাপ আছে ব্যাঙটার মনে, ব্যাঙটার সংস্কারে। যুগ যুগ ধরে সাপ

ব্যাঙ খায়। যেমন যুগ যুগ ধরে সংসার নামক ময়াল সাপ মানব নামক জীবকে গিলে বসে আছে। সংসার বলে কিছু নেই। কিন্তু আমাদের গিলে বসে আছে, এই অনুভূতি আমাদের সংস্কারে চলে গেছে। নড়তেও পারি না, চড়তেও পারি না, পড়ে আছি জবুথবু হয়ে। কি ঠিক বলেছি কি না!'

ছোটদাদু বললেন, 'এই তো চাই হরিশঙ্কর! এমন একটা পরিষ্কার মাথা না হলে ধর্মের অধিকারী হওয়া যায় না। পিণ্টু আজ তোমাকে একটা কথা বলে যাই, সন্ন্যাসী আর গৃহীতে তফাৎ বিশেষ নেই। সন্ন্যাসীর মন যদি গৃহীর মন হয় তা হলে বাইরের গেরুয়া হল সাজমাত্র। মন না রাঙিয়ে কাপড় রাঙালে কি হবে যোগী! গৃহীও মন রাঙিয়ে যোগী হতে পারে। তোমার মাতামহ, মাতুল, তোমার পিতা সকলেই মহাসাধক। বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই। যে-কোনও ভেকধারী সন্ন্যাসীর কান কেটে দিতে পারে। কৌশলটা কি জানো, আরোপ করো। সেটা কি? একটা প্রতীকে তোমার মন স্থাপন করো। যেমন বৃক্ষ। সব সময় মনে করবে তুমি একটা বিশাল গাছ। সেই গাছে অসংখ্য পাতা। একটা দিন মানে অসংখ্য মুহূর্ত। কয়েক কোটি মুহূর্ত নিয়ে একটা দিন। একটা দিন মানে ষড়ঋতু। তোমার সকাল হল বসন্ত। মুকুলিত মুহূর্তের পত্রসম্ভার নিয়ে বৃক্ষরূপী তুমি দিন শুরু করলে। দ্বিপ্রহর হল গ্রীষ্ম। মধ্যাহ্নের দিন ঢলে যাওয়ার বিষণ্ণতায় বর্ষার অনুভূতি। অপরাহ্ণের শরতে তুমি দিবসের ফসল তুলবে গোলায়। সন্ধ্যার হেমন্তে নামবে নির্জনতা। দিনের চোখ বুজে এল। যাত্রা করো, যাত্রা করো যাত্রীদল, পাখি ফিরে চলো কুলায়, ব্যস্ত জনপদ শান্তির, কর্মবিরতির আচ্ছাদনে। রাত আসছে, আসছে শীত, আসছে জৈব-নিদ্রা। একে একে ঝরে গেল একটি দিনের সব মুহূর্তের পাতা। প্রতিটি মুহূর্ত যেন কারণে ঝরে। অকারণে নয়। কর্মের যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দাও তোমার ওই বিল্ববৃক্ষের এক-একটি ত্রিপত্র। ত্রিপত্র মানে, স্মরণ, মনন, নিদিধ্যাসন। বৃক্ষ অচল, বৃক্ষ অটল, সে শুধু ঊর্ধ্বে ওঠে, সসীম থেকে অসীমে যেতে চায়। আকাশে ডালপালা বিস্তার করে নৃত্য করে। পাখি হল রমতা সাধু। বৃক্ষকে সঙ্গ দেয়, ঈশ্বরের নাম শোনায়। আর বৃক্ষের ভূমি কি? সংস্কার। আর প্রাণ-রস কি? বিশ্বাস। এই বিশ্বাসে তুমি আসবে কি ভাবে? ধ্যানের মাধ্যমে। পুজোর চেয়ে জপ বড়, জপের চেয়ে ধ্যান বড়। নিক্তির ওপরের কাঁটা, নিচের কাঁটা। ওপরের কাঁটা হল ঈশ্বর-শক্তিতে বিশ্বাস আর নিচের কাঁটা হল মন। মাঝে মাঝে দেখে নাও, ওপরের কাঁটার সঙ্গে নিচের কাঁটা মিলেছে কি না! যদি এদিক ওদিক হয়ে গিয়ে থাকে, বুঝতে হবে স্মরণে টলেছ, অবিশ্বাসে হেলেছ। সঙ্গে সঙ্গে স্থির হও। চোখ বোজাও। বিচারে বোসো। ঝুঠা সোহাগ জগৎ কী রী সজনী, হোয় হোয় মিট জাসী /মাতা পিতা সুত কুটুম কবীলা, টুটু গয়া জ্ঞাঁ তাগা। প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা, সোহাগ, পিতা, মাতা, আত্মীয়-কুটুম্ব সব দু'দিনের। ইন দেহকা গরব ন করনা, মাটিমে মিল জাসী/এ সংসার চহরকী বাজী সাঁঝ পড্যাঁ উঠ জাসী। জগতের এই বিচিত্র রং-ঢং, কড়াক্রান্তি, গাড়ি-বাড়ি, সাজসজ্জা, যা কিছু দেখছ, এ সবই জাদুকরের জাদুখেলা। জীবনসন্ধ্যায় দেখবে সব ভোঁ-ভাঁ। জো দিন গয়ে সো ফির নহি আবৈ, অন্ত সময় কোই কামন আবৈ, জব জম লেহি বোলায়। জয়নারায়ণ, তোমার সেই বিখ্যাত গান :

আমার দিন তো চলে যায় মা,
আর কবে দেখা দিবি, ধূলা ঝেড়ে কোলে নিবি,
বড় দেরি হয়ে গেল, তাড়াতাড়ি আয় মা ॥

জো দিন গয়ে সো ফির নহি আবৈ। আর শেষে যখন যম এসে ধরবে তখন কেউ আসবে না সাহায্য করতে। ইন দেহকা গরব ন করনা, মাটিমে মিল জাসী। এই হল বিচার। গানের চর্চা তো কর, তা এই গানটা গাইতে পার :

ভবে আসা খেলতে পাশা, বড় আশা করেছিলাম।

জয়, ধরো না। শেষ গানটা গেয়ে যাই। ধরো, গলা মেলাও।'

জয়নারায়ণ বললেন, 'তা হলে হারমোনিয়ামটাও আসুক। সুরে সুর লেগে যাক।'

আমি উঠতে যাচ্ছিলুম, মুকু বললে, 'তুমি বোসো, আমি আনছি।'

হারমোনিয়াম এসে গেল। শুরু হল গান। ছোটদাদু যেন ভাবসাগরে ভাসছেন। ক্ষীরের মতো চেহারা। পদ্মের মতো প্রস্ফুটিত বসে থাকা। জয়নারায়ণ সুর ভাসালেন,

ভবে আসা খেলতে পাশা, বড় আশা করেছিলাম।
আশার আশা ভাঙা দশা, প্রথমে পঞ্জুড়ি পেলাম।
প'বারো আঠার ষোল, যুগে যুগে এলাম ভাল,
(শেষে) কচে বারো পেয়ে মাগো, পঞ্জা ছক্কায় বদ্ধ হলাম।
ছ-দুই-আট, ছ-চার-দশ কেউ নয় মা আমার বশ ;
খেলাতে না পেলাম যশ, এবার বাজী ভোর হইল।

ছোটদাদু বললেন, 'জয়, রামপ্রসাদী তুমি এত ভাল গাও! চেহারা পাল্টে দিয়েছ। পঞ্জুড়ি মানে কি? পঞ্চভূত। পঞ্জা-ছক্কায় বন্দী হওয়া অর্থাৎ পঞ্চভূত ও ছয় রিপুর বশ হওয়া। ছ-তিন-নয়ে ফাঁকি দিব। ছয়কে ফাঁকি দেওয়া অর্থাৎ ছয় রিপুর বশ না হওয়া। তিনকে ফাঁকি দেওয়া অর্থাৎ তিন গুণের অতীত হওয়া। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিন গুণেতেই মানুষকে বশ করেছে। তিন ভাই, সত্ত্ব থাকলে রজঃকে ডাকতে পারে, রজঃ থাকলে তমঃকে ডাকতে পারে। তিন গুণই চোর। তমোগুণে বিনাশ করে, রজোগুণে বদ্ধ করে, সত্ত্বগুণে বন্ধন খোলে বটে ; কিন্তু ঈশ্বরের কাছ পর্যন্ত যেতে পারে না ; কিন্তু পথ দেখিয়ে দেয়।'

ভোরের প্রথম পাখিটি কোথাও চিক করে উঠল, যেন দিনের কপাট অল্প একটু ফাঁক হল। ছোটদাদু মহানন্দে মশগুল। আমি ভাবছি, আর একটু পরেই এই আসর ভেঙে যাবে। এই মুহূর্তের সমন্বয় আর জীবনে ঘটবে না। সময় আর নদী একই ধারা। এক জল একই জায়গা দিয়ে দু'বার বহে যাবে না। অলওয়েজ নিউ, এভার চেঞ্জিং। ভাল লেগেছে বলে দৃশ্য, ঘটনাকে আবার ইচ্ছামতো সাজানো যাবে না। মালা হতে ফুলগুলি ছিঁড়ে ঝরে যায়।

হরিশঙ্কর বসে আছেন স্তব্ধ আকাশের মতো। ঘটনাকে মেনে নেওয়ার অসীম ক্ষমতা তাঁর। তিনি বলেন, মানুষ হল আইসক্রিম। খোলের ভেতর সময় ভরা। টস্ টস্ করে ঝরে যাচ্ছে মুহূর্ত। জীবন হল মোমবাতি। জ্বলবে আর গলবে, নিঃশেষ একদিন। হরিশঙ্করের দর্শন হল, No one throws a stone at a barren tree. ফল ধরে আছে যে-গাছে, সেই গাছেই লোক ঢিল ছোঁড়ে। সফল জীবনই মানুষের আক্রমণের লক্ষ্য।

ছোটদাদু নড়েচড়ে বসে বললেন, 'এইবার তোমাদের অনুমতি ছাড়াই আমি একটা কাজ করব?'

হরিশঙ্কর প্রশ্ন করলেন, 'কি কাজ! তুমি আবার অনুমতি নেবে কি, আমরাই তোমার অনুমতি নোবো। বলো কি কাজ তুমি করতে চাও?'

'আমি একটা ব্রিজ তৈরি করব।' ছোটদাদু হাসছেন।

সকলেই একটু অবাক। ব্রিজ তৈরি করবেন মানে? কোন্ নদীর ওপর?

হরিশঙ্কর বললেন, 'রহস্য কিঞ্চিৎ পরিষ্কার হওয়া দরকার।'

ছোটদাদু বললেন, 'পিন্টু, তোমার রাজবেশ পরে এসো। সিল্কের পাঞ্জাবি, গরদের ধুতি। পাঞ্জাবিতে সোনার বোতাম লাগাবে।'

'কেন ছোটদাদু?'

'আমি যে প্রশ্ন পছন্দ করি না পিন্টু।'

'আমার যে ওর কোনওটাই নেই।'

'তা হলে সাদা ধুতি, আদ্দির পাঞ্জাবি পরে এসো।'

জয়নারায়ণ বললেন, 'তোর না থাকে আমার আছে। যা পরে আয়, তোর দীক্ষা হবে।'

হালকা পালকের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। দীক্ষা মানে ত্রিজন্ম। উপনয়নে দ্বিজন্ম হয়ে গেছে। সেজেগুজে ঘরে ঢুকতেই, ছোটদাদু বললেন, 'মুকু, তুমি একটা টকটকে লাল শাড়ি পরে এসো। লাল শাড়ি তোমার আছে, আমি দেখেছি।'

জয়নারায়ণ বললেন, 'আমরাই বা কেন বাকি থাকি।'

ছোটদাদু বললেন, 'ঠিকই তো। হরিকে নিয়ে যাও। বেশ ধোপদুরস্ত হয়ে এসো। মুকু, তুমি দু'খানা পুজোর আসন, গঙ্গাজলের ঘটি, কোষা-কোষী, তাম্রকুণ্ড, ধূপ, ধূপদানী, দেশলাই, প্রদীপ নিয়ে আসবে।'

একটা কিছু হবে, এই আনন্দে সব হয়ে গেল। পরিপাটি আয়োজন। ছোটদাদু আমাকে আর মুকুকে পাশাপাশি আসনে বসালেন। আমার বাঁ পাশে মুকু। প্রদীপ জ্বলছে। ধূপের ধোঁয়া পাক খাচ্ছে উষার ফিকে গোলাপী আলোয়। আমাদের সামনে কোষা-কোষী, তাম্রকুণ্ড। ছোটদাদু বসেছেন সামনে পদ্মাসনে।

ছোটদাদু বললেন, 'জয়, তোমার আঙুলে দুটো আঙটি। ও দুটো কি গ্রহশান্তির জন্যে?'

'আজ্ঞে না। শখের আঙটি।'

'যে-কোনও একটার মায়া ছাড়তে পারবে?'

'কেন পারবো না!'

'তা হলে মুকুর অনামিকায় একটা পরিয়ে দাও। পিন্টুর হাতে একটা রয়েছে দেখছি।' মাতুল মহা উৎসাহে মুকুর আঙুলে আঙটি পরিয়ে দিলেন। বাইরে কলকল করে পাখি ডাকছে।

ছোটদাদু বললেন, 'ব্যাপারটা কি হতে চলেছে বলে তোমাদের অনুমান?'

জয়নারায়ণ বললেন, 'দীক্ষা।'

ছোটদাদু বললেন, 'না, দীক্ষা নয়, বিবাহ।'

হরিশঙ্কর, জয়নারায়ণ দু'জনে একসঙ্গে বললেন, 'বিয়ে!'

আমার বুকের ভেতরটা গুড়গুড় করে উঠল। বিয়ে! এই ভাবে কি বিয়ে হয়! বিয়ের তো কিছু নিয়ম আছে। তা ছাড়া, মুকুর মতামত। হরিশঙ্করের ইচ্ছা, অনিচ্ছা।

হরিশঙ্কর বললেন, 'পাত্রীর মত নিবি না। মুকুর বাবা?'

ছোটদাদু বললেন, 'আমার মত, আমার ইচ্ছা। এর ওপর কারোর কথা তো চলবে না।'

হরিশঙ্কর বললেন, 'বিবাহের একটা অনুষ্ঠান আছে।'

ছোটদাদু বললেন, 'সে দায়িত্ব আমার।'

হরিশঙ্কর বললেন, 'বেশ, কিন্তু ছেলেটাকে এরই মধ্যে সংসারে ঢোকাবি! সংসার যে বড় কদর্য জায়গা। আমি চেয়েছিলুম, ও হবে বৈদান্তিক সন্ন্যাসী। এক মুক্তপুরুষ।'

ছোটদাদু একটা আঙুল তুলে বললেন, 'সন্ন্যাসী হওয়া কি ডাক্তার হওয়া, না ইঞ্জিনিয়ার হওয়া! হবো বললেই হওয়া যায়। সংস্কার চাই, দৈব কৃপা চাই। তুমি তো সব ছেড়ে চলে গিয়েছিলে। ফিরে এলে ঘোর সংসারী হয়ে। কবে মুক্তি পাবে? আশার ছেলের মানুষ হতে পনের-কুড়ি বছরের ধাক্কা। এই পনেরটা বছর তোমার কোনও মুক্তি নেই। সংসার! আমরা কে সংসারের বাইরে আছি হরিশঙ্কর। সংসার ঢুকে বসে আছে আমাদের মনে। পক্ষহীন শোনো বিহঙ্গম, এ যে নহে পথ পালাবার। জেনে রাখো, যৌবনের সকালেই তুমি তোমার স্ত্রীকে হারিয়েছ। এই বয়সে তোমার পুত্রবধূর প্রয়োজন, যাকে তুমি মা বলে ডাকবে। সেই ডাকাটাই তোমার সাধনা। পিন্টু আর মুকু, দু'জনের দুই গ্রহ। দু'জনের রাশিচক্রের মিলনে এই সংসার হেসে উঠবে। এর কিছু আছে, কিছু নেই, এর যা নেই, ওর তা আছে, ওর যা নেই, এর তা আছে। কি রকম জানো, একটা ছবি ছিঁড়ে দু'টুকরো হয়ে আছে, এখন শুধু সাবধানে জুড়ে দেওয়া। কোনও পক্ষের কোনও প্রতিবাদ আছে?'

কারোর মুখে কোনও কথা নেই। নীরবতায় পেরেক ঠুকছে ঘরের দেয়াল ঘড়ি। যেন কোনও স্বর্ণকার সময়ের অলঙ্কারে মিছরি কাটছে।

ছোটদাদু বললেন, 'নীরবতাই সম্মতির লক্ষণ। একটা প্রশ্ন কেবল মুকুকে, তোমার মন থেকে পুলিস অফিসারের সেই ছেলেটি ঝরে গেছে কি? সুরঞ্জনার দাদা?'

মুকু চমকে উঠল।

ছোটদাদু বললেন, 'বিপজ্জনক জীবনসঙ্গী হত। ওদের পরিবারে তোমার সুখ হত না। ওদের আদর্শের সংজ্ঞা আলাদা। তুমি এই পরিবারের জন্যেই তৈরি।'

মুকু বললে, 'আমার রাগ আর অভিমান দুটোই হয়েছিল।'

'এখন?'

'এখন আর কিছু নেই।'

'আমি যা চাইছি তোমার মত আছে!'

'আছে।'

'তোমার বাবার মত?'

'কে বাবা? কার বাবা? আমার বাবা, আমার সামনে বসে আছেন।'

হরিশঙ্কর স্নিগ্ধ চোখে মুকুর দিকে তাকালেন। ভোরের নীল আকাশ অনেক সময় মানুষের দিকে এই ভাবে তাকায়। ফাঁদে পড়া ধেড়ে ইঁদুরের মতো আমার মনের অবস্থা।

ছোটদাদু বললেন, 'পিন্টু, এইবার তোমাকে প্রশ্ন, দেখলে তো অনেক, একই মশলার রকমভেদ, মুকুকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছো?'

আমার মাথা অবনত। মুকু কি আমাকে মানুষ ভাবে! ওর চরিত্রের বলিষ্ঠতা আমার আছে কি? আমার সুরঞ্জনা, আমার জবা। আমার দুর্বলতার পরিধি তো কম নয়! আমি একটা ফড়িং। লাফ মেরে একবার এই ঝোপে, একবার ওই ঝোপে।

ছোটদাদু বললেন, 'উত্তর দাও।'

'আমি সব দিক থেকে ওর অযোগ্য।'

'আমি এই জ্ঞানোদয়টুকুই চেয়েছিলাম। যোগ্যের জন্যেই অযোগ্য। আচ্ছা শুরু করা

যাক অনুষ্ঠান। একই মন্ত্রে দু'জনের দীক্ষা। মন্ত্রের জীবনবন্ধন।'

অনুষ্ঠান শুরু হল। ছোটদাদু আচমন করে প্রত্যেকের হাতে একটু একটু গঙ্গাজল দিলেন। মন্ত্রটি ভারী সুন্দর,

হংস ঋষিঃ। অব্যক্তাং গায়ত্রী ছন্দ।
পরমহংস দেবতা। অহমিতি বীজম্।
স ইতি শক্তিঃ। সোহহমিতি কীলকম ॥

হরিশঙ্করের হাতে আমার ডান হাত, জয়নারায়ণের হাতে মুকুর ডান হাত। দু'জনে আমাদের হাত মেলালেন। ছোটদাদু লাল সুতোর সাতটা পাক মেরে বন্ধন দিলেন। সেই মিলিত হাতের ওপর শুরু হল তাঁর জপ। সময় চলে যায়। ধ্যান গভীর থেকে গভীরতর। একটা তরঙ্গ বহে চলেছে শরীরে। একটা ঘোর। অদ্ভুত একটা ভালবাসার ভাব। একটা স্নিগ্ধতা। মুকুর আঙটি চলে এল আমার আঙুলে, আমারটা মুকুর আঙুলে। ছোটদাদু কখন যে শাঁখা, সিঁদুর জোগাড় করেছিলেন, তাও জানি না। আমাকে বললেন শাঁখা পরাও, সিঁদুর দাও। ছোটদাদু বিশুদ্ধ উচ্চারণে বলছেন,

শক্তয়োহস্য জগৎ কৃৎস্ন শক্তিমাংস্তু মহেশ্বরঃ।
শক্তিস্ত শক্তিমদ্রুনাদ্ ব্যতিরেকং ন গচ্ছতি।
তাদাত্ম্য মনয়োনিত্যং বহ্নি দাহি কয়োরিব ॥

ছোটদাদু বললেন, 'এইবার তোমরা দু'জনে আমাদের সাতবার প্রদক্ষিণ করে আসনে বোসো।'

গোটা একটা মেয়ে আমার হাত ধরে গোল হয়ে ঘুরছে। মাথায় লাল ঘোমটা, হাতে শাঁখা, কপালে সিঁদুর। ধূপের ধোঁয়া, প্রদীপের শিখা। মন্ত্রের ওঙ্কার। ক্ষণিকের জন্যে মনে হল, এই ঘরের বাইরে, তাঁবুর মতো বিশাল এক মশারির ভেতর একটি অসহায় পরিবারের অনিশ্চিত কাহিনী তৈরি হচ্ছে।

আসনে বসলুম দু'জনে। ছোটদাদু আমাদের কানে বীজমন্ত্র দিলেন। দিয়ে বললেন,

'কয়েকটি কথা স্মরণে রেখো। জীবনের পথে কাজে লাগবে, সুখে, দুঃখে, শান্তিতে, অশান্তিতে, সত্যকে হারিয়ে ফেলো না। উদার দৃষ্টিতে দেখবে। কখনো উৎকণ্ঠিত হবে না। বিপদে হারিয়ে ফেলো না নিজেকে। মনকে ধরে রাখবে কেন্দ্রবিন্দুতে, প্রদীপের স্থির শিখার মতো। মনকে শান্ত রাখবে, এক সেকেন্ডের জন্যেও দৃঢ়তা হারাবে না। মন হবে টলটলে তরল, নমনীয়, উদার, উন্মুক্ত, স্বাধীন। শরীর যখন বিশ্রামে তখনও মন যেন একাগ্রতা না হারায়। প্রচণ্ড ব্যস্ততা ও বিক্ষিপ্ততাতেও মাথা যেন ঠাণ্ডা ও স্থির থাকে। শরীর যেন মনের দ্বারা প্রভাবিত না হয়, মনও যেন শরীর নিরপেক্ষ থাকে। মনকে ধরে থাকবে, শরীরটাকে ভোলার চেষ্টা করবে। মনকে সব কিছু জানাবে ; কিন্তু বাজে ব্যাপারে মাথা ঘামাবে না। বাইরের ব্যাপারে মাথা ঘামাবে না, নিজের ভেতরের শক্তিকে জাগাবার চেষ্টা করবে। ক্ষুদ্রকে বৃহতের ধারণা করতে হবে, বৃহৎকে ক্ষুদ্রের। সততাই একমাত্র মন্ত্র। জ্ঞানের পরিধি বাড়াও। জগতের সব কিছু জানো, বিচার, অবিচার, সৎ, অসৎ। সমস্ত শিল্প ও দক্ষতা আয়ত্ত করো। পৃথিবী তোমাকে যেন ঠকাতে না পারে, যেন বোকা না বানাতে পারে।'

ছোটদাদু হেসে বললেন, 'এইবার তোমরা গুরুজনদের একসঙ্গে প্রণাম করো।'

প্রণাম শেষ হতেই বললেন, 'পুবের জানালার দিকে মুখ করে দু'জনে পাশাপাশি বোসো, মুকু বসবে তোমার বামে। তোমার বাঁ হাতের ওপর থাকবে মুকুর ডান হাত।

ওই অবস্থায় একশো আটবার বীজমন্ত্র জপ করবে ধীরে ধীরে, নিঃশব্দে, একসঙ্গে। মনে মনে চিন্তা করবে, মন থেকে মনে চলে গেছে, মন্ত্রের উজ্জ্বল একটি সেতু। একশো আট হয়ে যাওয়ার পর, মুকু বসবে তোমার কোলে। ওই ভাবে একশো আট। তারপর তোমরা মিলিত হবে। শরীরে শরীর। ঊর্ধ্বে অধে, অধে ঊর্ধ্বে। কিন্তু, সঙ্গমের হি কর্তব্যং কর্তব্যং ন তু মৈথুনম্। আশা করি বুঝতে পারলে। আমরা চলে যাচ্ছি। দরজা বন্ধ হচ্ছে বাইরে থেকে।'

বন্ধ দুয়ার জীবের উপমা। বাইরেটা বন্ধ না হলে আত্মপ্রকাশ কি অসম্ভব! ওই দুয়ার যখন জগতের দিকে খুলে গেল আবার, তখন আর আমি নয়, আমরা দেখলুম, এক শান্ত, সমাহিত সাধক, সাদা শার্ট, সাদা ধুতি পরে পথ ধরে হেঁটে চলেছেন, দূর থেকে দূরে। একবারও পেছন ফিরে তাকালেন না। যা ঘটে গেল, গেল। সম্পূর্ণ নিরাসক্ত। কৃষক যে-ভাবে জমিতে বীজ ছড়াতে ছড়াতে চলে যান দিগন্তের কোনও এক মহাবৃক্ষের আড়ালে। তারপর রাত আসে, মৃত্তিকার স্নেহে সময় খেলা করে যায়, দিবসের সূর্য শাসন করে, আরোপ করে তিতিক্ষা, আনন্দে উপ্ত হয় প্রাণ। চিতা জ্বলবে একের পর এক, সময়ের ব্যবধানে। সাক্ষী মহাকাল লিখবে জীবের কাহিনী, বাতাস উল্টে যাবে পাণ্ডুলিপির পাতা।

আমাদের জাফ্রি ঘেরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে হরিশঙ্কর নায়কের মতো হেসে বললেন,

'তুমিও সংসারী, আমিও সংসারী। বউমা এইবার চা চাপাও।
জীবনের লিকার যত গাঢ় হবে, আদর্শের দুধ তত বেশি ঢালবে, স্থৈর্যের চিনি।'

লাল মতো একটা কি চলে গেল! মুকু। জয়নারায়ণ অকৃত্রিম ছেলেমানুষের মতো বললেন,

'ওই দেখ তোর বউ! বউমা ডাকে নড়ছে, চড়ছে। নিউ চ্যাপ্টার অফ ইওর লাইফ।'

—

9 788172 150877